কাশীকান্ত মৈত্র

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫/২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ, ১৩৬৫

প্রচ্ছদ : রঞ্জিত দাস

মুদ্রাকর :
শ্রীনিশীথকুমার ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং অফিস
২০৯এ, বিধান সরণি
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মূল্য : পঁচিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

সামাজিক ন্যায়-বিচার গণতান্ত্রিক আদর্শ মূল্যবোধ ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে শোষণ দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী ভারত গড়ে তোলার নিরলস আপোষহীন সংগ্রামের সকল সৈনিকের উদ্দেশে—

—লেখক

: লেখকের অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থ :

রাজনীতি বিপ্লব কূটনীতি

মার্কসবাদ লেনিনবাদ তত্ত্বে ও প্রয়োগে

ট্রেড ইউনিয়ন ও সমাজতন্ত্র

বাঘা যতীন

বাংলার লুপ্ত অঞ্চল

ভূমিকা

এই বই-এর লেখাগুলির অধিকাংশরই রচনা-কাল ১৯৭৪-৭৬ সাল। কোন পরিকল্পনামত লেখা এ নয়। কৃষ্ণনগরে ধাবাবাহিকভাবে বহু উৎসাহী কর্মী ও বন্ধুদের "পাঠচক্র" বসত। সেই পাঠচক্রে আলোচিত বিষয়বস্তুগুলিই মূলত এই বই-এর বিষয়বস্তু। এই বই-এর শেষ পরিচ্ছেদের বক্তব্য কয়েকটি প্রবন্ধে অনেককাল আগে "দৈনিক লোকসেবক" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এবং ইংরাজীতে "Socialism, Legality and Liberty" শিরোনামায় পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ভিন্ন আকারে। বন্ধুবা অনুরোধ করেছিলেন ছোট ছোট পুস্তিকাকারে লেখাগুলি প্রকাশ করতে। কিন্তু সে সুযোগ যেমন আসেনি, সুযোগ যদিও বা আসত, কোন সহৃদয় প্রকাশকের আনুকূল্য ছাড়া পুস্তিকাকারে এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন রচনা প্রকাশ করা সম্ভবও ছিল না। তাছাড়া দেশে বিশেষ করে—এই রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ যা ছিল তাতে এই ধরনের লেখাগুলি একত্রিত করে বৃহদাকারের বই ছাপতে কোন প্রকাশক আগ্রহী হতে পারেন ভাবিনি। সত্যি কথা বলতে কি, ১৯৫৩ সালে বিশিষ্ট প্রকাশন সংস্থা—"রবীন্দ্র লাইব্রেরী" সাগ্রহে আমার আগের একটা বড় বই "রাজনীতি বিপ্লব কূটনীতি" প্রকাশ করেছিলেন। নূতন বইটির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতে প্রকাশক শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস গভীর উৎসাহ প্রকাশ করলেন এবং পাণ্ডুলিপি চেয়ে নিলেন। সেইজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাঁকে। তখনও কৃষ্ণনগরের বাড়িতে "পাঠচক্র" নিয়মিতই বসত। সুতরাং বই-এর বিষয়বস্তু চূড়ান্ত ও সম্পূর্ণ রূপও নিতে পারেনি। দ্রুতগতিতে ছাপার কাজ চলার ফাঁকে প্রকাশিত বইটি "গণতন্ত্র মুখোশ ও মুখশ্রী" এই নামে বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থাও প্রকাশক করলেন। এমন সময় সারা দেশে "জরুরী অবস্থা" ঘোষিত হলো (২৬শে জুন, ১৯৫৭)। প্রকাশক ছয় ফর্মা ছাপা শেষ করে কাজ বন্ধ করে দিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে আমাকে গোটা পাণ্ডুলিপি ফেরত দিতে এসে জানালেন আবার যখন "জরুরী অবস্থা" উঠে যাবে তখন ছাপার কাজে তিনি হাত দেবেন। পাণ্ডুলিপি তাঁর কাছেই সযত্নে রেখে দিতে অনুরোধ জানাই। প্রকাশক আমাকে লেখার

কাজটা চালিয়ে যেতে অনুরোধ জানিয়ে বিদায় নিলেন। প্রকাশকের সহৃদয়তা মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল।

আমাদের কৃষ্ণনগরের পাঠচক্র কিন্তু "জরুরী অবস্থার" সমস্ত ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেই নিয়মিত বসছিল এবং বহু তরুণ ও সহযোগী কর্মীদের উপস্থিতিতেই চলে আসছিল। "জরুরী অবস্থা" প্রত্যাহৃত হওয়ার পরই প্রকাশক আমাকে জানালেন এইবার বইটার ছাপার কাজ শুরু হবে। কাজ শুরু করতে গিয়ে দেখা গেল পাণ্ডুলিপির অনেকগুলি অংশ হারিয়ে গেছে। বহু চেষ্টা করেও সেগুলো পুনরুদ্ধার করা সম্ভব যখন হলো না, তখন প্রকাশকের হাতে যেসব অংশগুলি পৃথক পৃথক ভাবে ছিল তারই ওপর নির্ভর করে আগের অসমাপ্ত কাজটা শুরু হলো। এর জন্য অনেক দেরীও হয়ে গেল অবশ্য।

এখানে বলে রাখা দরকার, এই বইয়ের প্রথম পরিচ্ছেদ ১৯৫১ সালে "ভারত ও গণতন্ত্র" এই শিরোনামায় প্রকাশিত আমার একটি রচনা—যা সেদিন পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল এবং "দৈনিক বসুমতী" পত্রিকার রবিবাসরীয় সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। পাঠকই বিচার করবেন ঐ রচনাটির প্রাসঙ্গিকতা। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত এই রচনায় যে নীতি মূল্যবোধ আদর্শের কথা বলেছিলাম তা থেকে আমি সরে আসিনি। এই মূল্যবোধগুলিই আমার রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি।

সমাজতন্ত্রকে বাদ দিয়ে গণতন্ত্র সার্থক হতে পারে না, আবার গণতন্ত্রকে পরিহার করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থ হবেই। ভারতের মাটিতে এই দুই-এর সমন্বয় চাই। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধে যে-কথা বলেছিলাম ১৯৫০ সালে প্রকাশিত "মার্কসবাদ লেনিনবাদ তত্ত্বে ও প্রয়োগে" গ্রন্থেও তাই বলেছিলাম :

"পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠার দাবী জোরদার হয়ে উঠছে—তেমনি আবার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধের জন্য জনমত সংগঠিত ও সোচ্চার হয়ে উঠছে, সমাজতন্ত্র যেমন গণতন্ত্র—মানবতাধর্মী হয়ে উঠতে চাইবে—গণতন্ত্রও তেমনি শ্রেণীহীন, শোষণহীন, সাম্যধর্মী হয়ে বিকশিত হতে চাইবে। একেকে বাদ দিয়ে অপরের পূর্ণতা নেই—রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র—একটি অপরটির পরিপূরক। দুয়ের সমন্বয়েই সভ্যতার পরিপূর্ণতা" ["মার্কসবাদ লেনিনবাদ তত্ত্বে ও প্রয়োগে"—পৃষ্ঠা ৩৯৮]

আবার এই বক্তব্যই পুনরুচ্চারিত হয়েছে ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত—"রাজনীতি বিপ্লব কূটনীতি" আমার অপর এক গ্রন্থে।

"সামাজিক ন্যায়বিচার, সাম্য ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রকে পরিহার করে তাকে পঙ্গু রেখে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পরীক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আবার রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে বর্জন করে সমাজতন্ত্রের পরীক্ষার সার্থকতা সম্বন্ধে ইতিহাসের রায় নির্মম এবং সুস্পষ্ট। চীন ও রাশিয়ায় বৈষয়িক উন্নয়ন যথেষ্ট হয়েছে নিঃসন্দেহে—কিন্তু সেসব দেশের নাগরিকরা, বুদ্ধিজীবীরা আবার রাজনৈতিক গণতন্ত্রের জন্য সোচ্চার হয়ে উঠছেন। বিশ্ব-বিশ্রুত পদার্থবিজ্ঞানী শাখারভের প্রতিবাদ বিদ্রোহ কি এযুগের সমাজতন্ত্রী ও বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ নয়? নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক সলঝেনিৎসিনের বিদ্রোহ তো অন্ধকারের নায়কদের বিরুদ্ধেই। রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের সাধনা ও প্রয়াস নিরলসভাবে চালিয়ে যেতে হবে যুগপৎ। একটি অপরটির ওপর অনিবার্যভাবে নির্ভরশীল। ভারতকে সেই নূতন পথে সাহসের সঙ্গে এগুতে হবে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র সেই বলিষ্ঠ পথের সন্ধান দিয়েছেন ভারতবাসীকে.... প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পূর্ণ রাজনৈতিক গণতন্ত্রের গ্যারান্টি না থাকলে দেশের জনগণ একপার্টি-শাসনের লৌহ হস্তের বজ্র-মুষ্টির পেষণে নিষ্পেষিত হয়। ভারতের জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীলদের এই সমন্বয়ের নূতন পথেই এগুতে হবে মহারাত্রির তপস্যা কি রুশ ও চীনদেশের অপ্রয়োজনীয় নকল সংস্করণরূপে ভারতকে গড়ে তোলার জন্যই? যে কোন দেশভক্ত দেশব্রতী দেশহিতৈষী এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবেন।" [রাজনীতি বিপ্লব কূটনীতি: ভূমিকা]

এই মূল চিন্তাধারাই এই বই-এরও বিষয়বস্তু। "পাঠচক্রের" আলোচিত বিষয়গুলির সংকলনে রচিত এই বই-এ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের সমন্বয়ের কথাটাই তুলে ধরেছি, গণতন্ত্রের আদর্শকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি—তার বিপদের দিকগুলিও আলোচনা করেছি। পাণ্ডুলিপির যে অংশগুলি হারিয়ে গিয়েছে তা আর এই গ্রন্থে সংযোজিত করা গেল না।

১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন "জরুরী অবস্থা" ঘোষিত হবার পর দেশের ওপর দিয়ে এক ঝড় বয়ে গেল। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরের দিন রাজ্যসভার

কয়েকজন সদস্যের নির্বাচনের তারিখরূপে ঘোষিত ছিল। ঐ দিনের ভোটাভুটির ফল বৈকালেই ঘোষিত হলো। কংগ্রেস মনোনীত সদস্যরাই জয়ী হলেন। কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দেওয়া হয়নি এই সন্দেহে, এই অনুমানের ভিত্তিতে—আমাকে সহ দলের পাঁচজন প্রবীণ সদস্যকে পরিষদীয় দল থেকে 'সাস্‌পেণ্ড' করে ৭ দিনের মধ্যে 'শো কজ' নোটিশের জবাব দেবার নির্দেশ দেওয়া হলো। ২৭শে জুন রাত্রে নোটিশ পেলাম। সেই নোটিশের জবাবে যে দীর্ঘ চিঠি পরিষদীয় দলকে ২রা জুলাই, ১৯৫৫ তারিখে পাঠাই তার কিছু কিছু অংশ পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এই বই-এর শেষে "পরিশিষ্ট" হিসেবে চিহ্নিত করে সংযোজিত হয়েছে। অভিযোগের উত্তরে ঐ চিঠিতে যে মূল রাজনৈতিক বক্তব্য রেখেছিলাম তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ এই বই-এর বিষয়বস্তুর মূল সুর। তাই এই চিঠিটার অংশ "পরিশিষ্ট"-রূপে সংযোজিত করেছি বন্ধুদের অনুরোধে। এই চিঠি পাবার পরই পরিষদীয় দল আমাকে দল থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং দলও সেই সিদ্ধান্তকে সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরী করলেন। একই কারণে আরও দুজন বিধানসভা সদস্যকে দল থেকে বহিষ্কার করা হল।

এর পর ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার চলতি অধিবেশনে সরকার পক্ষ একটি সরকারী প্রস্তাব (Official Resolution) উত্থাপন করলেন। সেদিনের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এই প্রস্তাবের মূল রূপকার। প্রস্তাবটি সমর্থন করেছিলেন আর এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রবীণ গান্ধীবাদী নেতা শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি। অবশ্য শ্রীমুখার্জি একটা সংশোধন এনেছিলেন যা সরকার পক্ষ গ্রহণ করে নেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মনোনীত "স্বর্ণ সিং কমিটি" সংবিধান সংশোধন সম্বন্ধে তাঁদের প্রতিবেদন ও প্রস্তাবনাগুলি সুপারিশাকারে চূড়ান্তভাবে পেশ করার আগেই পশ্চিমবাংলার বিধানসভায় শাসক দলের পক্ষ থেকে প্রস্তাব এল সংবিধান সংশোধন করার। ৪২-তম সংবিধান সংশোধন আইনে যে মূল প্রস্তাব ছিল তাঁরই সুস্পষ্ট প্ররোচনা ছিল এই প্রস্তাবে। পার্লামেণ্টকে সংবিধান সংশোধনের জন্য আবেদন জানান হলো। ভারতে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাই এই অনন্য কৃতিত্বের দাবীদার! সেদিনও আমি নীরব দর্শক ছিলাম না। প্রস্তাবের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলাম। আমার পেছনে দল ছিল না যে, বক্তৃতা করার জন্য যথেষ্ট সময় পাব। সেদিন বিধানসভায়

উপস্থিত দুজন আর. এস. পি দলের মাননীয় সদস্য যখন জানতে পারলেন সভাকক্ষে এসে যে, আমিই একমাত্র প্রতিবাদী বিরোধী বক্তা, তখন তাঁরাই তাঁদের দলের জন্য বরাদ্দ সময়টুক স্পীকার মহোদয়কে বলে আমাকে ছেড়ে দিলেন। এর জন্যে এই দুই সহৃদয় সদস্যকে সেদিন জানিয়েছিলাম আমার কৃতজ্ঞতা। আমি প্রস্তাবের বিরোধিতা করে দীর্ঘ বক্তৃতা করি এবং বক্তৃতা শেষ করি কবিগুরুর "সভ্যতার সংকট"—ঐতিহাসিক রচনার কিছু অংশ এবং উপসংহারে উচ্চারিত উপনিষদের বাণীটি উদ্ধৃত করে :

"অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি
ততঃ সপত্নান জয়তি, সমূলস্তু বিনশ্যতি।"

আমার বিরোধিতা সত্ত্বেও সদস্যে-ঠাসা সমস্ত সভাকক্ষ বিনা বাধায় বলার সুযোগ দিয়েছিলেন। বিধানসভা কক্ষের ভিতরে ও লবিতে কি ভীতি-বিহ্বল পরিবেশই না সেদিন লক্ষ্য করেছিলাম। বহু কংগ্রেস সদস্য আমাকে বাইরে এসে গোপনে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সেদিন। প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত বিনা বাধায় পাশ হলো না।

আমি সেদিন বলেছিলাম—এই প্রস্তাব সুন্দর সুললিত ভাষায় রচিত হলেও এ এক হিমশৈলের মত ('An iceberg resolution')—যার জলের ওপর জেগে-থাকা অংশটি সমুদ্রের তলদেশে প্রসারিত গুপ্ত অংশটিকে যাত্রী ও নাবিকের চোখের আড়াল করেই রাখে—আর সেই গোপন জলের তলায় লুকানো অংশই জাহাজ-ডুবির কারণ হয়ে থাকে। এ সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব যা প্রকাশ করছে তা সামান্যই, যা গোপন করছে জনতার দৃষ্টি থেকে তা সত্যিই মারাত্মক। দেশে "জরুরী অবস্থা"কালীন সংবাদপত্রের সেন্সর ব্যবস্থা চালু থাকায় আমার বক্তৃতার উল্লেখ কোন কাগজেই ছিল না। দেশের সাংবাদিকরা সেদিন ছিলেন অসহায়।

তারপর এল ঘটা করে ৪২-তম সংবিধান সংশোধন আইন পার্লামেন্ট থেকে পাশ হয়ে পশ্চিমবাংলার বিধানসভায় অনুমোদনের জন্য সাংবিধানিক রীতি অনুযায়ী। তখনও "জরুরী অবস্থা" চলেছে দেশে। বিধানসভায় সমগ্র বিলটির বিরোধিতা করি আমি একা এবং আলোচনা শেষে ভোটাভুটির জন্য "ডিভিশন" দাবী করি। সেদিন বিধানসভায় একটিমাত্র ভোটই বিলের বিরুদ্ধে পড়েছিল এবং একটি মাত্র কণ্ঠই প্রতিবাদ করেছিল।

দোর্দণ্ড প্রতাপশালী শাসক দলের চোখ-রাঙানি-হুমকী-ব্ল্যাক মেইলের ভয়ে মুখ বুজে থাকিনি। গণতন্ত্রীরূপে, জনগণের একজন সেবক হিসেবে আমার দায়িত্ব পালন করেছি মাত্র—তার বেশি কিছু নয়। যাঁরা অবর্ণনীয় অত্যাচার অবিচার নিপীড়ন সইলেন গণতন্ত্র মানবিক অধিকার ও মূল্যবোধের রক্ষার ঐতিহাসিক সংগ্রামে সেই অসংখ্য নেতা কর্মী দেশভক্ত ও দৃঢ়চেতা নাগরিকদের লাঞ্ছনা-বরণ ও ত্যাগ-স্বীকারের কাছে আমার এই সামান্য প্রতিবাদ অকিঞ্চিৎকর আমি জানি, আমি মানি। বিধানসভায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরূপে দেশের একজন অতি নগণ্য সেবকরূপে গণতন্ত্রের আলো নিভিয়ে দেবার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা ক্ষীণ প্রতিবাদও যে জানাতে পেরেছিলাম সেটা আমার জীবনের পরম সৌভাগ্য ও পবিত্র কর্তব্য পালন বলে মনে করি। ১৯৫৬ সালের ভাষণে ৪২-তম সংবিধান সংশোধন আইনের বিরোধিতা করতে গিয়ে বিধানসভার সকল সদস্যদের কাছে বিশ্বকবির কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃত করে শুনিয়েছিলাম :

> "স্থির থেকো তুমি
> থেকো তুমি জাগি,
> প্রদীপের মত আলস তেয়াগি।
> এ আঁধার মাঝে তুমি ঘুমাইলে
> ফিরিয়া যাইবে তারা॥"

ঘোর অমানিশার মধ্যে যখন সমগ্র রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবন নিমজ্জিত তখন আমরা যেন আদর্শের প্রদীপ জালিয়ে সকল আলস্য ভয় শঙ্কা পরিত্যাগ করে অন্ধকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাই। উত্তরকালের মানুষের কাছে কি কৈফিয়ৎ দেব আমরা যদি সকলে আলো নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারের জয়গান গাই? দিন আসবে—মহা আশার বাণী নিয়ে নূতন যুগের আহ্বানে নূতন ঊষার স্বর্ণ-দ্বারের পথ চিনিয়ে দেবার জন্য আগামী কাল উপস্থিত হবে আমাদের সামনে। কিন্তু তারা যদি এসে দেখে আমরা নিদ্রামগ্ন—তাহলে অনাগত কালের মানুষের মুক্তি-সাধনার যাত্রায় আমাদের উত্তরসূরীরা নির্বাক বেদনায় ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে। তা কোনও মতেই হতে পারে না। সেদিন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য কংগ্রেস দলের সকল সভ্যকে আহ্বান জানিয়েছিলাম। আহ্বান জানিয়েছিলাম নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শকে তুলে ধরার জন্য।

শুনিয়েছিলাম সুভাষচন্দ্রের মহাবাণী। বিনা বাধায় আমার বক্তব্য এক ঘণ্টাকাল ধরে বলার সুযোগ আমি সেদিনও পেয়েছিলাম। তার জন্য সেদিনও আমার অকুণ্ঠ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলাম মাননীয় সকল সদস্যদের।

তারপর এল ঐতিহাসিক ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচন এবং রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন—আমূল পরিবর্তন। এই সব ঘটনার মধ্যেকার কালটুকুই আমার এই বই-এর বিষয়বস্তু রচনার কাল। আমার অনেক বন্ধু অনুরোধ করেছিলেন "জরুরী অবস্থার" সময় ১৯৭৬ সালের এপ্রিল ও ডিসেম্বর মাসে ৪০-তম সংবিধান সংশোধন আইন সম্বন্ধে বিধানসভায় আমার বক্তব্যের ভিত্তিতে একটা রচনা অন্তর্ভুক্ত করতে।

"পাঠচক্রে" এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রচনাকারে তৈরী করা হয়েছিল। কিন্তু বই-এর কলেবর বৃদ্ধি ঘটবে ভেবে ঐ লেখাটা এই বই-এর অন্তর্ভুক্ত করা হলো না।

একটা তর্ক ৪২-তম সংবিধান সংশোধন আইনকে কেন্দ্র করে সেদিন দেশে উঠেছিল বুদ্ধিজীবী মহলে। সংশোধনের বিপক্ষে যাঁরা ছিলেন তাঁরা একটা মৌল প্রশ্ন তুলেছিলেন : ভারতের সংবিধানের "মূল বৈশিষ্ট্য" (Basic Structure) ধ্বংস করার কোন ক্ষমতা পার্লামেন্টের নেই। আর সমর্থনের পক্ষে যাঁরা নিজেদের বিশেষজ্ঞ বলে দাবি করতেন সেদিন তাঁরা বলেছিলেন, ভারতের সংবিধানের "Basic features" অথবা "Basic structure" বলে আসলে নাকি কিছু নেই-ই। পশ্চিমবাংলার বিধানসভায় ওঁরা এই কথাটাও খুব জোর দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন। আমি এই বিতর্কের জবাবে বিধানসভায় "শ্রীমতী ইন্দিরা নেহরু গান্ধীর" নির্বাচনী আপীল মোকদ্দমায় সুপ্রীম কোর্টের রায়ের উল্লেখ করেছিলাম এবং "কেশবানন্দ ভারতীর" মোকদ্দমায় সুপ্রীম কোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়েই সবপ্রথম ভারতের সংবিধানের "মূল বৈশিষ্ট্য"-র কথাটা বলা হয়েছিল। বিচারপতি এইচ. আর. খান্নাই এই কথাটা বলেছিলেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আপীল মোকদ্দমা সুপ্রীম কোর্টে চলাকালে ভারতের সংবিধান সংশোধন করে প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, স্পীকার এঁদের নির্বাচন বৈধতা সম্পর্কিত মোকদ্দমা শুনানীর অধিকার আদালতের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে—বিচারের ক্ষমতা পার্লামেন্টের সদস্যদের দিয়ে গঠিত কমিটির হাতে অর্পণ করা হয়েছিল। যে-আইন দ্বারা এই সংবিধানিক সংশোধন আনা হয়েছিল সেটা ছিল

৩৯-তম সংবিধান সংশোধনী আইন [Constitution Thirty-nineth Amendment, 1957 with effect from 10. 8. 1975. Special provision as to elections to Parliament in the case of Prime Minister and Speaker.] এই সংশোধনী আইন দ্বারা ভারতের সংবিধানে "Art. 32 -A" সংযোজিত হলো।

সংবিধানের এই সংযোজিত নূতন ৩২৯(ক) ধারায় যেমন প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার প্রভৃতি উচ্চ পদাধিকারীদের নির্বাচন কোন আদালতে চ্যালেঞ্জ করার অবকাশ আর রইল না—তেমনি যে পরিষদীয় কমিটি বা সংস্থার কাছে এই নির্বাচন চ্যালেঞ্জ করা চলবে—যে-সব কারণের ভিত্তিতে—নূতন পৃথক আইন প্রণয়ন করে সেই আইনের বৈধতাও আবার কোন উচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ করা চলবে না [Art. 329-A of Constitution of India]। আবার যদি সেই নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে কোন বিতর্ক বা মোকদ্দমা উক্ত বিশেষভাবে গঠিত পরিষদীয় কমিটির কাছে আসে এবং কমিটি কোন সিদ্ধান্ত নেন—সেটাও কোন আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। আইন এমনিভাবেই বিশেষ স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য রচিত হয়েছিল।

বিধানসভায় আমি অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচনী আপীল মোকদ্দমায় সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের রায় উদ্ধৃত করে দেখিয়েছিলাম যে, "কেশবানন্দ ভারতীর" (১৯৫৩) মোকদ্দমার রায়ের পরও সংবিধানের "মূল বৈশিষ্ট্য" "Basic features of Constitution'-তত্ত্ব ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় থেকে স্বীকৃতি লাভ করেছে। শ্রীমতী গান্ধীর সমর্থনে যাঁরা সবচেয়ে সোচ্চার থেকে ভিন্ন মতাবলম্বীর কণ্ঠরোধ করতে উদ্যত ছিলেন তাঁদেরই সেদিনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার নেতার অন্যতম প্রধান যুক্তি ছিল ভারতের সংবিধানের কোন বিশেষ "বৈশিষ্ট্য" (Basic structure) নেই—তাই পার্লামেন্ট সংবিধানের খোল-নলচেও পাল্টাতে পারেন—প্রয়োজনীয় সংখ্যাধিক্যের জোরে। আর "মৌল অধিকার" (Fundamental rights) ? মৌল অধিকার বলেও এ যুগে নাকি কিছু নেই, থাকতে পারে না। বিচারপতি শ্রীখান্না কেশবানন্দ ভারতীর মোকদ্দমায় তাঁর নিজস্ব রায়ে এককভাবে সংবিধানের Basic structure-এর কথাটা বলেছিলেন। অন্য বিচারপতিরা সেকথা সমর্থন করেননি। সংবিধানের যখন "Essential

feature" অথবা "Basic structure" বলে কিছু নেই—একজন বিচারপতি শ্রীখান্না তাঁর মন্তব্য দ্বারা সংবিধানের সেই গুণ আরোপ করতে পারেন না। [বিচারপতি শ্রীখান্না, এখানে বলে রাখা দরকার—"মিসা"-আইনের উপর প্রদত্ত বিখ্যাত রায় দিয়ে স্মরণীয় হয়ে রইলেন। জরুরী অবস্থা চলাকালেই ঐ বিখ্যাত রায় দিয়েছিলেন তিনি।]

বিচারপতি শ্রীখান্না কেশবানন্দ ভারতীর মোকদ্দমায় বলেছিলেন :

..."the power of amendment under Article 368 does not include the power to abrogate the Constitution, *nor does it include the power to alter the basic structure or frame-work of the Constitution.*"

"সংবিধান সংশোধনী ক্ষমতা প্রয়োগ করে সংবিধানকে বাতিল করা যেতে পারে না। এই সংশোধনী ক্ষমতা সংবিধানের মূল কাঠামো বা বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে না..."

বিচারপতি শ্রীখান্না আরও বলেছিলেন :

"Right to property does not pertain to basic structure or frame-work of the Constitution ...." [All India Reporter, 1973, Supreme Court, Pp. 1903—1904]

সংবিধানে ঘোষিত সম্পত্তি-সম্পর্কিত অধিকার ভারতের সংবিধানের অন্যতম মৌল বৈশিষ্ট্য নয়।

মাননীয় বিচারপতি খান্না ১৯৫৭ সালের "কেশবানন্দ ভারতীর আপীল মোকদ্দমায়" সংবিধানের "মৌল বৈশিষ্ট্য বা কাঠামো" সম্বন্ধে যা বলেছিলেন—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সুপ্রীম কোর্টের আপীল মোকদ্দমার শুনানীকালে বিচারপতিরা তা থেকে আদৌ সরে আসেন নি। বিচারকরা এই "Basic structure"-এর থিওরী স্বীকার করে নিয়েই উক্ত আপীল মোকদ্দমা শুনেছিলেন। এই কথাটি অনেকেরই হয়ত জানা নেই। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ৪২-তম সংবিধান সংশোধন আইনের বিরোধিতা করতে গিয়ে কংগ্রেস দলকে সে-কথাটাও স্মরণ করিয়ে দিয়ে সুপ্রীম কোর্টের রায় থেকে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এ. এন. রায়-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি উদ্ধৃত করে শুনিয়েছিলাম। মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীরায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মোকদ্দমার রায়ে বলেছিলেন :

"It should be stated here that the hearing has proceeded on the assumption that *it is not necessary to challenge the majority view in Keshavananda Bharati's case* (A.I.R. 1957 Supreme Court, Page 1461)." [Smt. Indira Nehru Gandhi Vs. Rajnarayan Per Ray. C. J. at Page 2314, All India Reporter, 1957 (Supreme Court) 2299.]

माननीয় প্রধান বিচারপতির এই মন্তব্যের পর যাঁরা বলেছিলেন সংবিধানের মৌল কাঠামো সম্পর্কিত মন্তব্য নিছক বিচারপতি শ্রীখান্নার নিজের মন্তব্য—এ যুক্তি আর কি টিকতে পারে—প্রশ্ন করেছিলাম সেদিন। সুপ্রীম কোর্টের যে আপীল মোকদ্দমায় শ্রীরাজনারায়ণের বিরুদ্ধে শ্রীমতী গান্ধী জিতলেন সেই মামলার শুনানীর ভিত্তি স্বরূপ "Basic structure" এর এই থিওরীকে মেনে নিয়েছিলেন। এই মামলার রায়ে পুনরায় বিচারপতি শ্রীখান্না বলেছিলেন :

"Clause (4) of Article 329A is liable to be struck down on the ground that it violates the principle of free and fair elections which is an essential postulate of democracy and which in its form is a part of the *Basic structure of the Constitution* inas much as (ii) it abolishes the forum without providing for another forum for going into disputes relating to validity of the election of the appellant and further prescribes that the said dispute shall not be governed by any election law and that the validity of the said election shall be absolute and consequently not liable to be assailed and (vi) it extinguishes both the right and the remedy to challenge the validity of the aforesaid election" [Per Khanna, J.]

৩৯-তম সংবিধান সংশোধন আইনের ৩২৯-(ক) ধারার (৪) ও (৫) উপধারা অবৈধ, কারণ এই উপধারার বিধান দ্বারা স্বাধীন ন্যায়ভিত্তিক নির্বাচন নীতি লঙ্ঘন করা হয়েছে। স্বাধীন বাধামুক্ত নির্বাচন গণতন্ত্রের অন্যতম মূল নীতি এবং ভারতের সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্যও। নির্বাচনী মামলা বিচারের মীমাংসার জন্য স্বীকৃত যে ব্যবস্থা ছিল সেটারও বিলোপ ঘটান হলো—বিকল্প

বিচারের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করেই। প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন চ্যালেঞ্জ করার অধিকারও কেড়ে নেওয়া হলো এবং প্রতিকারের সুযোগও চিরতরে লুপ্ত করা হলো এই সংশোধনী আইনে। প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনকে সকল প্রতিবাদ ও চ্যালেঞ্জের বাইরে রেখে দেওয়া হলো। এটা অগণতান্ত্রিক, অবৈধ।

মাননীয় বিচারপতি ম্যাথু বললেন :

"... ...the amendment would destroy an *essential feature* of democracy as established by the Constitution, namely the resolution of election dispute by an authority—by the exercise of judicial power by ascertaining the adjudicative facts and applying the relevant law for determining the real representative of the people."

মাননীয় বিচারপতি চন্দ্রচূড় বললেন :

"· these provisions are an outright negation of the right of equality confered by Article 14 a right which more than any other is a *basic postulate* of our *constitution.* The provisions are arbitrary and are *Calculated to damage or destroy* the *Rule of law*" [Per Chadrachud, J.]

"এই আইনের উল্লিখিত উপধারাগুলি 'আইনের শাসনে'র মূল ভিত্তিই ধ্বংস করে ফেলবে এবং এ-আইন স্বেচ্ছাচারিতা দোষে দুষ্ট। আইনের চোখে এই আইন সকলের সমতার মৌল আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সমতার আদর্শ সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।"

আমি এই কথাগুলি আজ এখানে প্রথম বলছি না। সেদিন এই যুক্তিগুলি উদ্ধৃত করে বিধানসভা সদস্যদের এই অগণতান্ত্রিক ৪২-তম সংশোধন আইনকে সমর্থন না জানাবার জন্য আবেদন জানিয়েছিলাম। সরকার পক্ষের নেতা বিধানসভার ভেতরে কি বাইরে এই বক্তব্যের কোন জবাবই দিতে পারেননি।

দেশের সংবিধান আর পাঁচটা পার্লামেণ্টের স্লট মেশিন থেকে ভোটে পাশ-হয়ে-আসা কেন্দ্রীয় বিভিন্ন আইনের মত একটা বিধান নয়। এটা একটা "Supra-National document"। সংশোধনের নামে ভোটের জোরে তার "মৌল কাঠামো" বা "আদর্শ" ধ্বংস করার অধিকারকে দেশ কখনই মেনে নিতে

পারে না। ভোটের জোরে পারে দেশের পার্লামেণ্ট পার্লামেণ্টারী সার্বভৌমত্ব-তত্ত্বের আড়ালে এদেশে "প্রজাতন্ত্রের" জায়গায় "রাজতন্ত্র" প্রতিষ্ঠিত করতে? পার্লামেণ্ট সংবিধান সংশোধনের অজুহাতে পারে পাশব সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে "ধর্মনিরপেক্ষ" রাষ্ট্রের জায়গায় ধর্মীয় অনুশাসন পরিচালিত রাষ্ট্র-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে? পারে পার্লামেণ্ট ভারতের প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানের মুখবন্ধে ঘোষিত জাতীয় আদর্শ-পরিপন্থী রাষ্ট্র-কাঠামো প্রণয়ন করতে? কখনই নয়।

ভারতে গণতন্ত্রের বন্ধুরা এই দিকটার প্রতি সব সময় সজাগ ও সচেতন থাকবেন। কেননা পরিবর্তিত পটভূমিতে আবার সংবিধান সংশোধনের জন্য "রাজ্যগুলিকে অধিক ক্ষমতা" দেবার নামে, রাজ্যগুলির "স্বায়ত্তশাসন" (Autonomy) সুনিশ্চিত করার ধুয়ো তুলে আর একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে একটি বিশেষ মহল থেকে, বামপন্থী প্রগতিশীলতার মুখোশ পরে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়েই। সংশোধনের আড়ালে কোন অবস্থাতেই দেশকে দুর্বল হতে দেওয়া চলবে না। ভারতের অতীতের ক্লেদাক্ত ইতিহাসের শিক্ষা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। বিচ্ছিন্নতা-কামী শক্তিগুলি নানা তত্ত্বকথার আডালে নিজেদের দেউলিয়া রাজনীতির চরম ব্যর্থতা ঢাকবার তাগিদে নিত্য নূতন ফন্দী আঁটবে। দেশবাসীকে সাবধান থাকতে হবে অতন্দ্র প্রহরীর মত।

এই সংবিধানকে কেন্দ্র করেই শ্রীমতী গান্ধীর শিবির থেকে "প্রগতিশীলতার" মুখোস পড়ে নির্লজ্জভাবে আর একটি অদ্ভুত বক্তব্য রাখা হয়েছিল: এদেশে নাকি "মৌল" অধিকার বলে কিছু নেই, থাকতেও পারে না। শ্রীমতী গান্ধীর শিবিরের প্রধান পুরোহিত দৃঢ়তার সঙ্গে রাজ্য বিধানসভা বিতর্কে সদম্ভে ঘোষণা করলেন ঐ অতি অদ্ভুত তত্ত্বটি। শুনে স্তম্ভিত হয়েছিলাম সেদিন। প্রথম-বারের ভাষণে উনি আমার বিরোধিতার জবাব ঝাঁঝাল ভাষায় দিয়ে গেলেন। আমার উত্তর দেবার কোন অধিকার ছিল না। ভোট দাবী করে বিরুদ্ধে ভোটটা দিলাম সে সময়। পরের বার "র‍্যাটিফিকেশনের" সময় ঐ মুখ্যমন্ত্রীরই প্রারম্ভিক ৪২-তম সংবিধান সংশোধন আইনকে স্বাগত জানিয়ে ভাষণ দেবার পর আমিই বিরোধিতা করতে উঠে বলি এই যুক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এ যুগে মৌল অধিকার বলতে যা বোঝায় তা আসলে সর্ব দেশের জন্য সর্ব লোকের সর্ব কালের মান্য অবশ্য-গ্রাহ্য মানবিক অধিকার (Human rights)।

"*Human* or *fundamental rights* is the modern name for what have been traditionally known as natural rights, and these may be defined as *moral rights* which every human being, everywhere at all times, ought to have simply because of the fact that in contra-distinction with other beings, he is rational and moral. *No man* may be *deprived of these rights without grave affront to justice* ,"

[Protection Of Human Rights Under The Law : Gains Ezejiofor ; London.]

এই মন্তব্যটি সেদিন বিধানসভায় পাঠ করে শুনিয়েছিলাম।

শুধু মানুষ হয়ে বাঁচতে হলে এই মৌল মানবিক অধিকারগুলি সমাজ ও রাষ্ট্রের দ্বারা মান্য হওয়া চাই-ই। মানুষের কল্যাণের নামে এই মৌল অধিকার হরণের অপচেষ্টাকে রুখতেই হবে। ৪২-তম সংবিধান সংশোধন আইন মৌল স্বাধীনতা ও মানবিক অধিকারের ওপর সেই আক্রমণ চালিয়েছিল। আমাদের সংবিধান যে গণতান্ত্রিক সামাজিক মানবিক উচ্চ আদর্শের কথা ঘোষণা করেছে তাকে সকল অবক্ষয় বিচ্যুতি আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব দেশবাসীরই। সমাজের কল্পিত উন্নতি কল্যাণের নামে সংবিধানের "Basic structure" "Essential features" ধ্বংস করার সকল অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করতেই হবে। তেমনি আবার সংবিধানের মৌল নীতিগুলির রূপায়ণের (Directive principles) যে গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রতিশ্রুতি রয়েছে তাকেও সযত্নে রক্ষা করতে হবে। শ্রীমতী গান্ধী প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানের "Basic structure" "Essential feature"-গুলিকে ধ্বংস করার এক বিরাট পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। তিনি ও তাঁর "গোষ্ঠি" সাংবিধানিক মৌল স্বাধীনতাগুলি হরণ করে গোটা দেশকে গণ-কারাগারে রূপান্তরিত করেছিলেন। দেশে বিরাজ করছিল সন্ত্রাস ব্ল্যাক-মেইল, বিভীষিকা হিংসার রাজত্ব। নিরপেক্ষ প্রশাসন ও আইনের শাসনের সুমহান আদর্শ অপসৃয়মাণ ছায়ার মত দূরে মিলিয়ে গিয়েছিল ; বিরোধী দলগুলিকে পঙ্গু করে দেওয়া হলো, দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে কারারুদ্ধ করা হলো, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হলো। সকলপ্রকার রাজনৈতিক বিরোধিতার অধিকার কেড়ে নেওয়া হলো।

বিচারালয়ের সম্মান মর্যাদা ভূলুন্ঠিত হলো। পার্লামেণ্ট ও বিধানসভাগুলিকে নির্বীর্য করা হলো। "এক দল এক নেতা" "নেতাই দেশ, নেতা অভ্রান্ত", "নেতার উপর কিছু নেই, বাইরেও কিছু নেই" দেশ জুড়ে চলেছিল এই রাজনৈতিক কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মত্ততার তাণ্ডব।

দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য "বিপ্লবের" স্বার্থে নাকি ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল শ্রীমতী গান্ধীর শিবিরের এ ছিল অন্যতম যুক্তি। এই সংবিধান সংশোধন আইনে কিন্তু "বিপ্লবের" বাষ্পমাত্রও ছিল না। কল-কারখানা বা শিল্পপরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর অংশগ্রহণের সাথে স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়নের দু-চারজন নেতার বোর্ডের সভায় উপস্থিতি দ্বারা দেশে শিল্পক্ষেত্রে "বিপ্লব" সাধিত হবে? এর চাইতে হাস্যকর দাবী আর কি হতে পারে? সরকারী খরচায় কিছু কিছু মোকদ্দমায় দরিদ্র শ্রেণীর কিছু কিছু ব্যক্তির পক্ষে সরকার-নিযুক্ত আইনজীবী আদালতে পক্ষ নিয়ে সওয়াল করলে দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্পূর্ণ হবে? আর এই প্রয়োজনীয় কাজ করার জন্য সংবিধান সংশোধন করার প্রয়োজন হয় না। আইন করেই এই সব কাজ করা যায়। কংগ্রেস সদস্যরা এসব বিচার করেও দেখলেন না এই কালা কানুন সমর্থন করার আগে। দলের মধ্যে গণতন্ত্র ছিল না বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। "Statement of objects and reasons" বিধানসভায় উদ্ধৃত করে দেখান হয়েছিল যে, দেশের যে-গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীনতা হরণ করার ব্যবস্থা হলো—স্বয়ং কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী কবুল করেছিলেন:

2. "The democratic institutions provided in the Constitution are basically sound and the path for progress does not lie in denigrating any of these institutions." [Statement of objects and reasons.]

তাহলে দেশের আদালতের স্বাধীনতার ওপর, আইনের শাসনতন্ত্রের ওপর এভাবে আঘাত হানা হলই বা কেন? সংবিধান প্রণীত হবার পর সংবিধান স্বীকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি যদি ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করে থাকে, নিজ নিজ ভূমিকা যথাযথ পালন করেই থাকে, তাহলে এই পদক্ষেপ নেওয়া হলো কেন? "পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বের" দোহাই পেড়ে শেষ পর্যন্ত পার্লামেণ্ট বিধানসভাগুলিকে নির্বীর্য করার ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা হলো। সংসদ

ও বিধানসভা সদস্যরা "ধন্যি ধন্যি" বলে সংবিধানিক গণতন্ত্রের গলায় মৃত্যু-ফাঁস পরিয়ে দিলেন। গণতন্ত্রকে দিয়েই গণতন্ত্রের চিতা-শয্যা তৈরী হলো। ইতিহাসে এমন ঘটনা অন্যান্য দেশেও ঘটেছে। রাশিয়ায় "সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে" নির্বাচিত গণ-পরিষদ (Constituent Assembly) ১৯১৮ সালে লেনিনই অবৈধভাবে ভেঙে দেন, গণতান্ত্রিক অধিকার দলিত করেন, অন্য কোন নেতা নন। হিটলার ও তাঁর দল Weimar Constitution (হ্বাইমার গণতান্ত্রিক সংবিধান) অবলম্বন করেই গণতন্ত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পূর্ণ করেছিলেন।

একথা হয়ত বলা হবে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য সরকার কোন ব্যাপক গণ-কল্যাণধর্মী কর্মসূচী নিতে গেলে নাগরিকদের সম্পত্তিগত অধিকার বা স্বার্থ ক্ষুণ্ণ বা সঙ্কুচিত হবেই। আর যেহেতু ভারতের সংবিধানে সম্পত্তি রাখা, হস্তান্তর করা, নূতন সম্পত্তি অর্জন করা সংবিধানে মৌল অধিকার (Fundamental Rights) বলে স্বীকৃত, সেইহেতু সেই সব অধিকারে হস্তক্ষেপ করে জনকল্যাণধর্মী কোন অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক আইন বা কর্মসূচী আইনের সূক্ষ্ম বিচার [illegible] বা বানচাল হয়ে যেতে পারে। একথার মধ্যে যুক্তি আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু আগে যে ঐতিহাসিক "কেশবানন্দ ভারতীর" মোকদ্দমার উল্লেখ করেছি, সেই মোকদ্দমার রায়ে একজন বিচারপতিও বলেন নি সম্পত্তিগত মৌল অধিকার ভারতের সংবিধানের "মৌল বৈশিষ্ট্য" (Basic feature or Essential feature)। বিচারপতি শ্রীখান্নাও সেকথা বলেন নি। সম্পত্তিগত অধিকারকে পার্লামেন্ট সঙ্কুচিত করতে পারে—কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিতও করতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট তো ২৫-তম সংবিধান সংশোধন আইনকে (25th Constitution Amendment Act) বৈধ বলে মেনে নিয়েছিলেন আগেই।

২৫-তম সংবিধান সংশোধন আইনের বলে ভারতে সংবিধানের ৩১ ধারাকে এমনভাবে সংশোধন করা হয়েছিল যার ফলে কোন নাগরিকের যে-কোন সম্পত্তি সরকার আইন বলে নিয়ে নিলে সেই সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বাবদ দেয় অর্থের যৌক্তিকতা বা পর্যাপ্ততা কোন আদালতেই চ্যালেঞ্জ করা যেত না (adequacy of compensation)। তাহলে "কেশবানন্দ ভারতীর" মোকদ্দমার রায়ের পর এই বিতর্কের কি আর অবকাশ ছিল? ঐ কারণ দেখিয়ে সংবিধান সংশোধনের যৌক্তিকতা তো আদৌ ছিল না।

"মৌল স্বাধীনতা" বলতে এ-যুগে আর কিছুই নেই—আর থাকলেও তা

অলঙ্ঘনীয় নয়—শ্রীমতী গান্ধীর যে-সমর্থকের দল দৃঢ়তার সঙ্গে দিবারাত্র বলে বেড়াচ্ছিলেন—রাজ্য বিধানসভাতেই তাঁদের গোষ্ঠীর পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন নেতা, যাঁকে সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ক্যাবিনেট সদস্যদের না জানিয়েই রাত্রির অন্ধকারে রাষ্ট্রপতি শ্রীফকরুদ্দিন আলি আমেদ-এর কাছে রাষ্ট্রপতি ভবনে "জরুরী অবস্থা ঘোষণার" প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন,—এই কথাগুলি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন। আমি সেদিন বিধানসভায় প্রতিবাদী ভাষণে কংগ্রেস সদস্যদের ও স্পীকার মহোদয়কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম যে, ১৯২৭ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ৪৩-তম কংগ্রেস অধিবেশনে "মতিলাল নেহরু কমিটি"কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল "to draft *Swaraj* Constitution for India on the basis of *Declaration of Rights*"। ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী "মতিলাল নেহরু কমিটি" ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাতে বলা হয়:

"It is obvious that our first care should be to have our fundamental rights guaranteed in a manner *which will not permit their withdrawal under any circumstances*." [Nehru Committee Report]

অর্থাৎ "স্বাধীন ভারতের আগামীকালের সংবিধানে মৌল অধিকারগুলি এমনভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে কোন অবস্থাতেই সেই সব অধিকারের অপহরণ সহ্য করা না হয়।" আশ্চর্যের বিষয় সেদিন কংগ্রেস দল তার এই ঐতিহাসিক রিপোর্টের ঘোষণাকেও কোন মর্যাদা দিল না। এ বক্তব্যের জবাবও সেদিন মেলেনি।

সংশোধনের কোন প্রয়োজন ছিল কি? সংবিধানের রক্ষণশীল কোন কোন ধারা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে অন্তরায় এই অজুহাতে ৪২-তম সংবিধান সংশোধন আইন প্রবর্তনের কোনই যুক্তি ছিল না। আমি এই যুক্তিরও অবতারণা করেছিলাম। আরও বলেছিলাম সম্পত্তিগত অধিকারকে "Fundamental Rights" বলে গণ্য না করে "Statutory Right" বলে গণ্য করা হোক। কিন্তু সংবিধান এভাবে সংশোধনের কি প্রয়োজন আছে? এ প্রশ্নেরও কোন জবাব মেলেনি। অথচ রাজ্য বিধানসভায় ৪২-তম সংবিধান সংশোধন আইন সমর্থিত (Ratified) হয়ে গেল।

দেশের উচ্চ আদালত কবে কোথায় কিভাবে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে বাধা রচনা করেছেন তার প্রমাণ দাখিল করে সরকার তাদের বক্তব্য সমর্থন করুন? আমার এই দাবী সেদিন অরণ্যে-রোদনের মতই শুনিয়েছিল।

ভারতের সংবিধানের মুখবন্ধেও সম্পত্তিগত অধিকারকে সংবিধানের 'বৈশিষ্ট্য'-রূপে স্থান দেওয়া হয়নি। ৪২-তম সংশোধন আইনের ৫৯টি ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মাত্র দুটি পৃথক ধারায় (১) শ্রমিকশ্রেণীর কারখানার বা শিল্প পরিচালনায় অংশ গ্রহণের প্রস্তাব ছিল এবং (২) দরিদ্রশ্রেণীর মানুষকে আদালতে সাহায্যের ব্যবস্থার প্রস্তাব ছিল (legal aid to the poor)। আমার জিজ্ঞাস্য ছিল—এই কারণের জন্য সংশোধনী আইনের প্রয়োজন কোথায়? এর জন্য তো সংবিধান সংশোধন করার প্রয়োজন হয় না। এই আইনের "Statement of objects and reasons"-এর মধ্যে বলা হয়েছিল:

"The question of amending the Constitution for removing the difficulties which have arisen in *achieving the objective of socio-economic revolution which would end poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity* have been engaging the active attention of Government and the public for some years now."

৪২-তম সংশোধনী আইন এক-পার্টি শাসন প্রতিষ্ঠার পথ করে দিয়েছিল। যেদেশে সচেতন নির্ভীক জনমতের সদা-জাগ্রত অতন্দ্র প্রহরা নেই—সেদেশে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটবেই। এ দেশে দারিদ্র্য দূরীকরণের—কি কেন্দ্রে কি রাজ্যে—কোন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যা দেশের আদালত ব্যর্থ করে দিয়েছে? দেশের আইনমন্ত্রী যদি এত বড় অসত্য কথা বলেন—তাহলে দেশে আইনের মর্যাদা রক্ষিত হবে কি করে? সেদিনের কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীই সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন, অশোভনভাবেই, "দেশের সুপ্রীম কোর্ট—সুপ্রীম নয়।" "সুপ্রীম"—শাসক দলের খেয়াল-খুশি, জবরদস্তিপনা। দেশের আইন আদালত সংসদ সংবিধান সব কিছুই মত্ত দল-দেবতার খেয়াল-খুশি চরিতার্থতার যেন হাতিয়ার। ৪২-তম সংবিধান সংশোধন আইন প্রণয়নের পক্ষে গ্রহণযোগ্য যুক্তিই উপস্থাপিত করা হয়নি—তবু ভোটের জোরে এই আইন পাশ হয়ে গেল গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে!

এই সংবিধানকে "সত্যিকারের ফেডারেল কাঠামোর" রূপ দেবার নামে প্রকারান্তরে ভারতকে একটা "কনফেডারেশনে" পর্যবসিত করার চক্রান্ত হচ্ছে। দেশের সংবিধানের "মৌল বৈশিষ্ট্য" আর একভাবে ধ্বংস করতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত আন্দোলন হতে যাচ্ছে। এই চক্রান্ত সফল হলে ভারত নূতন বিদেশী হস্তক্ষেপ ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হবে। ভারতকে দুর্বল করে রাখার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত দীর্ঘদিনের একথা যেন রাজনীতির ছাত্ররা ভুলে না যান। ভারতের সাংবিধানিক গণতন্ত্র ঐক্য সংহতি রক্ষার লড়াই সংবিধান রক্ষার লড়াই-এরই অঙ্গ।

কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যগুলির সম্পর্ক ঠিক কি হবে, কেন্দ্রের হাতে কতটা ক্ষমতা থাকবে এবং রাজ্যগুলির হাতেই বা কতটা ক্ষমতা থাকবে তার ওপরেই আমাদের সংবিধানের (এবং যে কোনও সংবিধানের) মৌলিক রূপ ও বৈশিষ্ট্য নির্ভর করছে। সেই মৌলিক রূপরেখা— সই বৈশিষ্ট্য ও উপরোক্ত "Basic structure" এবং "Essential feature"-এর সামিল। আমাদের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যই হলো শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার যার উপরে দেশের সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রাচীন ঐতিহ্য এবং সর্বোপার দেশের সার্বভৌমত্ব গণ-স্বার্থ রক্ষার গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। কোনও সংশোধনের দ্বারা সেই শক্তিশালী কেন্দ্রকে অপেক্ষাকৃত শক্তিহীন করার চেষ্টা করলে সেই চেষ্টা সংবিধানের সেই "Basic structure"-কে পরিবর্তনের চেষ্টারই নামান্তর হবে।

কেতাবী ঢং-এর তথাকথিত "এ্যাবস্ট্র্যাক্ট" ফেডারেল কাঠামো অবাস্তব এবং আত্মঘাতী হয়ে উঠবে একদিন। একটি বিশেষ দল চাইছেন—কেন্দ্র যেন "পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ, কারেন্সী" এই চার বিষয়ের ক্ষমতা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। "রেসিডুয়্যাল পাওয়ারস" সব রাজ্যগুলিকে দেওয়া হোক। এই প্রস্তাব কার্যকরী হলে তা ভারতের সংবিধানের "মৌল বৈশিষ্ট্যকে" চুরমার করে দেবে। পৃথিবীর কোন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে কি এইভাবে ঠুঁটো জগন্নাথ বানান হয়েছে? রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। কেন্দ্রকে দুর্বল করতে পারলে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিরই পোয়াবারো হবে যে! সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তিগুলি ভারতকে দুর্বল করে রাখতে চায়। সেই চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে গণতন্ত্রীদের, দেশভক্তদের।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর দিকে চেয়ে যাঁরা "খাঁটি" যুক্তরাষ্ট্রীয়

বা ফেডারেল কাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য এই দাবী তুলছেন তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের পটভূমির কথাটা ভুলে যান কেন? সে দেশের প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের ইতিহাসটা কি তাঁরা সুবিধামত ভুলে যাচ্ছেন? সেদেশে প্রথমে মাত্র ১৩টি "রাষ্ট্র" চুক্তি করে একটি সঙ্ঘবদ্ধ ফেডারেশন গড়তে চেয়েছিল। ভারতের আধা-ফেডারেল কাঠামো রচনার পটভূমি-ইতিহাস কি তাই? প্রদেশগুলি কি "চুক্তি" সম্পাদন করে "কেন্দ্রীয় সরকার" তৈরী করেছিল এদেশে? এদেশে "বাম" বলে প্রচারিত একটি রাজনৈতিক মহল প্রয়োজনে পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে আইডিয়াল বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কাঠামোতে "প্রেসিডেন্টের" যে বিপুল ক্ষমতা সে কথা এঁরা ভুলে যান কেন? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টের যে ক্ষমতা ও মর্যাদা ভারতের মার্কসবাদীরা সে বিষয়ে বা ভাবেন না কেন? রাশিয়া বা চীন বা কোন্ কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে আছে জুডিসিয়ারি বা আদালতের সেই ক্ষমতা? গণতন্ত্রের মুখোশ পরেই গণতন্ত্র রক্ষার আর একটা নকল লড়াই সুরু হবার উপক্রম হয়েছে।

এঁরা কি চান ভারতের "রাষ্ট্রপতি" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির মত পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিমান ক্ষমতাবান রাষ্ট্রপতিরূপে স্বীকৃতি লাভ করে তথাকথিত "অটোনোমাস" "স্বাধীন" "অধিক ক্ষমতাশালী" রাজ্যগুলির উপর খবরদারী করেন? মনের সব ইচ্ছাগুলি খুলে বলুন না কেন তাঁরা? দেশবাসীরা তাহলে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পাবেন। দেশকে ভিতর থেকে দুর্বল করে—কেন্দ্রকে ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে রেখে—সংবিধানের মৌল কাঠামোর খোল-নল্চে পাল্টাবার প্রস্তাব এনেছেন যাঁরা তাঁরা বিদেশী শক্তি, সম্প্রসারণবাদী শক্তি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরই আনন্দ বর্ধন করছেন।

রাজ্যগুলি অর্থনৈতিক মুক্তিলাভের জন্য, দ্রুত বিকেন্দ্রিত ব্যাপক বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য, বেকারী দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য চেষ্টা নিরলসভাবে চালিয়ে যাবে। বঞ্চিত অবহেলিত রাজ্যগুলিকে অনুন্নত এলাকাগুলির জন্য আরও ব্যাপক হারে অর্থ বরাদ্দ করতেই হবে, অর্থ নৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ত্বরান্বিত করতেই হবে। কেন্দ্রীয় ও যেকোন আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। কিন্তু দেশকে কোন অবস্থাতেই দুর্বল করা চলবে না। "কেন্দ্র" দুর্বল থাকলে ভারতের কি পরিণতি হতে পারে ইতিহাসের সেই শিক্ষা যেন

ভারতের দেশপ্রেমিক গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীরা বিস্মৃত না হন। চীন দেশের অতীতে অনুরূপ পরিস্থিতিতে কি হাল হয়েছিল সেটাও স্মরণে যেন থাকে ইতিহাসের ছাত্রদের। একথাও যেন ভুলে যাওয়া না হয় যে, প্রতিটি সমাজতন্ত্রী বা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বশক্তিমান। সেই সব দেশে সকল ক্ষমতা সর্বশক্তিমান কেন্দ্রের শক্ত মুঠির মধ্যে ধরা আছে। ফেডারেশন যেন দেশের একটা মুখোশ মাত্র।

খাঁটি কেতাবী ফেডারেল কাঠামোকে রূপ দেবার নামে সংবিধান সংশোধনের নামে বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোই শুধু নয় সত্যিকারের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ধ্বংস করে দেশকে চির-দুর্বল করে রেখে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ষড়যন্ত্র সম্প্রসারণ-বাদীদের লীলাক্ষেত্রে ভারতকে রূপান্তরিত করার এক নূতন খেলার পরিবেশ তৈরী করা হচ্ছে। পৃথিবীর কোন "সমাজতান্ত্রিক" দেশের কাঠামোতে কয়েকটি মূল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে বাকী সব ক্ষমতা "রেসিডুয়াল পাওয়ার" অঙ্গরাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়েছে? রাশিয়া, চীন কি তাই করেছে? সকল কমিউনিস্ট রাষ্ট্রেই সকল ক্ষমতা সর্বশক্তিমান একপার্টি-সর্বস্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই ন্যস্ত। পৃথিবীর কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একটি অঙ্গরাজ্যকে (জম্মু-কাশ্মীরের মত) বিশেষ মর্যাদা, বিশেষ ক্ষমতা (Special Status) দেওয়া হয়েছে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেওয়া হয়েছে কোন ইউনিটকে এই বিশেষ স্ট্যাটাস? আছে সে দেশের সংবিধানে ভারতের সংবিধানের মত ৩৭০ ধারার ন্যায় একটি অদ্ভুত ধারা? পৃথিবীর কোন্ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এরূপ অদ্ভুত বিচিত্র ব্যবস্থাকে দেশের 'শোভা" বলে ঘোষণা করেছে? সংবিধান সংশোধনের নামে এও বলা হচ্ছে "ভারতের আগামী দিনের সংবিধানে ৩৭০ ধারাকে অব্যাহত রাখতে হবে জম্মু-কাশ্মীরকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিতেই হবে"। এ কোন্ সমাজবাদী গণতন্ত্রীর কথা হতে পারে? এ তো দেশকে টুকরো টুকরো করে দেবার নূতন চক্রান্ত। "জরুরী অবস্থা" চাপিয়ে গণতন্ত্র রক্ষার নামে, দেশকে শক্তিশালী করার নামে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার আয়োজনকে ভারতবাসী যদি ব্যর্থ করে দিতে পারেন তাহলে রাজ্যগুলিকে শক্তিশালী করার নামে গোটা ভারতকে চির দুর্বল করে সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদীদের সন্তোষ সাধনের চেষ্টাও সেই দেশবাসীই ব্যর্থ করে দেবেন।

"অধিক ক্ষমতা" কোন-দলের জন্য নয়, কোন রাজ্যের জন্য নয়, বিশেষ

রাজ্যের জন্যও নয়। অধিক ক্ষমতা চাই দেশের জনগণের হাতে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন "All power to the Indian people"—"সকল ক্ষমতা জনগণের হাতে আসা চাই", চাই প্রকৃত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, চাই "চেক্‌স্ এ্যাণ্ড ব্যালেন্স"-এর ব্যবস্থা যাতে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দাম্ভিক প্রকাশকে বৈষম্য অবিচারকে জনগণ ব্যর্থ করে দিতে পারেন। "লোকশক্তির" কাছে "রাজশক্তির" অস্ত্র সংবরণ একমাত্র গণতন্ত্রেই সম্ভব। বঞ্চিত রাজ্যগুলি তার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অর্থ কেন্দ্র থেকে পাবে—এ তো একটা স্বাভাবিক যুক্তিযুক্ত ন্যায়সঙ্গত দাবী। এটা কোন কেন্দ্রীয় সরকারের দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করবে কেন? কিন্তু বর্তমান কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন রাজ্য যথেষ্ট ভাল কাজ করতে পেরেছে এবং বিপুল জনহিতকর কাজ করতে পারে। সমস্ত প্রশ্নটি ধীরে সুস্থে বিবেচনা করে সৌভ্রাতৃত্বমূলক পরিবেশে গোটা দেশের জনগণের প্রতি সুবিচার করার গুরু কর্তব্য যৌথভাবেই সকলকে পালন করতে হবে। কিন্তু যে-ভাবে প্রচার অভিযানে নয়া সংবিধান সংশোধনকামীরা নেমে পড়েছেন আসরে সেটা নিরীহ ব্যাপার বলে মনে করার কোন কারণ নেই। স্বাধীনতা-উত্তর কালে ভারতের প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রয়াত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল খণ্ডিত ভারতের রাষ্ট্রীয় সংহতি সাধনের কাজে যে সৃষ্টিধর্মী দক্ষ ভূমিকা নিয়ে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন সেই রাষ্ট্রীয় সংহতিকে আজ এক তথাকথিত "প্রগতিশীল" গোষ্ঠী "ভারত বহু-জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্র" (India is a multi-national State)-তত্ত্বের ধুয়ো তুলে বিনষ্ট করতে উদ্যত। গণ-তন্ত্রীদের সে ব্যাপারে সজাগ থাকা কর্তব্য। গণতন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করা হবে চরম ক্ষতিকারক। বিশ্ব সৌভ্রাতৃত্বের অখণ্ড বন্ধন ভারতের সভ্যতা-কৃষ্টি-সংস্কৃতির অন্যতম মূল সুর। ভারতের গণতন্ত্রীদের সমাজতন্ত্রীদের ভবিষ্যৎ পৃথিবীর মনুষ্য-জাতির মুক্তির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। ভারতবাসীরা একটি অখণ্ড অবিভাজ্য জাতি-সত্বা।

দেশের সংবিধানে অঙ্গীকৃত মৌল অধিকারগুলির (Fundamental Rights) সঙ্গে সংবিধানের নীতি-নির্দেশক লক্ষ্যগুলির (Directive Principles of State Policy) কোন সংঘাত নেই। দেশের মানুষের সীমাহীন দারিদ্র্য, বেকারী, দেশের অর্থনৈতিক পশ্চাদ্‌পদতা দূর করার জন্ম জাতীয় সম্পদের সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত করার প্রচেষ্টার সঙ্গে নাগরিকদের

"মানবিক মৌল অধিকার"-গুলি সযত্নে রক্ষা করার সঙ্কল্পের মধ্যে কোন সংঘাত আদৌ নেই। "জরুরী অবস্থা" জারী করে ক্ষমতায় নিজের ও "নিজের গোষ্ঠীর" আসন স্থায়ী করতে গিয়ে শ্রীমতী গান্ধী এদেশে সর্বব্যাপী হৃদয়হীন একনায়ক-তন্ত্রের "ইনফ্রা-স্ট্রাক্‌চার" রচনার "ব্লু প্রিণ্ট" তৈরী করে ফেলেছিলেন। সে চক্রান্ত আপাততঃ ব্যর্থ হয়েছে ঠিক। কিন্তু তাই বলে হাল ছেড়ে নিশ্চেষ্ট থাকার কোন কারণ নেই। সামনে দারুণ সঙ্কট, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীদের দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হবে। বহু মূল্য দিতে হবে—বিরাট ত্যাগ, নিঃস্বার্থপর দেশসেবা, কঠোর সংগ্রাম ও আত্মবলিদানের মূল্যেই বিজয় সুনিশ্চিত হবে।

রাজনৈতিক দল ও ট্রেড-ইউনিয়ন সংস্থাগুলি যদি সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধি ও নিছক পাইয়ে দেবার রাজনীতি চরিতার্থতার হাতিয়ার হয়, গোষ্ঠী-স্বার্থ সিদ্ধির আখড়ায় পর্যবসিত হয় তাহলে দেশ ও গণতন্ত্র বিপন্ন হবে। গণতন্ত্র বিপন্ন হলে সমাজতন্ত্রের লড়াইও পর্যুদস্ত হবে। "সমষ্টির" সঙ্গে "ব্যষ্টির" কোন বিরোধ নেই। অংশকে বাদ দিয়ে সমগ্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না—আবার "অংশের" স্বার্থরক্ষার জন্য "সমগ্রের" স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া যায় না। প্রয়োজন সাম্য-ন্যায়-নীতিবোধ, সৃষ্টিধর্মী সমন্বয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই মহাসমন্বয়ের আদর্শের কথা শুনিয়েছেন দেশবাসীকে।

কি দেশে কি সমাজে "material incentives"-ই কেবল মানুষের মূল চালক শক্তিরূপে কাজ করবে? শুধু পার্থিব স্বার্থবোধের তাগিদেই মানুষ সামনের দিকে এগুতে কি পারে? "Moral incentive" "নৈতিকতার তাগিদ" বলে কি কিছুই নেই? সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা, নীতিবোধ, বিবেকবোধ কি রাজনীতির আঙিনা থেকে নির্বাসিত হয়ে রইবে? সামাজিক ন্যায়নীতিবোধ (athics) কি একজন সমাজসেবীর চেতনায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করবে না? সামাজিক ন্যায়নীতিবোধ কি অর্থনীতিরও অন্যতম মূল কথা নয়? "পাইয়ে দেবার রাজনীতি"র অস্ত্রে অবিরাম শান দিয়ে যাঁরা যাচ্ছেন তাঁরা ভুলে যেন না যান যে, এই "কিছু পাইয়ে দেবার" কৌশলকে অবলম্বন করে একটি সরকার যে-কোন শাসক দল ও পুঁজিপতি শ্রেণী এই শ্রমিক শ্রেণীকে সংগ্রাম-বিমুখ করে তুলতে পারে। এ এমন এক অস্ত্র যার দুদিকেই ধার আছে। এ অস্ত্র ব্যুমেরাং-এর মতন, নিক্ষেপ করলে অস্ত্র নিক্ষেপকারীর দিকেই ফিরে এসে তাকে আঘাত করে। পৃথিবীর কোন কমিউনিষ্ট দেশেই 'ইকনমিজম'কেই

শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়াকেই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের চালকশক্তি করতে দেওয়া হয়নি। জাতীয়তাবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলিও ব্যতিক্রম আছে-অবশ্যই—মার্কসিস্ট পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে এ ব্যাপারে অনুকরণ করে চলেছেন। মনে রাখতে হবে হাঁসের পেট চিরে সোনার ডিম বার করার কৌশলের পরিণতি কি হতে পারে। অবিরাম নিছক "কিছু পাইয়ে দেবার নীতি" দেশের কি শ্রমিক শ্রেণী কি সাধারণ নাগরিককে রাজনৈতিক আদর্শ, মূল্যবোধ, দেশ ও সমাজ-সচেতনতা সম্বন্ধ ক্রমে ক্রমে উদাসীন করে তুলবে। স্বাধীন মুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজের কাছে সেটা হবে ক্ষতিকারক অবস্থা। উন্নত মানের জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে সব সময়ই লড়তে হবে— কাজের সর্ত আকর্ষণীয় করা, চাকুরীর স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত করা, বাঁচার মত মজুরী, সামাজিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য শ্রমিক সমাজকে গ্রামীণ কৃষি শ্রমিক, কৃষিজীবীদের সংগ্রাম করতেই হবে। সকল জুলুমবাজী ও অবিচার, বৈষম্য, আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে লড়তে হবে নিরলসভাবে।

কিন্তু এই বিরাট দেশের বঞ্চিত দুর্বল দুঃসহ দারিদ্র্যক্লিষ্ট অবহেলিত বিশাল অংশকে সমাজের ওপরে তুলে এনে পূর্ণ মনুষ্যত্বের মর্যাদা দিয়ে দেশ গড়ার কাজের অংশীদার করার মহান কর্তব্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেই হবে। সমাজ ও দেশহিতৈষণাকে বাদ দিয়ে শ্রমিক আন্দোলন কখনই দাঁড়াতে পারে না। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেরও লক্ষ্য – সমতা, ন্যায়বিচার, শৃঙ্খলা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, উৎপাদন বৃদ্ধি, জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন, গণতন্ত্র, সৌভ্রাতৃত্ববোধ, শৃঙ্খলাবোধ। শ্রমিক শ্রেণী জাতিরই শক্তিশালী বৃহৎ একটি অংশ—সমগ্র জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার পৃথক কোন সত্তা নেই। পরিশ্রমের সঙ্গে পারিশ্রমিকের কোন সম্পর্ক থাকবে না প্রগতিবাদী রাষ্ট্রে? ভারতে কর্মবিমুখতার জয়গান যে লড়াকু ইউনিয়নগুলি গাইছেন তাতে তাঁরা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনেরই ক্ষতি করছেন। প্রয়োজনীয় পরিশ্রম না করে পারিশ্রমিক পাবার দাবী আসলে যে মুদ্রাস্ফীতিরই সহায়ক। মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে নকল লড়াইয়ের যে হুমকি মার্কসবাদী ইউনিয়নগুলি দিচ্ছেন—তা যে কত হাস্যকর ও আত্মপ্রবঞ্চনামূলক দেশের নাগরিকরা কি সেটা বুঝবেন না একদিন?

জাতির উত্থান-পতনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত শ্রমিক সমাজের উত্থান-পতন। গোটা জাতিকে গোটা সমাজকে বাজি রেখে সংগঠিত একটি অংশের

স্বার্থপূরণের লড়াই পৃথিবীতে কখনই সফল হয়নি। নূতন ভারত, শক্তিশালী ভারত গড়ে তুলতে কর্তব্যপরায়ণ সাহসী দেশপ্রেমিক শ্রমিক সমাজকে তার যোগ্য স্থান করে নিতেই হবে। রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে "অর্থ নৈতিক গণতন্ত্রে" রূপান্তরিত করার সংগ্রামে স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলিকে দলীয় সংকীর্ণতাবাদী রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। ত্যাগ ও পরার্থপরতা ছাড়া কোন মহৎ উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। সমাজতন্ত্রের আদর্শ তো একটা মহৎ নৈতিক মূল্যবোধের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। সেখানে হিংসা, সন্ত্রাস, জবরদস্তি, বলপ্রয়োগ, অরাজকতা, ব্ল্যাকমেইল-এর স্থান নেই। সমাজতন্ত্রের জন্যও চাই সাহসী নির্লোভ বিবেকবান উদারনৈতিক ন্যায়পরায়ণ দরদী মানুষ ও নেতা। দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই ধীরে ধীরে সাফল্যের উপাদানগুলি তৈরী হবে।

আশু সাফল্যের তাগিদে মূল লক্ষ্য আদর্শ যেন জলাঞ্জলি দেওয়া না হয়। নিছক আশু সাময়িক সাফল্যের মোহ অনেক সংগ্রাম আন্দোলন নেতৃত্বের সমাধিভূমি। মহৎ আদর্শ, স্বপ্ন "আইডিয়া" মৃত্যুহীন। সাফল্যের নিরিখেই তো সত্যাসত্যের বিচার হতে পারে না। যত দুর্যোগ যত অসুবিধা বাধা আঘাত আসুক আদর্শবাদীরা দুঃসাহসিকতার ডানায় ভর দিয়ে লক্ষ্যের অভিমুখে ক্লান্তিহীন প্রয়াস চালিয়ে যাবেন। মানব ইতিহাসে সেই প্রয়াস নিরলস চেষ্টা সাময়িক ব্যর্থতার অন্ধকারে ঢাকা পড়ে থাকলেও হারিয়ে যায় না কখনই চিরতরে।

আর একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। সোভিয়েট রাশিয়াতে "মানবিক অধিকার" ও গণতন্ত্রের দাবীতে সে দেশের নাগরিকরা বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীরা ধীরে ধীরে সোচ্চার হচ্ছেন। ইউরোপের কয়েকটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টিও এই দাবীতে এতই সোচ্চার হয়েছেন যে, কমিউনিস্ট মতাদর্শ থেকে "সর্বহারার একনায়কত্ব" ("Dictatorship of the Proletariat") তত্ত্ব বর্জন করার দাবী জানান হয়েছে। ফরাসী ইতালী স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি নির্বাচনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট সরকারকে পরিবর্তিত করার দাবী সমর্থন করেছে। প্রতিটি কমিউনিস্ট দেশ ও দল সোভিয়েট নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে "স্বাধীনভাবে" নিজ নিজ পথ অনুসরণ করার দাবীতেও অটল এখন। গণতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী মানুষের কাছে এই নূতন উদ্যমের, তা সত্যিসত্যিই

যদি আন্তরিক হয়, তাৎপর্য সুদূর-প্রসারী। এর দ্বারা গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধেরই জয়যাত্রা সূচিত হচ্ছে। গণতন্ত্রকে এতকাল যে-শিবির থেকে ঊনবিংশ শতকের "পুঁজিবাদী বুর্জোয়া মাল" বলে পরিহাস করা হয়ে আসছিল এদেশে "Euro-Communism" আন্দোলনের প্রভাব সেই শিবিরের ওপর কতটা পড়বে সেটাও দেখতে হবে খোলা মন নিয়ে। তবে এদেশের মার্কসবাদী শিবিরে যেভাবে নূতন করে "স্তালিন-বন্দনা" স্তালিনের মূল্যায়নের নামে সুপরিকল্পিতভাবে হচ্ছে তার শেষ পরিণতি কোন্ দিকে গড়াতে পারে ভারতের গণতন্ত্রীদের সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যে-স্তালিন যুগের স্বৈরতান্ত্রিক দানবীয় কার্যকলাপের বিরুদ্ধে, স্তালিনবাদের বিরুদ্ধে রুশ দেশের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল বিংশতিতম সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে (20th Party Congress, 1956)। ধীরে ধীরে স্তালিনের মূল্যায়নের নামে যা করা হচ্ছে এ দেশের মাটিতে তা "ইউরো-কমিউনিজম"-তত্ত্বের বিরোধী শুধু নয় অগণ-তান্ত্রিকও। "গণতন্ত্র সুরক্ষিত" ও "প্রসারিত" করার আন্দোলনের সঙ্গে স্তালিন-বন্দনার অসংগতি কি খুবই সুস্পষ্ট নয়? মুখে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, ভারতে অটোনোমাস ফেডারেটিং ইউনিটস্ স্থাপন, "রাজ্যের হাতে আরও বেশি ক্ষমতা চাই" বলে যাঁরা আন্দোলন করছেন তাঁদের জিজ্ঞেস করা দরকার স্তালিন ও স্তালিনবাদ বুঝি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, গণতন্ত্রের প্রতীক? গণতন্ত্র রক্ষা করতে যাঁরা সঙ্কল্পবদ্ধ তাঁদের বিশেষভাবে এই প্রশ্নগুলির রাজনৈতিক মোকাবিলা ও গণমত তৈরীর জন্য দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে মুখোশ যত নিখুঁত হোক না কেন বেশি দিন তা মুখে এঁটে রাখা যায় না। মুখোশ একদিন খুলে পড়বেই।

গণতন্ত্রের প্রধান শত্রু: (১) অজ্ঞতা (২) ভীরুতা (৩) গৃধ্নুতা (৪) হিংসা (৫) উচ্ছৃঙ্খলতা। গণতন্ত্রীদের অজ্ঞতার অন্ধকারে জ্ঞান ও সচেতনতার প্রজ্বলিত মশাল তুলে ধরতে হবে। বীর সাহসী মানুষ তৈরী করতে হবে। লোভ ও গৃধ্নুতার দুর্গগুলিকে জয় করতে হবে। Possessory instincts-গুলো সমষ্টির স্বার্থে সমগ্র দেশের স্বার্থে দৃঢ়তার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা চাই-ই। সামাজিক দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলাবোধ দেশহিতৈষণা জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হওয়া চাই। গণতন্ত্র মানে ভোটে জয়লাভের কৌশল করায়ত্ত করার সাধনা নয়, রাজা-বদলের জন্য নির্দিষ্ট কয়েক বছর অন্তর ভোট ভোট খেলা নয়।

গণতন্ত্র অর্থহীন যদি লোকশক্তিকে জাগ্রত করা না হয়। প্রত্যেক যুগেই "রাজশক্তি" (Legal Sovereign) ও "লোকশক্তি"র (Political Sovereign) মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা দেবেই। আর এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সমাধান নিরসনের গণতান্ত্রিক পথ হলো "লোকশক্তির" কাছে "রাজশক্তির" নতি স্বীকার করা। "লোকশক্তিকে" জাগ্রত করতে দেশের সকল নাগরিককে প্রকাশমান হতে হবে। নিঃস্বার্থপরতা নির্লোভ চরিত্র সাহসিকতা জ্ঞান শক্তির উন্মেষ দরকার। দেশে ভোট হয় নির্দিষ্ট কয়েক বছর অন্তর জনমত যাচাই করার জন্য। কিন্তু একটা প্রাণোচ্ছল জাতি হলো তার প্রতিদিনের নিরুপদ্রব শান্তিপূর্ণ গণইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। গণতন্ত্র যেমন ভোটতন্ত্র নয়, দলতন্ত্র নয়—তেমনি আবার কেবলমাত্র "সিভিল লিবার্টির" প্রচারমঞ্চও নয়। চাই "অর্থনৈতিক গণতন্ত্র" ও সাম্যের লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলা। চাই শক্তি বীর্যের সাধনা। যে-দেশ গণতন্ত্রের আদর্শকে, সামাজিক ন্যায়-বিচার ও "অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের" আদর্শকে, "সিভিল লিবার্টির" আদর্শকে ধরে মাথা উঁচু করে বিশ্বের কাছে তার স্বাতন্ত্র্য স্বকীয়তা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চায় সেই দেশকে শক্তিশালী করতে হবে, তার ভৌগোলিক অখণ্ডতা সার্বভৌমত্বকে সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করার দেশ-প্রেমিক মানসিকতা সৃষ্টি করা চাই। আন্তর্জাতিক তত্ত্ব-কথার আড়ালে যারা বহিঃশক্তিকে এদেশে একদিন অনুপ্রবেশ করার পথ করে দেয় যুগে যুগে তাদের সম্বন্ধে সদা-সজাগ থাকতে হবে অতন্দ্র প্রহরীর মত। গোটা ভারতের ও ভারতীয় জাতির অখণ্ড ভাবমূর্তিকে সম্মুখে রেখে শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

দেশের সার্বভৌমত্ব তো শেষ বিচারে জনগণের, তথা মনুষ্যত্বের সার্বভৌমত্ব। দেশের শাসকশ্রেণী বা শাসক দল নির্বাচনে জয়ী হয়ে জনগণের "সেবক" ও "ভৃত্যের" ভূমিকা ছেড়ে "উৎপীড়ক" ও "প্রভুর" ভূমিকা যাতে নিতে না পারে সেইজন্য "লোকশক্তিকে" জাগাতে হবে, সচেতন করতে হবে। কেবল গণতন্ত্রেই সেটা সম্ভব।

শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কর্তব্য থেকে যাচ্ছে। আমার সহধর্মিণীর সহযোগিতা ছাড়া পাণ্ডুলিপি তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ হতই না। টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন লেখাগুলো সংকলিত করা, বিচ্ছিন্ন টুকরো টুকরো লেখাগুলোকে একত্র করা

যথেষ্ট সময়-সাপেক্ষ ও পরিশ্রম-সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল। শ্রীপার্থসারথি বসু প্রথম থেকেই প্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে বইটির প্রকাশে প্রচুর সাহায্য করেছেন। আমার আগের বই দুটি প্রকাশের ব্যবস্থায়ও শ্রীপার্থসারথি বসুর সহযোগিতা অকৃপণভাবে পেয়েছি। আইনজীবী সতীর্থ শ্রীধ্রুব মুখার্জী ও শ্রীসোমেন বসু বইটি প্রকাশের সময় আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলেন। ধন্যবাদ প্রাপ্য আমার নির্বাচনী কেন্দ্রের কর্মী সহযোগী ও তরুণ বন্ধুদের যাঁরা "পাঠচক্রের" অয়োজন করেছিলেন নিয়মিতভাবে। তাঁদের নিষ্ঠা গভীর আগ্রহ আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছিল। প্রকাশক শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও নিরলস কর্মী শ্রীপরিতোষ চক্রবর্তীর সহায়তা ভিন্ন এই ধরনের বই প্রকাশ করা সম্ভবই হত না। এঁদের জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

৪৫ এস আর. দাশ রোড, কলিকাতা ২৬

কাশীকান্ত মৈত্র

১লা বৈশাখ, ১৩৫৮

১

ভারত ও গণতন্ত্র

ভারতের গণ-পরিষদ ভারতের জন্য একটা শাসনতন্ত্র রচনা করেছেন, যেটাকে আমরা মোটামুটিভাবে প্রচলিত অর্থে গণতান্ত্রিক বলে অভিহিত করতে পারি। এই নূতন শাসনতন্ত্রের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ধারা ও বিধি যদিও মূলতঃ প্রকৃত গণতন্ত্রের বিরোধী, তবুও একে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে গণতান্ত্রিক বললে সত্যের অপলাপ হবে না নিশ্চয়ই। একটা সজীব, প্রাণবন্ত গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার জন্যে যেটা সব চেয়ে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হল এক শিক্ষিত, সজাগ, বলিষ্ঠ জনমতের অস্তিত্ব, যে জনমত গণতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতিতে গভীরভাবে বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাশীল—যা এই মতবাদকে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও প্রয়োগ করার জন্যে যে-কোন বিরুদ্ধ ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে এবং তার প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বস্ব পণ করতে পারে। শাসনতন্ত্রের গণতান্ত্রিক নিখুঁত রচনা ও শব্দচয়নের বা রচনা ভঙ্গিমার ওপরই প্রকৃত গণতন্ত্রকে সর্বদা দাঁড় করান চলে না। কিন্তু এই গণতান্ত্রিক মতবাদ-সচেতন জনমত তো আর বর্ষার বন্যলতার মত আপনি-আপনি গজিয়ে উঠবে না। জনমতকে এমনভাবে শিক্ষিত করে উচ্চস্তরে উন্নীত করতে হবে, যার ফলে দেশবাসী স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই দেশের সমস্যাগুলিকে বিশ্লেষণ করে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে পারে। এই জনমত সৃষ্টির দায়িত্ব রাষ্ট্রের কর্ণধারদের যতটা—রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ দল ও সংস্থাগুলির দায়িত্বও ততোধিক। এই দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের ওপর চাপিয়ে দেওয়া চলতে পারে না। অর্থাৎ এই জনমত সৃষ্টির ব্যাপারে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অবাধ অধিকার স্বীকার করা চলে না। সেটা হলে গণতন্ত্রের বিকাশ ব্যাহত হবে। রাষ্ট্রে "Competing Opinion Factories" বা প্রতিদ্বন্দ্বী জনমত সৃষ্টির কারখানার অস্তিত্ব গণতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য। রাষ্ট্র যখন এই ব্যাপারে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী দল বা সংস্থাগুলির কণ্ঠরোধ করে, তখন থেকেই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা স্বৈরতান্ত্রিক সম্ভাবনাযুক্ত হয়ে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। কেন না এই অজুহাতে বিরোধী দলের কণ্ঠরোধ করে এক-পার্টি শাসনের উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। বৈচিত্র্য হল গণতন্ত্রের প্রাণ। আর স্বৈরতন্ত্র বা সমগ্রতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হল "Soul-less Regimentation."

সুতরাং এখানেই শাসনতন্ত্রে মতবাদ ব্যক্ত করার, গণতান্ত্রিক বিরোধিতা সৃষ্টি করার ন্যায়সঙ্গত অধিকার স্বীকৃতির প্রশ্নটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ঠেকে। এই অত্যাবশ্যক অধিকারগুলি শাসনতন্ত্রে স্বীকৃত না হলে গণতন্ত্র অর্থহীন ধাপ্পাবাজীতে পরিণত হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আদর্শবাদ-সচেতন সজাগ, সক্রিয় জনমত ব্যতিরেকে গণতন্ত্র কায়েম হতে পারে না; আবার গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র, যা স্বভাবতঃ দেশে বলিষ্ঠ জনমত সৃষ্টির উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করে, ব্যতিরেকে খাঁটি গণতন্ত্র আত্মবিকাশ করতে পাবে না। এ যেন এক দুষ্টচক্র। কিন্তু ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যাবে যে, ইতিহাসের রায় ভিন্ন। সে রায় হল এই: প্রকৃত সাহসী বিচারশীল রাজনৈতিক দলাদলি-নিরপেক্ষ মোহমুক্ত জনমতই গণতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য রক্ষাকবচ। গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রেব ক্রটিহীন, শ্রেষ্ঠ খসড়াও বাস্তবক্ষেত্রে গণতন্ত্রের নির্ভরযোগ্য রক্ষাকবচ হয় না। প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের জার্মানীর বিখ্যাত Weimar Constitution-ও সে দেশে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। সে-দেশেব জনগণ অপরপক্ষে হিটলার ও নাৎসীবাদকেই সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছিল। আবাব এটাও স্মরণ রাখা দরকার যে, কোন শাসনতন্ত্রই 'Fool-proof' বা 'Knave-proof" হতে পারে না। তাই শাসনতন্ত্রের মধ্যে ক্রটি-বিচ্যুতি থাকাটাই খুব বড় কথা বা ভয়ের কথা নয়। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে যথেষ্ট গলদ থাকা সত্ত্বেও স্বাধীন মত ব্যক্ত করার, দল গঠন করার, নিজ নিজ মতবাদ অনুযায়ী জনমত সৃষ্টি কবাব অধিকার সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং এদেশেব এই বর্তমান শাসনতন্ত্রেব অ-গণতান্ত্রিক বিধানকে কেন্দ্র করে যে হৈ চৈ হচ্ছে, তাতে এদেশের গণতন্ত্রীদেব হতোদ্যম বা নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। প্রকৃতপক্ষে যে-জনমত কথায় কথায় নৈরাশ্যের কাছে আত্মসমর্পণ কবে, যা সাহস ও ধৈর্যেব সঙ্গে কঠোব বাস্তবের সম্মুখীন হতে চায় না, নিজ রাজনৈতিক বিশ্বাসকে রূপ দেবার জন্যে দৃঢ়সঙ্কল্প প্রদর্শনে শৈথিল্য দেখায়—তা কিন্তু পরোক্ষভাবে গণতন্ত্র বিরোধী সমগ্রতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী দল ও শক্তিসমূহেরই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হয়। এদেশে একদল লোক আছেন, যারা অন্যান্যদের, বিশেষতঃ জাতীয়তাবাদী বামপন্থীদেব মতন ভারতের তথাকথিত অ-গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের তীব্র সমালোচনা কবে থাকেন এবং এই সমালোচনার মাধ্যমে দেশবাসীর মনের গভীরে গণতন্ত্রের কার্যকারিতা ও যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রকৃত সংশয় ও সন্দেহ জাগিয়ে তুলে

তাদের নিজেদের রাজনৈতিক শিবিরে টেনে আনার চেষ্টা করেছেন। "বুর্জোয়া" আখ্যায় অভিহিত করে পৃথিবী থেকে গণতন্ত্রকে 'Liquidate' করাই এদেশের ব্যবহারিক রাষ্ট্রদর্শনের সারমর্ম। ভারতের গণতন্ত্রীদের এই রাজনৈতিক দলের এই চাতুর্যপূর্ণ কৌশল সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন হওয়া দরকার। ভারতের শাসনতন্ত্রের গলদ, রাষ্ট্রশাসন পরিচালনায় দুর্নীতি, কুশাসন, অন্যায় অবিচারের কঠোর সমালোচনা নিশ্চয়ই করতে হবে—কিন্তু তার উদ্দেশ্য হবে দেশবাসীদের নিজেদের অধিকার ও ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা, গণতান্ত্রিক নীতি ও ব্যবস্থাপনায় তাদের বিশ্বাস ও আস্থা জাগিয়ে তোলা, সর্বপ্রকার অ-গণতান্ত্রিক নীতি ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কঠিন ব্যূহ রচনা করে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করবার মত নূতন প্রগতিশীল শক্তি গড়ে তুলতে জনগণকে উৎসাহিত করা। তার উদ্দেশ্য হবে না জনসাধারণের অজ্ঞতা, উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে তাদের নিজেদের সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা—তার উদ্দেশ্য হবে না গণতন্ত্রের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দিহান করে তোলা।

ব্যক্তিবাদের আধিক্য :

ভারতের গণতন্ত্রের একটি বিশেষ দুর্বলতা এই যে, এদেশে বিশেষ বিশেষ নেতা বা ব্যক্তির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব ও প্রাধান্য আরোপ করা হয়েছে। ইতিহাসের বিবর্তনে ব্যক্তির প্রভাব অনস্বীকার্য। মনীষী কারলাইল এর ওপর সার্বভৌমত্ব আরোপ করেছিলেন, আবার কার্ল মার্কস্ একে একেবারেই অস্বীকার করে গেছেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য এই দুয়ের মাঝামাঝি জায়গায়ই রয়েছে। ব্যক্তি-প্রভাবের ওপর অত্যধিক প্রাধান্য আরোপ করার একটা ফল এই যে, এর থেকে শেষে ব্যক্তিপূজা দাঁড়িয়ে যায়। আর এটাও সাধারণ কথা যে, যে-সমাজে ব্যক্তি-পূজা প্রচলিত সেখানে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতেই পারে না। যুক্তিবাদ-বিরোধী ও ফ্যাসীবাদের বা যে-কোন প্রকার একতান্ত্রিক—স্বৈরতান্ত্রিক মতবাদের এটা হল একটা মূল স্তম্ভ। এই ব্যক্তি-পূজা গণতন্ত্র-বিরোধী এই জন্য যে, ব্যক্তির ইচ্ছা ও খেয়ালখুশির রথচক্রের তলায় সমষ্টির স্বার্থ ও কল্যাণ নিষ্পিষ্ট হয়। ভারতীয় গণতন্ত্রের আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ওপরই যে শুধু অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তাই নয়, এখানে জনসাধারণকে

নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য ও অবহেলার প্রাচীর তুলে তাদের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্র থেকে অতি দূরে ঠেলে রাখা হয়েছে।

ভারতের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, শ্রীনেহরুকে বাদ দিয়ে ভারত শাসনের কথা কল্পনাও করা যায় না। এই ধরনের চিন্তাধারা শুধু অতি অবাস্তবই নয়—মূলতঃ গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী-বিরোধী। শ্রীজওহরলালের স্তাবকদের খেয়াল রাখা উচিত যে, নেহরু ব্যতিরেকে ভারতীয় গণতন্ত্র চালু হতে পারে না—একথা বললে নেহরুর প্রশংসা করা হয় না মোটেই। এর অর্থ, ভারতীয় গণতন্ত্রকে হেয় করা হয় এবং অন্যান্য দেশের কাছে নিজেদের ও নিজেদের দেশকে ছোট করা হয়। গণতন্ত্রে কোন ব্যক্তিই কোনদিন অপরিহার্য নন। একজন বিরাট ব্যক্তির অভাবে একটা শূন্যতা সৃষ্টি হতে পারে সত্যি, কিন্তু সেই শূন্যতা কোনদিনই সেই জাতিকে বা তার আদর্শকে গ্রাস করতে পারে না, যদি সেই দেশের জনসাধারণ নিজেদের আদর্শ, ভবিষ্যৎ ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকে। কোন বিশেষ বিশেষ নেতার অপরিহার্যতার কথা বার বার ঢক্কানিনাদে জাহির করার ফলই হবে দেশবাসীকে, সাধারণ মানুষকে সমাজে বা রাষ্ট্রে আগামী দিনে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের পথে বাধা দেওয়া। জনসাধারণ মনে করে দেশের সমস্ত ভাবনা দেশের রাষ্ট্রনায়কদের—তাদের নয়। জনসাধারণের এই ধরনের নিশ্চিন্ততা, অজ্ঞতা, উদাসীনতা এবং নেতৃত্বের প্রতি অন্ধ আবেগ স্বৈরতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থারই উপযোগী ক্ষেত্র রচনা করে থাকে। একথা সুস্পষ্টভাবে বোঝার ও বুঝানোর সময় এসেছে যে, গান্ধীজী, প্যাটেল ও নেহরু যত বিরাট ও মহৎ-ই হোন না কেন, ভারতের চেয়ে কোনদিনই তাঁরা বড় নন। এদেশের রাষ্ট্রীয় বুনিয়াদ রচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে তার প্রয়োজন, তার আদর্শ ও ইতিহাসের প্রতি। দেশের দায়িত্বশীল নেতা ও ব্যক্তিদের বলতে শোনা যায়—"মহাত্মা গান্ধী এই বলেছেন, অতএব আমাদের এইভাবে চলতে হবে" ইত্যাদি। আমরা যেন ধরে নিয়েছি মহাত্মাজী-সর্দারজী-নেহরুজী যা যা বলেছেন, সেগুলো সর্বকাল উপযোগী এবং অভ্রান্ত। এই ধরনের অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্য-পরিত্যজ্য। ভারতীয় কংগ্রেসের গত নাসিক অধিবেশন ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে শ্রীনেহরুর অপরিহার্যতারই এক নির্লজ্জ স্বীকৃতি মাত্র। বিরাট পরিবর্তনের সূচনাকারী এক প্রলয়ঙ্করী মুহূর্তের মুখোমুখি

দাঁড়িয়ে দেশের কর্মসূচী নির্ধারণের সময় যখন এল, তখন গণতন্ত্রের 'পূজারী' ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দেশের স্বার্থ, প্রয়োজন, গণদাবী উপেক্ষা করে কতিপয় নেতার অপরিহার্যতাই ঘোষণা করল। নীতির চেয়ে নেতাই বড় হল। নেহরু বা প্যাটেল প্রমুখ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতাদের উত্তরাধিকারী হয়ে যাঁরা আসবেন তাঁরা এই সব নেতাদের সমকক্ষ বা এঁদের চেয়ে বেশী ব্যক্তিত্ববান বা প্রতিভাবান হবেন কিনা ভারতের গণতন্ত্রের কাছে এটা আসল সমস্যা নয়। সমস্যাটা আসলে হচ্ছে এই যে, গণতান্ত্রিক আদর্শে গভীরভাবে আস্থাশীল, যথেষ্ট পরিমাণ দায়িত্ববোধসম্পন্ন, নিষ্ঠাবান ব্যক্তি রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুভার স্বেচ্ছায় বহন করার জন্যে এগিয়ে আসবেন কি-না। ভারতীয় ঐতিহ্য-কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিরা সেই কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে সজীব করে তোলার জন্যে তার মর্মবাণী দেশ-বিদেশে প্রচার করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে জনসাধারণের পুরোভাগে এসে দাড়াতে পারবেন কি-না। Great man-এর থেকে আমাদের দৃষ্টি Common man-এর দিকে ফেরাতে হবে। অবহেলিত সাধারণ মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বকে আবিষ্কার করতে হবে, তাদের সুপ্ত বুদ্ধি, মমত্ব ও কর্মকুশলতাকে জাগ্রত করতে হবে। নচেৎ ভারতে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না।

গণতান্ত্রিক বিরোধিতা :

যে-কোন গণতন্ত্রেই স্থায়ী বিরোধী দলের অস্তিত্ব অপরিহার্য। এই গণতান্ত্রিক বিরোধিতা না থাকলে গণতন্ত্র ধীরে ধীরে স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হয়। আগামী সম্ভাব্য পরাজয়-ভীতি এবং নূতন দল ও নেতৃত্ব কর্তৃক দেশের শাসন-ভার পরিচালনার সম্ভাবনা শাসনকারী দলকে সংযত, নীতি-অনুবর্তী, কর্মকুশল ও জনস্বার্থের প্রতি জাগরুক রাখে। যে-দেশে বিরোধী দলের অস্তিত্ব স্বীকারই করা হয় না, অথবা কার্যক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলিকে জনমত সংগঠনের সুযোগই দেওয়া হয় না, সেখানে গণতন্ত্র শুধুমাত্র ফাঁকা বুলি-ই হয়ে দাঁড়ায়। প্রত্যেক সরকারই তাঁদের সমালোচকদের কাছ থেকে বেশী উপদেশ ও প্রয়োজনীয় সাহায্য পেয়ে থাকেন। অন্ধ স্তাবকদের স্তুতিবাদ অপেক্ষা বিরোধী দলের হুঁশিয়ারী ও সমালোচনা যে-কোন দেশের সরকারের কাছে অধিক মূল্যবান পাথেয়। ভারতের শাসনতন্ত্রে বিরোধী দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে সত্যি,

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এদেশের রাজনীতিতে বিকল্প নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী কোন এক শক্তিশালী দল না থাকায় ভারতের গণতন্ত্রের এই শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচ প্রকৃত নির্ভরযোগ্য রক্ষাকবচ বলে গণ্য হতে পারে না। কংগ্রেস দল যদি বুঝতে পারে যে, বিরোধী দলগুলি যত বিরুদ্ধ সমালোচনই করুক না কেন, আগামী নির্বাচনে তাদের জয়ী হবার কোনই সম্ভাবনা নেই—তাহলে কংগ্রেস দল আদর্শ ও নীতিভ্রষ্ট হয়ে—যা আজ সত্যি ঘটেছে—ক্ষমতার গর্বে অন্ধ হয়ে দেশকে এক নীরন্ধ্র তমিস্রার অতল গহ্বরে তলিয়ে দেবে। সুতরাং বর্তমানের ছোট ছোট বিরোধিতা অর্থহীনই হয়ে পড়ে। গণতান্ত্রিক উপায়ে স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভবের দৃষ্টান্ত ইতিহাসেই পরিদৃষ্ট হয়। হিটলার গণতান্ত্রিক উপায়েই জার্মানীর ডিক্টেটর হয়েছিলেন। কেবল যে এই রাজনৈতিক স্থায়ী বিরোধীদলের অনস্তিত্বই গণতন্ত্রের ভবিষ্যতে আস্থাশীল ব্যক্তিদের চিন্তিত করে তুলছে তাই নয়, বর্তমানের রাষ্ট্রীয় কর্ণধাররাও এই বিরোধী দলের উদ্ভবের প্রতি সহানুভূতিশীল নন। বরং সব-প্রকার বিরোধিতারই তাঁরা নিন্দাই করে আসছেন—শিশু-রাষ্ট্রের জিগীর তুলে। ভারতের গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হলে এক বলিষ্ঠ স্থায়ী বিরোধী দল গড়ে তুলতেই হবে—কেন না, এক-পার্টি শাসন ও গণতন্ত্র পরস্পর-বিরোধী। 'এক-পার্টি গণতান্ত্রিক শাসন' সোনার পাথর বাটির মতই অলীক।

দেশরক্ষা ব্যবস্থার দৃঢ়তা ও গণতন্ত্র ঃ

বিশ শতকের প্রথমার্ধেই দুটো বিশ্বযুদ্ধের এবং আজকের বৃহৎ দুই শক্তি গোষ্ঠীর শক্তিদম্ভের মধ্যে দিয়ে একথাটা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মুখে শান্তির মহৎ উদার বাণী পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করলে এবং বিভিন্ন দেশের রাজ-নৈতিক ধুরন্ধরদের মুখ-নিঃসৃত এই সব মহৎ ও উদার বাণীগুলিকে মৌখিক মূল্যে গ্রহণ করে তারই ওপর নির্ভর করে শান্তি স্থাপনের নামে এক নিবীর্য, দুর্বল, 'অহিংস নীতি' অনুসরণ করলেই পৃথিবীতে শান্তি আনা যায় না। এই সব ডিপ্লোম্যাটদের কথার ওপর বিশ্বাস করে দেশের নীতি নির্ধারণ করা চলে না ততদিন—যতদিন পর্যন্ত না প্রত্যেক দেশের কার্যকলাপের মধ্যে প্রকৃত শান্তি স্থাপনের ও রক্ষার এক আন্তরিক ইচ্ছা ও উপায় উদ্ভাবন সম্বন্ধে একটা নিভর-যোগ্য আগ্রহ ও আকুতি পরিস্ফুট হয়ে উঠছে ; যতদিন বিভিন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্র-গুলি, যাদের অনুসৃত বহির্নীতি বহুলাংশে পৃথিবীর ইতিহাসের গতিধারা

নিয়ন্ত্রিত করে থাকে, কার্যতঃ বিশ্বরাষ্ট্র সংস্থাকে তাদের নিজ নিজ হীন ও আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করতে চাইবে এবং খেয়াল-খুশিমত বিশ্ব রাষ্ট্রসঙ্ঘের সিদ্ধান্ত ও নীতি লঙ্ঘন করবে। বিশ্ব-রাজনীতির বর্তমান পরিস্থিতিতে শান্তি স্থাপনের অর্থ হচ্ছে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ বিশ্বের দুই বিবদমান মতলববাজ শক্তিজোটকে কোনমতেই তাদের পারস্পরিক স্বার্থ-সংঘাতের অনলে শান্তিপ্রিয় নিরপেক্ষ দেশগুলিকে আহুতি হতে না দেওয়া। অর্থাৎ ইঙ্গ-মার্কিন ও রুশ শক্তিদ্বয় যদি নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ বাধাতে বদ্ধ-পরিকরই হয়, তাহলে যে সব রাষ্ট্র আজও প্রকৃতপক্ষে এই দুই শক্তিজোটের কোনটার সাথেই সম্পূর্ণভাবে নিজেদের ভাগ্যকে জড়িত করেনি—সেই সব রাষ্ট্রের নায়করা হাজার কণ্ঠে শান্তির উপদেশ বর্ষণ করলেও কিছু হবে না। এসব ক্ষেত্রে সত্যি Silence is golden। বরং সত্যিই যদি তাঁরা নিরপেক্ষ থাকতে চান, বিশ্বব্যাপী সমরানলে নিজেদের দগ্ধ বা ভস্মীভূত করতে না চান, তাহলে তাঁদের রাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্য হবে সঙ্ঘর্ষকে ক্ষুদ্রতম ক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা। যেখানে বৃহৎ বিবদমান রাষ্ট্রগুলি এখন থেকেই রণদামামা বাজিয়ে হিংসার তাণ্ডবনৃত্যের ঘৃণ্য আয়োজন শুরু করেছেন, সেখানে শান্তির অর্থই হচ্ছে এমন এক উপায় উদ্ভাবন করা, যার ফলে প্রকৃত শান্তিপ্রিয় দেশগুলি সমরানলে পুড়ে ছারখার হয়ে না যায়। তার জন্যে চাই নিজ নিজ শান্তিপ্রিয় দেশগুলিকে আধুনিকতম কায়দায় সামরিক শক্তিতে পুষ্ট করা। আজকের যুদ্ধবাদী রাষ্ট্রগুলির জঙ্গীবাদকে (militarism) রুখতে হলে চাই Armed preparedness—সামরিক প্রস্তুতি। এর অভাব হলে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি যুধ্যমান শক্তিজোটদ্বয়ের রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থ নৈতিক চাপ উপেক্ষা করে নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করতে পারবে না এবং চাপে পড়ে যে-কোন একটি ব্লকের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে বাধ্য হবে। তাই নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে না থেকে সামরিক প্রস্তুতির দিকে উপযুক্ত নজর দিতে হবে। কিন্তু শুধু এইটুকু করলেই হবে না। কারণ যুদ্ধের উপযোগী পরিবেশ কেবলমাত্র বাইরের রাষ্ট্রগুলিই সৃষ্টি করে না। দেশের অভ্যন্তরে যখন অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও গৃধ্নুতার তাণ্ডব অভিনয় চলে, তখনই সেই দেশে ও সমাজের অভ্যন্তরে অন্তর্যুদ্ধের বারুদ স্তূপীকৃত হয় এবং একই সঙ্গে যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এইরূপ অন্তর্যুদ্ধ চলে, তখনই এক বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে থাকে। আজকের বিভিন্ন রাষ্ট্রের

অন্তর্যুদ্ধকে রুশ দেশ নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে একথা সর্বজনবিদিত। যখনই রুশদেশ এই অন্তর্যুদ্ধকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হচ্ছে, তখনই আবার ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি প্রচুর অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সেই সব দেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের, যাদের বিরুদ্ধে অন্তর্যুদ্ধের দাবানল জ্বলে উঠেছে, তাদের সাহায্য করছে। এমতাবস্থায় সেই সব দেশের তুই দলের অন্তর্যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে কূটনীতির অর্থে ইঙ্গ-মার্কিনদের সঙ্গে রুশদের যুদ্ধে পরিণত হয়। ঠিক এইভাবেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকা তৈরী হচ্ছে। তাই সমাজের ঘুণ-ধরা প্রচলিত অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে অপরিবর্তিত রেখে যদি শুধু সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে তার অর্থ হবে অন্যায়, অবিচার ও সর্বপ্রকার শোষণকে দীর্ঘজীবী করাব অপচেষ্টা এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অন্তর্বিদ্রোহকে ডেকে আনা। অতএব সামরিক প্রস্তুতিব ভিত্তি হবে সমাজে সাম্য, ন্যায়বিচার ও উন্নত জীবিকাব মান স্থাপন কবা। প্রত্যেক নিরপেক্ষ দেশগুলিকেই এই দ্বিমুখী নীতি অনুসরণ করতে হবে। এবাব এই ভূমিকার আঙ্গিকে ভারতীয় গণতন্ত্রের আলোচনা করা যাক।

ভারতের গণতন্ত্রেব একটা মারাত্মক ত্রুটি এই যে, এদেশের নেতাবা গান্ধীবাদের উৎকর্ষ ও মাহাত্ম্য পৃথিবীতে প্রচাব করতে গিয়ে গোটা দেশটাকে এই মতবাদেব এক বাজনৈতিক পরীক্ষাগারে পরিণত করেছেন। আর রকম দেখে মনে হয়, এই পরীক্ষারও যেন শেষ নেই। নেতারা এমন এক নাটুকেপনা আরম্ভ করেছেন যার ফলে জনসাধারণের মনে ধারণা জন্মেছে যে, ভারতের সামগ্রিক স্বার্থের চাইতেও গান্ধীবাদী নেতাদের গান্ধীবাদ সম্বন্ধে যে ধারণা বা ব্যাখ্যা, সমস্ত ক্ষেত্রেই তার প্রয়োগের প্রয়োজন ও প্রাধান্য সর্বাধিক। নেতারা একথা ভুলে যান যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গান্ধীজীর অহিংসাবাদ ও শান্তিবাদী কর্মসূচী দেশের অভ্যন্তরে গান্ধীবাদী অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি প্রয়োগের যুক্তিযুক্ত পরিণতি মাত্র। একটাকে বাদ দিয়ে অপরটিকে অনুসরণের অর্থ হচ্ছে গান্ধীবাদের অপপ্রয়োগ ও অপব্যাখ্যা। এটা গান্ধীবাদ নয়, গান্ধীবাদের বিকৃত ব্যঙ্গরূপ। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই অহিংস নীতি প্রয়োগের তুটো ফল হতে পারে, প্রথমতঃ আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও বাহবার জন্যে এই নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে সরকারকে দেশের সামরিক শক্তিকে হ্রাস করতে হতে পারে। কারণ মুখে দিবারাত্র অহিংস নীতি উচ্চারণ করে

সেই সঙ্গে দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার মধ্যে সত্যনিষ্ঠা ও নীতির [illegible] মেলে না—ভণ্ডামি ও শঠতার পরিচয়ই পাওয়া যায়। মুখে এক, আর কাজে আর এক, এই 'ম্যাকীয়াভেলী'-নীতি বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রনায়করা অনুসরণ করে চলেছেন। ভারতীয় রাষ্ট্রনেতারা এই ভেবে আত্মতুষ্টি লাভ করতে পারেন যে, যখন বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রই তাদের সামরিক শক্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়ে চলেছে এবং পরস্পরের দিকে হিংস্র রক্তবর্ণ চোখে [illegible]য় আছে, তখন কেবলমাত্র ভারতবর্ষই সামবিক শক্তি হ্রাস করে শান্তিবাদী মনোভাবেরই যথার্থ পরিচয় দিচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, এর ফলে জন-মনে দেশরক্ষা খাতে অধিক ব্যয়ের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গভীব সংশয় দেখা দিতে পারে। আব এই ব্যাপারে কোন গণতান্ত্রিক সরকারই জনমতকে উপেক্ষা করতে পারেন না। অর্থাৎ দেশরক্ষা খাতে বর্ধিত ব্যয়ের বিরুদ্ধে যদি একবার সুস্পষ্টভাবে জনমত ব্যক্ত হয় ও সেই মতানুবর্তী জনমত সংগঠিত হয়, তাহলে দেশের সবকার তাকে অবহেলা [illegible] পারবেন না। জনমতের নির্দেশ মত সামরিক ব্যয় কমিয়ে দিতে বাধ্য হবেন। গত বছর ভারতীয় পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন উদ্বোধন উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ডক্টব বাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর ভাষণে জানান যে, ভারত সবকারের ব্যয়-সঙ্কোচ এবং শান্তিবাদী মনোভাবেব পবিচায়ক হিসাবে দেশরক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় সঙ্কুচিত করা হবে। এই gestureটা খুবই মহৎ ও উদার তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু বাষ্ট্রনীতিতে এটা অত্যন্ত অবিজ্ঞোচিত। কিছুদিন পূর্বে শ্রীজওহরলাল নেহরু এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা কবেন যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর কলেবর ছেঁটে ফেলা হবে—কেন না, তাঁর মতে যে কোন সেনাবাহিনীর কর্মকুশলতা নির্ভর করে তার mobilityর ওপর, আয়তনের ওপর নয়।

শুধু বিবদমান শক্তিচক্রদ্বয়ই নয়, যখন প্রতিবেশী চীন তিব্বত আক্রমণ করে বসল এবং রাষ্ট্রের ভাবী সীমানা সম্বন্ধে শঙ্কাজনক মনোভাব ব্যক্ত করছে, যখন পাকিস্তান ভারতের প্রতি এক চরম শত্রুভাবাপন্ন নীতি অনুসরণ করে চলেছে, দেশের ও তার সীমানার দীর্ঘায়তন এবং ভৌগোলিক অবস্থিতি—পার্বত্য ও সীমান্ত এলাকায় যানবা[illegible] উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব ও প্রাকৃতিক ব্যবধানের জন্য যখন এই তথাকথিত [illegible]ility of army সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় কোনমতেই হওয়া চলে না, তখন ভা[illegible] [illegible]রকার কর্তৃক এই নেহরু-নীতি

অনুসরণ রীতিমত মারাত্মক। ভারতের গণতন্ত্রীদের এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার সময় এসেছে। এই সঙ্কট-মুহূর্তে ভারতকে সামরিক দিক থেকে দুর্বল করার অর্থই ভারতের গণতন্ত্রকে দুর্বল ভিত্তির ওপর দাঁড় করান। গান্ধীবাদের ত্রুটির কথা বলছি না এখানে বা সেটা প্রমাণ করার জন্যেও অহিংস নীতি অনুসরণের সমালোচনার অবতারণা করিনি। কথাটা এই যে, এদেশের নেতারা এই অতি সহজ কথাটা বুঝছেন না যে, পৃথিবীর সকল দেশের জন-নায়করা ও দেশবাসীরা এক উন্নততর নৈতিক মানবিক চেতনার স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত তাদের কাছে অহিংসা, শান্তি ও প্রেমের বাণী শুনান বেনাবনে মুক্তা ছড়ানরই সামিল। নূতন কার্যসূচীকে রূপ দিতে হলে নূতন মানুষ চাই, যারা তাদের সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে সেই কার্যসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চেষ্টিত হবে। এদেশের রাজনীতিতে গান্ধীবাদের আংশিক ব্যর্থতার প্রধান কারণ হল—যাঁরা এই মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করতেন, তাঁরা তাঁদের আচরণ, চরিত্র, ব্যবহারে পুরোমাত্রায় অ-গান্ধী। গান্ধীজীর সেই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী, সেই উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা, নিজ বিশ্বাস সমস্ত দুনিয়ার উপহাস উপেক্ষা করে প্রতিষ্ঠিত করাব সেই অসামান্য চারিত্রিক দৃঢ়তা, যে-কোন প্রতিকূল অবস্থায় জনতাব পাশে এসে দাঁড়িয়ে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার দৃঢ় অপরাজেয় সঙ্কল্প এই সব গান্ধীবাদীদের মধ্যে দেখিনি। গান্ধীবাদ সফল হবে সেদিন, যেদিন পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়কবা এই মতবাদ গ্রহণ করার চারিত্রিক যোগ্যতা অর্জন করবেন। বনের বাঘের চেয়ে মনের বাঘ আরও সাঙ্ঘাতিক। আমাদেব নেতারা ধরে নিয়েছেন যে, হিংস্র-মাংসলোলুপ ব্যাঘ্র বাতারাতি নিরামিষাশী হয়ে চান্দ্রায়ণ ব্রত পালন শুরু করে দিয়েছে। নেতাদের চিন্তার দৈন্য তো এইখানে। এছাড়া আর একটা কথা ভাবার আছে। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে যে সংগ্রাম-নীতি ছিল, স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী কালেও সেটাকেই একটা জড়, অপরিবর্তনীয় নীতিতে দাঁড় করানোর পেছনে কোন যুক্তি নেই। কারণ ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম যে অহিংস উপায়ে কংগ্রেস কর্তৃক পরিচালিত হয়েছিল তার কারণ কেবলমাত্র নৈতিক বা আধ্যাত্মিকই ছিল না। ওটা কৌশলগতও ছিল। অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক পদ্ধতিতে সংগ্রাম পরিচালনা বিশেষ ফলপ্রদ হবে না, এটাও একটা

প্রধান বিচার্য বিষয় ছিল। আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে বলা হচ্ছে, তবে কেন দেশকে স্বাধীনভাবে সামরিক শক্তিতে সমৃদ্ধ করা হবে না? তা ছাড়া কংগ্রেস ও ভারতবর্ষ এ দু'টো সম অর্থবোধক শব্দ নয়, যেমন পাকিস্তান ও মুসলীম লীগ সম অর্থবোধক। কংগ্রেস নেতারা যদি মনে মনে এই পাকিস্তানী নীতি পোষণ করেন ও সেই অনুযায়ী কাজ করেন, তাহলে সব দিক দিয়েই ভারতে গণতন্ত্রের বিকশিত হবার পথ রুদ্ধ করা হবে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের বুদ্ধি-জীবিদের, বিশেষতঃ অধ্যাপক, সাংবাদিক, দলনেতাদের দেশ-সংক্রান্ত ব্যয় সম্বন্ধে তাঁদের পুরাতন দিনের সমালোচনাপূর্ণ মনোভাব কিছুটা পরিবর্তন করতে হবে। 'সমাজতান্ত্রিক' রুশ দেশও সামরিক খাতে যে কি পরিমাণ ব্যয় বরাদ্দ করে থাকে, সেটা লক্ষ্য করেও অন্ততঃ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর রূপায়ণ দরকার। ভারতের সেনাবিভাগকে গণতান্ত্রিক ছাঁচে ঢালতে হবে, যাতে করে দেশের সাধারণ লোকেরা এবং সকল প্রদেশের লোকেরাই সামরিক জীবিকা গ্রহণ করতে পারে। দেশের তরুণদের এর মধ্যে অধিক সংখ্যায় ঢুকবার সুযোগ দিতে হবে। সেনাবিভাগের গঠনে ইংরেজ অনুসৃত মামুলী নিয়ম-গুলি এই জীবিকা কেবলমাত্র কতিপয় প্রদেশের লোকেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। এই নীতিগুলির আশু পরিবর্তন দরকার। তা ছাড়া পৃথিবীর দুই শক্তিচক্রের কেউই চায় না যে, ভারতবর্ষ সামরিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল রাষ্ট্রে পরিণত হোক। কারণ তাহলে তাদের কারুরই পক্ষে এদেশকে তাদের স্ব-স্ব রাজনৈতিক মতলববাজীর জালে আটকান সম্ভব হবে না। তারা এটাও চায় না যে, ভারতবর্ষ কোন তৃতীয় শক্তিচক্র (Third Bloc) রচনা করে মধ্যবর্তী এক নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণপূর্বক বিশ্বরাজনীতিতে একটা Balance of Power রচনা করুক। এ বিষয়ে ইঙ্গ-মার্কিন Interven-tionist-দের মনোভাব খুবই স্পষ্ট। এমনকি রুশ দেশও যে প্রকৃত মিত্র চায় না, মিত্র-র নামে কতকগুলি তাবেদার রাষ্ট্র বানিয়ে রাখতে চায়, একথাটাও দিনের আলোর মতই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। সমগ্র বল্কান রাষ্ট্র-গুলির দিকে চোখ ফেরালেই এর সত্যতা প্রমাণিত হবে। যুগোশ্লোভিয়াকে 'কোমিনফর্ম' থেকে বহিষ্কার করার অন্যতম প্রধান কারণ এই ছিল যে, সে দেশের সামরিক শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং রুশ সামরিক খবরদারী ও কর্তৃত্ব গ্রাহ্য হচ্ছিল না মোটেই। Titoism যাতে আর পূর্ব

[illegible] জন্ম কোন দেশে ছড়াতে না পারে, সেই জন্যে রুশ নীতি বর্তমানে আরও শক্তিশালী ও হৃদয়হীন হয়ে পড়েছে। ভারতীয় গণতন্ত্রের রক্ষার জন্যে সামরিক শক্তিবৃদ্ধির আরও একটা কারণ আছে। কিছুদিন থেকে আমেরিকার রিপাবলিক্যান পার্টির প্রচারণা ও বাস্তব ঘটনার চাপে পড়ে পশ্চিমে একটা নূতন ইঙ্গ-মার্কিন strategy-র পেছনে ধীরে ধীরে একটা জনমত গঠিত হচ্ছে। এটা "Write off Asia" এই শ্লোগান মাধ্যমে বর্তমানে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই নূতন আন্দোলনের উদ্যোক্তারা মনে করেন যে, ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির পক্ষে এশিয়াকে লাল জুজুর হাত থেকে ঠেকান সম্ভব হবে না। তাই অর্থ ও রণসম্ভার এখানে নষ্ট না করে পশ্চিম ইউরোপে নিয়োগ করা দরকার। এই নীতি এখনই অনুসৃত হলে ভারত ও এশিয়ার নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি এক অতীব সঙ্কটজনক অবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে যদি না তারা এব মধ্যে সামবিক ব্যাপারে অন্ততঃ আত্মনির্ভরশীল হয়ে না ওঠে। কারণ এই অবস্থায় যদি তারা দি সোভিয়েট ব্লকের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চায়, তাহলে তাদেব সোভিয়েট রাষ্ট্রতত্ত্ব ও মতবাদকে গ্রহণ করতে হবে এবং সমস্ত ব্যাপারে সোভিয়েট নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব অকুণ্ঠভাবে গ্রহণ করতে হবে। অথচ যারা আদর্শগত কারণে আজ নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী সেই সব রাষ্ট্র এই সব ফলাফলের কথা স্মরণ করে সোভিয়েট ব্লকে যোগদান কববে না অথবা মুখে নিরপেক্ষতার কথা বললেও কার্যত আতঙ্ক ও আত্মরক্ষার তাগিদে ইঙ্গ-মার্কিন শিবিরে যোগ দিতে বাধ্য হবে। এর থেকে একথা মনে করলে খুবই ভুল হবে যে, এশিয়ায় ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির অবস্থিতি এশিয়ার দেশগুলির প্রগতির সহায়ক। তা কখনই নয়। এশিয়ার বুক থেকে ইঙ্গ-মার্কিন শোষণের ও চক্রান্তের অবসান এশিয়ার জাগ্রত জাতীয়তাবাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ লাভের যে প্রথম সোপান—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রগতিশীল সকল নিরপেক্ষ দেশই ইঙ্গ-মার্কিনীদের "এশিয়া ছাড়" একথা বার বাব জানিয়ে দিয়েছে। এশিয়াকে তৃতীয় যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচাতে হলে আগে তাকে পাশ্চাত্যের চক্রান্তের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি তাদের সামরিক পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে সরে পড়ার পর এই মহাদেশে যে একটা সামরিক শূন্যতা সৃষ্টি হবে—এশিয়ার নিরপেক্ষ দেশগুলি তাদের নিজ নিজ শক্তি দ্বারা সেই শূন্যতাকে পূরণ করতে পারবে কিনা এটাই আমাদের

চিন্তার কথা, তখন এশিয়ায় Soviet Bloc ও Non-Soviet Bloc-এর মধ্যে প্রচণ্ড military disbalance সৃষ্টি হবে, অর্থাৎ দুয়ের শক্তির মধ্যে একটা বিপুল বৈষম্য দেখা দেবে। আর সেই ধাক্কা এই সব গণতান্ত্রিক দেশগুলি সামলাতে পারবে কিনা সেটাই আমাদের বিবেচ্য। কারণ সেই ধাক্কা সামলানোর মত শক্তি ও শক্ত সামাজিক, আর্থিক বুনিয়াদ না থাকলে কম্যুনিস্ট অভিযানের সম্মার্জনীর সামনে এই সব ছোট-বড় রাষ্ট্র অনায়াসেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা সম্ভব হবে না যদি এশিয়ার এই রাষ্ট্রগুলি যুগোশ্লোভিয়ার মত সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও সমাজবাদী অর্থনৈতিক সামাজিক পুনর্গঠনের পথে সাহস ও নিষ্ঠার সঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে চলে।

শান্তি আন্দোলন ও আমাদের গণতন্ত্র :

স্টকহল্‌ম শান্তি আবেদনকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর সর্বত্রই শান্তি আন্দোলন' ছড়িয়ে পড়েছে ভারতবর্ষেও এই আন্দোলনের ঢেউ এসে পড়েছে। কিছু দিন থেকে এই আন্দোলন সংবাদপত্র ও দলীয় প্রচার-যন্ত্র মারফৎ বেশ খানিকটা আসর জমিয়ে নিয়েছে। এই তথাকথিত শান্তি আন্দোলন ভারতের গণতন্ত্রকে কিভাবে আঘাত করতে পারে এবং সেই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্যই বা কি সেই সম্বন্ধে এখানে কিছুটা আলোচনা করছি। প্রথমেই বলা দরকার যে, এই আন্দোলনটির নেতৃত্ব যারা করছেন তাঁরা আজ কোমিনফম থেকেই তাঁদের রাজনৈতিক প্রেরণা লাভ করে থাকেন। দুঃখের কথা এদেশের বুদ্ধিজীবীদের একটা বৃহৎ অংশ এই আন্দোলনকারীদের গুপ্ত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে অজ্ঞানতঃ এই সব আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত করে দলীয় স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়েছেন। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির মোহে যে তাঁরা এই সব আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের জড়িত করেছেন একথা মনে করলে ভুল হবে। মনে প্রাণে তাঁরা শান্তি চান এবং শান্তিময় জীবনযাপনের উদগ্র কামনাই হয়তো তাঁদের ঐই সব আন্দোলনের মধ্যে টেনে এনেছে। কিন্তু তাঁরা তলিয়ে দেখেন না যে, এই সব মতলবী আন্দোলন বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের গণতন্ত্রের ও স্বাধীনতার সহায়ক মোটেই নয়। কম্যুনিস্টদের এটা হল নয়া চাল। যেমন ভাসমান হিমশৈলের বৃহৎ অংশটুকু জলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে তেমনি এঁদের মস্কো কর্তৃক বিশ্বশাসনের আসল মতলবটি এই সব শ্রুতিমধুর

শ্লোগানের মধ্যে লুকান আছে। এই শান্তিবাদী আন্দোলনকে তীব্র করে তোলার একটা প্রধান উদ্দেশ্য হল গণমন থেকে যে কোন প্রকার আক্রমণ প্রতিরোধ করার সঙ্কল্প ও স্পৃহাকে লুপ্ত করা,—শান্তির শ্লোগান দিয়ে জনসাধারণকে নিশ্চেষ্ট করে ঘুম পাড়িয়ে রাখা। কারণ সেইটাই হবে কম্যুনিস্ট আন্দোলন পরিচালনার উৎকৃষ্ট মুহূর্ত। এই আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের মূল বক্তব্য হল যে, কেবল ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিই যুদ্ধের আয়োজন করছে। রুশ জঙ্গীবাদ থেকে ভয় পাবার কিছুই নেই। ওটা শান্তির পরিপূরক। কিন্তু শান্তিবাদী জঙ্গীবাদ কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতই অর্থহীন। ভারতবর্ষ কটা দেশ আক্রমণ করেছে, কোন কোন দেশে নিজের সৈন্য পাঠিয়ে নিজের হীন সঙ্কীর্ণ স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করেছে—এদেশে কি এমন যুদ্ধের আয়োজন হয়েছে আজ পর্যন্ত যার ফলে এদেশে শান্তি আন্দোলন জোরদার করতে হবে ?

কিন্তু শান্তি আন্দোলন কম্যুনিস্ট ছাড়াও আর এক পক্ষ থেকে পরিচালনা করা হচ্ছে। এরা রাজনৈতিক জগতে Pacifist বলেই পরিচিত। এই তো কিছুকাল পূর্বেই বিশ্বের "শান্তিবাদীদের" প্রথম সম্মেলন হয়ে গেল এদেশেই। এটা একটা পরিহাসই বটে। যে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি সমরায়োজন করছেন ক্ষিপ্রগতিতে শান্তিবাদীরা সেই সব দেশে সম্মেলন না করে মুমূর্ষু ভারতবর্ষে এসে তাঁদের উপদেশামৃত বর্ষণ করে গেলেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই সব শান্তিবাদীদের আন্দোলনও আমাদের গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর। ইঙ্গ-মার্কিনীরা তাদের পাটোয়ারী স্বার্থের কাজে এদের লাগিয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে এদের শান্তি আন্দোলন বিশ্বে ধনবাদী শোষণ ও শাসনকে দীর্ঘমেয়াদী করতে সহায়তা করবে সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। মার্কিন শক্তি মুখে শান্তির বাণী আওড়াচ্ছে কিন্তু তলে তলে সামরিক প্রস্তুতি করে যাচ্ছে। ভারতবর্ষও যদি এদের মত বাইরে শান্তিবাদের নামাবলী চড়িয়ে ভিতরে ভিতরে আত্মরক্ষামূলক সামরিক প্রস্তুতির কাজ চালিয়ে যেত তাহলে এই সব শান্তি আন্দোলন সম্বন্ধে এদেশকে সাবধান করে দেবার প্রয়োজন হত না। যেহেতু আমরা আমাদের দেশকে বিড়াল-তপস্বীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখতে চাই না, সেই হেতু এই সব তথাকথিত শান্তি আন্দোলন সম্বন্ধে এদেশকে সচেতন করে দেওয়া দরকার এই শান্তির মায়ামৃগের প্রলোভনে আমরা অসাবধান হলেই আমাদের জীবনের সারবস্তু জাতীয় স্বাধীনতাকে হারাতে হবে। শান্তি আমরা সকলেই চাই।

কিন্তু স্বাধীনতা, জাতীয় স্বকীয়তা, প্রতিভা ও জাতীয় ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়ে তোলার অধিকারের বিনিময়ে আমরা তথাকথিত শান্তি ক্রয় করতে চাই না। Pacifist-দের শ্লোগানের অন্তঃসারশূন্যতা এবং স্টকহল্‌ম শান্তি প্রচারকদের ভাঁওতাবাজীর গোপন উদ্দেশ্য জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিতে হবে—মস্কো-ওয়াশিংটন-লণ্ডনের কূটনীতিবিদদের হাতে খেলার পুতুল আমরা হতে চাই না। এই সব মেকী শান্তি আন্দোলনের সমর্থন জানাব না। কারণ এদের মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি আসবে না। কোন এক শক্তিজোট কর্তৃক বিশ্বশাসনের পথ সুগম করাই সব আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। বিশ্বে যখন বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতা বিপন্ন, যখন মানুষের জীবনের উচ্চতর মূল্যবোধগুলি শক্তিশালী বিবদমান শক্তিগোষ্ঠীদ্বয়ের হিংসা, গৃধ্নুতা ও শঠতার আঘাতে লুপ্ত হবার মৌন আশঙ্কা জপছে, যখন ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির অস্তিত্ব ও স্বাধিকার তাদের ভয়াল ভ্রূকুটির সামনে বিপন্ন বোধ করছে, যখন জাতিতে জাতিতে সমান সুযোগ ও অধিকার ভোগ করার নীতি বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয় কর্তৃক পদদলিত হচ্ছে প্রতিনিয়তই, তখন শান্তির ললিতবাণী ব্যর্থ পরিহাসের মতই শোনাবে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান জঙ্গীবাদকে আজ আর কিছুতেই শান্তিবাদের নিষ্ক্রিয় কর্মসূচীর দ্বারা রুখতে পারা যাবে না। দানবিক শক্তির ভয়াল ভ্রূকুটিকে কেবলমাত্র আত্মিক শক্তির দ্বারা উপেক্ষা বা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। আত্মিক শক্তিকে সামরিক শক্তির দ্বারা পুষ্ট করতে হবে। ভারতীয় গণতন্ত্রকে তাই যে কোন সাংঘাতিক অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্যে দেশের আত্মরক্ষামূলক সামরিক আয়োজন ও প্রস্তুতিকে Trim order-এ রাখতে হবে।

সমাজতন্ত্রের অপরিহার্যতা :

আগেই আমরা ভারতীয় গণতন্ত্রকে বিশ্ব রাজনীতির টালবাহানা ও সংঘাতশীল শক্তি গোষ্ঠীদ্বয়ের শয়তানীর হাত থেকে রক্ষা করতে হলে—তার সামরিক শক্তি সুদৃঢ়করণের অপরিহার্যতার উল্লেখ করেছি। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে, অধিকসংখ্যক অধুনাতম অস্ত্রশস্ত্র আমদানী বা তৈরী করে, দেশের সেনাবাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি করে দুর্ভেদ্য সীগফ্রীড-ম্যাজিনো লাইন রচনার দ্বারাই কোন দেশকে ও তার রাষ্ট্রীয় মতবাদকে যে-কোনরূপ আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা যায় না। দেশরক্ষা

[illegible] করে প্রধানতঃ দেশবাসীর রাষ্ট্রের প্রতি, রাষ্ট্রীয় [illegible] স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য ও দরদের ওপর। দেশবাসী স্বতঃস্ফূর্ত- [illegible], ঐতিহ্য ও শাসন-ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হতেই পারে না, যদি [illegible] বুনিয়াদ সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়-বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়। সমাজ যতদিন Haves ও Have nots-দের দ্বারা বিভক্ত থাকবে, যতদিন দেশের [illegible] জনসাধারণকে প্রাচুর্যের মধ্যেও "ম্যায় ভুখা হুঁ" বলে চীৎকার করতে হবে এবং [illegible] অবিচারের কাছে নতি স্বীকার করে তাদের ঘৃণ্য অস্তিত্ব ক্রয় করে কালাতিপাত করতে হবে, ততদিন দেশের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধের ও অরাজকতার সম্ভাবনা, সেই দেশের দেশরক্ষা ব্যবস্থার দৃশ্যমান দুর্ভেদ্যতার অন্তরালে আত্মগোপন করে থাকে—সুযোগের অপেক্ষায়। ধনবাদী শাসন-ব্যবস্থা আজকের দিনে অচল, কারণ এই ব্যবস্থায় সমাজের মূল সমস্যার সমাধান অসম্ভব। তা ছাড়া ধনবাদের জঠরে সংঘাতের বীজ লুকিয়ে থাকে এবং সংঘর্ষ অনিবার্য কারণেই একদিন না একদিন প্রকট হয়ে উঠবেই। তাই ভারতীয় গণতন্ত্রকে সমগ্রতান্ত্রিক কম্যুনিজমের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে সমাজতন্ত্রের শক্ত ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে।

আগামী সাধারণ নির্বাচন :

বহু-প্রতিশ্রুত সাধারণ নির্বাচনের তারিখ যদিও আবার পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে তবু এই নির্বাচনেই ভারতীয় গণতন্ত্রের অগ্নি পরীক্ষা হবে। এই নির্বাচন আমরা প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র না সমগ্রতন্ত্র চাই তা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করার এক ঐতিহাসিক সুযোগ দেবে। আমাদের গণতন্ত্রের প্রতি নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার গভীরতা একদিকে যেমন পরীক্ষিত হবে আমরা কি ভাবে এই ভোটাধিকার প্রয়োগ ও ব্যবহার করি তার দ্বারা। অপরপক্ষে ভারতের বর্তমান শাসনকর্তারা যাঁরা নিজেদের গণতন্ত্রী বলে দাবী করেন, যেভাবে ও যে পরিবেশের মধ্যে আগামী সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার সুযোগ ও ব্যবস্থা করে দেবেন তার দ্বারাও প্রমাণিত হবে সত্যি তাঁরা এদেশে গণতন্ত্র কায়েম করতে চান কি না। কারণ এই সুযোগ ও পরিবেশের উপর বহুলাংশে নির্ভর করবে প্রত্যেক নাগরিক কর্তৃক স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার কাজে লাগানোর বাস্তব সম্ভাব্যতা। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীই আগামী দিনের রাষ্ট্রীয়

বুনিয়াদের Potential builder, তাই নির্বাচনের মাধ্যমে যদি এদেশে খাঁটি গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তা হলে দেশবাসীকে—গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, নিষ্ঠাবান, শিক্ষিত জন-প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করে পাঠাতে হবে। প্রধানতঃ ভোটদাতাদের বিচার করতে হবে, কারা বা কোন্ কোন্ প্রতিনিধি গণতন্ত্রের বিজয়-নিশানের বিশ্বস্ত বাহক হতে পাববেন। তাই আগামী সাধারণ নির্বাচন আমাদেব সামনে একটা বিবাট সমস্যা ঝুলিয়ে রেখেছে। পুরাতন গণতন্ত্রে লোকের আস্থা হাবিয়ে যাবাব একটা প্রধান কারণ এই যে, জনসাধারণের ভোটে প্রতিনিধিবা নির্বাচিত হয়ে দেশেব শাসনভাব গ্রহণ করলেও দেশের কল্যাণ সাধিত হয়নি। যোগ্য ও শিক্ষিত ব্যক্তি নির্বাচিত হয়ে যেতে না পাবায় ডেমোক্র্যাসী মেডিয়োক্র্যাসীতে পর্যবসিত হয়। ফলে জনমানসে গণতন্ত্রের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে নৈবাশ্যেব সঞ্চাব হয়। প্রায়ই বলা হয়, Quantity ব প্রতিই গণতন্ত্রের আগ্রহ, Quality-ব প্রতি নয়। গণ-তন্ত্রকে জীবন্ত ও প্রগতিশীল করে তুলতে হলে এই ধাবণাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন কবতে হবে ঘটনার দ্বাবা। তাই 'গণতন্ত্র'কে বাস্তবিক 'গুণতন্ত্রে'ব পর্যায়ভুক্ত কবতে হবে। আর সেটা সম্ভব তখনই হবে যখন সত্যিই সর্বজনশ্রদ্ধেয় 'গুণী' ব্যক্তিবা দেশেব প্রতিনিধিত্ব কবতে পাববেন।

রাজনীতি সখের ও পেশাদারী :

এই সঙ্গে এসে পড়ে যে, সত্যিই যদি গণতন্ত্রকে আমরা আমাদেব রাজনৈতিক জীবনের স্থায়ী ভিত্তিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত কবতে চাই, তা হলে এ দেশের গণতন্ত্রীদেব কাছে সমস্যা কেবল এইটাই নয় যে, আগামী সাধারণ নির্বাচনে যোগ্য ও গুণী প্রতিনিধিদেব নির্বাচিত কবা। সেটা তো হল স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা। আমাদেব নিশ্চিত হতে হবে যে, দেশেব গুণী ব্যক্তিবা বৃহৎ সংখ্যায় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করবেন। আর সেটা তখনই সম্ভব হবে যখন দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিবা রাজনীতিকে মিশন হিসাবে গ্রহণ করবেন এবং তাব জন্য রীতিমত নিজেদেব প্রস্তুত করবেন।

আন্তর্জাতিক যোগাযোগ :

ভারতীয় গণতন্ত্রীদের শুধু নিজ দেশেব সীমানার মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে চলবে না। বিপদ যখন বিশ্বব্যাপী তখন আত্মরক্ষার ব্যবস্থাটা শুধু স্থানীয় হলে চলবে না। তাই ভারতীয় গণতন্ত্রকে তাব মিত্র খুঁজে বার করতে হবে।

আদর্শবাদ ও ভাবাবেগের কথা ছেড়ে দিলেও অন্ততঃ প্রয়োজনের তাগিদেই আমাদের জাতীয় সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যার বিচার করতে হবে। সুতরাং ভারতীয় গণতন্ত্রের এমন এক বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করতে হবে যার ফলে ভারত ও অন্যান্য ছোট-বড় দেশগুলির স্বাধীনতা, স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলিকে এক সখ্যতা ও সমন্বিত স্বার্থের যোগসূত্র দ্বারা গ্রথিত করা যায়। ভারতের বর্তমান পররাষ্ট্র নীতির দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। বর্তমান নীতি অত্যন্ত ত্রুটি ও হেঁয়ালীপূর্ণ। এর চাইতে বোধ হয় মনীষী আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ-থিয়োরী অনেক সহজবোধ্য। ভারতীয় গণতন্ত্রকে রক্ষা ও সুদৃঢ় করতে হলে, বর্তমানে শুধু এক সক্রিয় নিরপেক্ষতা অবলম্বন করলেই হবে না, এই নিরপেক্ষতার মধ্য দিয়ে শান্তিপ্রিয় সকল নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে নিয়ে এক তৃতীয় শক্তিচক্র রচনা করতেই হবে। আর সেটা তখনই সম্ভব যখন ভারতবর্ষ তার বর্তমান শ্যাম-রাখি-কি-কুল-রাখি নীতি পরিত্যাগ করবে। ইঙ্গ-মার্কিন ও রুশ এই দুই শক্তিচক্রের কেউই চায় না ভারত বা অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি নিরপেক্ষ থাকে। নিরপেক্ষতাকে উভয় পক্ষই বরদাস্ত করবে না। তারা এই সব দেশগুলিকে দুই শিবিরের মধ্যে কোন একটাকে বেছে নেবার জন্যেই চাপ দেবে। তাই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে 'তৃতীয় শক্তির' উদ্ভবকে এরা কখনই প্রশ্রয় দেবে না। এই যখন অবস্থা তখন নিজেকে ও অপর নিরপেক্ষ প্রগতিশীল দেশগুলিকে শয়তানী ঘূর্ণনাভের জাল থেকে মুক্ত করার জন্য অগ্রণী হয়ে, নেতৃত্ব নিয়ে এই তৃতীয় শক্তির উদ্ভবকে সাহায্য করতে হবে। এখনও সময় আছে এই দেশগুলিকে সংঘবদ্ধ করে, নিজেদের পৃথক ও যৌথভাবে শক্তিশালী করে জাতীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে ন্যায়, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও রুশ জঙ্গীবাদের ভ্রূকুটির হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার এবং বর্তমান "cold-hot war"কে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ রেখে নিজেদের জীবন, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে কসাইখানার পাশবিকতা ও বীভৎসতার হাত থেকে রক্ষা করার।

বিঃ দ্রষ্টব্য ঃ এই রচনাটি ১৯৫১ সালের 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকার রবিবাসরীয় সংখ্যায় "বাস্তববাদীর দৃষ্টিকোণে ভারতীয় গণতন্ত্র" এই শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছিল সর্বপ্রথম। তার কিছুদিন পরই ঐ বছরই "ভারত ও গণতন্ত্র" এই শিরোনামায় রচনাটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল - রায় প্রেস, ২১।৩এ, গড়িয়াহাট রোড থেকে। প্রকাশক ছিলেন শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়।

২

সংবিধান ও গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের অনুরাগীদের মনে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে গণতন্ত্রের কার্যকারিতা সম্বন্ধে গভীর সংশয় জেগেছে। দেশের গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কট, সমাজের বৃহত্তম অংশের অবিশ্বাস্য দারিদ্র্য, ভয়াবহ বেকারী, বৈষয়িক উন্নয়ন সাধনে পরিকল্পনাগুলির চরম ব্যর্থতা, দুর্নীতির প্রসার, দুর্বিনীত আমলাতন্ত্র, প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকে গরীবদের লুণ্ঠন করে ধনীদের আরও ধনী হবার অবাধ স্বাধীনতা—বিত্তবান ও বিত্তহীনদের আয়-ক্ষমতা—সুযোগ-সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে বিস্তৃততর ব্যবধান, ধনী উদ্ধত শাসকশ্রেণী দুর্নীতি পরায়ণ আমলাদের আইন বিচার-ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে দুবল অসহায় পিছিয়ে-পড়া কোটি কোটি মানুষের গণতান্ত্রিক-মানবিক অধিকার হরণ এইসব মিলিয়ে সাধারণ মানুষেরই শুধু নয়—বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মনেও একটি মৌল প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছে : কি দাম আছে এই তথাকথিত গণতন্ত্রের? পাঁচ বছর অন্তর একদিনের গণতন্ত্রে রাজা-বদলের অধিকারের প্রয়োগ-কে 'গণতন্ত্র' বলে বড়াই করা অসাড় আত্মম্ভরিতা ছাড়া আর কি? প্রতি-প্রাপ্তবয়স্কের-একটি-ভোট—'one-man one-vote rite' এতেই কি গণতন্ত্র সীমাবদ্ধ? গণতন্ত্র কি নিছক ভোটতন্ত্র? রাজা-বদলের অধিকার কি রাজ্য-শাসন পরিচালনা ও তদারকির অধিকার নয়? দেশ স্বাধীন হবার পর উপযুপরি পাঁচটি সাধারণ নির্বাচন দেশ জুড়ে হয়ে গেল। পঁচিশ বছর কেটে গেল তবু ভারতের আটাশ কোটি মানুষ আজও নিরক্ষর; রাজা-বদলের পুণ্য দিনে ছিন্নবস্ত্র—অস্থিচর্মসার—বুভুক্ষু মুমূর্ষুর দল ভোটকেন্দ্রে গিয়ে প্রতিনিধি বাছাই করে—তার যোগ্যতা গুণাগুণ বা রাজনীতি বা শাসননীতির বিচার করে নয়—প্রতীক-চিহ্নের ছবি দেখে! মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে পাঁচ বছর অন্তর একদিনের জন্য বরাদ্দ গণতন্ত্রে ভোট দানের অধিকারও আর অবাধ নয়—স্বাধীন নয়—ভীতি-মুক্ত নয়। প্রশ্ন জেগেছে, তাহলে এ গণতন্ত্রের মহিমা কীর্তন আর কেন? এই 'গণতন্ত্র' তাহলে মৌল পরিবর্তনের মাধ্যম হবে কি করে? তাহলে কি দেশের মানুষকে পড়ে পড়ে শুধু মারই খেয়ে যেতে

হবে? মুখ বুঁজে কি অত্যাচার-অবিচার সইতে হবে? গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষের কাছে এর উত্তর গণতন্ত্রের মধ্যেই নিহিত রয়েছে: গণতন্ত্রই অগণতান্ত্রিক শক্তিকে প্রতিহত করতে পারে। মানুষের তথা সমাজের সার্বিক বিকাশ গণতন্ত্রেই সম্ভব।

ভারতের সংবিধানের মুখবন্ধে দেশকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র-রূপেই শুধু ঘোষণা করা হয়নি—সমগ্র দেশবাসীর জন্য অঙ্গীকার করা হয়েছে:

"ন্যায়বিচার—সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, চিন্তার স্বাধীনতা, মত প্রকাশ, প্রত্যয়-বিশ্বাস ধর্ম-উপাসনার স্বাধীনতা,

পদমর্যাদার প্রতিষ্ঠার সমতা—সকলের জন্য সমান সুযোগ, আর এই প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র জনগণের মধ্যে প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদার ভিত্তিতে সৌভ্রাতৃত্ববোধ এবং জাতীয় ঐক্যবোধ জাগিয়ে তুলতে প্রয়াসী হবে।"

সংবিধানের প্রস্তাবনায় এই গাম্ভীর্যপূর্ণ উদার ঘোষণা সত্ত্বেও মানুষ যখন দেখে দরিদ্রের উপর ধনীর অত্যাচার অব্যাহত, অত্যাচারীর উদ্যত খড়্গ-কৃপাণের নিষ্ঠুর আঘাতে সযত্নে লালিত সকল উচ্চতর মূল্যবোধ ছিন্নভিন্ন, যখন মানুষ দেখে—কি সমাজে কি ব্যক্তি-জীবনে—প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি সঞ্চিত পুঁজি এবং পাশব শক্তির মধ্যে লুকানো রয়েছে, সে যখন দেখে সমাজে সব কিছুর বিচার অর্থের নিরিখে হচ্ছে তখন সে বুঝে নেয় সংবিধানে প্রতিশ্রুত ও প্রচারিত মূল্যবান মৌল অধিকার: ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সমতা, সৌভ্রাতৃত্ব, মনুষ্যত্বের মর্যাদা—এ-সবই নিছক কাগজিক অধিকার—শোষিত দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের কাছে। অর্ধাহার অনাহার দুঃসহ জীবন-যন্ত্রণা যাদের নিত্যসঙ্গী, প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানে তাদের পরমান্ন—গোকুল পিঠে খাবার অন্যান্যদের সঙ্গে অবাধ ও সমান সুযোগ (equal opportunity) আছে সত্যি তত্ত্বগতভাবে। কিন্তু "দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে" সে যখন "নীরবে" মরে, তখন বিবেক সম্পন্ন মানুষের কাছে কি মনে হবে না এই সাংবিধানিক অধিকার একটা প্রচণ্ড শঠতা? বুভুক্ষু মানুষের "স্বাধীনতা"—কিসের স্বাধীনতা? ধুঁকে ধুঁকে—ক্ষয়ে-ক্ষয়ে তিলে-তিলে মৃত্যুহীন অপমৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার স্বাধীনতা? অন্নহীন-কর্মহীন-আশ্রয়হীন লক্ষ লক্ষ মানুষের সংবিধান-ঘোষিত সমতা (Equality of Status) বিপুল বিত্ত, সকল প্রকার সুযোগ[illegible] ভোগের
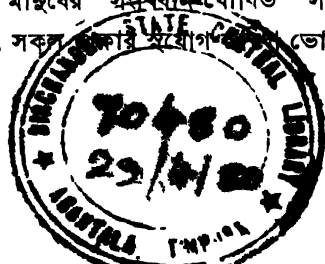
'জন্মগত' অধিকার যাদের সেই সোনার চুষিকাঠি মুখে নিয়ে জন্মিয়েছে আলালের ঘরের দুলালদের সঙ্গে? বামন ও দৈত্যের মধ্যে সমতা,—দুয়ের সম-মর্যাদা? এর চাইতে আষাঢ়ে অলীক তত্ত্ব আর কি থাকতে পারে? একজন সাইকেল আরোহী একজন স্কুটার চালক ও একজন গরুর গাড়ীর চালককে লাইনে দাঁড় করিয়ে স্টার্টার বাঁশি বাজিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কে আগে পৌঁছুতে পারে প্রতিযোগিতার ঘোষণা করলেন। কিন্তু এ কি সমতা-ভিত্তিক প্রতিযোগিতা? এই দৌড়-প্রতিযোগিতায় যে গরুর গাড়ীর চালকের পেছনে কেউই থাকবে না সে-কথা কি বুঝিয়ে বলার দরকার হয়? সমাজ যাদের দু'বেলা পেটভরে ডাল-ভাত খেয়ে বেঁচে থাকার গ্যারান্টি দেয় না সেখানে সেই ক্ষুধা-জর্জর মানহারা নাগরিকদের খর্বতা ও অপমানের দুঃসহ বোঝা ক্রীতদাসের মত বহন করতে হয়। তাদের ব্যক্তি-মর্যাদা বলে কিছু থাকতে পারে? জাতীয় ঐক্যের (Unity of the Nation) ভিত্তি কি এই ভেদনীতি-দারিদ্র্য-অনাহার-বঞ্চনার চোরাবালির ওপর কখনও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? সমাজ-উপেক্ষিত এই অপমানিত বঞ্চিত লক্ষ লক্ষ মানুষের দল গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কখনও "হয় না সহায়—হয় মহা দায়"—সংবিধানের গুরুগম্ভীর ঘোষণা সত্ত্বেও।

আইনের চোখে 'সমতা' 'স্বাধীনতা' 'ন্যায় বিচার' পাবার 'সুযোগ' এবং 'ক্ষমতা' (ability) দুটো কিন্তু এক বস্তু নয়। সংবিধান প্রদত্ত ঘোষণায় সুযোগগুলি নিঃসন্দেহে স্বীকৃত, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সুযোগ কার্যকরী করার বা বাস্তবে রূপায়িত করবার 'ক্ষমতা' অর্পিত না হচ্ছে ততক্ষণ 'অধিকার' অবাস্তবতার পর্যায়েই পড়ে থাকে। R. H Tawney-র Equality-র ওপর বিখ্যাত উক্তিটি স্মর্তব্য:

"Equality of opportunity is not simply a matter of legal equality. Its existence depends, not merely on the *absence* of *disabilities* but on the *presence* of *abilities*."

গোকুলপিঠে পরমান্ন খাবার অধিকার কাগজে-কলমে আইনের দৃষ্টিতে অতি দীন দরিদ্রেরও আছে। এদিক থেকে কোন আইনগত 'অক্ষমতা' (disability) নেই তার। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে যার সামর্থ্য নেই সে পরমান্ন গোকুলপিঠে খাবে কিভাবে? এক্ষেত্রে তার ক্ষমতার অভাব রয়েছে "presence of abilities"-এর অভাব। তাই যতক্ষণ না এই 'abilities'-গুলি

দিয়ে সাংবিধানিক অধিকারগুলির মালা গাঁথা না হচ্ছে ততক্ষণ সংবিধানে প্রদত্ত 'Liberty' 'Equality' 'Justice' 'Dignity'—সবই ফাঁকা বুলি। গণতন্ত্রের আদর্শে যারা বিশ্বাসী তাদের সংগ্রাম করতে হবে এইসব 'ক্ষমতা'গুলির প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে। ভারতের প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানের এই অপূর্ণতা ও অসঙ্গতি দূর করার জন্য চাই—নূতন বিপ্লব—যা দ্রুত মৌল সামাজিক পরিবর্তন (social changes) সূচিত করবে।

ভারতীয় সংবিধানে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার অধিকার মৌল অধিকার রূপে স্বীকৃত নয়। কিন্তু সংবিধান প্রণেতারা আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধানের অনুকরণে কতকগুলি মৌল নীতির (Directive Principles of State Policy) কথা বলেছিলেন যেগুলির বাস্তব রূপায়ণ হবে রাষ্ট্রের লক্ষ্য। সংবিধানে ৩৯ ধারায় এই নীতিগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে :

"অনুচ্ছেদ ৩৯ : রাষ্ট্র বিশেষভাবে নিজ রাজনীতি সেইরূপে পরিচালনা করিবে যাহাতে সুনিশ্চিত হইবে—

(ক) যেন নাগরিকগণ, পুরুষ ও স্ত্রী সমভাবে, একটি যথোপযুক্ত জীবিকা অর্জনের পন্থার অধিকারী হয় ;

(খ) যেন সমাজের পার্থিব সম্পদ সমূহের উপরে মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এরূপভাবে বণ্টিত হয় যাহাতে সাধারণের মঙ্গল সর্বোত্তমরূপে সাধিত হয় ; .

(গ) যেন আর্থনীতিক বিন্যাসের ফল স্বরূপ ধন সম্পদ ও উৎপাদনের উপায় সমূহ একক অধিকারে চলিয়া গিয়া সাধারণের ক্ষতির কারণ না হয় ,

(ঘ) যেন পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েই সমান পরিশ্রমের জন্য সমান বেতন পান ;

(ঙ) যেন পুরুষ ও স্ত্রী কর্মীদের স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা ও শিশুদের কাঁচা বয়স অপপ্রয়োগ করা না হয় এবং নাগরিকগণ আর্থনীতিক প্রয়োজনে বাধ্য না হন জীবিকা অর্জনের জন্য এরূপ পন্থাসমূহ গ্রহণ করিতে যেগুলি তাহাদের বয়স ও ক্ষমতার অনুপযোগী ;

(চ) যেন শৈশব ও যৌবন শোষণ হইতে এবং নৈতিক ও সাংসারিক অবহেলা হইতে রক্ষিত হয়।"

[ভারতের সংবিধান : বঙ্গানুবাদ : প্রফুল্লরতন মুখোপাধ্যায় ; পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫]

নিঃসন্দেহে যে-কোন সভ্য সমাজের পক্ষে এগুলি সার্বজনীন উচ্চ নৈতিক মানবিক গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা। আনন্দের কথা সংবিধান প্রণেতারা এই নীতিগুলি অধিকারের পোশাকে প্রতিশ্রুত সংরক্ষিত মৌল সংবিধানিক অধিকার রূপে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত না করলেও এর গুরুত্ব সম্বন্ধে দেশের প্রশাসকমণ্ডলী (Executive) এবং বিধানমণ্ডলী বা পার্লামেণ্টকে সজাগ করে দিয়েছিলেন। ডক্টর বি. আর. আমবেদকর খসড়া সংবিধান বিল উত্থাপন করে এই মৌল নীতিগুলি সম্বন্ধে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন :

" ... they are instructions to legislature and the executive. Whoever captures power will not be free to do what he likes with it." (Constituent Assembly Debates.)

"এই নীতিগুলি আইন-পরিষদ এবং প্রশাসকদের কাছে সাংবিধানিক নির্দেশাবলীর মতই। যিনিই ক্ষমতায় আসুন না কেন—এই নীতিগুলি লঙ্ঘন করাতে পারবেন না। সাংবিধানিক নির্দেশনামাগুলি অবশ্য-মান্য।"

'প্রজাতন্ত্র' ঘোষিত হবার পর পঁচিশ বছরের ওপর কেটে গেল— কিন্তু প্রশ্ন জাগবে, এই সার্বজনীন বুনিয়াদী লক্ষ্য-নির্দেশক নীতিগুলির কোন্‌টি আদৌ রূপায়িত হয়েছে? সংবিধানের এই অনুচ্ছেদের ৬টি উপধারার মধ্যে (ক), (ঘ) (ঙ) ও (চ) সাধারণভাবে কল্যাণ-সম্পর্কিত এবং বাকি তুটি উপধারা (খ) ও (গ) দেশের সম্পদের বণ্টন-সম্পর্কিত।

'কাজ করার অধিকার' নির্ভর করে কাজ পাবার অধিকারের ওপর। অবশ্য এই কাজ পেলেই হবে না। বাঁচার মত জীবিকা নির্বাহের উপযোগী মজুরী সুনিশ্চিত হওয়া চাই। আর সেই সঙ্গে চাই কাজের উপযোগী উৎসাহব্যঞ্জক যুক্তিসঙ্গত পরিবেশ।

সংবিধান প্রণেতারা এই নীতির গুরুত্ব সম্বন্ধে এত বেশী সজাগ ছিলেন যে, ৩৯ অনুচ্ছেদে একটা উচ্চ আশা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হননি। সংবিধানের ৪১ এবং ৪৩ অনুচ্ছেদেও দেশের প্রশাসকমণ্ডলী এবং আইন-পরিষদকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন :

"The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases

of unemployment, old age, sickness and disablement and in other cases of undeserved want."

এই অনুচ্ছেদে সরাসরি মজুরী বা বেতনের বিনিময়ে কাজ করার অধিকার, কর্মহীন হয়ে বসে থাকার কালে অথবা বার্ধক্য-রোগ-শারীরিক অক্ষমতা এবং দারিদ্র্যে সরকারী সাহায্য প্রাপ্তির অধিকারের কথা বলা হয়েছে। বেকারী-বার্ধক্য-রোগ-দারিদ্র্যের অবক্ষয় থেকে সমাজকে রক্ষা করার উদাত্ত আহ্বান প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানে লিপিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আজ দেশের শতকরা ৭০ জন দারিদ্র্য-সীমার (poverty line) নীচে বাস করছে (১৯৫১ সালের মূল্যসূচকের হিসাবে মাসিক ২০ টাকা আয়।)। অথচ দেশের চারটি পাঁচশালা পরিকল্পনা অতিক্রান্ত হবার পর পঞ্চম পাঁচশালা পরিকল্পনার প্রারম্ভিক কালের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষ এগুচ্ছে। দেশে পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা হচ্ছে—দারিদ্র্য বাড়ছে – বেকারীও বাড়ছে। এই পশ্চিমবাংলাতেই রাজ্য উন্নয়ন পর্ষদের হিসাবে ২৮ লক্ষ লোক বেকার। সি. এম. পি. ও.-র (CMPO) এক সমীক্ষায় জানা যায় এ রাজ্যে ৪৬ লক্ষ লোক বেকার ও অর্ধবেকার। প্রতি বছর প্রায় এক লক্ষ শিক্ষিত যুবক অলিখিত অঘোষিত বেকারদেব তালিকাভুক্ত হচ্ছেন। পশ্চিম-বাংলার 'ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স'-এর হিসাবে এ রাজ্যে বেকারদের সংখ্যা ৩৬ লক্ষ। সমগ্র পরিস্থিতি এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মুখে। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস, পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী দম্ভোক্তি করছেন তের বছর পর পশ্চিমবঙ্গ (১৯৫৫-৫৬) 'উদ্বৃত্ত বাজেট' উপস্থাপিত হয়েছে। মহানগরী কলকাতায় রাজ্য সরকার "বিশেষ সংবাদ" রূপে "উদ্বৃত্ত বাজেট" সংবাদ বড় বড় হরফে প্রচারিত হয়েছে। অথচ এই মহানগরী কলকাতার শতকরা ৩০ ভাগ লোক বাঁশের বেড়া-ঘেরা ও ভাঙা-টালির ছাদের নীচে বস্তিতে বাস করছে। একটি ঘরে পনের জন লোক মাথা গুঁজে আছে। এই উদ্বৃত্ত বাজেট ও গরীবি হটানোর দম্ভোক্তির দিকে বিকট ব্যঙ্গ করছে দেশের এই সীমাহীন দারিদ্র্য, এই দুঃসহ মৃত্যু-যন্ত্রণা। এই নির্লজ্জ দম্ভোক্তি—প্রজ্বলন্ত রোম নগরীর বুকে নির্দয় নীরোর বেহালাবাদনের মতই শোনায় না কি ?

শিক্ষালাভের অধিকারের কথা সংবিধানে বলা হয়েছে। অথচ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পঁচিশ বছর পর—সরকারী হিসাবমত ভারতবর্ষে নিরক্ষরের সংখ্যা আটাশ কোটি। দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশী লোককে নিরক্ষর

অবস্থায় পঙ্গু করে রাখা হয়েছে। এই অপমানিত পঙ্গু মানহারা মনুষ্যত্বই কি গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের 'ভিত্তি হবে? পৃথিবীর 'বৃহত্তম গণতন্ত্র' কি এই নিয়ে বড়াই করবে বিশ্বের সামনে? সংবিধান প্রণেতাদের আত্মা সংবিধানের এই নির্দেশাবলীর (Instruments of Instructions : Directive Principles of State Policy) এই অবমাননা দেখে—আঁৎকে উঠবে। ডক্টর আমবেদকরের গণ-পরিষদে প্রদত্ত আশ্বাসবাণী আরাবল্লীর পর্বতগাত্রে আঘাত খেয়ে খেয়ে প্রতিহত হয়ে ফিরছে। প্রকৃতি কখনও শূন্যতা বরদাস্ত করে না। গণ-বিক্ষোভ সারাভারতে তরঙ্গিত হচ্ছে। পাঁচলক্ষাধিক নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্ত অভূতপূর্ব অহিংস প্রতিবাদ মিছিল প্রশাসকমণ্ডলী ও শাসকগোষ্ঠীর উদাসীনতা-উপেক্ষা-সুসজ্জিত ব্যারিকেড-ভ্রূকুটি-অমান্য করেই ভারতের রাজধানীর রাজপথে আত্মপ্রকাশ করেছে।

সংবিধানের ৪৩ ধারায় বলা হয়েছে তিনটি মূল অধিকারের কথা : (ক) কাজ পাবার অধিকার, (খ) শিক্ষা পাবার অধিকার এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে (গ) সাহায্য পাবার অধিকার। সংবিধান প্রণেতারা অবশ্য সীমিত ক্ষমতার কথা বিস্মৃত হননি। সরকারের আর্থিক ক্ষমতা ও উন্নয়নের স্তরের সীমানার মধ্যেই এই নীতিগুলিকে কার্যকরী করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতার অর্থ কি এই: প্রতি পাঁচশালা পরিকল্পনা রূপায়ণের সাথে সাথে ধনীরা আরও ধনী হবে—গরীবরা আরও গরীব হবে? কর্মক্ষম বেকারদের সংখ্যা উত্তরোত্তর স্ফীত হবে? নিরক্ষরদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে ৩৫ কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে? দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০ কোটি লোক দারিদ্র্য-সীমার নীচে থেকে যাবে?

সংবিধানের ৪৫ অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হয়েছিল সংবিধান চালু হবার দশ বছরের মধ্যে চৌদ্দ বছর বয়স্ক শিশু ও কিশোররা অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা পাবে। কিন্তু এই গাম্ভীর্যপূর্ণ অঙ্গীকার কী আচরণের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে গত পঁচিশ বছরে?

সংবিধানের ৪০ ধারায় দেশে পঞ্চায়েতী গ্রামীণ স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা চালু করাকে সাংবিধানিক লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

Art. 40. The State shall take steps to organise Village Panchayats and endow them with such powers and authority

as may be necessary to enable them to function as units of Self-Government : [Constitution of India]

অতি-কেন্দ্রীকরণ এবং গণতান্ত্রিক স্বায়ত্ব-শাসন পরস্পর বিরোধী তত্ত্ব। তাই গণকল্যাণকামী রাজনৈতিক দার্শনিকরা গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। লেনিনও : "All power to the Soviets"—এই বৈপ্লবিক লক্ষ্যকে সামনে রেখেছিলেন। এও তো পঞ্চায়েতী রাজেরই কথা, সর্বোদয় আদর্শেরই বহিঃপ্রকাশ। সমাজতন্ত্রের ছোট্ট ব্যাখ্যা দুটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীর মাধ্যমে সমাজতন্ত্রীরা করেছিলেন : (১) বিদ্যুতের প্রসার গ্রামে গ্রামে এবং (২) গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন (Soviet)। এই সমাজতন্ত্রই হবে প্রকৃত গণতান্ত্রিক মানবতাবাদী সমাজতন্ত্র। এই গণতন্ত্রই হবে প্রকৃত গণঅংশগ্রহণের বাস্তবতায় মহিমাময়। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতের প্রসার হলে দেশজুড়ে কর্মযজ্ঞ সুরু হবে, ক্ষুদ্র কুটির-শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণ হবে। অল্প ব্যয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপন্ন করা যাবে, কর্মক্ষম অলস ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান হবে, লুপ্ত গ্রামীণ বৃত্তি পেশা পুনরুজ্জীবিত হবে। 'ডোল' খাইয়ে, খয়রাতি দান মধ্যে মধ্যে লুটিয়ে দিয়ে সরকারের বদান্যতা দেখাতে হবে না। আর পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীত হলে দেশের সামগ্রিক প্রশাসনে গ্রামের মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ বাস্তবতার গৌরব অর্জন করবে।

সংবিধান প্রণেতাদের—যাঁদের অধিকাংশই এ যুগের রাজনীতির ছাত্রদেক কাছে হয়ত রক্ষণশীল (Conservative) বলে বিবেচিত হবেন—উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক আদর্শকে রাষ্ট্রের নির্দেশিত লক্ষ্যরূপে তুলে ধরার জন্য তাঁদের সশ্রদ্ধ স্মরণ না করে পারা যায় না। আর অদৃষ্টের পরিহাস এ যুগের প্রগতিশীলরা ক্ষমতাসীন হয়ে পঞ্চায়েতী-রাজ আদর্শকে হিম-ঘরে পুরে রেখেছেন। পশ্চিম-বাংলায় গত পনের বছরের মধ্যে কোন পঞ্চায়েতের নির্বাচন পর্যন্ত হয়নি। আমাদের দেশের পঞ্চায়েতী প্রশাসন কাঠামো ত্রুটিপূর্ণ এবং নির্বাচন-ভোটাভুটি আস্থা-অনাস্থা ভোটযুদ্ধ ও ক্ষমতা দখলের নিম্নস্তরের পাওয়ার পলিটিক্স্ এটাই যেন মুখ্য ব্যাপার। গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের ক্ষমতাই বা কতটুকু ? লক্ষ লক্ষ গ্রামে গাঁথা এই ভারতবর্ষ শাসিত হচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্যের রাজধানীগুলি থেকে কতকগুলি জবরদস্ত আদর্শহীন পেশাদারী রাজনীতিবিদ ও আমলাদের দ্বারা। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস সমগ্র ভারতের যে-গ্রামগুলিতে দেশের

শতকরা ৮০ জন লোক বাস করে—শিক্ষা-স্বাস্থ্য জীবিকা আধুনিক সভ্যজীবনের আশীর্বাদ—বিজ্ঞান—প্রযুক্তিবিদ্যার আশীর্বাদ শুধু তোলা আছে শহরাঞ্চলের শতকরা ২০ জনের জন্য। যুগ যুগ ধরে অবহেলিত গ্রামের উপেক্ষিতরা বঞ্চনার দুঃসহ বোঝা নীরবে বয়ে আসছে। প্রতিকারহীন মূক প্রতিবাদ নীরবে নিভৃতে কেঁদেছে। সর্বোদয়ী আদর্শ উপেক্ষিত। দিল্লী আজও অনেক দূরে। নেতাজীর বিপ্লবী যুদ্ধ-আওয়াজ "চলো চলো—দিল্লী চলো", "দিল্লীর পথ—স্বাধীনতার পথ" বেইমান বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের যোগসাজসে—কোহিমার প্রান্তসীমা পর্যন্ত এসে প্রতিহত হয়ে ফিরে গেল। [সেদিন হাজার হাজার ভারতের মুক্তিযোদ্ধারা ব্রিটিশের কারাগারে বন্দী,—আগস্ট-বিপ্লবের অন্যতম শক্তিমান নায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রকাশ্যে নেতাজীকে ভারতে তাঁর 'আজাদ হিন্দ্ মুক্তি বাহিনী' নিয়ে প্রবেশের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আজকের কংগ্রেসের 'বন্ধু' সি. পি আই. ব্রিটিশের ছত্রছায়ায় সেদিন নেতাজীকে রুখতে চেয়েছিলেন।] দিল্লীর কেন্দ্রীভূত সমস্ত ক্ষমতা জনতার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে না পারলে—স্বাধীনতা গণতন্ত্র অর্থহীন বাগাড়ম্বর হয়ে দাঁড়াবে। নেতাজী সেই জন্যেই দাবী করেছিলেন : "All power to the Indian people"—'জনতার হাতে সমস্ত ক্ষমতা ছড়িয়ে দিতে হবে।' জনগণই ক্ষমতার উৎস—কারাগার নয়, আমলাতন্ত্র নয়—উদ্ধত রাইফেলের নল নয়।

সংবিধান প্রণেতারা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে বিকেন্দ্রীত গণতন্ত্রের আদর্শ রূপায়িত হোক এটাই চেয়েছিলেন। সংবিধানের নীতি-লক্ষ্য-নির্দেশক ধারাগুলির সঙ্গে (Directive Principles of State Policy) মৌল অধিকারগুলির কোন দ্বন্দ্ব নেই। সংবিধান কার্যকরী করতে গিয়ে জনকল্যাণ-এর চাইতে দলীয় সংকীর্ণ রাজনীতিই প্রাধান্য পেয়ে এসেছে এদেশে। তাই সংবিধানে যে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলি রক্ষার জন্য গণ-পরিষদ সোচ্চার হয়েছিলেন সেই মানসিকতা ও নিষ্ঠা সাংবিধানিক গণতন্ত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। ফলে বিকেন্দ্রীকরণের আদর্শের স্থান দখল করেছে অতি-কেন্দ্রীকরণের আদর্শ, দক্ষতার স্থান নিয়েছে অযোগ্যতা। গণতন্ত্রের কার্যকারিতা সম্বন্ধেই সন্দেহ জন্মাচ্ছে। আলডুস হাক্সলি বলেছেন :

"The art of what may be called 'goodness politics' as opposed to power politics is the art of organizing on a large

scale without sacrificing ethical values which emerge only among individuals and small groups. More specially, in the art of combining decentralization of government and industry, local and functional autonomy and smallness of administrative units with enough over-all efficiency to guarantee the smooth running of the federated whole".

[Grey Eminence—A Study in Religion and Politics—Aldous Huxley ; P. 248.]

সংবিধানে ৪৪ ধারায় বলা হয়েছে :

"The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory."

দেশের সকল শ্রেণীর সকল সম্প্রদায়ের নাগরিকদের জন্য একই ধরনের ব্যক্তিগত আইন প্রচলনে উদ্যোগী হবে রাষ্ট্র। অথচ ভোটের রাজনীতির জন্য পাওয়ার পলিটিকস্—কুটিল দলাদলির রাজনীতির দুষ্ট চক্রে পড়ে দেশের রাজনৈতিক দলগুলি এদিকে নজরই দেয়নি। ভারতীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য চাই সর্বাগ্রে ভারতের নাগরিকদের ভারতীয়তা। আগে ভারতবর্ষীয় রূপে আমাদের গড়ে উঠতে হবে। সেই মাটির তাল দিয়েই তো ভারতীয় গণতন্ত্রের আরাধ্য প্রতিমা গড়ে তোলা সম্ভব। নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সেই মহান্ নেতার প্রেরণায় একটি গান রচনা করে প্রতি সভা-অনুষ্ঠানে সেই গান পরিবেশন করতেন যার একটি কলি ছিল এইরূপ : "হাম্ হিন্দি হ্যায় আউর কুছ ভী নেহি হ্যায়।" দুঃখের কথা স্বাধীন ভারতের কর্ণধাররা সেই আদর্শ কি আদৌ অনুসরণ করেছেন? চেষ্টা হয়েছে ভারতবাসীকে খান্ খান্ করার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডিত স্বার্থের তাগিদে। দেশে যদি সকল সম্প্রদায়ের জন্য একই দেওয়ানী আইন সংহিতা সমানভাবে প্রযুক্ত না হয়—তাহলে সেই সমতাবোধ আসবে কি করে? সংবিধানের ঘোষণা সত্ত্বেও কেন সেই নির্দেশিত লক্ষ্যের দিকে পার্লামেণ্ট বা শাসকদল পদক্ষেপ নিল না? কেনই বা অন্য রাজনৈতিক দল এই মৌল প্রশ্নটিকে এড়িয়ে চলে এসেছে? সেই ভোটে বিশেষ বিশেষ সংকীর্ণ স্বার্থে সুড়সুড়ি দিয়ে ক্ষমতা দখলের রাজনীতির অকল্যাণকর ট্র্যাডিশন চলে আসছে। হাক্সলীর ভাষায় 'গুড্‌নেস পলিটিক্স্' সততা বা সদ্‌গুণ রাজনীতি-র স্থান দখল করে

আছে 'পাওয়ার পলিটিক্‌স্'—কুচক্রী ধান্ধাবাজী রাজনীতি—পাইয়ে দেবার রাজনীতি। আইনের বাধা তো কিছুই ছিল না তবু কেন এই 'ইউনিফর্ম সিভিল কোড' চালু হল না? দুঃখের কথা একটা বলিষ্ঠ সৎ চেষ্টাও হল না গত পঁচিশ বছরে। ছোট ছোট ভূগোল ও সম্প্রদায়ের গণ্ডী দিয়ে দেশ জুড়ে আত্মঘাতী অনৈক্যের সাধনায় মত্ত হলাম আমরা। গণতন্ত্রের আধারটাকেই সংকীর্ণতার অপমানে প্রতিমুহূর্তে খর্ব করে আসছি আমরা। তবু মুখে বলব 'বৃহত্তম গণতন্ত্র'কে চালু রেখেছি আমরা।

সংবিধানের ন্যায় পুণ্য রাষ্ট্রীয় দলিলে নির্দেশিত গম্ভীর লক্ষ্যগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য যে-পদক্ষেপগুলি নেওয়া প্রয়োজন ছিল সেদিকে না এগিয়ে 'পাওয়ার পলিটিক্সের' লক্ষ্যেই আমরা ছুটে চলেছি। 'গরিবী হটানোর' কথা সর্বকালের উপযোগী সুন্দর ভাষায় তো ভারতীয় সংবিধানেই ছিল। নিঃসন্দেহে সংবিধান প্রণেতারা ভোট-রাজনীতি জোট-রাজনীতির কথা ভাবেননি। তাই চটকদার শ্লোগানের ভাষা ব্যবহার করেননি তাঁরা। ভারতীয় সংবিধানের ৪১, ৪৩, ৪৬ ও ৪৭ অনুচ্ছেদগুলির দিকে নজর দিলেই দেখা যাবে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যকে সংবিধান প্রণেতারা সাংবিধানিক লক্ষ্য হিসাবে সামনে রেখেছিলেন। সংবিধানের ৪৬ ধারায় সমাজের দুর্বল অবহেলিত অংশকে উপজাতি তপশিলী সমাজের মানুষকে অবিচার ও শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের ঘোষণা রয়েছে। শিক্ষা ও আর্থিক পশ্চাদপদতা দূর করে সমাজের দুর্বল অংশগুলিকে ("Weaker sections of the people") রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে।

"রাষ্ট্র বিশেষ যত্ন সহকারে জনগণের দুর্বল অংশগুলির শিক্ষার অর্থ নৈতিক স্বার্থের উন্নতিসাধন করিবে এবং বিশেষভাবে তপশীলভুক্ত জাতিগুলির ও তপশীলভুক্ত উপ-জাতিগণের এবং তাহাদিগকে সামাজিক অবিচার ও সকল প্রকার শোষণ হইতে রক্ষা করিবে।" [ভারতের সংবিধান: অনুবাদক প্রফুল্লরতন মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩৭, ৪৬ অনুচ্ছেদ]

তাই 'গরিবী হটানো'র কথা দলের নির্বাচনী ভাষণে থাকলেও সেটা মোটেই নূতন কথা নয়—১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতের যে-সংবিধান চালু হল তাতেই এই লক্ষ্যের কথা নানা ভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু তবু সংবিধান প্রণেতারা যাঁরা পঁচিশ বছরের আগে এই সব কর্তব্যের কথা বলতে গিয়ে সদ্য-স্বাধীন সমস্যা-জীর্ণ 'শিশু-রাষ্ট্রে'র অক্ষমতার চিন্তায় কাতর হয়ে স্বাধীনতা

আন্দোলনের সামাজিক-অর্থনৈতিক লক্ষ্য ও স্বাধীনতা-উত্তর যুগের জনকল্যাণধর্মী প্রজাতান্ত্রিক গণরাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রতি ভারতীয় রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীনতা দেখাননি—তাঁরা আজ 'রক্ষণশীল'! আর যাঁরা বছরের পর বছর এই দায়িত্ব পালনে অবহেলা দেখিয়ে এসেছেন নানা অছিলায় তাঁরা এযুগের "প্রগতিশীল"। পার্লামেন্টে ১৯৫১ সালে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েও 'গরিবী হটানোর' সাংবিধানিক লক্ষ্য সম্বন্ধে চরম উদাসীনতা দেখিয়ে এসেছেন 'প্রগতিবাদীরা'। সংবিধানে এই উচ্চ মানবতাধর্মী লক্ষ্যগুলিকে কার্যকরী করার জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন ছিল না, দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতারও প্রয়োজন ছিল না।

কেউ হয়ত 'প্রগতিশীল' শিবির থেকে ব'লে বসবেন, এই সব নীতিগুলো তো মৌল অধিকার-বলে সংবিধানে স্বীকৃত নয়? তাই এই সব উচ্চারিত নীতিগুলির মাহাত্ম্যই বা কতটুকু? উত্তরে তাঁদের সংবিধানের ৩৭ ধারার দিকে দৃষ্টি দেবার কথা বলা যেতে পারে। ৩৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে:

"এই অংশে সন্নিবেশিত বিধিগুলি কোন বিচারালয় দ্বারা বলবৎ করা যাইবে না, তথাপি দেশ শাসনকার্যে উহাতে উল্লিখিত নীতিগুলি মৌলিক এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইবে আইনসমূহ প্রণয়ন করিতে এই নীতিগুলি প্রয়োগ করা।" [অনুচ্ছেদ ৩৭: ভারতের সংবিধান—অনুবাদক প্রফুল্লরতন মুখোপাধ্যায়; পৃষ্ঠা ৩৪]

আর সংবিধানের যে-কোন অংশ বা অনুচ্ছেদ সংশোধনের অনিয়ন্ত্রিত বল্গাহীন ক্ষমতা পার্লামেন্টের আছে—[24th and 25th Amendments to Constitution] এই ঘোষণা সুপ্রীম কোর্ট থেকে পাবার পর দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যকে মৌল অধিকারের তালিকাভুক্ত করতেই বা বাধা কি ছিল? ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল জাতীয় জীবনের ৪টি গুরুত্বপূর্ণ বছর কেটে গেল—প্রাক্-নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলি যেন নিছক কথার আতসবাজী, নির্বাচনী উৎসবের চোখ-ধাঁধান আলোর চমক সৃষ্টির জন্যই যেন ওগুলোর প্রয়োজন ছিল। প্রতিশ্রুতি এবং আচরণ, সঙ্কল্প ও কৃতিত্বের বিস্তৃততর ব্যবধানের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেই 'দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের', 'পরিত্যক্ত', 'হতাশ' রাজনীতিবিদদের কণ্ঠস্বর বলে সোরগোল হবে। কথা ও কাজের এই অসঙ্গতি সাধারণ মানুষকে গণতন্ত্রের কার্যকারিতা সম্বন্ধে হতাশ করছে। আমলাতন্ত্রের লালফিতার ফাঁসে বহু উচ্চ-সঙ্কল্প নিষ্পিষ্ট আজ। জাতীয় উদ্যম ও পুনরুজ্জীবনের রথের চাকা ব্যর্থতা ও

অকর্মণ্যতার চোরাবালির বুকে বসে গিয়ে রথের গতি রুদ্ধ হয়ে গেল। সঙ্কট উত্তরণের মুখে আরোহীদের গন্তব্য লক্ষ্যের কথা ভুলে গিয়ে—রথের সারথি উপদেষ্টাদের সঙ্গে কূটিল তর্কে মশগুল হয়ে রইলেন রথের চাকার অথবা অশ্বের কোন্‌টা 'প্রগতিশীল' কোন্‌টা 'প্রতিক্রিয়াশীল', কোন্‌টা ডান-ঘেঁষা কোন্‌টা বাম-ঘেঁষা, রথের ঝালড় আর ঝালড়ের ওপর বুটি-চিকনের সাজসজ্জা-অলঙ্কার 'সমাজতন্ত্রী দুনিয়া' না 'বুর্জোয়া দুনিয়ার' আমদানী মাল !

নিশ্চেষ্ট হয়ে থেমে থাকলে চলবে না। থমকে আটকিয়ে-পড়া রথকে সচল করতে হবে। আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আদর্শে দীক্ষিতদের সম্মিলিতভাবে রথের চাকায় কাঁধ লাগিয়ে তাকে ঠেলে তুলে লক্ষ্যের অভিমুখে ছোটাতে হবে, ভারতের সংবিধানে যে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও সমতার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা উচ্চারিত হয়েছে তাকে বাস্তবায়িত করতে নূতন বিপ্লবের সার্বিক প্রস্তুতি নিতে হবে। দেশের সংবিধান সেই বিপ্লব প্রস্তুতি ও রূপায়ণের কাঠামো। ধার-করা প্রগতিশীলতার মোহে এ-যুগের কালিদাসের মত যে গণতন্ত্রের বৃক্ষ-ডালে বসে আছি—তাকেই যেন কাটতে উদ্যত না হই।

গণতন্ত্র ঃ অগ্রাধিকার ও সীমাবদ্ধতার তর্ক

সামাজিক-বৈষয়িক উন্নয়ন বনাম রাজনৈতিক গণতন্ত্র

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিষদীয় গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে দেশের মৌলিক রূপান্তর ঘটানো কি সম্ভব ? একনায়কতন্ত্রী ব্যবস্থা ছাড়া কি দ্রুত আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনা সম্ভব নয় ? যাঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নন তাঁরা বলবেন——'গণতন্ত্র'—'মতপ্রকাশের স্বাধীনতা', 'আদালতের স্বাধীনতা' নিরপেক্ষ ভূমিকা রাজনৈতিক বিরোধিতার অধিকার এসব তত্ত্বকথা অবহেলিত সমাজের হৃতভাগ্য দৈন্য-জীর্ণ শ্রেণীর মানুষের কাছে নিছক কথার মালা গাঁথা,—বিশেষ সুযোগ সুবিধাভোগী শ্রেণীর বিশেষ বিশেষ সুবিধা-সুযোগ রক্ষার সহায়ক-মন্ত্র। এসব বুর্জোয়া শ্রেণীর রক্ষাকবচ। দেশের মানুষের কাছে আসল সমস্যা অন্ন-বস্ত্রের, বুনিয়াদী শিক্ষা, মাথা গোঁজার সুনিশ্চিত আশ্রয়—রোগ অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা, সর্বোপরি—কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা। রাষ্ট্রকে সর্বাগ্রে এই কাজগুলি করতে হবে। কিন্তু এই কাজগুলো করা হচ্ছে কিনা সেটা যাচাই করা সম্ভব যদি দেশে রাজনৈতিক গণতন্ত্র থাকে।

যে-ব্যক্তি দু'বেলা দু'মুঠো প্রাণধারণের উপযোগী আহার্য পায় না,—নিশ্চিন্তে নিরাপদে মাথা গোঁজার স্থায়ী আশ্রয় যার নেই, যার জীবন-দুয়ারে প্রতিষেধক রোগের অবাধ অভিঘাত—অর্থের অভাবে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুই যার জীবনে সুনিশ্চিত—কর্মহীনতার দুঃসহ অভিশাপ যে-বেকার বহন করছে তার কাছে ভারতের সংবিধানে ঘোষিত মৌল অধিকারগুলি সত্যিই কি জনমানসে সাড়া জাগাতে পারে ? এই পঙ্গু মনুষ্যত্ব কি সংবিধান-স্বীকৃত অধিকার ও আদর্শ সম্বন্ধে আদৌ উৎসাহিত বোধ করতে পারে ? এই প্রশ্ন আজকের সাময়িক প্রশ্ন মনে করলে ভুল হবে। প্রত্যেক সমাজেই এই প্রশ্ন কোন না কোনও ভাবে উঠেছে—ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উঠেছিল ভারতবর্ষেও উঠেছে। যাঁরা এই গুরুত্বপূর্ণ তুলে থাকেন সভা-সমিতিতে আলোচনা-চক্রে—তাঁরা মনে করেন—আগে অন্ন-বস্ত্র-স্বাস্থ্য-শিক্ষা-আশ্রয়-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা রাষ্ট্র সুনিশ্চিত করুক তার পর 'গণতন্ত্রের' কথা, আইনের শাসনের (Rule of law) কথা—মৌলিক সাংবিধানিক অধিকারের

কথা পরে ভাবা যাবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ও তার অব্যবহিত পরে মার্কসীয় ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ বুদ্ধিজীবীরা এই একই তর্ক উঠিয়েছিলেন। এই তর্ক ছিল: Social change *first* democracy next *versus* democracy *first* social change next—এইভাবে আবর্তিত হয়েছিল। সেদিন বিরোধী গোষ্ঠী এই ভাবধারার সঙ্গে একমত হতে পারেননি। 'সর্বাগ্রে গণতন্ত্র চাই—সর্ব অবস্থায় গণতন্ত্র চাই'—এই কথাই বলেছিলেন তাঁরা। কমিউনিস্টরা, মার্কসীয় ভাবধারায় বিশ্বাসী সমাজতন্ত্রীরা মনে করতেন—পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে বা সমাজ-ব্যবস্থায় 'রাজনৈতিক গণতন্ত্র' আসলে বুর্জোয়া শ্রেণীর শ্রেণী-একনায়কত্ব বা ডিক্‌টেটরশিপ্ (Dictatorship of the bourgeoisie)। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সর্বহারা শ্রেণীর গণতন্ত্রও তেমনি শ্রমিক-মেহনতী শ্রেণীর একনায়কত্ব (Dictatorship of the proletariat) স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের অধিকার—অবাধ নির্বাচনের এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার, শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার—ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব নির্বাচনের স্বাধীনতা—রাজনৈতিক বিরোধিতার অধিকার কি সত্যিই বুর্জোয়া শ্রেণী একনায়কত্বের অঙ্গরাগ বা বৈশিষ্ট্য? শ্রেণী-বিন্যস্ত সমাজে কি এই সব মৌল অধিকারের কোনই দাম নেই—প্রয়োজন নেই? বুর্জোয়া শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তনকামী রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর কাছে এই সব সাংবিধানিক অধিকার কি অপ্রয়োজনীয় উচ্ছিষ্ট?

অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-বৃত্তি-আশ্রয়-চিকিৎসা—এক কথায় সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচী বর্ষার বন্যলতার মত আপনা থেকে কোন শাসক দলকে জড়িয়ে লতিয়ে ওঠে না। এর প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত করার জন্য চাই সংগ্রাম, রাজনৈতিক সঙ্ঘবদ্ধতার ও চাপ সৃষ্টির মৌল অধিকার। সংগ্রাম কে করবে? ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দলহীন আদর্শে বা বিশেষ স্বার্থে সম্পৃক্ত গোষ্ঠী অথবা রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক সঙ্ঘবদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ রাজনৈতিক দলের মধ্য দিয়েই ঘটে থাকে। ব্যক্তিগতভাবে নাগরিক হিসাবে—গোষ্ঠীগতভাবে অথবা দলগতভাবে কাজ করার জন্য—নিরলস প্রয়াস চালাবার জন্যই প্রয়োজন দল, সংগঠন বা আন্দোলন যেমন ভারতের সংবিধানে বলা হয়েছে:

"১৯। (১) প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার থাকিবে—

(ক) স্বাধীনতার—বাক্যে ও মত প্রকাশে,

(খ) সমবেত হইবার—শান্তিতে ও অস্ত্রশস্ত্র বর্জিত হইয়া ;

(গ) সমিতি ও সংঘসমূহ গঠন করিবার ;

(ঘ) ভারতের রাষ্ট্রীয় সীমার সবত্র অবাধে চলাফেরা করিবার ,

(ঙ) ভারতের রাষ্ট্রীয় সীমার যে কোন অংশে বাস করিবার এবং স্থিতিশীল হইবার ,

(চ) সম্পত্তি অর্জন, দখল ও হস্তান্তর করিবার , এবং

(ছ) যে কোন ব্যবসায় লিপ্ত হইবার অথবা যে কোন জীবিকা, বাণিজ্য ও কারবার করিবার।" [ভারতের সংবিধান : অনুবাদক : প্র. র. মু. : পৃঃ ১৫]

চাই কথা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, অস্ত্র না নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে সঙ্ঘবদ্ধ ও জমায়েত হবার স্বাধীনতা ও অধিকার। দল, ইউনিয়ন ও সমিতি গড়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সুসংগঠিতভাবে কাজ করার স্বাধীনতা চাই। সারা দেশের এক প্রান্ত থেকে আর প্রান্ত পর্যন্ত নাগরিকদের অবাধে চলাফেরার স্বাধীনতা থাকা চাই। সেই সঙ্গে চাই—ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন নাগরিকের জীবনধারণের জন্য স্বাধীনভাবে সমাজ-স্বীকৃত পেশা বা বৃত্তিতে বা ব্যবসায় নিযুক্ত থাকার স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা বা মৌল অধিকারগুলিকে সংযম ও ন্যায়সঙ্গত নিয়ন্ত্রণের বাঁধ দিয়ে সুসমঞ্জস করার অধিকার অবশ্যই রাষ্ট্রের আছে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ বা বিধি-নিষেধের নামে এই মৌল অধিকারগুলি সংবিধানের পাতায় বন্দী কতকগুলি নিছক কাগুজে অধিকারে পর্যবসিত করার ক্ষমতা রাষ্ট্রের নেই।

এখন এই অধিকারগুলি যদি কেড়ে নেওয়া হয় 'বুর্জোয়া গণতন্ত্রের' বা স্বৈরতন্ত্রের এঁটো পাতার উচ্ছিষ্ট বলে—তাহলে রাজনৈতিক সংগ্রামের উপযোগী জমি থাকবে কি করে—যে-জমির ওপর দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি হাত পা ছুঁড়তে পারে- কুচকাওয়াজ করতে পারে? রাজনৈতিক গণতন্ত্র যেখানে নির্বাসিত সেখানে ন্যায়-বিচার আদায়ের সংগ্রাম— গুপ্ত সমিতির (secret society) হিংসাত্মক ঢোকা-গোপ্পা সশস্ত্র সংঘর্ষে মূর্ত হবেই। রাশিয়াতে তাই হয়েছিল জারতন্ত্রের যুগে। ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে সশস্ত্র বিপ্লবী নানা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বিচারের বাণী রূপ পাবার জন্য ছটফট করেছে। ভারতের সর্বযুগের সর্বকালের বরেণ্য মহাপ্রাণ মৃত্যুঞ্জয়ী বীররা বিভিন্ন গুপ্ত সমিতির মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করে আত্ম-বলিদান দিয়ে দেশকে

স্বাধীনতা-সাম্য-অধিকার সম্বন্ধে সজাগ করে দিয়ে গেছেন। মৃত্যুহীন প্রাণের ডালি দিয়ে ভারতের অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা দেশ-জননীর পূজা করে অমর হয়েছেন।

জনসভা করতে গেলেই যদি দেশের সরকার সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে আইন জারী করে দেন, যানবাহনে করে অবাধে সভা-সমাবেশ মিছিলে যোগ দিতে বাধা দেওয়া হয়, যদি রাজনৈতিক নেতাদের কোন অঙ্গরাজ্যে প্রবেশের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়—যেমন, বিহার রাজ্যে গফুর-সরকার করেছিলেন অথবা কলকাতায় ২রা এপ্রিল (১৯৫৫) সর্বোদয় নেতার সভা যেভাবে যে অবস্থায় পরিত্যক্ত হল—তাহলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে খর্ব করা হয়। সংবিধানের ঘোষিত ১৯ (১) ধারার (ক) (খ) (গ) (ঘ) (চ) উপধারাগুলিতে যে মৌল অধিকারগুলি গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে সংবক্ষিত করা হয়েছে যদি দেশে সেই অধিকারগুলি প্রশাসকরা লুণ্ঠন করেন, তাহলে দেশের আমূল রূপান্তরের জন্য বিপ্লবের কথা যারা বলছেন—সেই বিপ্লবের বা 'সর্বাত্মক বিপ্লবের' রূপায়ণ কিভাবে সম্ভব হবে? আর যদি রাজনৈতিক অধিকার এভাবে হরণ করা হয় তাহলে প্রকাশ্য শান্তিপূর্ণ গণ-বিপ্লব—চোরা-গোপ্তা পথে সশস্ত্র ও সন্ত্রাসবাদী রূপ নেবেই। চলাফেরার স্বাধীনতা না থাকলে ছোট ছোট গুপ্ত সমিতি দেশময় গজিয়ে উঠবে একদিন।

রাশিয়াতে নাগরিকদের চলাফেরার অবাধ স্বাধীনতা নেই। সেদেশে এক শহর থেকে—যেমন, মস্কো থেকে লেনিনগ্রাদে যে-কেউ যখন-তখন ইচ্ছামত যেতে পারে না। দেশে চালু আছে আভ্যন্তরীণ পাসপোর্ট ব্যবস্থা। যদি ভারতে একদিন কোন অছিলায় মস্কো-অনুরাগীরা এযুগের 'প্রগতিশীলদের' দাক্ষিণ্যে ক্ষমতাসীন হয়ে এই ধরনের পাসপোর্ট প্রথা (Internal Passport System) চালু করেন তাহলে ভিন্নমতাবলম্বী রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীদের এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যের কথা ছেড়েই দেওয়া গেল, এক রাজ্যের মধ্যেই এক শহর থেকে অন্য শহরে গিয়ে সভা-সমিতি দ্বারা জনমত সংগঠিত করাও অসম্ভব হবে। বিপ্লবী মতবাদ প্রচার যাঁরা করতে চান তাঁরা তাহলে কি করে এগুবেন ?

যদি কমিউনিস্ট দেশগুলির মত সংবাদপত্র, প্রকাশনী-সংস্থা, মুদ্রণশিল্প সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত হয় এবং দেশে এক-দলীয় শাসন সংরক্ষিত হয়, তাহলে ভিন্ন মতাবলম্বীরা কিভাবে তাঁদের মত প্রচার করবেন? সরকার বা শাসকদল-

বিরোধী পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা, ইস্তাহার ছাপান সম্ভব হবে না। দেশের পরিস্থিতির খবর দেশবাসী জানবেন কি করে? শাসকদলের প্রচার-মন্ত্রকের প্রেরণায় সংবাদপত্র, পত্র-পত্রিকা, প্রচার-পুস্তিকা তারস্বরে শাসকদলের কীর্তির মাহাত্ম্য প্রচারে সদা-ব্যস্ত থাকবে। প্রচার করা হবে সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন মাধ্যমে দেশের অবস্থার ব্যাপক উন্নতি হচ্ছে। গরিবী হটছে, কৃষি-বিপ্লব, শিল্প-বিপ্লব, গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণ হয়েছে। দিবা-রাত্র এই প্রচারের ফলে যা প্রচণ্ড অসত্য তাই সত্য বলে স্বীকৃত হবে। মস্কো ভজনায় বিভোর ভারতের 'প্রগতিশীল'রা কি এসব প্রশ্নের জবাব দেবেন? প্রকাশ্যে যা বলা বা প্রচার করা যেত তা যখন নিষিদ্ধ হয় তখন গোপন ছাপাখানা থেকে গোপনে ছাপিয়ে বিলি করার প্রবণতা দেখা দেবেই। আলোর মধ্যে প্রকাশ যেখানে ব্যাহত হবে সেখানে অন্ধকারে প্রশাসকের চোখ ফাঁকি দিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে গোপনে চলাফেরা করবে মতবাদের বাহকরা—পরিবর্তনবাদীদের সমর্থকরা। বিপ্লবোত্তর রাশিয়াতে খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিকরা অতি গোপনীয়তার সুড়ঙ্গ-পথ ধরে সংগঠিত হবার চেষ্টা করছেন। বিশ্ববিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী শাখারভ, বিশ্ব-সাহিত্যিক সলঝেনিৎসিন এই গোপনীয়তার নিষিদ্ধ সুড়ঙ্গ-পথ ধরে রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের সংগঠিত করতে এগিয়ে এসেছিলেন। গোয়েন্দা পুলিশ, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাজনৈতিক পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সজাগ প্রহরা পুনঃ পুনঃ গণতন্ত্রকামী স্বাধীনতাকামী নাগরিকদের সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়াসকে ব্যর্থ করেছে সেদেশে। কিন্তু সেই প্রচেষ্টাকে নির্মূল করতে পারেনি। সদা-জাগ্রত সচেতন গণমতের প্রখর প্রহরা গণতন্ত্রের তথা স্বাধীনতার প্রকৃত গ্যারান্টি। একদলীয় বলদর্পী কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে অথবা ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রে পুলিশ-মিলিটারী গেস্তাপো নিরাপত্তা গোয়েন্দার সজাগ প্রহরা স্বৈরতন্ত্রের গ্যারান্টি।

শাসকশ্রেণী ভিন্ন মতাবলম্বীদের দমন করে প্রশাসন বিপদমুক্ত করার জন্য দলীয় একনায়কত্বকে দীর্ঘমেয়াদী করার মত্ত নেশায় রাষ্ট্রের পুলিশ প্রশাসন খাতে ব্যয় বৃদ্ধি ঘটাবে। ধীরে ধীরে রাষ্ট্র হবে মিলিটারী-পুলিশ-ব্যুরোক্রাট-টেক্নোক্রাটদের তলপিবাহক, উদ্ধত অনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্রের পরিচালক-সমিতির বৈঠকখানা। 'প্রজাতন্ত্র' পুলিশ-মিলিটারীর ব্যারাক-তন্ত্রে পরিণত হবে একদিন। ভিন্ন মতাবলম্বীদের কার্যকলাপের ওপর পাহারা দেবার জন্য নিযুক্ত হবে গোয়েন্দা পুলিশ, গোয়েন্দা পুলিশের ওপর নজর রাখার জন্য নিযুক্ত হবে আরও

দক্ষ পুলিশ। রাস্তার ট্রাফিক পুলিশকে পাহারা দেবার জন্য রাস্তার মোড়ে মোড়ে থাকবে একাধিক সশস্ত্র পুলিশ। আবার তাদের ওপর পাহারা দেবার জন্য থাকবে সাদা পোশাকের পুলিশ পথচারীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে। রাজনৈতিক নেতাদের, বিধানসভা, লোকসভা সদস্যদের পুলিশ পাহারা নিয়ে চলাফেরা করতে হবে। মন্ত্রীদের আগে পেছনে পুলিশী টহল থাকবে। দিন দিন গোটা সমাজ পুলিশের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। পুলিশী প্রশাসনও শাসকশ্রেণীর কাছ থেকে সুদে-আসলে পাপ, গণ্ডা বুঝে নিয়ে ছাড়বে। স্তব্ধ নিথর জলাশয়ের বুকে অঙ্কিত ছোট বৃত্ত যেমন বড বড বৃত্ত অঙ্কন কবে যায়, তেমনিভাবেই একাজ এগুবে) গোটা সমাজ নিবাপত্তা পুলিশ-গোয়েন্দা-মিলিটাবী দিয়ে পবিবৃত হয়েই বাস করবে। গণবিপ্লবেব মানসিকতা থাকলেও বিপ্লব হবে না, সবাত্মক বিপ্লবও নয়। পুলিশী রাষ্ট্র বা একনায়কতন্ত্রী বাষ্ট্রে পবিবর্তন আনার জন্য পুলিশ-মিলিটাবীদেরই একদিন শবণ নিতে হবে। বাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের কোন ভমিকাই থাকবে না।

পশ্চিমবাংলায় ১৯৫৬ সালে কংগ্রেসী শাসন-যুগে পুলিশ প্রশাসনে ব্যয় হয়েছিল প্রায় ১৪ কোটি টাকা। ১৯৫৯ সালেব যুক্ত-ফ্রন্টীয় শাসন-যুগে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দলের নেতারই হাতে ছিল খোদ স্বরাষ্ট্র দপ্তর। পুলিশ প্রশাসনে ব্যয় হয়েছিল সে বছব প্রায় ২৮ কোটি টাকা। যে-অজুহাতে এ ব্যয় বৃদ্ধিব কারণ দেখান হয়েছিল সেদিন, ১৯৫৫ সালে এ বাজ্যের স্বরাষ্ট্র তথা মুখ্যমন্ত্রী সহ একই কাবণ দেখিয়ে বাজ্যেব পুলিশ প্রশাসন খাতে ৫২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়-মঞ্জুবী চেয়ে নিয়েছেন। দেশ বারুদের স্তূপের ওপর বসে আছে। গণ-অসন্তোষ সর্বস্তরে পবিব্যাপ্ত। অস্ফুট অব্যক্ত যন্ত্রণায় সাধারণ নাগরিকরা ছটফট করছে। নিষ্ফল আক্রোশে মাথা কুটছে হৃদয়হীন পাষাণ প্রশাসনের গায়ে। চারিদিকে পুলিশ, সি-আর-পি'ব পাহাবা। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইনেব (M.I.S. Act of 1951—যাকে বাংলায় 'মিসা' আইন বলা হয়) পাশুপত অস্ত্র পুলিশের হাতে। ইচ্ছামত যে কোন ব্যক্তিকে যখন তখন এই নিবর্তনমূলক আটক আইনে বন্দী করে বিনা বিচারে রাখা যায়। যতদিন --

(Emergency) চালু থাকবে ততদিন এ-সজন f

কালের জন্য বন্দী করে রাখা যায়। দেশের সর্বোচ্চ ক

বিভাগীয় পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। বি

অসামাজিক হিংসাত্মক কাজ করাবার জ

'মিসা' আইনের পরোয়ানা থেকে মুক্ত করে আনা হবে শাসকশ্রেণীর প্রয়োজনমত। সঙ্ঘবদ্ধ গুণ্ডামীর কাছে শুভবুদ্ধি বার বার পর্যুদস্ত হয়েছে ইতিহাসে। হাজার হাজার মানুষকে যদি যে কোন অজুহাতে পুলিশের সাজানো অভিযোগে গ্রেপ্তার করে অনির্দিষ্ট কাল যাবৎ বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা যায় তাহলে রাজনৈতিক বিরোধিতার অধিকার বলে কোন কিছু থাকতে পারে? অথচ গণতন্ত্রে রাজনৈতিক বিরোধিতার অধিকার না স্বীকৃত হলে স্বৈরতন্ত্র ও গণতন্ত্রের বিভাজন রেখা বিলুপ্তই হয়।

একথাটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে রাজনৈতিক গণতন্ত্র আগে সুনিশ্চিত না হলে সাম্য ও সামাজিক ন্যায়-বিচারের সংগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই সামাজিক পরিবর্তনের জন্য রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে হবে। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের জন্য যে-বিপ্লব একান্ত প্রয়োজন সেই বিপ্লব যাতে সর্বাত্মক হতে পারে তার জন্যই চাই রাজনৈতিক গণতন্ত্র সর্বাগ্রে। এই গণতন্ত্রকে বুর্জোয়া শ্রেণীর বুজরুকি বা ধাপ্পা অথবা বুর্জোয়া শ্রেণীর ডিক্‌টেটরশিপ মনে করা সম্পূর্ণ ভুল তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মাশুল ইউরোপকে দিতে হয়েছে।

শিল্পের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্ঘবদ্ধভাবে অর্থনৈতিক ন্যায়-বিচার আদায়ের জন্য যে-সংগ্রাম, যৌথ-দরকষাকষিব (collective bargaining) দীর্ঘ সংগ্রাম-লব্ধ অধিকার কি পুঁজিপতিদের শোষণনীতির সহায়ক? প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শিল্পের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্যই করেছে। ইতিহাস তার সাক্ষী। 'ওয়ার্কার্স সেল্‌ফ ম্যানেজমেণ্টের' রাজনৈতিক কর্মসূচী অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের লক্ষ্যে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। পূর্ব-ইউরোপে যুগোস্লাভিয়া এই কর্মসূচীকে রূপ দিতে সচেষ্ট। ধর্মঘটের অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের দ্বারা চাপ সৃষ্টির মৌল অধিকার যদি স্বীকৃতি না পায় তাহলে শিল্প-পরিচালনায় শ্রমিকশ্রেণীর অংশগ্রহণ কি করে সম্ভব? গণতন্ত্র না থাকলে বুরোক্রাট ম্যানেজার টেকনোক্রাট [illegible] ওপরতলার বিশেষজ্ঞদের স্বেচ্ছাতন্ত্রই শ্রমিকশ্রেণীর ঘাড়ে চেপে বসবে।

[illegible]ল্প কৃষিতে সামরিকীকরণের নীতি (militarization)
[illegible]তন ইচ্ছাশক্তি নয়—মিলিটারীর রাইফেলের নলই
নীর রাজনৈতিক অংশ সজাগ দৃষ্টি রাখবে—
কিনা—উৎপাদন বাড়ছে কিনা। জুলুমের

বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে যে-কোন সামান্যতম প্রতিবাদ উচ্ছৃঙ্খলতার বা প্রতিক্রিয়াশীলতার দোহাই দিয়ে ভারী বুটের তলায় স্তব্ধ করে দেওয়া যায়।

স্বাধীন বাধামুক্ত ভোট-ব্যবস্থা বুর্জোয়া শ্রেণী শোষণের স্বার্থে? এসব মার্কসিস্ট আজগুবি কথা। 'বুর্জোয়া' রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মধ্যেও জার্মানীতে ও ইতালীর পার্লামেন্টে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিপুল সংখ্যায় কমিউনিস্ট, সোসালিস্ট প্রার্থীরা বিজয়ী হয়ে এসেছিলেন। ইতিহাস-বর্জিত মিথ্যা তত্ত্বকে নূতন পোশাকে সাজিয়ে সত্যকে ঢাকা দেবার চেষ্টা করলে ফল ভাল হয় না। কোদালকে কোদাল বলতেই হবে। সেই সৎ সাহসটুকু হারালে সমাজেরই ক্ষতি হবে। টমাস ম্যানের সেই স্মরণীয় উক্তিটি বার বার উচ্চারণেও পুরোনো হয় না—তার ধার হারায় না: Harmful truth is better than useful lie. সত্য কথা বলা বুদ্ধিজীবীর ধর্ম।

ন্যায়-বিচার—সামাজিক রূপান্তরের দাবী যুগে যুগে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে সংগ্রাম করতে। কিন্তু সামাজিক রূপান্তর যে-সব কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে ঘটেছে—সেইসব রাষ্ট্রে রাজনৈতিক গণতন্ত্র নির্বাসিত কেন? সামাজিক রূপান্তর ঘটলেই দেশে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পরিমণ্ডল কোন প্রাকৃতিক বা বৈজ্ঞানিক নিয়মে সৃষ্ট হয় না—গণতন্ত্রের প্রত্যাশিত বহুমুখী বিকাশও ঘটে না। [আর বিজ্ঞানও তো 'পার্টি লাইন' মাফিক চলবে! সুতরাং বৈজ্ঞানিক বা ডায়েলেক-টিকের নিয়মও তো পার্টি অনুশাসন মাফিক হবে। এক-পার্টি একনায়কতন্ত্র-পন্থীরা তো রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পরিবেশ সৃষ্টি করে নিজেদের শাসন-ব্যবস্থার স্থায়িত্বের ভিত্তি ধ্বসিয়ে দিতে এগিয়ে নিশ্চয়ই আসবেন না।] বুদ্ধিজীবীরা সাহিত্যিক বিজ্ঞানীরা সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় আজও কিভাবে নির্যাতিত লাঞ্ছিত হচ্ছেন তা রাজনীতির ছাত্ররা জানেন। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে লক্ষ লক্ষ মানুষকে রাশিয়ায় নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে মিথ্যা সন্দেহের বশে কল্পিত অভিযোগের ভিত্তিতে কারারুদ্ধ করা হয়েছে—বাধ্যতামূলক দাস শিবিরে নির্বাসিত করা হয়েছে।

এদেশে 'মিসা' আইনে যথেচ্ছ ও অবাধ গ্রেপ্তার ও অপব্যবহারের কথা বলেছি। রাশিয়াতে সমাজতন্ত্রের "শত্রুদের" শায়েস্তা করার নামে যা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে তাতে একজন সুস্থ নাগরিক শিউরে উঠবেন। বিশ্ব-বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক বোরিস পাস্তারনাক তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস

'Doctor Zhivago'-য় ১৯৩৭ সালের রাশিয়ায় অস্থির অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন :

"One day Lara went out and did not come back. She must have been arrested in the street, as so often happened in those days and she died and vanished somewhere forgotten as a nameless number on a list which later was mislaid in one of the innumerable mixed or women's concentration camps in the North."

প্রসিদ্ধ রুশ সাহিত্যিক ইলিয়া এরেনবুর্গও ১৯৩৭ সালে স্পেন থেকে রাশিয়ায় ফিরে যে-চিত্র দেখেছিলেন তাতে স্তম্ভিত হয়ে যান। দেশে ফিরে দেখেন নামী অগণিত সাহিত্যিক-সাংবাদিক 'বিলুপ্ত' হয়ে গেছেন (liquidated)। বিশ্ব-সাহিত্যিক সলঝেনিৎসিন তথ্য-সমৃদ্ধ কাহিনী বর্ণনা করেছেন তাঁর অসাধারণ চাঞ্চল্যকর পুস্তকে (The Gulag Archipelago : Solzhenitsyn)। গোটা জাতিই পার্জ-ড্রাগণের দৈনিক খোরাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বর্বরতা-নৃশংসতা সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছিল স্তালিন-যুগে। সাহিত্যিক হাওয়ার্ড ফাসট প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে কমিউনিস্ট দলের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিলেন [Naked God : By Howard Fast)]। প্রশ্ন স্বভাবতই জাগবে, এত বৈষয়িক উন্নয়ন যে দেশে হয়েছে—সামাজিক রূপান্তর ঘটেছে—সেদেশে গণতন্ত্রের বিকাশ না হয়ে তা প্রতিনিয়ত পদদলিত হচ্ছে কেন ? কেনই বা দেশের নাগরিকরা প্রতিবাদে সোচ্চার হতে পারছেন না ? অসমাপ্ত বিপ্লবকে সার্থক সমাপ্তির লক্ষ্যে নিয়ে যাবার জন্য লেনিন-ট্রট্স্কির আদর্শ নিয়ে আর কোন নেতা তো এগিয়ে আসতে পারছেন না ? সহজ উত্তর : রাজনৈতিক গণতন্ত্র সেদেশে নেই বলেই সেটা সম্ভব নয়। নাগরিকদের অত্যাচার-নিপীড়ন মুখ বুজে সইতে হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে—অন্ন-কর্ম-সংস্থানের আশ্রয়ের ব্যবস্থা হল ধরে নেওয়া গেল। কিন্তু কৃষক-শ্রমিকদের স্বার্থে পরিচালিত বলে প্রচারিত ও কথিত রাষ্ট্রে যদি কলে-খামারে শ্রমিক ও শ্রমজীবীদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ও আন্দোলনের অধিকার না থাকে তাহলে সামাজিক ন্যায়-বিচারের (Social justice) লড়াই শ্রমিকশ্রেণী করবে কি করে ? কমিউনিস্টরা যত মগজ ধোলাই করে

বোঝাবার চেষ্টাই করুন না কেন, কোন আজব দৈব নিয়মে কমিউনিস্ট দল ক্ষমতায় আসলেই সে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মৌল সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে যায় না ; কোন কমিউনিস্ট দেশে যায়নি এবং যেতেও পারে না। দেশ-শাসন ও পরিচালনার ক্ষেত্রেও চড়াই-উত্‌রাই আছে। কখনো এগিয়ে যাওয়া কখনো পিছিয়ে আসা। কমিউনিস্টরা যখন রিট্রিট ('Retreat') করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে—সেই পশ্চাদপসরণের কাজটিকে বিরাট বৈপ্লবিক সাফল্য বলে প্রকাশ করতেও দ্বিধা করেন না। রাশিয়াতে লেনিন ১৯২১ সালে একের পর এক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পর 'নূতন অর্থনৈতিক কার্যসূচী' (NEP) প্রবর্তন করলেন তখন NEP এর মাহাত্ম্য প্রচার কম তো হয়নি। "War Communism"-এর হঠকারী কার্যসূচী থেকে "New Economic Policy"-তে হটে আসার ব্যাপারটা তত্ত্বের বিচারে নিঃসন্দেহে বিরাট পশ্চাদপসরণ। দেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই লেনিন এই 'বাস্তববাদী' নীতি প্রবর্তন করলেন। এটা ছিল লেনিনের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য। দেশে এই NEP প্রবর্তনের জন্য দলের অভ্যন্তরে কোন চাপ আসেনি। বরং চাপ ছিল অতি বামপন্থীদের কাছ থেকে যাতে রক্তাক্ত শ্রেণী-সংগ্রামের পথ থেকে হটে না আসা হয়। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পরিমণ্ডল লেনিন নিজেও কোনদিন চাননি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর। ১৯১৭ সালের শেষভাগে লেনিন রাশিয়ায় "নিখাত বিপ্লবী শাসন" প্রতিষ্ঠার জন্য ("Strictly revolutionary order") দাবী করেছিলেন 'merciless suppression of attempts at anarchy on the part of drunkards, hooligans, counter-revolutionaries and other persons." (Lenin : Collected Works : 5th Edition, Vol. 35, P. 68)

"দেশের মাতাল, সমাজবিরোধী, প্রতি-বিপ্লবী এবং অন্যান্যরা অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করলে নির্মম হাতে দমন করতে হবে" [লেনিন]। প্রশ্ন স্বভাবতই জাগবে রাশিয়ায় "অক্টোবর বিপ্লবের" পর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সামনে তাহলে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রধানত, মাতাল, গুণ্ডা, সমাজবিরোধীরা ? দেখা যাচ্ছে "প্রতি-বিপ্লবীদের" স্থান তৃতীয় সারিতে ছিল ! অত্যাচারী জারতন্ত্রের বুকে গুণ্ডা, সমাজবিরোধী মাতালরা আতঙ্ক সৃষ্টি করেনি, বিপ্লবীরাই আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অরাজকতা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিল যারা তাদের প্রথম ও দ্বিতীয় সারিতে ছিল (১) মাতাল ও (২) সমাজবিরোধী গুণ্ডারা।

এদেশে এই যুক্তি দিয়ে তো লক্ষ লক্ষ লোককে 'মিসা' আইনে গ্রেপ্তার করে রাখতে পারে যে-কোন শাসকদল ইচ্ছে করলে—রাশিয়ার কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে? আর গান্ধীবাদী সরকার এদেশে দরাজ হাতে বিলিতি ও দেশী মদের দোকান খোলার লাইসেন্স দিয়ে চলেছেন। দেশ গড়ার জন্য অর্থ চাই, রাজস্বখাতে আয় বাড়াতে হবে—তাই গান্ধীবাদের নামাবলী গায়ে চড়িয়ে দরাজ হাতে মদের দোকান, ক্যাবারে নাচ—হালকা গান, জুয়া—রেসের মাঠ, সাট্টা খেলার ব্যবস্থা হয়েছে। অশ্লীল সিনেমা থিয়েটার নাচ গান, অশ্লীল সাহিত্য প্রচারের অঢেল ব্যবস্থা করে দিয়ে সারা দেশে 'drunkards', 'hooligans' তৈরী কর র চমৎকার আয়োজন হয়েছে। সাপ হয়ে কামড়িয়ে রোজা হয়ে ঝাড়বার ব্যবস্থা হয়েছে! তাই এদেশে গরিবী হঠানোর বৈপ্লবিক কর্মসূচী অথবা নারোরার বৈপ্লবিক কর্মসূচী রূপায়ণের পথে বাধা দেবার অজুহাতে 'মাতাল' 'গুণ্ডাশ্রেণীব' গ্রেপ্তার-দমনের অসুবিধা কোথায়?

মহাবিপ্লবী লেনিন এত সমস্যা থাকতে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় মাতাল-গুণ্ডাদের নিয়ে বিব্রত হলেন? আসল কথা মাতাল-গুণ্ডার নামে দেশের ভিন্ন মতাবলম্বীদেব দমন করার অজুহাত সরকারের হাতে এসে গেল। আর হঠাৎ বিপ্লবের অব্যবহি ত পর এত মাতাল-গুণ্ডা আমদানী হলই বা কি করে রাশিয়ায়? গুণ্ডা-মাতাল দমনের নামে সরকারের বিরুদ্ধবাদীদের, ভিন্ন মতাবলম্বীদের ঘায়েল করা যাবে সহজেই। কেন একজন মানুষ সমাজবিরোধী হচ্ছে সেকথা কি সমাজ-সংস্কারক বা রাজনৈতিক নেতা প্রশাসকরা জানতে চাইবেন না? এদের সুস্থ স্বাভাবিক-জীবনে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা না করে তাদের ফায়ারিং স্কোয়াডের মুখে দাঁড় করাবেন? যে শাসন করবে তার হাতে কি লৌহদণ্ডই থাকবে? দয়া-মায়া-স্নেহ-সৌভ্রাতৃত্ব—সংবেদনশীলতা বলে কিছুই থাকবে না? আর গণতন্ত্রের কথা কেহ উচ্চারণ করলেই সঙ্গে সঙ্গে বলা হবে লেনিনের সুরে—'গণতন্ত্র, স্বাধীনতা? কাদের গণতন্ত্র? কাদের স্বাধীনতা?' মাতাল গুণ্ডাদের—উগ্রপন্থীদের স্বৈরতন্ত্রের রাজপথ দিয়ে সমাজতন্ত্র এগিয়ে চলবে। উগ্রপন্থীদের জিগির তুলে মিথ্যা অজুহাতে কত মানুষকে প্রতিনিয়ত এদেশের প্রতিহিংসাপরায়ণ এক শ্রেণীর পুলিশ গ্রেপ্তার ও হত্যা করেছে। আর প্রকৃত কুখ্যাত গুণ্ডা সমাজবিরোধী যারা তারা দেশের রাজনৈতিক নেতাদের 'দেহরক্ষী', অতএব সমাজ-রক্ষীরূপে স্বীকৃতি পাচ্ছে। সমাজবিরোধীদের সুস্থ নাগরিক হয়ে বসবাস

করার, বাঁচার সুযোগ দেওয়াই হবে না। তাতে রাজনৈতিক নেতাদের অসুবিধে যে! লেনিন How to organize the competition [January 7 & 10, 1918) এই প্রবন্ধে লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করলেন—"purging the Russian land of all kinds of harmful insects." এই ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গের মধ্যে শুধুমাত্র 'শ্রেণী শত্রুদের'ই (class enemies) অন্তর্ভুক্ত করেননি। তিনি "workers malingering at their work"—কাজে ফাঁকি দিচ্ছে যারা সেই শ্রমিকদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এই 'কীট পতঙ্গের' মধ্যে। যে-কোন ব্যক্তিকেই 'harmful insect' বলে পার্জ করা যেত এবং যায়। স্তালিন এই অস্ত্রকে আরও শাণিত করে বেপরোয়াভাবে ব্যবহার করেছিলেন।

দেশে শক্তিশালী বিরোধী গণতান্ত্রিক দল ও গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন না থাকলে শ্রমিক ও মেহনতী শ্রেণীর ওপর অত্যাচারের ভয়াল খড়্গ কৃপাণ কিভাবে নেমে আসবে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। রাশিয়ায় দুর্ভিক্ষ হয়েছে। দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক মরেছে। 'পার্জে' লক্ষ লক্ষ মানুষকে খতম করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে দাস শিবিরে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে। সরকারের আসন কি একবারও টলেছে? টলেনি। শাসক দল নিরাপদে শাসন করে আসছে। রাজনৈতিক গণতন্ত্র থাকলেই ক্ষমতার আসনের ভিত কাঁপিয়ে তোলা সম্ভব। একথা ভারত সম্বন্ধেও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ভারতের গণপরিষদে সংবিধান-ঘোষিত মৌল অধিকার সম্বন্ধে আলোচনাকালে ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ বলেছিলেন:

"There is also a reference to Fundamental Rights in this Resolution. It is a *socio-economic revolution* that we are attempting to bring about. It is therefore necessary that we must *re-make* the material conditions , but apart from re-making the material conditions we have to safeguard the liberty of *human spirit* .... We have to safeguard the liberty of human spirit against the encroachments of the State. While State regulation is necessary to improve economic conditions *it should not be done at the expense of human*

spirit .... This declaration which we make today is of the nature of a pledge to our own people and a pact with the civilised world." (Constituent Assembly Debates, Vol. II, P. 273 : Dr. S. Radhakrishnan)

এই মৌল অধিকারগুলিকে সামাজিক অর্থনৈতিক বিপ্লবের প্রতিশ্রুতি পালনের সমতুল্য বলে ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। এর জন্য সামাজিক অর্থনৈতিক রূপান্তরের গুরুত্ব যেমন তিনি আরোপ করেছিলেন, তেমনি তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন মানুষের মানবিক চেতনা ও আত্মিক শক্তি সবতোভাবে শৃঙ্খল-মুক্ত রাখার সমস্যাটিকে। রাষ্ট্রীয় খবরদারীর সীমানা মানুষের আত্ম-শক্তির ও স্বাধীন-সত্তার ক্ষেত্রে যাতে অনুপ্রবিষ্ট হতে না পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। মৌল অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণা সমগ্র জাতির কাছে—গণপরিষদের পবিত্র অঙ্গীকার যা অলঙ্ঘনীয়, সভ্য দুনিয়ার সঙ্গে এই অঙ্গীকার আমাদের জাতিকে ও দেশকে মৈত্রী বন্ধনে চির-আবদ্ধ রাখবে।

এই সামাজিক অর্থনৈতিক বিপ্লব মাঝপথে থেমে গেল কেন? মানুষের দুদমনীয় বিবেক-শক্তি চেতনা ও আত্মাকে শৃঙ্খলিত করার চেষ্টা কি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের সমতুল্য নয়? থমকিয়ে দাড়ানো 'জাতীয় বিপ্লবকে' সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সঙ্কল্পকে, সর্ব রকমের একনায়কত্বকে প্রতিরোধ করার আহ্বানকে 'সামগ্রিক বিপ্লবের' নাম দিলে আঁতকিয়ে উঠবারই বা কি কারণ থাকতে পারে? সামাজিক-অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন চাই-ই। কিন্তু তার জন্য মানবিক চেতনা ও সত্তার স্বাধীনতা ("liberty of human spirit") খর্ব করা চলবে না। আবার এই 'হিউম্যান স্পিরিট'কে অলঙ্ঘনীয় রাখার অজুহাতে সমাজকে ঢেলে সাজার কর্মসূচীকে অবহেলা করতে দেওয়া যায় না। সংবিধানে প্রতিশ্রুত বিপ্লব থমকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য সংবিধানকে কি দায়ী করা চলে? সংবিধানের সঙ্কল্পকে রূপায়িত করার দায়িত্ব যাঁদের ছিল—এ ব্যর্থতা তাঁদেরই।

ভারতের মার্কসবাদীরা প্রশ্ন তুলেছিলেন যখন কেরালা ও পশ্চিমবাংলায় যুক্ত-ফ্রন্টীয় শাসন চালু হয়েছিল—এই সংবিধানের 'সীমাবদ্ধতার' মধ্যে সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটানো আদৌ সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয় সে বিষয়ে কোন বিস্তারিত বক্তব্য যুক্তির সাহায্যে জনসাধারণের কাছে কোনদিন তুলে ধরা হয়নি। যুক্ত-ফ্রন্ট শাসন-ব্যবস্থা ১৯৫৭ ও ১৯৫৯-৬০ সালে এমন কোন্ বৈপ্লবিক

পরিকল্পনা বা অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন যার রূপায়ণের অন্তরায় হয়েছিল দেশের সংবিধান? হিংসা, অরাজকতা, সন্ত্রাস এক বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল সেদিন। সাধারণ মানুষ সন্ত্রাসবাদী হঠকারী রাজনীতির মুখে গণতন্ত্রের কার্যকারিতায় আস্থা হারিয়েছিল। মার্কসবাদী দলগুলি পরিষদীয় গণতন্ত্রকে শ্রেণী-সংঘর্ষের অনিবার্যতা তত্ত্বের এবং এক-পার্টি দলীয় একনায়কত্বের পরিপন্থী জ্ঞান করেই 'সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা'র অজুহাত তুলে দেশ গঠনের 'goodness politics'-এর যে ঐতিহাসিক সুযোগ পেয়েছিলেন তা হারালেন। সেদিন ও 'power politics'-এর কাছে 'goodness politics' পর্যুদস্ত হয়েছিল।

একথা অনস্বীকার্য যে, সুপ্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী কায়েমী স্বার্থ বহু সাধু প্রয়াস ও সঙ্কল্প ব্যর্থ করে দিতে সদা-চেষ্টিত এবং এইসব কায়েমী স্বার্থের পৃষ্ঠপোষক ও আজ্ঞাবাহীরা দেশের সর্বত্র বেশ শক্তিশালী। তাদের চক্রান্তের সফলতা পরিষদীয় গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতার ওপর নির্ভর করে না। কায়েমী স্বার্থবাদীদের শায়েস্তা করার মত শক্তিমান নেতা ও দলেরই অভাব। নিষ্ঠাবান আদর্শবাদী নির্লোভ সাহসী নেতা ও দক্ষ প্রশাসকের একান্ত অভাব, অভাব দুর্জয় সঙ্কল্প ও চরিত্রের। দুঃখীর চোখের জল মোছাতে কোন্ সাংবিধানিক বাধা আছে? যে-দেশের ২০ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে পড়ে মার খাচ্ছে সে-দেশের নেতা মন্ত্রী রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির বিলাস-বহুল জীবন, কদর্য জাঁক-জমক কি প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানে আবশ্যিক করা হয়েছে? দেশের সরকার যদি স্থির করে দুবল শ্রেণীর মানুষকে শোষণ থেকে রক্ষা করবে—সে পথ ধরে এগুতে বাধা কোথায় এই সংবিধানে? সেই সাধু সঙ্কল্পকে ব্যথ করে সাধ্য কার? যদি বাধা থাকে সে বাধা মুক্ত করতেই বা অসুবিধা কোথায়? অভাব দুর্জয় সঙ্কল্প, সৎসাহস ও যোগ্য দরদী নেতৃত্বের। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী যে-সংবিধান চালু হল—গণপরিষদের সদস্যরা আগামী দিনগুলিতে কি কি নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হবে তা চিন্তা করে সংবিধানে তার বিধান রচনা করে যেতে পারেননি, আর সেটা সম্ভবও নয়। নূতন নূতন জটিল সমস্যার সমাধানের পথ সেই সেই যুগের শাসক দলকেই করতে হবে।

'ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাই' গণতন্ত্রের অন্যতম রক্ষাকবচ। ক্ষমতার সীমাহীনতাই একনায়কত্বের বৈশিষ্ট্য। এই যথেচ্ছ, অপ্রমত্ত, সীমাহীন ক্ষমতা অন্যায়ভাবে দখলের, রক্ষার ও প্রয়োগের বিরুদ্ধেই তো গণতন্ত্র সদা-সোচ্চার। লেনিন 'অক্টোবর

বিপ্লবের' পর অপ্রমত্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর ক্ষমতার ওপর তো কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না? তিনি তো কোন বুর্জোয়া সংবিধানের সীমাবদ্ধতার মধ্যে বন্দী ছিলেন না? কিন্তু তাঁর দুর্দমনীয় সঙ্কল্প ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও কোন্ মৌল সমস্যার সমাধান তিনি তাঁর জীবদ্দশায় করতে পেরেছিলেন? ইতিহাসে তার জন্য তিনি ছোটও হননি। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের আন্তরিক বলিষ্ঠ সৎ চেষ্টাগুলিই বেশী দাগ কেটে গেছে। সমস্যাটা শুধু 'ক্ষমতার' পরিমাণের সীমাবদ্ধতা নয়। ক্ষমতার প্রয়োগ, ক্ষমতার সঙ্গে নীতি মূল্যবোধের সমন্বয়, জাতীয় আদর্শের সঙ্গে তার সম্পর্ক এগুলি আরও মৌল প্রশ্ন। আর এই প্রশ্নগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণ—'checks and balances'-এর প্রশ্ন। ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার মধ্যেই ক্ষমতার সহনীয় ভব্য-প্রকাশ। ক্ষমতার মহিমা-গরিমা ক্ষমতার আইনানুগ সুসংযত ভব্য নিয়ন্ত্রিত কল্যাণকর প্রকাশেই– ক্ষমতার দাপটে নয়। ট্রট্স্কির সেই ব্যর্থ বেদনা-কাতর উক্তিটি বার বার মনে পড়বে : "Leaden rump of bureaucracy" "বিপ্লবের মাথার ওপর" চেপে বসে শেষ পর্যন্ত।

গণতান্ত্রিক সংবিধানের কাঠামোর ভিতর থেকে দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটানো সম্ভব নয়—এই তত্ত্বকথাটি দিবারাত্র প্রচার করে মার্কসবাদী দলগুলি গণতন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব জনগণের মনে জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিল। অথচ যদি সত্যি সত্যি এই সীমাবদ্ধতার জন্য দেশের মঙ্গল করা, গরীবের দুঃখ লাঘব করা, সামাজিক ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করা সম্ভবই না হবে—তাহলে পশ্চিমবাংলায় যুক্ত-ফ্রন্ট ১৯৫৯ সালের নির্বাচনে ৩২-দফা কর্মসূচী রূপায়ণের সঙ্কল্প নিয়ে কেনই বা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন? তাহলে কি মার্কসবাদী দলগুলি সংবিধানের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণের জন্যই—গণতন্ত্রের অসাড়তা প্রমাণের জন্যই সেদিন নির্বাচনে নেমেছিলেন? দেশের নির্বাচকমণ্ডলী যারা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে শাসক কংগ্রেস দলের মত (১৯৫২) ১৯৫৯ সালে যুক্ত-ফ্রন্টকে ক্ষমতাসীন করেছিলেন—তাঁদেরই কি আস্থা নিয়ে এই মহ-তত্ত্বকথা শোনান হয়েছিল সেদিন? নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলি কি তাহলে নিছক ধাপ্পা ছিল? ১৯৫১ সালে শাসক কংগ্রেস দল 'গরিবী হঠানোর' যে কর্মসূচী ঘোষণা করলেন তার হালও যুক্ত-ফ্রন্টের ৩২ দফা কর্মসূচীর মত হল। এটা আরও বেশী হতাশব্যঞ্জক, কেননা সেদিনের শাসক যুক্ত-ফ্রন্টের চাইতে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস দলের সুযোগ ও ক্ষমতা বহুগুণ বেশী ছিল এবং আছেও। সংবিধানের

কোন্ সীমাবদ্ধতার জন্য কোন্ বিধি-নিষেধের জন্য দারিদ্র্য-দূরীকরণের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার চেষ্টা ব্যর্থ হল তার তো প্রমাণ পাওয়া গেল না? শাসকদলের নির্ভীক স্পষ্টবক্তা শ্রীচন্দ্রশেখর রাজ্যসভায় বাজেট-বিতর্কে নির্মমভাবে সমালোচনা করেছেন শাসকদলের চরম ব্যর্থতা অর্থনৈতিক কর্মসূচী রূপায়ণের ক্ষেত্রে রাজ্য-সভায় বাজেট-বিতর্কে। [৪ঠা মার্চ, ১৯৫৫] চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্ত, মোহন ধারিয়া একবারও বলেননি এই সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী রূপায়ণ সম্ভব নয়। শাসকদলের 'প্রগতিশীল' বলে বিজ্ঞাপিত অংশও অন্যভাবে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকবার জন্য 'সংবিধানের সীমাবদ্ধতার' কথা বলতে সুরু করেছেন। তাই 'সীমিত একনায়কত্বে'র প্রস্তাবও কেউ কেউ করেছেন। একনায়কত্বের বা ডিক্টেটরের ক্ষমতার সীমানা টানবেন কে? স্বয়ং ডিক্টেটর নিজেই। সীমানা লঙ্ঘন করবেন না তিনি তার গ্যারান্টিই বা কি? আর 'সীমিত একনায়কত্ব' অনিয়ন্ত্রিত একনায়কত্বের রূপ নিলে দেশের নাগরিকদের প্রতিকারই বা কি? বিপ্লব? সেকি সম্ভব একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়, বিশেষ করে সে-একনায়কতন্ত্রের যখন 'প্রগতিশীল' সমাজতন্ত্রের পট্টবস্ত্র পরিধান করে রাজ্যাভিষেক হয়?

রাষ্ট্রের কর্ণধারদের বেলায় যে-যুক্তি প্রযোজ্য, ব্যক্তি-নাগরিকের বেলায় তা কেন প্রযোজ্য হবে না? সমাজে ব্যক্তিকে কেন তাহলে সামাজিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হয়? সেখানে তবে কেন 'সীমাবদ্ধতাকে' সমর্থন করা হবে? সমাজে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বন্দিত হবে নিঃসন্দেহে। তবে ব্যক্তির প্রকৃত বিকাশ হয় সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই তো। তা নাহলে সমাজ জীবনে এক একটি ব্যক্তি এক একটি ক্ষুদে ডিক্টেটর হয়ে বসবে। আমরা যে 'আইনের শাসনের' (Rule of law) কথা বলি সেও তো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার 'সীমাবদ্ধতাকে' সুনিশ্চিত কবার জন্যও। 'সীমিত একনায়কত্ব' ("limited dictatorship") ও 'আইনের শাসন' কি তাহলে পরস্পর-বিরোধী তত্ত্ব নয়?

ভারতে বিগত পঁচিশ বছর ধরে ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি কেন্দ্রের কাছে অবহেলিত ও বঞ্চিত হয়ে এসেছে এবং এই নিষ্ঠুর বঞ্চনার প্রতিকার না হবার মূলে আছে সাংবিধানিক গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা নয়, পূর্বাঞ্চলের রাজ্য-মন্ত্রিসভাগুলির অকর্মণ্যতা, অন্যায় ও বঞ্চনার প্রতিকারের দাবীতে সোচ্চার না হওয়া। রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের নেতৃত্বের ভিত্তি রাজ্যের জনগণ ও গণতান্ত্রিক দল না হয়ে যদি দিল্লীর কৃপা-অনুকম্পা ও পৃষ্ঠপোষকতা হয়

তাহলে মেরুদণ্ড সোজা করে মুখ্যমন্ত্রীরা দাঁড়াবেন কি করে? দিল্লীর হাতের রবারস্ট্যাম্প হলে দিল্লীর আমলাতন্ত্রের সার্টিফিকেট মিলতে পারে কিন্তু জনতা'র অথবা দেশের কল্যাণ হয় কি?

পশ্চিমবাংলাতেই ভারতের সর্বাধিক সংখ্যক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত বেকার (প্রায় ৪৬ লক্ষ)। এ রাজ্যের মন্ত্রিসভা এ রাজ্যের ভূমিপুত্র বেকার কর্মপ্রার্থীদের কর্মসংস্থান করতে সাহস পাচ্ছেন না। রাজ্যের কিছু প্রভাবশালী দিল্লীর কৃপাজীবী প্রভাবশালী কায়েমীস্বার্থের তল্পিবাহক নেতা "দলের ও মন্ত্রিসভার ভাবমূর্তি" ক্ষুণ্ণ হবে এই অজুহাতে রাজ্যের শ্রম-দপ্তরের এবং রিজিওন্যাল লেবার কাউনসিলের সর্বসম্মত প্রস্তাবটি কার্যকরী করছেন না। এর জন্য কি ভারতের সংবিধান দায়ী? অন্যান্য রাজ্য-সরকারগুলি—পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছাড়া—কিন্তু রাজ্যের কর্মপ্রার্থীদের ভূমি-সন্তান হিসাবে চাকুরীতে অগ্রাধিকারের প্রস্তাব অনেক আগেই কার্যকরী করেছেন। কেন্দ্র তো বাধা দেননি। 'ভাবমূর্তি' ম্লান হবার প্রশ্ন তো ওঠেনি সেই সব রাজ্যের বেলায়। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে পশ্চিমবাংলায় শিল্প-সম্প্রসারণ হল না, সর্বদিক থেকে শিল্পোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হল। একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা এই রাজ্যকে শ্মশানে পরিণত করল—কোন প্রতিকারের চেষ্টাটুকুও হল না। রাজ্য শাসক-দলের নেতৃত্ব কি এই শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে পাঞ্জা কষার চেষ্টা করেছেন?

কেন্দ্রের হাতে এত ক্ষমতা—এতেও কাজ হল না। আরও ক্ষমতা দরকার। কোন্ অজুহাতে 'সীমিত একনায়কত্ব' প্রতিষ্ঠার মারাত্মক প্রস্তাব করা হয়েছে? যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সুপরিকল্পিত অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে কেন রাজ্যের শাসকদল প্রজাতন্ত্রের পূজারী হিসাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন না? এই অবক্ষয়ের ধারা অব্যাহত থাকলে এই গণতান্ত্রিক সংবিধানের সোপান বেয়েই ভারতে 'সীমিত একনায়কত্ব' প্রতিষ্ঠিত হবার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাবাকারে এটা পাশ না হলেও অসুবিধা হবে না হয়ত 'প্রগতিবাদীদের'। সমাজতন্ত্রের সুসমন্বিত ও বিকেন্দ্রীত বিকাশের জন্যই সমাজতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের সমন্বয় প্রয়োজন। 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দটির পূর্বে 'গণতন্ত্র' শব্দের ব্যবহার নিছক শোভাবর্ধক অলঙ্কার নয় নিশ্চয়ই। সমাজতন্ত্র যেমন সার্থক হয়ে ওঠার জন্য গণতন্ত্রধর্মী হবে, তেমনি গণতন্ত্রও অর্থপূর্ণ হয়ে জনগণের প্রতিদিনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে সমাজতন্ত্রকে অবলম্বন করবেই।

৪

(ক) সর্বহারা শ্রেণীর গণতন্ত্র

মার্কস্ এঙ্গেলস্ মনে করেছিলেন সকল রাষ্ট্র-ব্যবস্থা শ্রেণী-নির্ভর এবং শ্রেণী-স্বার্থ প্রভাবিত ও পরিচালিত। ঐতিহাসিক 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার'-এ (The Communist Manifesto) সমাজ-ব্যবস্থার অন্তিম লক্ষ্য চিত্রিত হয়েছে এইভাবে: " an association in which the free development of each is the condition of the free development of all—" সমাজের সকলের সমষ্টিগত বিকাশ ও উন্নতির সর্তই হল প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীন বাধামুক্ত বিকাশ ও উন্নতির অবকাশ।

এই আদর্শ প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতকের ইউরোপের সকল উদারপন্থী প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদ্দেরই আদর্শ ছিল। রুশো, কাণ্ট, সেণ্ট্ সিমন, ওয়েন এঁরাও তো এই লক্ষ্যের কথাই বলেছিলেন। রাজনৈতিক নিরিখে বিচার করলে এই আদর্শ হয় চরম গণতন্ত্র, না হয় 'নৈরাজ্যবাদেরই' (Anarchy) নামান্তর। মার্কস্-এঙ্গেলস্ সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বকেই 'সর্বহারা শ্রেণীর গণতন্ত্র' (proletarian democracy) বলে বর্ণনা করে গেছেন। এই শাসন একনায়কতন্ত্রী হয়েও 'উন্নততর গণতন্ত্র' বলে গণ্য হবে—কেন না এর পেছনে জনসমর্থন প্রচুর থাকার জন্য স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা অনেক কম থাকবে। দার্শনিক মার্কসের এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি কিন্তু কটাক্ষ হেনেছে বার বার ইতিহাসের রায়, মানুষের অভিজ্ঞতা।

গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি কার্ল মার্কসের অনুরাগ উপলব্ধি করতে হলে ১৮৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'প্যারিস কম্যুন'-এর যে-বর্ণনা তিনি দিয়েছিলেন সেটার দিকে একবার চোখ মেলতে হয়। মার্কস্ বলেছিলেন: "The direct opposite of the empire was the Commune." সাম্রাজ্যবাদী শাসনের মধ্য দিয়ে যে রাষ্ট্র-ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্যণীয় 'কম্যুন'-ব্যবস্থা ঠিক তারই বিপরীত সব দিক দিয়েই। আরও বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

"The Commune was made up of the municipal councillors, chosen by universal suffrage in the different wards of the town, responsible and revocable at short term. Most of its members were working men or acknowledged representatives of the working class...The police instead of continuing the agents of the central government, were at once deprived of their political attributes and made the responsible and at all times revocable agents of the Commune. So, too, were the officials in all other branches of the administration. Public service by everyone from members of the Commune downdards had to be done at workmen's wages...Having abolished the standing army and the police, the Commune was anxious to break the power of spiritual repression, the priestly power, by disestablishing and disendowing all churches All educational institutions were made free to the people and free from all interference from church and State·· Officers of justice were to be deprived of the sham independence that masked their abject subservience to every succeeding government. Like all other public servants, magistrates and judges were to be elected, responsible and revocable."

'প্যারিস কম্যুন' যাঁদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল (১) তাঁরা ছিলেন সবাই বিভিন্ন মহল্লা থেকে নির্বাচিত পৌর সদস্য। সহরের বিভিন্ন অঞ্চল বা মহল্লা থেকে (২) সার্বজনীন ভোটের ভিত্তিতে তাঁরা নির্বাচিত হন। (৩) নিজেদের কাজের জন্য নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে তাঁদের জবাবদিহি করতে হত এবং তাঁদের প্রতিনিধিত্বকাল ছিল স্বল্প-মেয়াদী। (৪) নির্বাচকরা তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরিষদ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারতেন। [আমাদের দেশে একজন গণপ্রতিনিধি নির্বাচিত হলে পর ৫ বছরের মধ্যে—তাঁর কাজে নির্বাচকমণ্ডলী বিক্ষুব্ধ হলেও—সেই সদস্যকে পদত্যাগ করে নূতন করে নির্বাচনের সম্মুখীন হবার দাবীও

করতে পারে না। আবার সংবিধানে বা জনপ্রতিনিধি নির্বাচন সংক্রান্ত আইনেও নির্বাচিত প্রার্থীকে ফিরিয়ে আনার অধিকারও স্বীকৃত নয়। সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ গণতন্ত্রকে জীবন্ত ও সার্থক করার জন্য এই দাবীর যৌক্তিকতার দিকে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মাত্র। এটা তাঁর কোন নূতন আবিষ্কারও নয় যে, উদ্ভট পরিকল্পনা বলে নিন্দিত হবে। বৃহৎ গণতন্ত্রে এই অধিকারকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া চলে কিনা, মেনে নিলে তার বিপুল অপপ্রয়োগ বা অপব্যবহাব হওয়া খুব স্বাভাবিক কিনা, বছরে ৩৬৫ দিনই দেশ নির্বাচন নিয়ে মেতে থেকে অন্য আশু সমস্যার দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকবে কিনা এই সবই অবশ্য অন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন—তার সঙ্গে এই দাবীর নৈতিকতার কোন সম্পর্ক নেই।] (৫) 'কম্যুনেব' নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিকাংশই ছিলেন কর্মরত মনুষ অথবা শ্রমজীবী শ্রেণীর স্বীকৃতমান্য প্রতিনিধিস্থানীয়। (৬) পুলিশের রাজনৈতিক ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব লোপ করে দেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারেব গোমস্তারূপে পুলিশকে কাজ করার অধিকার দেওয়া হয়নি। (৭) প্রতি কাজের জন্য পুলিশকে জবাবদিহি করতে হত। (৮) 'কম্যুনের' নিয়ন্ত্রণাধীন বাতিলযোগ্য দায়িত্বশীল চাকুরি ছিল সকল পুলিশের। (৯) উপরতলা থেকে নীচতলা পর্যন্ত সকল বিভাগে নিযুক্ত অফিসার কর্মচারীদের কারুরই চাকুরির মৌরুসীপাট্টা ছিল না। (১০) প্রত্যেকেই ছিলেন 'কম্যুনের' দায়িত্বশীল প্রতিনিধি, আর কায়েমী স্বার্থ যাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে তার জন্য চাকুরির পদগুলি ছিল বাতিলযোগ্য। (১১) তাঁদের বেতন ছিল সাধারণ শ্রমিকদের বেতন। (১২) 'কম্যুন' স্থায়ী সেনাবাহিনী ও পুলিশবাহিনী বাতিল করে দিয়েছিল। (১৩) গীর্জা ও পাদরীদের ক্ষমতা ও প্রভুত্ব এবং ধর্মের নামে নিপীড়ন চালাবার ক্ষমতাকে পর্যুদস্ত কবতে বদ্ধপরিকর ছিল। (১৪) শিক্ষা-ব্যবস্থায় বা প্রতিষ্ঠানে কারুর খবরদারি বা মাথা গলানর অধিকারও ছিল না। শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব-মুক্ত ও স্বাধীন। (১৫) ন্যায়ালয়ের বিচারপতিদের মেকি স্বাধীনতাব পরিবর্তে নূতন মর্যাদা স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতায় অলঙ্কৃত করা হয়। রাষ্ট্র-নিযুক্ত অন্যান্য সরকারী কর্মচারী অফিসারদের মতন বিচারক-ম্যাজিস্ট্রেটরাও হতেন ভোটে নির্বাচিত। তাঁরাও ছিলেন দায়গ্রস্ত এবং বাতিলযোগ্য।

'প্যারিস কম্যুনের' এই সপ্রশংস বণনা থেকে বুঝতে কোনই অসুবিধে হয় না কার্ল মার্কস চেয়েছিলেন সর্বহারা শ্রেণীর শাসনব্যবস্থা প্রথম থেকেই প্রকৃত গণ-

তান্ত্রিক মডেলে গড়ে উঠুক। একথাও জেনে রাখা ভাল কম্যুনের প্রতিষ্ঠাতারা মার্কসের আদর্শের চাইতেও প্রুঁধোর (Proudhon) চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বেশী। 'কম্যুনের' তৎকালীন বহু সমালোচকদের বিরুদ্ধে মার্কস্ কলমও ধরেছিলেন। তাই 'কম্যুনের' এই সপ্রশংস বর্ণনা একটা নিছক কৌশল বলে মনে করার কোনই কারণ থাকতে পারে না। মার্কস্ চেয়েছিলেন সর্বহারা শ্রেণীর সরকারের (dictatorship of the proletariat) আচরণে হবে গণতান্ত্রিক ন্যায়বাদী উদারপন্থী; মানুষের স্বাধীনতার প্রতি অন্যান্য সরকারের চাইতে হবে আরও বেশী শ্রদ্ধাশীল। মার্কসের এই উদারনৈতিক ভাবধারা বাস্তবে কতটুকু রূপায়িত হয়েছে—সেটা তুলনামূলকভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারা যাবে।

এক-পার্টি-শাসিত কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে স্বাধীন অবাধ সাধারণ নির্বাচন কি হতে পারে? এখানে শাসকগোষ্ঠীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা অবান্তর প্রশ্ন। সরকারী তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের (single list candidates) বিরুদ্ধে ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন অবকাশ তো নেইই—বিকল্প প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরূপে দাঁড়াবার দুর্জয় সাহস বা দুঃসাহস যদি বা কেউ দেখানও। নাম ঘোষণা করলেই তো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয় না! ভিন্ন বা বিকল্প মত প্রচারের সুযোগ কোথায়? যে দেশে নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত বিশ্ব-সাহিত্যিক সাহিত্য-সাধনার জন্য, অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্য এবং বাস্তব তথ্য রচনায় প্রকাশ করার অপরাধে নিজ মাতৃভূমি থেকে চিরতরে নির্বাসিত হন,—যে-রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় বিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠীর অনুকূলে বিজ্ঞান-লব্ধ জ্ঞান ও সত্য বিকৃত করে প্রচার করতে স্বীকৃত না হবার অপরাধে হয় বাধ্যতামূলক শ্রম-শিবিরে না হয় 'পাগলা গারদে' 'বিকৃত মস্তিস্ক' বলে বর্ণিত হয়ে থাকেন—সেই রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সরকারী কমিউনিস্ট দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন? তিনি তো সরাসরি রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে চিহ্নিত হবেন। তাছাড়া কমিউনিস্ট রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় তত্ত্বের দিক থেকে কল্পনায় ধরে নিতে হবে—সংঘাতশীল বিভিন্ন শ্রেণী বিলুপ্ত হয়েছে; সমাজে একটি মাত্রই শ্রেণী আছে: শ্রমজীবী শ্রেণী (One-Party one class-State)। সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বকালে সর্বহারা শ্রেণীর একমাত্র প্রতিনিধি কমিউনিস্ট পার্টি।

সেই পার্টিই প্রতিনিধি নির্বাচনে কোন্ কোন্ কেন্দ্র থেকে প্রার্থীরূপে কে বা কারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন স্থির করবে। তাই সেই দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে

যিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাবেন তিনি তো 'শ্রেণী-শত্রু' বলে চিহ্নিত হবেনই। গর্দানের বিনিময়ে কি কেউ নির্বাচনে 'গণতন্ত্র' আছে কিনা যাচাই করতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায়? [এ রাজ্যে—অর্থাৎ পশ্চিমবাংলায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেখানে নাকি স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থা, আইনের শাসন (Rule of law) স্বীকৃত—সরকার ঘোষিত তথাকথিত দুর্নীতি তদন্ত কমিশনের সামনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে দেশের দুজন নাগরিক অভিযোগপত্র পেশ করার পর তারা না-পাত্তা হয়ে গেলেন। পার্টি-ক্যাডার, পুলিশ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের অলিখিত হুমকী ও ভ্রূকুটির ভয়ে অভিযোগকারীরা নাকি কবুল করলেন গোপনে যে, তাঁরা কোন অভিযোগ করেননি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। তবেই তাঁরা রেহাই পেলেন। এ তো গণতান্ত্রিক দেশেই হচ্ছে। আর রাশিয়া চীন-মুলুকে কি হতে পারে সেটা অনুমান করা যেতে পারে।]

লেনিনবাদী কোন কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে সামান্যতম মতপার্থক্য প্রকাশের যেখানে সুযোগ নেই—সেক্ষেত্রে দলের বিরোধী বা স্বতন্ত্র কোন দলের পক্ষ থেকে শাসকদলের ঘোষিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবারও কোন সম্ভাবনা নেই। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাধারণ নির্বাচনের আগে বিক্ষুব্ধ নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক প্রত্যাহার করে নেবার (Recall) কোন অধিকার সুইজারল্যাণ্ড ছাড়া, পৃথিবীর অন্য কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই নেই—সুতরাং কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে সে অধিকার জনগণের না থাকলে বলার কিছু নেই। তবে পৃথিবীর যে কোন 'বুর্জোয়া' গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় একটা মৌল রাজনৈতিক নীতি স্বীকৃত এবং মান্য—সেটা হল দেশের 'Legal Sovereign' ও 'Political Sovereign'—দেশের জনগণ ও সরকারের মধ্যে সংঘাত যখনই প্রকট হয় তখনই এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সমাধানের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পথ হল পুনর্নির্বাচন ঘোষণা করে জনগণের রায় যাচাই করা (appeal to political sovereign)। এক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক কনভেনশন বা অলিখিত প্রথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শাসকদল ইচ্ছা করলে নানা চালাকির সুযোগ নিয়ে বিপক্ষ দলকে কাবু করে দল ভাঙা-ভাঙির রাজনীতিতে উস্‌কানি দিয়ে পার্লামেন্টে বা বিধানসভায় দলীয় প্রাধান্য বজায় রাখার চেষ্টা করতে পারে। ভারতে এ প্রবণতা খুব বেশী দেখা গেছে। ইংলণ্ড, পশ্চিম জার্মানীতে নিষ্ঠার সঙ্গে গণতান্ত্রিক কনভেনশন অনুসরণ করা হয়ে থাকে। তাই জন-মানসে সেই সব গণতান্ত্রিক রীতির প্রতি

আস্থাও অটুট রয়েছে। প্রার্থী প্রত্যাহারের (Right to recall) অধিকার পৃথিবীর অন্যান্য বৃহৎ গণতন্ত্রে না থাকলেও—পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা এবং নূতন করে জনতার রায় নেবার দাবীটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গণ-অধিকার। 'প্যারিস কম্যুনের' এটা একটা মৌল লক্ষ্য বলে ঘোষিত হলেও সমগ্রতান্ত্রিক কোন কমিউনিস্ট রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় এ অধিকার তাত্ত্বিক দিক থেকে আদৌ স্বীকৃতই হয়নি।

কোন কমিউনিস্ট রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কি সেনাবাহিনী, পুলিশী প্রশাসন রদ করতে পেরেছে? যে-কোন সমগ্রতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তিই তো সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা-গোয়েন্দা পুলিশ। 'বন্দুকের নলই যখন ক্ষমতার উৎস' (মাওবাদী তত্ত্ব) অথবা 'হিংসা যখন প্রগতির ধাই মা' (মার্কসীয় তত্ত্ব) তখন কোন মার্কসিস্ট রাষ্ট্র সামরিক লৌহ শৃঙ্খলা সামরিক ও পুলিশ বাহিনীকে ও সামরিক শৃঙ্খলা-তত্ত্বকে সর্বাধিক গুরুত্ব না দিয়ে পারেই না।

অক্টোবর-বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার কথা ধরা যাক্। ১৯১৭ সালের নভেম্বরে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের পর বলশেভিক পার্টি সেনাবাহিনী পুনর্গঠনের দিকে নজর দেয়। বিপ্লবী যুগে বলশেভিক পার্টি বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ গণফৌজ গড়ে তুলতে চেয়েছিল। সামরিক অফিসাররা নীচের তলা থেকে ওপর তলা পর্যন্ত পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বপূর্ণ শৃঙ্খলার আদর্শে আবদ্ধ হয়ে নির্বাচিত হবে ("built up from below on the principles of election of officers and mutual comradely discipline and respect") স্থির হয়েছিল। 'প্যারিস কম্যুনের' আদর্শ অনুযায়ী পেশাদারী সেনাবাহিনীর প্রতি কোন শ্রদ্ধা বিপ্লবী সরকারের ছিল না। শ্রেণী-সচেতন মেহনতি মানুষদের নিয়ে 'শ্রমিক-কৃষক লাল ফৌজ' ('Worker-Peasant Red Army') গড়ে তোলার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। শ্রমিকরা সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করত বিভিন্ন দাবী-দাওয়াকে কেন্দ্র করে। প্রকাশ্যে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতে দ্বিধা করত না। এই ধরনের সেনাবাহিনীতে কোন 'শৃঙ্খলাই' ছিল না বলা চলে। কিন্তু বিপ্লবোত্তর কালের বাস্তববোধ ও অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে লাল ফৌজকে নূতন করে ঢেলে সাজাবার ব্যবস্থা হল, আর এর নায়ক ছিলেন ট্রটস্কী। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও সামরিক সংস্থাকে পুনর্গঠিত করার দায়িত্ব এল তাঁর ওপর (Peoples' Commissar for War and President of the Supreme War

Council)। লাল ফৌজকে পেশাদারী সুশৃঙ্খল দক্ষ সেনাবাহিনারূপে গড়ে তোলার অনন্য কৃতিত্ব ট্রট্স্কীরই।

সেনাবাহিনী বিপ্লবী যুগে বিকেন্দ্রীভূত ছিল। প্রতিটি পঞ্চায়েৎ-কে (Local Soviets) কেন্দ্র করে সামরিক বাহিনী গড়ে উঠেছিল। আঞ্চলিক ভিত্তিক সেনাবাহিনী কেন্দ্রমুখী না হয়ে মারাত্মকভাবে কেন্দ্রাতিগ বা কেন্দ্রপ্রসারী হয়ে উঠেছিল। ট্রট্স্কী এর তীব্র নিন্দা করেন। ট্রট্স্কী বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন। ১৮ থেকে ৪০ বছরের বয়সের সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য আইন জারী করা হল। সামরিক বাহিনী ও সামরিক শিক্ষার ওপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল যে, ১৯২০ সালের শেষভাগে লাল ফৌজের সৈন্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৫০ লক্ষ। [The Prophet Armed : By Isaac Deutschér : P. 404] ট্রট্স্কী নির্বাচনের ভিত্তিতে সামরিক অফিসার নিয়োগ প্রথা রদ করলেন। সেনাধ্যক্ষ ও উচ্চ পর্যায়ের অফিসারদের সরকারী নিয়োগকর্তা করা হল। 'যে-কোন মূল্যে যে-কোন প্রকারে সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা আনতেই হবে' এই ছিল ট্রট্স্কীর সঙ্কল্প। বিপ্লবী যুগে যে শৃঙ্খলা-তত্ত্বকে নিশ্চিত 'বুর্জোয়া' প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব বলে বলশেভিক নেতারা নিন্দা করতেন, সেই শৃঙ্খলা-তত্ত্বকে এবং পেশাদারী সামরিক শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হল রাশিয়ায়। জারের আমলের সেনাবাহিনীর প্রায় ৪৮,০০০ অফিসারকে লেনিনের সম্মতি নিয়েই লাল ফৌজের অন্তর্ভুক্ত করা হয় ট্রট্স্কীর পরিচালনায়। শ্রেণী-সচেতনতা বা কোন্ শ্রেণী থেকে এই সব অফিসাররা আসছেন সেইসব অস্বস্তিকর গোলমেলে তাত্ত্বিক প্রশ্নগুলিকে ঠাণ্ডা ঘরেই পুরে রাখা হল। সাম্রাজ্যবাদী জারের সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত এই ৪৮,০০০ অফিসাররা গ্রামের গরীব কৃষক বা সহরের গরীব শ্রমিক পরিবারের ছেলে ছিলেন না—একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। বাম-কমিউনিস্টরা এই ধরনের স্থায়ী পেশাদারী কেন্দ্রায়িত সেনাবাহিনীর সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। বিপ্লববাদীরা দলীয় "লাল রক্ষী" (Red Guards) বাহিনীর ওপরই আস্থাবান ছিলেন। দক্ষতা ও লৌহ-শৃঙ্খলার নামে ট্রট্স্কী যে-মানসিকতাকে জনমানসে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন সেটা বিপ্লবী যুগের চিন্তা-ভাবনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। জীবনে যে-সব মূল্যবোধগুলিকে তিনি একদিন অতি সযত্নে লালন করেছিলেন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সেইসব প্রমূল্যগুলি (values)

যেন ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। আইজ্যাক ডয়েট্শার তাঁর প্রামাণ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে লিখেছেন :

"When he set out to found the Red Army Trotsky seemed to be burning all that he had worshipped and worshipping all that he had burned. The Bolsheviks had denounced militarism and encouraged the soldier to revolt against discipline and to see in their officer his enemy. They had done this not from enmity towards the army as such but because they had seen in that army the tool of hostile interest. So overwhelmingly successful had their agitation been that it rebounded on them. They were therefore compelled to break down their frame of mind which they themselves had built up before they could create the army which was a condition of their self-preservation" [The Prophet Armed : Isaac Deutscher : P. 406.]

অর্থাৎ ট্রট্স্কী যখন লালফৌজ গঠন করার কাজে হাত লাগালেন তখন অবস্থা দেখে যেন মনে হত তিনি একদিন যে-আদর্শকে পুজো করতেন তাকেই যেন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করছেন। আর যে সব চিন্তা-ভাবনাকে বিপ্লবী হিসেবে একদিন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প ছিলেন সেইসব মতকেই যেন পুজোর বেদীতে উপাস্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যত হয়েছিলেন। মার্কসিস্ট বিপ্লবী চিন্তা-নায়কের জীবনে এ এক অদ্ভুত স্ব-বিরোধিতার ট্র্যাজেডি। বিপ্লবী যুগে বলশেভিকরা সামরিক আয়োজন-ব্যবস্থা ও তার সহায়ক মানসিকতার তীব্র নিন্দা করার শিক্ষা পেয়েছিলেন নেতাদের কাছ থেকে। সেনাবাহিনীর প্রতি বিদ্বেষ-বোধ থেকে এই মানসিকতা জন্মায়নি কিন্তু। তাঁরা মনে করতেন বিরুদ্ধ স্বার্থ ও শক্তির রক্ষা-কবচই হল সুদৃঢ় স্থায়ী পেশাদারী সেনাবাহিনী। ক্ষমতা দখলের পর এই বিপ্লবীরাই বুঝলেন নূতন বিপ্লবী সরকারকে বাঁচাতে সর্বাগ্রে চাই সুদৃঢ় সুশৃঙ্খল স্থায়ী পেশাদারী সেনাবাহিনী (Professional Army)।

বিপ্লবের পর লেনিন বলেছিলেন : "The question of power is the fundamental question of every revolution." [Selected

Works : Vol. XXVI : P. 330 (The Tax In Kind)]. 'রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করা ও রাখার প্রশ্নটিই—প্রত্যেক বিপ্লবের মূল প্রশ্ন।' আর এই ক্ষমতা করায়ত্ব ও নিরঙ্কুশ রাখার সাধনায় কিন্তু ধীরে ধীরে একটি বিপ্লবী দল (Party of revolution) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দলে রূপান্তরিত হল (a party of order)। এই চেতনার ক্রমবিকাশে লেনিন-ট্রটস্কী-স্তালিন সাহায্য করেছেন পাল্লা দিয়ে। ক্ষমতা করায়ত্ব রাখা এবং ক্ষমতা নিরঙ্কুশ বাধা-মুক্ত করার প্রয়াস কিন্তু বিপ্লবের অনেক মৌল লক্ষ্যকে খর্ব করল।

লেনিন চেয়েছিলেন বুর্জোয়া রাষ্ট্র ভেঙে চুরমার করে তার জায়গায় সেই ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে শ্রমিকশ্রেণী নূতন রাষ্ট্র গড়ে তুলবে। আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো নীচু থেকে ওপর পর্যন্ত ধ্বংস করে ফেলার পরামর্শ তিনি দিয়েছিলেন। তিনিও চেয়েছিলেন, মার্কসের মত, অফিসারদের মনোনয়ন নির্বাচন-ভিত্তিক হবে এবং অফিসাররা সব সময় বাতিল যোগ্য (revocable) বলে গণ্য হবে। একই শ্রমিক-কর্মচারী নূতন রাষ্ট্রে থেকেই যাবে। তবে তারা যাতে নূতন আমলাতান্ত্রিকতা কায়েম করতে না পারে তার জন্য মার্কস্-এঙ্গেলসের পরামর্শমত একদিকে তারা যেমন প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে প্রবেশ করবেন নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে, তেমনি তাদের বেতনও হবে সাধারণ শ্রমিকের বেতন ("payment no higher than that of ordinary workers." Lenin) [The State and Revolution : Lenin]।

লেনিন স্থায়ী পুলিশের জায়গায় সাবজনীন গণ-বাহিনী গড়তে চেয়েছিলেন এবং 'কম্যাণ্ডিং অফিসাররা' নিবাচিত হবে বলেছিলেন ("Substitution of a universal popular militia for the police" এবং "electiveness and recall at any moment of all functionaries and commanding ranks, workers' control in its primitive sense, direct participation of the people at the courts, suppression of specializing prosecutors and defence counsels and by the vote of all present on the question of guilt.…")।

লেনিন প্রশাসনে শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ চেয়েছিলেন। আদালতের রায়—কে দোষী কে নির্দোষ তাও সকলের উপস্থিতিতে ভোট দ্বারা নির্ধারিত হবে—লেনিন বলেছিলেন। পেশাদারী বিশেষজ্ঞ সরকারী ব্যবহারজীবী এবং

এবং আসামী পক্ষের বিশেষজ্ঞ ব্যবহারজীবী ব্যবস্থা বাতিল করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এসব কথা তিনি বলেছিলেন 'অক্টোবর-বিপ্লবে'র আগে। 'অক্টোবর-বিপ্লবের' পর যখন তিনি ক্ষমতাসীন তখন নিজে কিন্তু নিজের প্রস্তাবগুলি আদৌ কার্যকরী করেননি। সেটাও আমরা খুব সংক্ষেপে আলোচনা করব। প্রশাসন একটি জটিল ব্যবস্থা। এর জন্য চাই অভিজ্ঞতা, বিশেষ কোন প্রশাসনিক বিদ্যা। বিশেষজ্ঞদের বাদ দিয়ে অনগ্রসর অবস্থা থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ অসম্ভব হবে। লেনিনের ভাষায়: "Without the guidance of specialists in the various fields of knowledge, technology and experience, the transition to socialism will be impossible." [Lenin—Selected Works : Vol. XXII : P. 445-446]

লেনিন বলেছিলেন: "We have had to resort to the old bourgeois method and to agree to pay a very high price for the "services" of the biggest bourgeois specialists·· Clearly such measure is a compromise, a departure from the principles of the Paris Commune···a step backward on the part of our Socialist Soviet State power, which from the very outset proclaimed and pursued the policy of reducing high salaries to the level of the wages of the average worker." [Selected Works : Vol. XXII : P. 447.]

"আমাদের সেই সাবেকী বুর্জোয়া ব্যবস্থাই অবলম্বন করতে হয়েছে। বড় বড় বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের খুব বেশী বেতন দিয়ে কাজে নিয়োগ করতে হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা একটা আপোষরফা, প্যারিস কম্যুনের আদর্শ থেকে পিছু হটে আসা; সমাজবাদী রাষ্ট্রের এটা এক পশ্চাদপসরণ—কেননা সুরু থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রে নিযুক্ত বড় বড় অফিসারদের বেতন হবে অতি সাধারণ কর্মচারীর বরাদ্দ বেতন।" [লেনিন]

লেনিনের লোকান্তরের পর সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্র এক চরম এবং নির্মম রূপ নিয়েছে। আর সেই সর্বব্যাপী আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ নাগরিকের আইনের পথে প্রতিকারের কোন উপায় নেই। এই আমলাদের কেউই 'নির্বাচিতও' নন এবং তাঁদের 'প্রত্যাহার' করে নেবার কোন অধিকারও

জনগণের নেই। এই বিশেষজ্ঞ ও ওপরতলার আমলারা এক বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী-ভুক্ত মানুষ। সাধারণ কর্মী-শ্রমিকের সঙ্গে একজন আমলার প্রভেদ প্রভূত।

'প্যারিস কম্যুনে' শিক্ষা-ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব-মুক্ত ছিল। কোন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রেই শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রীয় অনুশাসন ও নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত নয়, যদিও শিক্ষা অবৈতনিক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি দলীয় মত প্রচারের এবং দলীয় আদর্শের ছাঁচে-ঢালা মানুষ তৈরীর কারখানা।

অন্যান্য উদারতন্ত্রী মানবতাবাদীদের ন্যায় সততা ও সদ্‌গুণ-রাজনীতি লেনিনের চিন্তার অন্যতম মূল চালকশক্তি ছিল। কিন্তু বিপ্লবোত্তর যুগের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ববাদী সর্বগ্রাসী একনায়কত্ব সেই প্রাক্-বিপ্লবী যুগের মূল্যবোধগুলির মূলে কুঠারাঘাত করল। অক্টোবর-বিপ্লবের মহানায়ক ট্রট্স্কী নির্বাসিত জীবনে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বললেন :

"Bureaucracy conquered something more than the Left Opposition. It conquered the Bolshevik party. It defeated the program of Lenin, who had seen the chief danger in the conversion of the organs of the State "from Servants of society to Lords over society." It defeated all these enemies, the opposition, the party and Lenin, not with ideas and arguments but with its own social weight. The leaden rump of the bureaucracy outweighed the head of the revolution. That is the secret of Soviets, Thermidor." [The Revolution Betrayed : Leon Trotsky : P. 94.]

বামপন্থী বিরোধিতা যা পারেনি আমলাতন্ত্র তাই পেরেছিল। আমলাতন্ত্র বলশেভিক দলকে সম্পূর্ণ কব্জা করে নিল, লেনিন দ্রষ্টা হিসেবে যে-বিপদের আশঙ্কা করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন একদিন দেশের প্রশাসন-ব্যবস্থা জনগণের 'ভৃত্যের' ভূমিকা ছেড়ে 'প্রভুর' ভূমিকা নিতে পারে,—তাই হল। আমলাতন্ত্র সকল বিরুদ্ধ শক্তিকেই সম্পূর্ণ ভাবে ঘায়েল করল, পরাস্ত করল দলকে, দলের নেতা লেনিনকে, বামপন্থী বিরোধী-শক্তিকে—যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, উন্নত ভাবাদর্শ দিয়ে নয়—নিজের সামাজিক দাপটের ও প্রভাবের জোরে। বিপ্লবী ভাবাদর্শের মাথার ওপর চেপে বসল উদ্ধত নিষ্ঠুর আমলাতন্ত্রের স্ফীতকায় অপমান। যুক্তি ও বুদ্ধি—মুষ্টির উদ্ধত আস্ফালনের কাছে হার মানল।

সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রভুত্ব বনাম সংখ্যালঘিষ্ঠের বিরোধিতা

'কম্যুনের' সপ্রশংস বর্ণনা থেকে কার্ল মার্কসের রাজনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতি অনুরাগ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বিপ্লবী দল ক্ষমতা দখলের পর—সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের যুগে সর্বহারা শ্রেণীকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবার দল হিসেবে কমিউনিস্ট দলের কি ভূমিকা হবে—একাধিক সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট দল সে রাষ্ট্রে থাকবে কি না—এসব বিষয়ে অবশ্য তাঁর মতামত জানা যায় না। তত্ত্ব ও প্রয়োগের বিচারে 'সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব' (Dictatorship of the Proletariat) বিশ্লেষণ করলে এইসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর মিলবে এবং তথাকথিত সর্বহারা শ্রেণী-রাষ্ট্রের প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যাবে।

১৯১৭ সালের 'ফেব্রুয়ারী-বিপ্লবের' পর রাশিয়ায় যে অস্থায়ী সরকার (Provisional Government) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ১৯১৭ সালে ২০শে এপ্রিল লেনিন এক ঘোষণায় তাকে "বিশ্বের সর্বাপেক্ষা স্বাধীন দেশ" ('freest country in the world') বলে বর্ণনা করেছিলেন। সেই দেশের সেই পটভূমিতেই আবার লেনিন অক্টোবর-বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। 'অক্টোবর-বিপ্লবের' আগে তিনি গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন এই 'অস্থায়ী সরকার'—গণতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সক্ষম হবে না বলেই নূতন করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতি নিতে হবে। তাঁর সেই সময়কার বিভিন্ন বক্তৃতা রচনায় সুন্দর সুন্দর এবং মনোহারী গণতান্ত্রিক শ্লোগান স্থান পেয়েছিল। একটা রচনার একটি অংশ উদ্ধৃত করা যাক :

"The Party of the proletariat can not rest content with a bourgeois parliamentary democratic republic ··· the Party fights for a more democratic workers' and peasants' republic in which the police and the standing army will be com-

pletely abolished and replaced by the universally armed people, by a univer‹al militia. All official persons will not only be elective but also subject to recall at any time upon the demand of the majority of electors ... [From the Bourgeois to Proletarian Revolution : Vol. VI : Lenin's Selected Works : P. 116-17]

এ ছিল অক্টোবর-বিপ্লবের প্রাক্কালে ঘোষিত কর্মসূচী। কিন্তু অক্টোবর-বিপ্লবের পর লেনিনের চিন্তায় অদ্ভুত মোড় লক্ষ্যণীয় হল। একটি বিপ্লবী দল শাসনকারী সরকারী ক্ষমতালিপ্সু দলে পর্যবসিত হল—গণতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী দল রাতারাতি একটি অন্য দলের অস্তিত্ব-লোপকারী স্বৈরতান্ত্রিক দলে রূপান্তরিত হল। লেনিন এবং ট্রট্স্কী সবগ্রাসী ক্ষমতাসম্পন্ন নিরঙ্কুশ এক-পার্টি শাসনের পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে যান। ক্ষমতা দখলের পর বলশেভিক দলে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী মতাদর্শ প্রভুত্ব লাভের চেষ্টা করছিল। লেনিন ও ট্রট্স্কী সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর নেতৃত্ব করছিলেন। এঁরা দুজনেই বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় দলের একনায়কত্ব (Party dictatorship) প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গে যৌথ শাসনের বিরুদ্ধে ছিলেন তাঁরা। প্রতিদ্বন্দ্বী অপর গোষ্ঠীতে ছিলেন জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ। এঁরা আবার কোয়ালিশন সরকার গঠনের পক্ষে ছিলেন; মেনশেভিক ও সোস্যাল রেভল্যুশনারীদের সঙ্গে সমঝোতা করে কাজ করার অনুকূলে মত ব্যক্ত করেন। লেনিন পেট্রোগ্রাড্ কমিটির সভায় এই ধরনের কোয়ালিশন সরকারের প্রতি গভীর সংশয় প্রকাশ করে বলেছিলেন: As for conciliation I can not even speak about that seriously ... Our present slogan is : No Compromise, i.e. for a homogeneous Bolshevik Government." [Quoted from : How Rusia Is Ruled : By Merle Fainsod : P. 123]

অর্থাৎ একমতাবলম্বীদের নিয়েই বলশেভিক সরকার গঠন করতে হবে। এ-ব্যাপারে কোন আপোষ নয়—কোন সমঝোতা নয়: এই হবে দলের স্লোগান। বিপ্লবী সরকার ৯ই নভেম্বর (১৯১৭) একটি সরকারী নির্দেশনামা জারী করল দেশের বলশেভিক দল বিরোধী যাবতীয় সংবাদপত্রগুলিকে কণ্ঠরোধ করে। জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ এই কালাকানুন রদ করার জন্য পার্টির

কেন্দ্রীয় কমিটিতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে Sovnarcom ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিলেন। ১৭ই নভেম্বর (১৯১৭) তাঁরা যে বিবৃতি প্রকাশ করলেন সেটি স্মর্তব্য :

"We take the stand that it is necessary to form a socialist government of all parties in the Soviet. We believe that only the formation of such a government can preserve the fruits of the heroic war won by the working class and the revolutionary army in the October-November days.

We deem the alternative to be a purely Bolshevik government which can maintain itself only by means of political terror. It is this last-named alternative which the Soviet of peoples' commissars has chosen. We can not and will not accept it. We can see that it will alienate the proletariat masses and cause their withdrawal from political leadership ; it will lead to the establishment of an irresponsible regime and to the ruin of the revolution and the country . .

We resign therefore from membership in the Central Committee so that we may be free to express our opinion openly to the masses of workers and soldiers and to ask them to support our slogan : Long live the government of the parties in the Soviet ! For an immediate understanding on these terms." [From Fainsod's book : How Russia Is Ruled : P. 124-25]

কামেনেভ-জিনোভিয়েভ রাইকভ—এই সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল : "সোভিয়েটের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত দলগুলিকে নিয়েই সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠন করা আবশ্যক। দেশের শ্রমিক শ্রেণী ও বিপ্লবী সেনাবাহিনী অক্টোবর-বিপ্লবের ঐতিহাসিক সংগ্রামের দিনগুলিতে অমিত বিক্রমের মধ্যে দিয়ে যে বিজয় অর্জন করেছে—সেই সাফল্যের ফসলকে রক্ষা করার জন্যই এই ধরনের বিভিন্ন দলের সহযোগিতায় যৌথ সরকার গড়ে তোলা দরকার। এই যৌথ

কোয়ালিশন সরকারের বিকল্প হিসেবে দেশে যদি শুধুমাত্র এক-দলীয় বলশেভিক সরকার গঠন করা হয় তাহলে সে সরকার নিজেকে ক্ষমতায় আসীন রাখার জন্য রাজনৈতিক হিংসা-ভীতির আশ্রয় নেবে। দুঃখের বিষয়, এই অবাঞ্ছিত পথটিই গ্রহণ করা হল। আমরা এই সিদ্ধান্ত মানছি না—মানব না। আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি এই সিদ্ধান্ত দেশের বিপুল শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে সরকার থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে, আর রাজনৈতিক নেতৃত্ব জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একপেশে সঙ্কীর্ণতাবাদী হয়ে পড়বে। এর থেকে এক দায়িত্বহীন শাসন-ব্যবস্থা জন্ম নেবে এবং বিপ্লবী আদর্শ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তাই এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমরা সুর মেলাতে না পেরে পদত্যাগ করছি। আমরা কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি থেকে পদত্যাগ করছি যাতে সাধারণ শ্রমিক-কর্মচারী ও সৈন্যদের কাছে আমাদের মত স্বাধীনভাবে প্রচার করতে পারি।"

মার্কসিস্ট দলের মধ্যে অন্ধভাবে 'পার্টি লাইন' অনুসরণ করতেই হবে সকল সভ্যকে—এমন কোন কথা নেই। থিওরী সেকথা বলে না—বলতেও পারে না। লেনিন ও ট্রট্‌স্কী শৃঙ্খলা-সর্বস্ব, সর্বগ্রাসী ক্ষমতাসম্পন্ন দলরূপে বলশেভিক দলকে গড়ার অপরিহার্যতার কথা বলেই দলের ভিতরে ও বাইরে স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ খর্ব করেছিলেন। জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের কমিউনিস্ট আন্দোলনে কম অবদান ছিল না। ব্যক্তিগত গুণে যোগ্যতায়, ত্যাগে এবং বিপ্লবী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণে এঁরা ইতিহাসে স্মরণীয়ই হয়ে থাকবেন।

বলশেভিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ লেনিনবাদী-অংশ দলীয় একনায়কত্বকে ধীরে ধীরে শক্তিশালী করে তোলে এবং বিরোধী গোষ্ঠীগুলি ও নেতাদের দল থেকে দফায় দফায় বহিষ্কারের পথ প্রশস্ত করেছিল। ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে রাশিয়ায় বহু-প্রত্যাশিত ও বহু-প্রতিশ্রুত গণ-পরিষদের নির্বাচন হল তখন সে-মুহূর্তে লেনিন দেখলেন 'সোস্যাল রেভলুশনারীরা' তাঁর অনুগামী বলশেভিক প্রতিনিধিদের চাইতে বেশী সংখ্যায় নির্বাচিত হয়ে এসেছেন তখনই অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক উপায়ে গণপরিষদ ভেঙে দিলেন। নির্বাচনে জনগণের রায়কে তিনি আমলই দিলেন না। ১৯১৮ সালের শেষভাগের দিকে রাশিয়ায় অকমিউনিস্ট দলগুলির কার্যকরী ক্ষমতা লোপ পেয়েছিল বললে ভুল হবে না। এই সব দলগুলি নিছক সাইনবোর্ডের মধ্যেই, পার্টির কার্যালয়ের মধ্যেই বেঁচেছিল।

রাশিয়ায় গৃহ-যুদ্ধ সমাপ্তির পর এবং 'নয়া অর্থনীতি' (NEP) চালু হবার সাথে সাথেই বিরোধী দলগুলির প্রতি সহনশীলতার নীতির অপমৃত্যু ঘটল। লেনিন নিজেই ইঙ্গিত নিক্ষেপ করলেন একটি খুব অর্থবহ ছোট উক্তির মধ্যে দিয়ে। সেটাই ছিল তাঁর সিগ্‌ন্যাল।

"We shall keep the Mensheviks and S.R.'s. whether open or disguised as 'non-party' in prison." [Lenin : "Tax in Kind" S. W. : Vol. XXVI : xxvi, P. 348]

'মেনশেভিকপন্থী বা সোস্যাল রেভলুশনারীদের স্থান কারাগারে।' ক্রনস্তাদ্‌ নাবিকদের ঐতিহাসিক বিদ্রোহ [Kronstadt rebellion] লেনিনকে চরম অসহিষ্ণু নীতির দিকে আরও ঠেলে দিল। দলের মধ্যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর স্থানই হতে পারবে না। আর এই দৃষ্টিভঙ্গীকে 'উন্নত গণতন্ত্র' বলে বলশেভিক নেতারা প্রচার করতে থাকেন।

১৯২০ সাল থেকে দলের মধ্যে "ওয়ার্কারস্‌ অপোজিশন"—এই নামে একটি সুসংহত আদর্শবাদী গোষ্ঠী সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। পার্টির দশম কংগ্রেসে এই গোষ্ঠী অধিক গণতন্ত্রের দাবী জানাল। এই গোষ্ঠীর দাবীর মধ্যে ছিল (১) ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা (২) শিল্প-প্রশাসনে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে প্রত্যক্ষ ক্ষমতা দিতে হবে (৩) দলের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের গণতন্ত্রীকরণ। এই অধিবেশনে বিরোধী গোষ্ঠীর বক্তব্য সমালোচনা শুনে লেনিন খুব ক্ষুব্ধ হন। তিনি ট্রট্স্কীরও সমালোচনা করেন; উপদলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্র নিন্দা করেন। "ওয়ার্কারস অপোজিশনের" (Workers' Opposition) কর্মসূচী তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। লেনিন জানালেন: "Of course it is permissible (specially before a congress)" for different groups to organise in blocs. But it must be done within the limits of communism." (Lenin) অবশ্য পার্টি-সম্মেলনে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা উপদল নিজেদের সংগঠিত করতে পারে। কিন্তু কমিউনিস্ট দলের দলীয় আদর্শের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই এই সব আলোচনা-সমালোচনা সীমিত থাকা চাই। কিন্তু প্রশ্ন: (১) দলীয় আদর্শের "সীমাবদ্ধতা" বলতে কি বোঝায়? (২) এই তথাকথিত সীমাবদ্ধতার সীমানা টানবে কে এবং (৩) কোন্‌ কোন্‌ বিবেচ্য বিষয়ের ভিত্তিতে?

(৪) 'কমিউনিজম্' এই আদর্শের সকল কমিউনিস্টদের মান্য সার্বিক কোন ব্যাখ্যা আছে কি? লেনিন, ট্রট্স্কী, মাও-সে-তুঙ, মিলোভান্ জিলাস, মার্শাল টিটো, ফিডেল ক্যাস্ট্রো, বুখারীন, মার্টভ, প্লেখানভ, এ্যাক্সেলরড্ লুনা চায়স্কী, কাউৎস্কী, রোজা লুকসেমবুর্গ, চে গুয়েভারা সকল শীর্ষ-স্থানীয় মার্কসিস্টরা কি একই ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছেন? সুতরাং মতবাদকে কেন্দ্র করেই যখন বহুবিধ ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে সেখানে লেনিন দলের বার্ষিক সম্মেলনে কতটুকু আলোচনা-সমালোচনা করা যাবে, প্রতিনিধিরা সম্মেলনে ভোটাভুটির মাধ্যমে কতটা নিজেদের মত প্রকাশ করতে পারবেন এইসব জটিল তর্ক সম্বন্ধে ফারমান জারী করার অধিকারী হবেনই বা কি ভাবে? লেনিনের সমালোচকরা তাঁকে 'econonuic militarizer' বলে সমালোচনা করেছিলেন। পার্টির ভিতরে থেকে পার্টির সমালোচনা বিরোধী গোষ্ঠী করে যাবেন এ অধিকার তত্ত্বের বিচারে স্বীকৃত হলেও লেনিন এ অধিকার কিছুতেই স্বীকার করতে রাজী হননি। তিনি তাঁর এই 'ওয়ার্কার্স অপোজিশন' গোষ্ঠীর সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন:

"All these arguments about freedom of speech and freedom of criticism and all the speeches of the 'Workers' Opposition' constitute nine-tenths of the sense of speeches which have no particular sense—all these are words of this order. Comrades, it is necessary to talk not only about words but about their contents as well. You can not trick us with words like 'freedom of criticism'. When we said that the party showed symptoms of disease we meant that this indication deserves three-fold attention; undoubtedly the disease is there. Help us to heal the disease. Tell us how we can heal it. We have spent a great deal of time in discussion and I must say that now it is a great deal better to 'discuss with rifles' than with the theses offered by the opposition. We need no opposition now, comrades, it is not the time! Either on this side or on that with a rifle, but not

with the opposition.···And I think that the party congress will have to draw that conclusion too. And the time has come to put an end to the opposition, to put a lid on it ; we have had enough of opposition now !" (Selected Works : Vol. XXVI : Pp. 227-28. March 9, 1921)

"'ওয়ার্কার্স অপোজিশন' গোষ্ঠীর বক্তাদের বক্তৃতার দশভাগের নয় ভাগই হল 'সমালোচনার স্বাধীনতা', 'বক্তৃতার স্বাধীনতা' দাবী সংক্রান্ত। এসব বক্তৃতা অর্থহীন অসার প্রলাপমাত্র। বন্ধুগণ! শুধু কথার মালা গাঁথলেই হল না, কথাগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ কি সেটাও সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নেওয়া দরকার। 'সমালোচনার স্বাধীনতার' নামে আমাদের ধোঁকা দেওয়া যাবে না—প্রতিনিধিরা একথাটা যেন বুঝে যান। আমরা যখন বলি দলের মধ্যে ব্যাধির অনুপ্রবেশ ঘটেছে তখন প্রতিকারের জন্য যথোপযুক্ত দৃষ্টি আরোপ করা দলের কর্তব্য। নিঃসন্দেহে ব্যাধি রয়েছে : আপনারা বলুন কিভাবে এ রোগের প্রতিকার সম্ভব। আমরা অনেক সময় ব্যয় করেছি আলোচনা করে। অনেক হয়েছে, আর নয়। বিরোধী গোষ্ঠীর প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার চাইতে রাইফেলের সঙ্গে আলোচনা করা শ্রেয়। আমাদের এখন 'বিরোধী গোষ্ঠীর' বিরোধিতার কোনই প্রয়োজন নেই। আমি মনে করি পার্টি অধিবেশন থেকে সমগ্র দল সেই সিদ্ধান্ত নিয়েই এখান থেকে যাবে। দলের মধ্যে বিরোধীদের আর বরদাস্ত করা চলতে পারে না। সকল বিরোধিতার পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে। অনেক বিরোধিতা আমরা সয়েছি, আর নয়। এখন বিরোধীদের মুখ বন্ধ করতে হবে।" (লেনিন)

লেনিনের এই সুস্পষ্ট বক্তব্যের ওপর কোন টীকার প্রয়োজন হয় না। একটি বিপ্লবী রাজনৈতিক দল দেশের মেহনতি শোষিত মানুষদের মুক্তি আনবে অথচ সেই দলে 'সমালোচনার স্বাধীনতা', স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার থাকবে না ? সম্মেলনে দলের নেতার মতামতকেই সকলের মত বলে প্রচার করতে হবে ? নেতা অভ্রান্ত—সন্দেহের ঊর্ধ্বে ? লেনিন যদি সন্দেহের ঊর্ধ্বে, সমালোচনার ঊর্ধ্বে বলে বিবেচিত হন, সেই একই যুক্তিতে স্তালিন, ট্রট্স্কী, মাও-সে-তুঙ, ক্যাস্ট্রো সবাই অভ্রান্ত। দলের মধ্যে 'স্বাধীনতা' তাহলে নেতা ও নেতার অন্ধ অনুগামীদেরই স্বাধীনতা ? ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মত ও বক্তব্য

নির্বিচারে মেনে নেওয়াই কি উচ্চতর উন্নততর আদর্শ গণতন্ত্র ? কার্ল মার্কস্ এই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য সাধনা করেছিলেন ?

একপার্টি-শাসিত দলের ভিতরে ও বাইরে—তাহলে 'স্বাধীনতা' 'গণতন্ত্র' এগুলি বিশেষ পদাধিকারী ক্ষমতাসীন সুবিধাভোগী কতিপয় নেতাদের জন্য ; সাধারণ নাগরিক, দলের বিবেক-সম্পন্ন সচেতন আদর্শ-অনুরাগী কর্মীদের কাছে ওগুলো নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল। সেই নিষিদ্ধ ফল খেলেই সমাজে 'পাপ' অনুপ্রবেশ করবে। কিন্তু প্রকৃত 'স্বাধীনতা' তো ভিন্ন মতাবলম্বীর মত প্রকাশের স্বাধীনতা। ভিন্ন বিরুদ্ধ মত প্রকাশের স্বাধীনতার নিরিখেই প্রকৃত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের যাচাই হবে। প্রচলিত মত ও সিদ্ধান্তের শুধুমাত্র অনুকূলে মত প্রকাশের অধিকারকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা কেউ বলবে না। এই মূল কথাটা অসামান্য সাহসের সঙ্গে প্রখ্যাতা জার্মান কমিউনিস্ট নেত্রী রোজা লুকসেমবুর্গ তুলে ধরেছিলেন। তিনি লেনিন-ট্রট্স্কীর মুখ চেয়ে কথা বলতেন না। তাঁর বক্তব্য উল্লেখ্য :

"Freedom only for the supporters of the Government only—for the members of one party—however numerous they may be—is no freedom at all. Freedom is always and exclusively freedom for the one who thinks differently. Not because of any fanatical concept of 'justice' but because all that is instructive, wholesome and purifying in political freedom depends on this essential characteristic, and its effectiveness vanishes when 'freedom' becomes a special privilege." [Rosa Luxemburg]

ভিন্নমতাবলম্বীর ভিন্নমত প্রকাশের অধিকারই স্বাধীনতার মুখ্য বৈশিষ্ট্য। আর এই বৈশিষ্ট্য যখন লোপ পায় তখন 'স্বাধীনতা'র কার্যকারিতাও লোপ পায়। 'স্বাধীনতা' মৌল 'অধিকার' থেকে একটি 'অনুগ্রহের দানে' পর্যবসিত হয়, সুবিধাভোগী সমাজের কতিপয়ের বিশেষ সুবিধা বলেই গণ্য হয়।

একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীদের সম্মেলনে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছবার তিনটি পথ আছে : (১) সর্বসম্মত উপায়ে : কোন সিদ্ধান্তই নেওয়া হবে না যদি সকল অংশগ্রহণকারী সদস্যরা একমত না হন (Unanimity principle)।

(২) সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে: যে কোন সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত হবে (Majority principle)। (৩) আলাপ-আলোচনার পর স্বপক্ষ-বিপক্ষ গোষ্ঠীর মতামত শুনে একটা ঐকমত্য গড়ে তোলা (Consensus principle)। যে কোন রাজনৈতিক দলের কাছে এই তিনটি পথই খোলা আছে। এই তিনটি নীতির মধ্যেই বিরোধী গোষ্ঠীর যথাযথ মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে। কোনটির মধ্যেই বিরোধী পক্ষকে কোণঠাসা, নির্মূল বা উপেক্ষা করার মানসিকতা নেই।

লেনিন বিপক্ষ গোষ্ঠীকে কোন মর্যাদাই দেননি। লেনিন নিজেই অক্টোবর-বিপ্লবের আগে বলেছিলেন "রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে পরিহার করে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌঁছুবার চেষ্টা অনিবার্যভাবেই অবিশ্বাস্য পরিণতির দিকেই ঠেলে দেবে দেশকে।" ["Whoever approaches socialism by any other path than that of political democracy will inevitably arrive at absurd conclusions."—Lenin.] একটি সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও কার্যক্রমে বিশ্বাসী বিশাল রাষ্ট্রে—যেখানে অন্য সকল দলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত—শাসক দলের অভ্যন্তরে বিভিন্ন গোষ্ঠী নিশ্চয়ই থাকবে (groups, factions, etc.)। বিভিন্ন জটিল অর্থনৈতিক রাজনৈতিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে নানাবিধ তর্ক—পক্ষে-বিপক্ষে গণসমর্থন অথবা পার্টির সদস্যদের সমর্থন সংগ্রহের অপ্রতিহত চেষ্টা চলবেই আর সেটাই খুব স্বাভাবিক এবং দলের স্বাস্থ্যের লক্ষণও সেটা। কিন্তু বলশেভিক দলের দশম কংগ্রেসে লেনিনের উপস্থিতিতে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হল তাতে বলা হয়েছিল:

"The Congress therefore hereby declares dissolved and orders the immediate dissolution of all groups without exception that have been formed on the basis of one platform or another (such as Workers' Opposition group, the Democratic Centralism group, etc.). Non-observance of this decision will entail absolute and immediate expulsion from the party."

"কংগ্রেস এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছে দলের ভিতরে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের নামে—যেমন ওয়ার্কার্স অপোজিশন গ্রুপ, ডিমোক্র্যাটিক সেন্ট্রালিজম্ গ্রুপ, ইত্যাদি—

যেসব গোষ্ঠী কাজ করে আসছে সেগুলি আজ থেকে অবলুপ্ত হল। এই সব গোষ্ঠীর আর কোন অস্তিত্বই রইবে না এখন থেকে। এই সিদ্ধান্ত যারা না মানবে—তাদের অবিলম্বে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে।”

ধীরে ধীরে রাজনৈতিক সমালোচনা, বিরোধিতা রাষ্ট্রদ্রোহিতার সমতুল্য বলে বিবেচিত হতে থাকে। ‘দশম অধিবেশন’ রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে নির্বাসন দেবার সূচনা-পর্ব। পরবর্তীকালে স্তালিন এই সিদ্ধান্তের চরম সুযোগ নিয়ে প্রতিপক্ষদের শুধুমাত্র সন্দেহ—কাল্পনিক অভিযোগের ভিত্তিতে নির্মূল করেছিলেন। দশম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার পর ১৯২১-২২ সালে রাশিয়ায় প্রথম রাজনৈতিক ‘পার্জ’ শুরু হয়ে যায়। লেনিন বললেন: “ · rascals, bueaucrats, dishonest or wavering communists and of Mensheviks who have re-painted their ‘facade’ but who have remained Mensheviks at heart”—এদের দল থেকে বিতাড়িত করতে হবে। এই সময় প্রায় সমগ্র দলের মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশ সভ্য হয় দল থেকে বহিষ্কৃত হন অথবা দল ছেড়ে চলে যান। এসব সত্ত্বেও ওয়ার্কার্স্ অপোজিশন গোষ্ঠী রণে ভঙ্গ দেননি। দলের ‘একাদশ কংগ্রেসে’ আবার ‘নীতির’ লড়াই সুরু করলেন তাঁরা। এই অধিবেশনই লেনিনের জীবদ্দশায় শেষ অধিবেশন যাতে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এক-পার্টি একনায়কত্বের কাঠামোর মধ্যে বহুদলীয় উপদল বা গোষ্ঠীর অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা লেনিন স্বীকার তো করেনই নি, বরং সকল বিরোধিতার শিকড় তিনি উপড়িয়ে ফেলতে উদ্যত হয়েছিলেন। ধীরে ধীরে পার্টি গড়ে উঠল সামরিক শৃঙ্খলা-ভিত্তিক সামরিক ধাঁচের সংকীর্ণ সংগঠনে। যুক্তি ও বিশ্লেষণের স্থান নিল অন্ধ গোঁড়ামি বা ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারের সমতুল্য মানসিকতা এবং নেতা-পূজা। দলের কেন্দ্রীয় সমিতির এবং দলপতির নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত অন্ধভাবে সৈনিকের মত অনুসরণ করা কর্তব্য বলে বিবেচিত হল। Merle Fainsod লিখেছেন:

“...the Supreme leader Stalin became vested with a god-like infallibility. His pronouncements were treated as the incarnation of divine wisdom. His decisions brooked no dispute. The political monopoly of the party was transformed into personal supremacy of the Iron Dictator” [(P. 138)—

How Russia Is Ruled : By Merle Fainsod] সর্বোচ্চ নেতা রূপে স্তালিন ঐশ্বরিক অভ্রান্ততা অর্জন করলেন। ঈশ্বরের মত তিনিও অভ্রান্ত। তাঁর বক্তব্য ঘোষণা বিবৃতি সব কিছুই স্বর্গীয় বিজ্ঞতার নির্যাস বলে দেশের ও দলের কাছে গণ্য হতে থাকে। তাঁর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন সংশয় সন্দেহ কোন প্রশ্ন করা চলবে না। দলের একচেটিয়া অধিকার আসলে সর্বোচ্চ অধিনায়কের ব্যক্তিগত লৌহকঠিন নিরঙ্কুশ প্রাধান্যে রূপান্তরিত হল।

এর মূলে লেনিন-ট্রট্‌স্কীর অবদান কম ছিল না। লেনিন সম্বন্ধে Fainsod বলেছেন :

"... he was responsible for the germinating conception on the basis of which all intra-party opposition came to be extinguished. As the party encompassed the political life of the nation and imposed a monolithic pattern on it, the party leadership became the exclusive sanctuary of power and orthodoxy" [How Russia is Ruled : P 148]

দলের অভ্যন্তরে উপদলীয় বিরোধিতার মূলোৎপাটনের পেছনে লেনিনের অবদান কম ছিল না। একটি সর্বস্ববাদী কর্তৃত্ববাদী জবরদস্ত দল গোটা জাতির রাজনৈতিক জীবনে লৌহ-কঠিন শৃঙ্খলার বেড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেছিল। তিনি গোটা পার্টিকে একই ছাঁচে ঢালাই করার ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

লেনিনের লোকান্তরের প্রাক্কালেই তাঁর উত্তরাধিকারী কে হবেন—সে নিয়ে লড়াই শুরু হয়েছিল। স্তালিন-কামেনেভ জিনোভিভ এই তিন নেতা জোট বেঁধেছিলেন যাতে ট্রট্স্কী কোনমতেই রাজনৈতিক নেতৃত্বে এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আসীন হতে না পারেন। হৃত-স্বাস্থ্য ভগ্নোদ্যম লেনিনের ওপর যখন অকাল-মৃত্যুর কালো ছায়া বিস্তার করছে তখন থেকেই স্তালিন শুরু করেন তাঁর কুৎসিত ষড়যন্ত্র। দলের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি নিজের অনুগতদের বসিয়ে দেন। ট্রট্স্কী ১৯২৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর এই নয়া জোটের বিরুদ্ধে (Triumvirate) প্রকাশ্য সমালোচনা শুরু করেন। স্তালিন তখন দলের সাধারণ সম্পাদক। ট্রট্স্কী দলের মধ্যে সমালোচনার স্বাধীনতা পুনঃপ্রবর্তনের দাবী করেন। দলীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার হন। তখন জিনোভিভ ট্রটস্কীর গ্রেপ্তার দাবী করে বসেন। বরং চতুর স্তালিন তখন সংযমের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

স্তালিন জিনোভিভের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। দলের 'চতুর্দশ কংগ্রেসে' এ সম্বন্ধে তিনি বললেন :

"We did not agree with Zinoviev and Kamenev because we knew that a policy of chopping off (heads) is fraught with great danger for the party—that the method of chopping off and blood-letting and they did demand blood—is dangerous infection : today you chop off one (head) tomorrow another, the day after a third—what in the end will be left of the party ?" [Stalin : Concluding Remarks of the Political Report of the Central Committee.]

"ট্রট্স্কী দলের সমালোচনা করছেন—বিরোধীর ভূমিকা নিয়েছেন—অতএব তাঁকে গ্রেপ্তার করা হোক—এই দাবী আমরা মেনে নিইনি কারণ মতে না মিললেই গর্দান নেবার নীতি বিপজ্জনক নীতি। শিরশ্ছেদ ও রক্ত ঝরানোর নীতি—একবার গ্রহণ করলে তা মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির রূপ নেয়। আজ একজনের শিরশ্ছেদ—আগামীকাল অপর আর একজনের—তার পরের দিন আর একজনের এইভাবে চক্রাকারে চলতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত দলের আর অবশিষ্ট কিছু কি থাকবে ?" (স্তালিন)

স্তালিনের বক্তব্য পড়ে মনে হবে সংযম ও পরমত-সহিষ্ণুতার যেন মূর্ত প্রতীক। যে জিনোভিভ-কামেনেভ স্তালিনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন ট্রট্স্কীর বিরুদ্ধে—তাঁদের কি পরিণতি হয়েছিল তা পরে আলোচনা করব। বলশেভিক পার্টির 'ত্রয়োদশ অধিবেশনে' জিনোভিভ ট্রট্স্কী ও তাঁর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালালেন এবং প্রকাশ্য সম্মেলনে দলের সভ্যদের সামনে তাঁর অপরাধ ভুলভ্রান্তি স্বীকার করার জন্য দাবী জানাতেও দ্বিধা করেননি। জবাবী ভাষণে প্রসঙ্গক্রমে অভিযোগের উত্তরে ট্রট্স্কী বললেন :

"The party in the last analysis is always right because the party is the single historic instrument given to the proletariat for the solution of its fundamental problems. I have already said that in front of one's own party nothing could be easier than to say : all my criticisms, my state-

ments, my warnings, my protests—the whole thing was a mere mistake. I, however, comrades, can not say that, because I do not think it. I know that one must not be right aganist the party. One can be right only with the party, and through the party, for history has created no other road for the realization of what is right." (Trotsky)

শেষ বিশ্লেষণে—পার্টিই নির্ভুল—কেননা আমাদের এই দলই সর্বহারা শ্রেণীর একমাত্র হাতিয়ার যা দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী তার নানাবিধ মৌল সমস্যার সমাধান করতে পারে। আমি স্বীকারই করেছি নিজের দলের কাছে—'আমার যাবতীয় সমালোচনা, আমার যাবতীয় বিবৃতি, আমার সকল হুঁশিয়ারী, আমার সকল প্রতিবাদ সব কিছুই নিছক ভুল মাত্র'—একথা স্বীকার করে নিজের মন হালকা করার চাইতে সহজ কাজ আর কি থাকতে পারে? কিন্তু বন্ধুগণ—আমি সেকথা বলতে পারছি না—কেননা আমি মনে করি না আমার সমালোচনা, হুঁশিয়ারী, প্রতিবাদ, বিবৃতি সবই ভ্রান্তিমূলক, আমি জানি দলের কোন সভ্য 'দল ভ্রান্ত সে নিজে নির্ভুল'—এ মানসিকতাকে প্রশ্রয় দিতে পারেন না। দলের সঙ্গে ঐকমত্য হবার মধ্যেই দলের সদস্যের প্রকৃত সার্থকতা। শেষ বিচারে দলই ঠিক পথ অনুসরণ করে চলে—কারণ যা সত্য এবং সঠিক তা রূপায়ণের একমাত্র মাধ্যমই তো দল। (ট্রট্স্কী)

রুশ-বিপ্লবের অন্যতম নায়ক অনন্য প্রতিভাধর ট্রট্স্কী অত্যন্ত স্বমত-নিষ্ঠ উচ্চাভিলাষী এবং একগুঁয়েও ছিলেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় দলের সমালোচনা করে ভুল করেছেন নিজে বিন্দুমাত্র অপরাধী একথা স্বীকার করলেন না সত্যি, কিন্তু যে সব তত্ত্বকথা শুনিয়ে গেলেন তা দলের ভিতরে সদস্যদের আভ্যন্তরীণ দলীয় গণতন্ত্র, স্বাধীন মতপ্রকাশ ও মৌল শাশ্বত রাজনৈতিক অধিকারের গলার ফাঁস বলেই গণ্য হবে নিঃসন্দেহে।

'রাজনৈতিক গণতন্ত্রে' আস্থাবান কোন যুক্তিবাদী ব্যক্তিই ট্রট্স্কীর বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারবেন না। তাঁর কথার মধ্যে যুক্তি ছিল না—ছিল দলের প্রতি অন্ধ ভক্তি এবং মার্কসীয় ডায়েলেকটিকের মারপ্যাচ। 'দল নির্ভুল' সকল অবস্থাতেই? ইতিহাসের রায় কি তাই? দল তো মানুষের তৈরী। দলের সিদ্ধান্ত তো আসলে কতিপয় সদস্যের সিদ্ধান্ত। দলের সদস্যদের সিদ্ধান্ত

বিশ্লেষণ ভুল হতেই পারে—এবং ভুল হয়ও। ট্রট্স্কী কিন্তু নিজেকে বাঁচিয়ে এই ধরনের বক্তব্যের আড়ালে একটি লেনিনবাদী দলে নিজের লেনিনবাদী ভাবমূর্তিকে বাঁচিয়ে দল থেকে বিচ্ছিন্নতার ভয়ে নিজের বিবেকের বিরুদ্ধেই লড়াই করেছিলেন। তাঁর বক্তব্যে স্তালিন খুব খুশী হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে ট্রট্স্কী-বিরোধী ধর্মযুদ্ধে ট্রট্স্কীর এই বক্তব্যকে কাজে লাগিয়েছিলেন। ট্রট্স্কীর চিন্তার মধ্যেও লেনিনের মতন অনেক স্ববিরোধিতা এবং অসঙ্গতি ছিল। তিনি 'অক্টোবর-বিপ্লবের' প্রাক্কালে অথবা ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময় যে-সব আদর্শের কথা বলেছিলেন তার সঙ্গে ত্রয়োদশ সম্মেলনের এই ভাষণের মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যাবে না। রাজনৈতিক দলের অগণতান্ত্রিক আচরণ ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে দলের সদস্যদের প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ করার মৌল চিরন্তন অধিকারের বিরুদ্ধে কট্টর মার্কসবাদীরা এই যুক্তিকে মারাত্মক অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে এসেছেন সকল গণতান্ত্রিক বিরোধিতা ও মতপার্থক্য চিরতরে স্তব্ধ করার জন্য।

ভারতবর্ষে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরেও যখনই মতপার্থক্য ঘটেছে বিরোধী পক্ষকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে। দলের শাসক গোষ্ঠীই 'অভ্রান্ত' অতএব দল নির্ভুল অভ্রান্ত আর বিরোধী গোষ্ঠী ভ্রান্ত দলকে ভিতর থেকে বহিঃশত্রুর সাহায্যার্থে ও সহায়তায় দুর্বল করার ঘৃণ্য চক্রান্তে লিপ্ত বলেই প্রচারিত হয়েছে। অন্য রাজনৈতিক দলগুলিও এসব অপর একটি দলের আভ্যন্তরীণ ঘরোয়া ব্যাপার বলে মাথা ঘামায়নি। দলীয় গণতন্ত্রের (Inner Party democracy) আদর্শ বার বার লঙ্ঘিত হয়েছে সর্বহারার গণতন্ত্রের নামে।

ট্রট্স্কী নিজে ভালভাবেই জানতেন যে, তিনি যে-সব প্রশ্ন পার্টির কাছে উত্থাপন করেছিলেন প্রতিটি প্রশ্নই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক প্রশ্ন। এই সব মৌল প্রশ্নের উত্তর বলশেভিক দলের ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী যেভাবে দিয়েছে, যে-সব সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা ট্রট্স্কীর ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ বিপরীত। ভবিষ্যৎ ইতিহাস প্রমাণ করেছে ট্রট্স্কীর বহু মৌল বক্তব্যের যথার্থতা, প্রমাণ করেছে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণীও। কিন্তু ট্রট্স্কী নিজেই কি পরমত সহনশীলতার কোন উজ্জ্বল নজির রেখে গেছেন? যাঁরাই তাঁর সঙ্গে একমত হননি তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছেন লেনিনের মতন। লেনিনের সঙ্গেও তো তাঁর মতপার্থক্য হয়েছিল। আর তার জন্য চোখা চোখা

কম গালি বর্ষণ করেননি। ক্রন্দস্তাদ্-নাবিকদের ঐতিহাসিক বিদ্রোহ রক্তাক্ত পথে চরম নৃশংসতার সঙ্গে দমন করার স্বৈরতান্ত্রিক কাজে ১৯২১ সালে তিনিই কি নেতৃত্ব দেননি ? এই বিপ্লবী অভ্যুত্থানকে 'প্রতিবিপ্লব' বলে সুবিধামত চিহ্নিত করে দমন করার নামে সেদিন ট্রট্স্কীর নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল এক লোমহর্ষক নরমেধযজ্ঞ। যে-যুক্তি দিয়ে এই রক্তাক্ত দমননীতিকে তিনি সমর্থন করেছিলেন সেই একই সনাতনী যুক্তি দিয়ে ইতিহাসের মসী-কৃষ্ণ অধ্যায়গুলিতে সাম্রাজ্য-বাদীরা স্বৈরতন্ত্রী সম্প্রসারণবাদীরা অত্যাচারের রথ ছুটিয়েছেন। স্তালিন একই যুক্তি দেখিয়ে গণ-নিপীড়ন ব্যাপক হত্যা ও দমননীতি চালিয়েছিলেন। স্তালিন প্রথমে জিনোভিভ কামেনেভ-কে 'বন্ধু' হিসাবে ব্যবহার করলেন ট্রট্স্কীর বিরুদ্ধে। জিনোভিভ কামেনেভের 'বামপন্থী ভাবমূর্তি'কে কাজে লাগালেন কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরোতে নিজের সংখ্যাধিক্য বজায় রাখতে। ট্রট্স্কীকে ক্ষমতাচ্যুত ও নিরস্ত্র করার সাথে সাথেই স্তালিন পলিটব্যুরোর তথাকথিত 'দক্ষিণপন্থী' অংশের নেতা প্রতিভাধর বুখারীন, রাইকভ ও টম্স্কীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে পার্টির 'চতুর্দশ অধিবেশনে' (১৯২৫) জিনোভিভ-কামেনভকে পর্যুদস্ত করলেন। ট্রট্স্কী তার আগেই কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। যে-সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে দলের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল তা নিয়ে দেশের ভিতরে কোন তর্কবিতর্ক আলোচনাই হয়নি 'সর্বহারার গণতন্ত্রে'। 'চতুর্দশ অধিবেশনে' মিকোইয়ান-জিনোভিভ সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলেন :

"যখন জিনোভিভের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে (majority) তখন তিনি দলের মধ্যে 'লৌহকঠিন শৃঙ্খলার', 'বশ্যতা'র (subordination) পূজারী বনে যান। আর যখনই তিনি দলের ভিতরে সংখ্যালঘু হয়ে পড়েন তখনই তিনি বিরোধীর ভূমিকা নিয়ে থাকেন।" বিতর্কিত প্রশ্নগুলি নিয়ে দলের অধিবেশনের কাছে নিজেদের (জিনোভিভ-কামেনেভ) বক্তব্য পেশ করার অনুমতি চেয়েও ব্যর্থ হলেন। দলীয় গণতন্ত্রে—আর এটাই প্রচারিত হয় 'আদর্শ গণতন্ত্র' বলে—সেই ন্যূনতম অধিকারও স্বীকৃত হল না। বিরোধী কণ্ঠস্বরকে এই ভাবে স্তব্ধ করার বিরুদ্ধে আবেদন জানালেন লেনিনের সহধর্মিণী ক্রুপ্স্কায়া। তিনি বললেন :

"For us truth is that which corresponds to reality. Vladimir Ilich (Lenin) said the teachings of Marx are

invincible because they are true. And our Congress would concern itself with searching for and finding the correct line. Herein lies its task. In is wrong to reassure ourselves with the fact that the majority is always right. In the history of our party there were Congresses where the majority was not right ··the majority should not gloat in the fact that it is• the majority but should disinterestedly seek for a true decision. If it will be true it will put our party on the right path." [Quoted from : How Russia Is Ruled. : P. 141]

"মার্কসবাদীদের কাছে—যা বাস্তব তাই সত্য। লেনিন বলতেন মার্কসের উপদেশাবলী অপরাজেয়, কেননা সেগুলি সবই সত্য। আমাদের পার্টি সম্মেলনের লক্ষ্যই হবে সঠিক রাস্তা খুঁজে বার করার প্রয়াস এবং শেষ পর্যন্ত সেই সঠিক পথ খুঁজে বার করা। দলের মুখ্য কাজ সেইটাই। এটা বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই—যে দলের ভিতরে যারা সংখ্যায় বেশী তারাই ঠিক নির্ভুল পথের দিশারী। দলের সংখ্যাগরিষ্ঠরা যে সব সময় নির্ভুল নয়—তার লক্ষ্য বহন করে দলের ইতিহাস। সংখ্যাগরিষ্ঠদের এমন আত্মম্ভরিতা পেয়ে বসা কখনই উচিত নয়—যে দলের মধ্যে মাথাগুনতিতে তারাই বেশী। নিরাসক্ত নিস্পৃহ মন নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য তাদের চেষ্টা করা উচিত। সিদ্ধান্ত সঠিক হলেই দল ঠিক চলবে।" (ক্রুপস্কায়া)

এ বক্তব্য যে-কোন দেশের যে কোন গণতান্ত্রিক দলের আদর্শ বলে গণ্য হবে। ভারতের গণতান্ত্রিক জাতীয় দলগুলির বেলায়ও একথা সমধিক প্রযোজ্য। সত্য কখনই কোন দেশে কোন কালে সংখ্যার ঘাড়ে চেপে আসে না। অক্টোবর-বিপ্লবের সিদ্ধান্ত যখন নেওয়া হয় তখন কি লেনিন দলের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পেয়েছিলেন ? তিনি যখন বিপ্লবের জন্য চরম আঘাত হানার দাবী জানান তখন অধিকাংশ নেতাই তো তাঁর বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু 'মাইনরিটি'র সিদ্ধান্তই তো সেদিন গৃহীত হয়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত সংখ্যালঘিষ্ঠদের মেনে নিতে হয়। এটা রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অন্যতম মৌল নীতি। কিন্তু 'রাজনৈতিক গণতন্ত্রের' অপর একটি মৌল নীতি হল সংখ্যা-

লঘিষ্ঠদের সমর্থন পাবার ও দাবী করার অন্যতম শর্ত হল : সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন জুলুম ও স্বেচ্ছাচারিতার সহায়ক কখনই হতে পারে না। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন হওয়া চাই ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিযুক্ত।

সংখ্যাগরিষ্ঠরা যদি এই মৌল শর্ত উপেক্ষা করে ন্যায় হোক অথবা অযৌক্তিক হোক, ঠিক হোক অথবা ভুল হোক সংখ্যাধিক্যের সমর্থন আছে বলেই যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন (majority rule) দলের ওপর এবং দেশের ওপর চাপাবার চেষ্টা করেন, যদি বিরোধী সংখ্যালঘিষ্ঠদের অবহেলা ও উপেক্ষা করা হয় তাহলে সংখ্যালঘিষ্ঠ বিরোধীদের বিদ্রোহ করার অধিকার জন্মগত অধিকারে রূপান্তরিত হয়। কমিউনিস্ট মার্কসবাদী দলের ভিতরে সংখ্যাধিক্যের শাসনের নামে যেমন বিরোধীদের ওপর ষ্টিম রোলার চালান হয়ে থাকে—ভারতের মত অকমিউনিস্ট রাষ্ট্রেও 'গণতান্ত্রিক' কংগ্রেস শাসকদলেও একই পদ্ধতিতে বিরোধী গোষ্ঠীর ওপর দমন নীতির রথ ছোটান হয়ে থাকে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থ নৈতিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি একের পর এক গৃহীত হয়ে চলেছে দেশবাসীর আড়ালে ! গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, অথচ দলের সাধারণ কর্মীদের তথা নাগরিকদের অন্ধকারেই রাখা হচ্ছে। রাজনৈতিক অর্থ নৈতিক জটিল প্রশ্নগুলি নিয়ে দেশে কোন প্রকাশ্য গণতান্ত্রিক বিতর্কও নেই। দেশের বুদ্ধিজীবী আইনজীবীরা নীরব দর্শক আজ। সোচ্চার হলে ব্ল্যাক মেইলের ভয় আছে। একটা অজানা ভয় আশঙ্কা জনমানসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কমিউনিস্ট দেশগুলির ইতিহাস গভীর মনোযোগের সঙ্গে এদেশের রাজনীতির ছাত্রদের অনুধাবন করা দরকার। "জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত আমরা" এই বলে বিরোধী পক্ষের বা গোষ্ঠীর প্রতি বিদ্রূপ-নিক্ষেপের মধ্যে অসহিষ্ণু দুর্বিনীত মনোভাবই শুধু ফুটে ওঠে না, অগণতান্ত্রিক মানসিকতা সংক্রান্ত ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়ে জনমানসে। কমরেড ক্রুপস্কায়া যে 'সঠিক পথে' ও 'সঠিক সিদ্ধান্তে' পৌঁছবার জন্য মিলিত প্রয়াসের কথা তাঁর দলের সহকর্মীদের শোনালেন তার জন্য প্রতিটি দলের মধ্যে চাই গণতান্ত্রিক পরিবেশ, বাধামুক্ত আলোচনা, নির্ভীক সমালোচনা, ভিন্নমত প্রকাশের ও প্রচারের গণতান্ত্রিক অধিকার, প্রতিনিধিদের নির্বাচনের এবং দলের নেতা নির্বাচনের অবাধ অধিকার।

ট্রট্স্কী ১৯১৭ সালের বিপ্লবের অনেক আগে দলের নেতৃত্ব ও সর্বহারার একনায়কত্ব সম্বন্ধে একটি ছোট্ট মন্তব্য করেছিলেন যা থেকে পরবর্তীকালের

সোভিয়েট রাশিয়া ও সকল কমিউনিস্ট দেশের ও দলের ইতিহাস প্রমাণ করেছে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি :

"The Caucus substitutes itself for the party ; then the Central Committee for the Caucus ; and finally a dictator substitutes himself for the Central Committee." (Trotsky)

'দলের মধ্যে দলের কর্তৃত্ব দখল করে থাকে শক্তিশালী গোষ্ঠী। আবার এই গোষ্ঠীর স্থান দখল করে দলের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পরিশেষে একজন ডিক্টেটার একনায়কত্ববাদী নেতা কেন্দ্রীয় কমিটির স্থান দখল করে থাকেন।' (ট্রট্স্কী)

ট্রট্স্কী তাত্ত্বিক হিসেবে সত্য বিশ্লেষণই একসময় করেছিলেন। কিন্তু ১৯১৭ সালের অক্টোবর-বিপ্লবের পর এই নেতার কথা ও বহু কাজ এই অগণতান্ত্রিক পরিণতির সহায়ক হয়েছিল। এ ব্যাপারে একসময় তিনি বরং লেনিনকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। বিপ্লবের প্রাক্কালে ট্রট্স্কীর এক মূর্তি, অক্টোবর-বিপ্লবের সময় ও পরে Commissar of War এবং দলের অন্যতম নেতা ও লেনিনের সহযোগীরূপে তাঁর ভিন্ন উগ্রমূর্তি। আবার ক্ষমতাচ্যুত হয়ে বলশেভিক দলের ভিতরে বাইরে গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার লড়াইয়ে অপরাজেয় ক্লান্তিহীন ধৃতাস্ত্র সেনাপতির ভূমিকায় তাঁকে দেখা গেছে। কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য কি লেনিন—কি ট্রট্স্কীর কারর জীবনেই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যেও একই ধারা লক্ষ্য করা যাবে। প্রধানমন্ত্রী দলের সিদ্ধান্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছার উৎস,—দলের প্রাণসঞ্চারিণী কোন আদর্শ—বা কোন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নয়। কি কংগ্রেসের সবভারতীয় কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি (High Command), কি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি সমিতির (A. I. C. C.) সভায় প্রধানমন্ত্রী কি চান সেদিকে নজর রেখেই বক্তারা বক্তৃতা করেন। 'Substitutism'-এর থিয়োরী—যার নিন্দ ট্রট্স্কী বলশেভিক দল সম্বন্ধে করেছিলেন—সেটা নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস সংগঠন সম্বন্ধেও সমভাবেই প্রযোজ্য। শেষ পর্যন্ত একজন ক্ষমতাশালী নেতা বা নেত্রী প্রকারান্তরে নিজের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির স্থান দখল করে থাকেন। এইভাবেই একনায়কত্ব দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। নেতৃত্বের সমালোচনা দলদ্রোহিতার সমতুল্য। দলের ভিতরে স্বাধীনভাবে প্রতিনিধি নেতা নিবাচনের অবাধ অধিকারও নেই। খোলা মন নিয়ে যাঁরা বিচার করবেন, দেশের কল্যাণ ও

সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের মহান ব্রত নিয়ে যাঁরা কাজ করবেন, গণতান্ত্রিক আদর্শকে যাঁরা সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করতে কৃতসঙ্কল্প ভারতের রাজনীতির এই অশুভ ধারা তাঁদের দৃষ্টিকে কখনই ফাঁকি দিতে পারবে না।

যে-কামেনেভ ট্রট্স্কীকে তাঁর স্বাধীন মতপ্রকাশ ও প্রচারের স্বাধীনতা ও কঠোর সমালোচনার নিন্দায় মুখর হয়ে বলশেভিক দলের মধ্যে শৃঙ্খলাবাদী কর্তৃত্ববাদীদের হাত শক্তিশালী করার জন্য 'ত্রয়োদশ কংগ্রেসে' "ভুল" স্বীকার করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিলেন ইতিহাসের নির্মম পরিহাস সেই কামেনেভকে পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসে (১৯২৭) ট্রট্স্কীর ঢং-এ বক্তৃতা করে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জয়গান গাইতে হয়েছিল :

"I come to this tribune with only one aim, to find a path of reconciliation between the opposition and the party (voices : "A lie, you're late.") the battle in the party for the last two years has attained such a state of bitterness as to place before all of us a choice between two roads. One of these roads is that of *Second Party*. That road under the conditions of dictatorship of proletariat would be fatal for the revolution.. that road is closed to us, forbidden and excluded by the whole system of our ideas, by all the teachings of Lenin on the dictatorship of the proletariat. There remains consequently, the second road··· This road means that we submit entirely and completely to the party. We choose that road···To take that road means that we submit to all the decisions of the Congress··· But in addition if we are to renounce our point of view, that would not be Bolshevik. This demand, comrades, for the renunciation of one's opinions has never before been posed in our party···If I were to come here and declare : I renounce the views that I printed two weeks ago in my theses, you would not believe me ; it would be

hypocrisy on my side and such hypocrisy is unnecessary." [Kamenev]

"আমি এই সর্বোচ্চ আদালতে (পার্টি কংগ্রেস) এসেছি একটি উদ্দেশ্য নিয়ে—পার্টি ও বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় সাধন। ('ভাঁহা মিথ্যে কথা—আপনি দেরীতে উপলব্ধি করেছেন'—প্রতিনিধিদের থেকে কণ্ঠস্বর) বিগত দু' বছর ধরে পার্টির মধ্যে যে-বিতর্ক চলে আসছে তা এমনিই তিক্ত রূপ নিয়েছে যে, মনে হচ্ছে যেন দলের সভ্যদের কাছে দুটি পথ খোলা আছে: একটি পথ হল দ্বিতীয় দলের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সর্বহারার একনায়কত্বে সে-পথ কখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সেটা হবে বিপ্লবের পক্ষে আত্মঘাতী—সে পথ লেনিন-মার্কসের আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং সর্বৈব নিষিদ্ধ। সুতরাং আমাদের সম্মুখে আর একটিমাত্র পথই খোলা আছে: সে পথ হচ্ছে দলের মতের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা। আমরা (অর্থাৎ বিরোধী বলে পরিচিতরা) সেই আত্ম-সমর্পণের পথই বেছে নিচ্ছি। কিন্তু সেই সঙ্গে যদি আমাদের নিজেদের মতকে 'ভ্রান্ত' বলে ঘোষণা করে নিজেদের আত্ম-ধিক্কার দিতে হবে বলে দাবী করা হয় দলের পক্ষ থেকে তাহলে সেটা হবে বলশেভিক নীতি-বিরুদ্ধ। এ প্রশ্ন অতীতে দলের কাছে বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়নি। তবু আজ যদি আমাকে ঘোষণা করে বলতে বলা হয় দু' সপ্তাহ আগে আমি পুস্তিকা বা প্রবন্ধে যা বলেছি—তা ভুল—তাহলে কি কেউ আমাকে বিশ্বাস করবেন? এই ধরনের স্বীকারোক্তি হবে নিছক ভণ্ডামী। আর এই ধরনের আত্ম-প্রবঞ্চনার প্রয়োজনই বা কি?"

তাই ট্রট্স্কীর মত কামেনেভও বুঝিয়ে দিলেন যে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলের মধ্যে (১) বিরোধিতার কোন স্থান নেই, (২) দেশে দ্বিতীয় কোন দল প্রতিষ্ঠা মার্কসীয় অথবা লেনিনবাদী চিন্তা-আদর্শ বিধ্বংসী; অতএব সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। (৩) দলের সভ্যদের পবিত্র কর্তব্য দলের অভ্রান্ততা প্রমাণ করার জন্য দলের মত ও সিদ্ধান্তের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। ট্রট্স্কীর মত কামেনেভও নিজের মত ও বক্তব্যকে ভ্রান্ত বলে প্রকাশ্যে নিন্দা করার বিরুদ্ধে ছিলেন। দুই নেতার ভাষা ভিন্ন, তবে বক্তব্যের সুর অভিন্ন। কামেনেভ, জিনোভিভ, রাইকভ, টম্স্কী যদি 'ত্রয়োদশ কংগ্রেসে' স্তালিনের পক্ষে না গিয়ে ট্রট্স্কীকে সমর্থন করতেন তাহলে ইতিহাসের মোড় হয়ত ঘুরে যেতে পারত। আবার প্রমাণ হল ইতিহাস বড়ই নির্মম শিক্ষাদাতা। কামেনেভের বক্তব্যেও

স্তালিন সন্তুষ্ট হননি। শেষ পর্যন্ত বুখারীন, কামেনেভ, জিনোভিভ, রাইকভ, টম্স্কী প্রমুখ প্রথম সারির নেতারা দলের নেতৃত্বের কাছে নিঃসর্ত আত্মসমর্পণের পথ বেছে নিলেন। অবশ্য ট্রট্স্কী ও তাঁর অনুগামীরা সেই অসম্মানের পথ বেছে নেননি। ১৯২৭ সালের ২৩শে অক্টোবর ট্রট্স্কী এবং জিনোভিভ দলের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বহিষ্কৃত হলেন অতি ঘৃণ্য মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে। স্তালিনবাদী কায়দায় এই নেতাদের ব্ল্যাকমেইল করা হল—গোয়েন্দা পুলিশের সাজানো গোপন রিপোর্টের ভিত্তিতে: এঁরা নাকি জারতন্ত্রী ও 'হোয়াইট গার্ডিস্টদের' সঙ্গে সহযোগিতা করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে স্তালিন ঘোষণা করলেন, বলশেভিক পার্টির ভিতরে বুখারীন, রাইকভ, টম্স্কী একটি দক্ষিণপন্থী চক্রান্তের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। অপরাধ তিনি তৎকালীন 'পার্টি লাইনের' সমালোচনা করে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ঐ বছরই এপ্রিল মাসে বুখারীনকে কমিণ্টার্ণের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। টম্স্কীকে জুন মাসে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব থেকে অপসারণ করা হল। পরে ১৭ই নভেম্বর ঐ বছর বুখারীনকে পলিট্ ব্যুরো থেকে বহিষ্কার করা হল। এইভাবে এক এক করে দলের সকল নেতাদের বহিষ্কার করে স্তালিন নিজের পথ নিষ্কণ্টক করলেন।

রাজনীতিতে একেই তো ফ্যাসিবাদ বলে আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। 'সর্বহারার গণতন্ত্রের' উৎকর্ষতা কি—এইভাবে ভিন্নমতাবলম্বীদের উৎখাত করা ? এর পর থেকে দলের অভ্যন্তরে ডান-বাম দ্বন্দ্ব-তত্ত্ব লোপ পেল। সকল সিদ্ধান্তই হত সর্বসম্মত। বিনা বাধায়—বিনা সমালোচনায় সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যেই কি 'আদর্শ গণতন্ত্রের' বীজ লুকোনো থাকে ? বুখারীণ, কামেনেভ, রাইকভ, জিনোভিভ—টুখাচভ্স্কী (লাল ফৌজের সেনাপতি) এঁদের মিথ্যা সাজানো রাষ্ট্রদ্রোহিতার মোকদ্দমায় অভিযুক্ত করে স্তালিনের জহ্লাদরা গুলি করে হত্যা করে। এঁরা সবাই রুশ বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন—দেশের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁরা দেশের দুশমন—সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দালাল—ক্রীড়নক বলে মিথ্যা মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হয়ে—দোষ "স্বীকার" করলেন। অদৃষ্টের পরিহাসই বটে।

(গ) সর্বহারার গণতন্ত্র

রাজনৈতিক বিরোধিতার অধিকার ও বহু-দলীয় সমাজতন্ত্র

১৯০৪ সালে ট্রট্স্কী একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পুস্তিকা প্রকাশ করেন 'Our Political Tasks' এই শিরোনামায়। এ পুস্তিকায় তিনি লেনিনের কঠোর সমালোচনা করতে ছাড়েননি। পেশাদারী বিপ্লবীদের দিয়ে বিপ্লবী দল গড়া এবং সেই দলের নেতৃত্বে বিপ্লব পরিচালনায় লেনিনবাদী তত্ত্বকে তিনি জ্যাকোবিন-পন্থী অ-মার্কসবাদী এবং র‍্যাডিক্যাল বুর্জোয়াপন্থী বলে সমালোচনা করেন। "What is to be Done?" (১৯০২) [হোয়াট ইজ্ টু বী ডান্]—পুস্তিকায় লেনিন যেভাবে স্বতঃস্ফূর্ত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অনাস্থা প্রকাশ করেছিলেন—তাতে ট্রট্স্কী সন্তুষ্ট হ'তে পারেননি। ট্রট্স্কী সে সময় বলতেন কেবলমাত্র বুর্জোয়া রাজনীতিবিদরাই শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি এত আস্থাহীন হতে পারেন। পেশাদারী বিপ্লবীদের পরিচালনায় 'সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব' (Dictatorship of the Proletariat) আসলে সর্বহারাশ্রেণীর ওপর প্রতিষ্ঠিত একনায়কত্বে পরিণত হবে এ আশঙ্কা সে সময় অনেকে প্রকাশ করেছিলেন।

গোটা দলকে একটি বিশেষ ছাঁচে ঢেলে ঐক্যবাদী সম-মতাবলম্বী (uniform party) করে গড়ে তোলার বিরুদ্ধে তিনি এক সময় সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করেন। সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব কালে (Dictatorship of Proletariat) ভিন্ন মতাবলম্বীদের সহ-অস্তিত্বের (co-existence of competing opinions) প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সুতরাং একটি বিপ্লববাদী মার্কসিস্ট দলের মধ্যে নীতিগতভাবে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর সহ-অস্তিত্ব শাস্ত্র-নিষিদ্ধ একথা বলার পেছনে কি যুক্তি আছে? 'সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব' এবং 'সর্বহারাশ্রেণীর ওপর চাপান একনায়কত্ব' দুটো এক জিনিস নয়। প্রকৃত সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বে রাজনৈতিক কাঠামোটা কি রকম হবে? ট্রট্স্কীর বক্তব্যটা উল্লেখ্য। দলের সবাইকে সব সময়ই একই সুরে কথা বলতে হবে কোন্ যুক্তিতে? মতপার্থক্য তুলে ধরার ও প্রচারের রাজনৈতিক অধিকার নিষিদ্ধ হবে কোন্ যুক্তিতে? ট্রট্স্কী বলেছিলেন:

"The task of the new regime will be so complex that they cannot be solved otherwise than by way of competition between various methods of economic and political construction, by way of long 'disputes', by way of a systematic struggle not only between the socialist and capitalist worlds, *but also between many trends inside socialism*, trends which will inevitably emerge as soon as the proletarian dictatorship poses tens and hundreds of new . problems. No strong dominating organization ··· will be able to suppress these trends and controversies. A proletariat capable of exercising its dictatorship over society *will not tolerate any dictatorship over itself* ··· the working class will undoubtedly have in its ranks quite a few political invalids ·· and much ballast of obsolescent ideas which it will have to jettison. In the epoch of its dictatorship, as now, it will have to cleanse its mind of false theories and bouregeois experience and to purge its ranks from political phrase-mongers and backward looking revolutionaries. But this intricate task cannot be solved by placing above the proletariat a few well-picked people······or one person invested with the power to liquidate and degrade." [Our Political Tasks—By L. Trotsky]

"নূতন শাসন-ব্যবস্থাকে অত্যন্ত জটিল সমস্যাদির সম্মুখীন হতে হবে। আর এইসব সমস্যার সমাধান কখনই সম্ভব নয় যদি না বিভিন্ন অর্থ নৈতিক-রাজনৈতিক মত ও ব্যাখ্যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে। শুধু যে সমাজবাদী ও পুঁজিবাদী দুনিয়ার মধ্যে নিরন্তর সংঘাত চলবে তাই নয়, সমাজবাদী চিন্তার মধ্যে যে বিভিন্ন ধারা ও চিন্তা থাকে তাদের মধ্যেও নিরন্তর সংঘাত চলতে থাকবে। এইসব সংঘাত অনিবার্যভাবেই দেখা দেবে যখন সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব অগণিত সমস্যার সম্মুখীন হবে। উদ্ধত প্রভুত্ববাদী কোন জবরদস্ত

রাজনৈতিক দলীয় সংগঠন এইসব বিভিন্ন প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চিন্তাধারাকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। উন্নত সচেতন সর্বহারাশ্রেণীই সমাজের ওপর একনায়কত্ব কায়েম করতে সক্ষম এবং এই ধরনের সচেতন সর্বহারাশ্রেণী কখনই কোন একনায়কত্বকেই তার নিজের ওপর প্রভুত্ব করতে দিতে পারে না। এ ধরনের কোন চেষ্টাকে শ্রমিকশ্রেণী বরদাস্তই করবে না। ভুলে গেলে চলবে না যে, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বেশ কিছু অনুপযুক্ত অকেজো রাজনৈতিক ব্যক্তি থেকে যায় এবং এমন সব উদ্ভট সেকেলে ভাবধারা থেকে যায় যা বর্জন করা দরকার। একনায়কত্বের যুগে মিথ্যা ভ্রান্ত বিভিন্ন থিয়োরী ও বুর্জোয়া চিন্তাধারার শিকার যাতে শ্রমিকশ্রেণী কখনই না হয় সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে। বড় বড় রাজনৈতিক স্লোগান কপ্চান যাদের সার—যে-সব বিপ্লবীরা সম্মুখের দিকে তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে পিছনে ফেলে-আসা পরিত্যক্ত ভাবধারাকে আঁকড়িয়ে রাখেন—তাঁদের দল থেকে হঠান দরকার। কিছু বাছাই করা মানুষকে সর্বহারাশ্রেণীর মাথার ওপর অভিভাবক করে বসিয়ে দিলেই দেশের বিভিন্ন জটিল সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব নয়। আর সমস্ত ক্ষমতা ও প্রভুত্বের অধিকারী একজন নায়ককে সকলের ওপর বসিয়ে দিয়ে বিপক্ষদের নির্মূল ও খর্ব করবার ব্যবস্থা করে দিলেও সমস্যার সমাধান হবে না।”

এ কথাগুলি বিপ্লবী নেতা ট্রট্স্কীর। সুদূর-প্রসারী রাজনৈতিক সম্ভাবনার ভবিষ্যদ্বাণীর নির্ভুল ইংগিত এই কথাগুলির মধ্যে ছিল। এই কথাগুলি খুব সংক্ষেপে তাঁর গভীর ও অতি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করছে বলা যেতে পারে। ট্রট্স্কী তাঁর 'Our Political Tasks'—পুস্তিকায় লেনিনের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। সত্য কথা বলতে কিন্তু তিনি দ্বিধা করেন নি যদিও সেদিন লেনিন ট্রট্স্কীকে কাছে টেনে এনেছিলেন তাঁর প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়ে।

ট্রট্স্কীর এই রচনা পড়লে বোঝা যায়—একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মূল প্রশ্নগুলি নিয়ে বহুবিধ ব্যাখ্যা থাকতে পারে আর সেটা খুব স্বাভাবিক। এই বহুবিধ ব্যাখ্যার মধ্যে একটা সুস্থ প্রতিযোগিতা ("Competition") থাকবে। এই চিন্তা ও কর্মসূচীর প্রতিযোগিতা চলতে দেওয়া উচিত—দেশের জটিল মৌল সমস্যাগুলির সমাধানের স্বার্থেই। সমাজ-

তান্ত্রিক চিন্তাধারা একটা বাঁধা-ধরা পূর্ব-নির্ধারিত স্ট্যাণ্ডার্ড ফর্মুলা নয় বা ক্রেমে বাঁধা একটা ছবিও নয় বা নির্দিষ্ট কোন মডেলও নয়। তাহলে সমাজতন্ত্রেরও একাধিক ব্যাখ্যা থাকবে, আর সেই ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ অনুযায়ী লক্ষ্যে পৌছুবার পথও ভিন্ন হতে পারে। চিন্তা ও মতবাদের প্রতিযোগিতা দলের ভিতরে একাধিক গোষ্ঠীর (groups or factions) ভিত্তি হবে। একই যুক্তিতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকতে পারে। কোন শাস্ত্রীয় (মার্কসীয় শাস্ত্র) বাধা নেই। ট্রট্স্কীর এই বক্তব্য একদলীয় একনায়কত্বের মূলে প্রচণ্ড আঘাত বলেই রাজনীতির ছাত্ররা মনে করবেন নিঃসন্দেহে তাঁর এই বক্তব্যের মধ্যে বহুদলীয় সমাজতন্ত্রের বীজ লুকানো ছিল (Multi-Party Socialism)।

শ্রমিক বা মেহনতী শ্রেণীকে অত্যন্ত রাজনীতি-সচেতন ও শ্রেণী-সচেতন হতে হবে। এই জন্যও তো প্রয়োজন দলের মধ্যে এবং বাইরে অপ্রতিহত রাজনৈতিক আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক (Public debate)। নেতাদের বক্তব্য, বিশ্লেষণ বা বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিনা প্রশ্নে বিনা বিচারে অভ্রান্ত সত্য বলে মেনে নিলে শ্রমিকশ্রেণী সচেতনতা লাভ করবে কি করে ? বুর্জোয়া দলে কর্মীদের 'স্বাধীনতা' থাকে না, প্রতিভা বিকাশের অবাধ সুযোগ থাকে না, নীচের তলার প্রতিভাবান কর্মীরা পিছনের সারিতেই বিস্মৃত অপরিচিত হয়েই পড়ে থাকে। কিন্তু একটি 'বিপ্লবী' "শ্রেণী সচেতন" সমাজতান্ত্রিক দলে তাত্ত্বিক পরিস্থিতিটা তো ভিন্ন। কর্মীর সবচেয়ে বড় সম্পদ তার 'স্বাধীনতা', নির্ভয়ে নেতাদের মুখ না চেয়ে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক জটিল (complex) প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে নিজ নিজ ব্যাখ্যা (construction) তুলে ধরা এবং প্রচার করা। নিজেদের মনোমত যোগ্য গুণী ব্যক্তিদের দলের বিভিন্ন কমিটিতে বিভিন্ন পদে নির্বাচিত করার স্বাধীনতা থাকা চাই।

জার্মান কমিউনিস্ট নেত্রী রোজা লুক্সেমবুর্গের মন্তব্যটা স্মর্তব্য। বিপ্লবের প্রতি চিরনিবেদিতা এই মহীয়সী নেত্রী ট্রট্স্কীর একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করে লেনিন-ট্রট্স্কীর বিপরীত আচরণের সমালোচনা করেছিলেন। ট্রট্স্কীর উক্তি : "Thanks to the open and direct struggle for governmental power, the labouring masses accumulate in the shortest time a considerable amount of political experience and advance

quickly from one stage to another of their development."
প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে মেহনতী জনগণ সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে বিপুল রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে এবং উন্নয়নের একটা স্তর থেকে আর একটা স্তরে দ্রুত এগিয়ে যায়।

এবার লুক্সেমবুর্গ বলছেন :

"Here Trotsky refutes himself and his own friends. Just because this is so, they have blocked up the function of political experience and the source of this rising development by their suppression of public life ! Or else, we would have to assume that experience and development were necessary up to seizure of power by the Bolsheviks, and then having reached their highest peak became superfluous thereafter." (Lenin's Speech : Russia is won for Socialism !!!)

"এখানে ট্রট্স্কী নিজের ও তাঁর বন্ধুদের খণ্ডন করছেন। মেহনতী জনসাধারণ এই বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে বলেই—ঠিক সেই কারণেই ট্রট্স্কী ও তাঁর বন্ধুরা সেই রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার প্রস্রবণকে অবরুদ্ধ করেছেন। মেহনতী শ্রেণীর দ্রুত উন্নতির উৎস-দ্বার রুদ্ধ করা হয়েছে দমন নীতি দ্বারা অথবা ধরে নিতে হবে মেহনতী শ্রেণীর এই বিপুল অভিজ্ঞতা ও অগ্রগতির প্রয়োজন বলশেভিক দল কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত—এবং এই ক্ষমতা দখলের পর মেহনতী শ্রেণীর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা—দ্রুত ক্রমবিকাশ—এইসব তত্ত্ব কথা—একান্তই অসার অপ্রয়োজনীয় বাগাড়ম্বর।" (লেনিন নিজেই এক ভাষণে ১৯১১ সালের বিপ্লবের পর বলেছিলেন—রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে !)

লুক্সেমবুর্গ বলেছিলেন ঐ একই রচনায় :

"Socialism in life demands a complete *spiritual transformation* in the masses degraded by centuries of bourgeois class rule. Social instincts in place of egotistical ones, mass initiative in place of inertia, *idealism* which conquers all suffering etc. etc."

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হল যে-জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসনে-শোষণে অপমানিত ও অপদস্থ হয়ে এসেছে তাদের সম্পূর্ণ নৈতিক রূপান্তর সাধন। ব্যক্তিগত আত্মম্ভরিতা অহংকারের জায়গায়—সামাজিক সহজাত আবেগ ও প্রবৃত্তি স্থান পাবে, জড়তার স্থান দখল করবে গণ-প্রয়াস, আর চাই একটা জলন্ত আদর্শবাদ-(Idealism)—যা মানুষকে সকল দুঃখ-কষ্ট উপেক্ষা করে এগিয়ে চলতে অনুপ্রেরণা জোগাবে। কেউই লেনিনের চেয়ে এইসব প্রয়োজনীয়তা বেশী বোঝেন না সত্যি কিন্তু "লেনিনের পথ—সেই লক্ষ্য থেকে সরে যাচ্ছে···"he (Lenin) is completely mistaken in the means he employs. Decrees, dictatorial force of the factory overseer, draconic penalties, rule by terror—all these things are but palliatives. The only way to a rebirth is the school of public life itself, the most unlimited, the broadest democracy and public opinion It is rule by terror which demoralizes."

লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য যে সব পথ লেনিন অবলম্বন করেছেন সেগুলো ভ্রান্ত। ডিক্রী বা আইনজারী, কলকারখানার কর্তৃপক্ষ প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা অর্পণ, অতি নিমম কঠোর শাস্তি-ব্যবস্থা, সন্ত্রাসবাদী শাসন-ব্যবস্থা—এগুলি আংশিক সাময়িক উপশমকারী কতগুলি ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু গোটা জাতির পুনর্জন্ম লাভ সম্ভব প্রকাশ্য উন্মুক্ত জনজীবনের অভিজ্ঞতার পাঠশালায়--উদারতম—বিস্তৃততম গণতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে—এবং সজাগ জনমতের কামারশালায়। যে-শাসনব্যবস্থার ভিত্তি ভীতি-প্রদর্শন ও সন্ত্রাস-সৃষ্টি তা জাতিকে পঙ্গু করে দেয়! বিধিনিষেধ, নিয়ন্ত্রণ সন্ত্রাসের শৃঙ্খলে গণতন্ত্র জনমত—গণ-অভিজ্ঞতাকে বাঁধা চলবে না।

লেনিন-ট্রট্স্কী প্রকাশ্য গণভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সংসদ বা পরিষদে আস্থাবান ছিলেন না। তাঁরা "সোভিয়েট ব্যবস্থা"র (পঞ্চায়েত ব্যবস্থা) বিশ্বাসী। এইসব 'সোভিয়েট'গুলি জনগণের প্রকৃত পরিষদ। কিন্তু দেশে যদি দমন-নীতি নিপীড়ন চলে তাহলে সোভিয়েটগুলিও পঙ্গু হয়েই রইবে! "But with the repressions of political life in the land as a whole life in the Soviets

must also become more and more crippled." (Rosa Luxemburg)

এই মহীয়সী মার্কসবাদী নেত্রীর আদর্শোজ্জ্বল হুঁশিয়ারীগুলি সর্বকালের আদর্শবাদী মানুষকে অন্ধকারের মধ্যে পথ দেখাবে—তাঁর কথাগুলি সর্বদেশের গণতন্ত্রীদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে রইবে। মার্কসবাদীরা কি ইউরোপে—কি ভারতবর্ষে রোজা লুকসেমবুর্গের রচনা পড়েন না—প্রচারও করেন না। এটা খুবই দুঃখজনক। তিনি আরও বলেছেন :

"Without general elections, without *unrestricted freedom* of press and assembly, without a *free struggle of opinion*, life dies out in every public institution, becomes a mere semblance of life, in which only the bureaucracy remains as the active element. Public life gradually falls asleep, a few dozen party leaders of inexhaustible energy and boundless experience direct and rule. Among them only a dozen of outstanding heads do the leading and an elite of the working class is invited from time to time to meetings where they are to applaud the speeches of the leaders and to approve proposed resolutions unanimously—at bottom these are a *clique affair*—a dictatorship to be sure, not the dictatorship of the proletariat, however, but a dictatorship in the bourgeois sense, in the sense of the rule of the Jacobins...Such conditions must invariably cause centralization of public life, attempted assassinations, shooting of hostages etc."

"স্বাধীন সাধারণ নির্বাচন, নিরঙ্কুশ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জনসমাবেশের স্বাধীনতা, স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার ব্যতিরেকে প্রতিটি জনপ্রতিষ্ঠানের জীবনযাত্রা শুষ্কপ্রায় হয়ে ওঠে—জীবন্মৃত হয়ে পড়ে। আমলাতন্ত্রই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। জনজীবনের গতি-উদ্দাম স্তব্ধ হয়ে আসে। কয়েক গণ্ডা বিপুল অভিজ্ঞতা এবং প্রচণ্ড উদ্যোগী নেতা দেশকে ও দলকে পরিচালিত করেন। তাঁরাই দেশের প্রকৃত শাসক হয়ে দাঁড়ান। এই কয়েক ডজন নেতার মধ্যে

থেকে আবার কয়েকজন মাথা-ওয়ালা নেতা তাঁদের ওপর খবরদারী করে থাকেন। আর শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে থেকে বাছাই করা ওপরতলার পোশাকী নেতারা প্রতিনিধিরূপে সভা-সমিতিতে আমন্ত্রিত হন—হাততালি দিয়ে নেতাদের অভিনন্দন জানাবার জন্য এবং বিনা বিতর্কে ঐকমত্য হয়ে—বিনা প্রতিবাদে সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করার জন্য। এটাকে সর্বহারার একনায়কত্ব বলা চলে না কখনই। রোজা লুকসেমবুর্গ একে একটা "Clique affair" বলে বর্ণনা করেছেন। এ শাসন কতিপয় চক্রান্তকারীর গোষ্ঠী শাসন মাত্র। যেন 'জ্যাকোবিনদের' শাসন। ট্রটস্কীও তাঁর Our Political Tasks—রচনায় "Jacobinism" এবং Marxism-এর মধ্যে একটিকে বেছে নেবার কথা বলেছিলেন। মার্কসবাদ-এ জ্যাকোবিন-সুলভ অসহিষ্ণুতা ও অন্ধ গোঁড়ামির স্থান নেই। লেনিনের মধ্যে সেই অসহিষ্ণুতা প্রাধান্য পাচ্ছিল দেখে ট্রটস্কী তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

রোজা লুক্‌সেমবুর্গের এই কথাগুলি ভারতের গণতান্ত্রিক জাতীয় দলগুলির ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। দেশের সর্বত্র একটা আতঙ্ক, অজানা ভয়, পুলিশী সন্ত্রাসের ভ্রূকুটি। কোন নাগরিকের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। এই ভয়-আতঙ্কের পরিবেশে গণতন্ত্রের পরীক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য। শাসকদলের বিরোধিতা যেন দেশদ্রোহিতার সমতুল্য—যেমনটি হয়েছে রাশিয়ায় চীনে কিউবায় যে কোন কমিউনিস্ট দেশে—এই অস্বস্তিকর অস্বাস্থ্যকর অবস্থাকে প্রশ্রয় দিয়ে আসছে—দেশের কিছু বড় বড় সংবাদপত্রও। ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বিধানসভা ভারতের লোকসভায় শোষিতের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয় কতটুকু? সংখ্যাগরিষ্ঠের দুর্মদ রথের চাকার তলায় গণ-আকাঙ্ক্ষা পদেপদে পিষ্ট হয়। এদেশের বুদ্ধিজীবীদের রোজা লুকসেমবুর্গের সঙ্গে গলা মিলিয়ে নির্ভয়ে বলতে হয়:

দেশে যদি স্বাধীন বাধাহীন নির্বাচনের ভিত্তিতে দেশের বিধানসভা লোকসভা ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির জন-প্রতিনিধি নির্বাচিত না হন—দেশে যদি মত প্রকাশের সমালোচনার অবাধ স্বাধীনতা না থাকে—যদি সংবাদপত্রের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা না থাকে—অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অবাধ সুযোগ ও অধিকার না থাকে তাহলে জন-জীবন তিলে তিলে শুকিয়ে যাবে। ক্লীতকায় ঔদাসীন্য সকল অপমান অবিচার উৎপীড়ন সয়ে যাবার কুৎসিত

মানসিকতা গণ-মানসকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। দেশে নেতা বা কতিপয় নেতার মতামত থাকবে—দলের নামে ছোট্ট গোষ্ঠীর চাপিয়ে দেওয়া মতামত থাকবে—শুধু থাকবে না জনসাধারণের মতামত (Public opinion)।

মার্কসীয় দর্শনে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র একপার্টি দ্বারা শাসিত হবে এমন শাস্ত্রীয় ইনজাঙশন নেই। লেনিনও সুস্পষ্টভাবে এরূপ কোন ফারমান জারী করে যাননি। অবশ্য লেনিনের বহু জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে পরস্পর-বিরোধী ও সংগতিবিহীন উক্তি আছে। এবার খ্যাতনামা চিন্তাশীল ফরাসী কমিউনিস্ট নেতা গ্যারাদির উক্তি তুলে ধরা যাক। অবশ্য গ্যারাদির মননশীলতা ও স্বাধীন চিন্তার জন্য খেসারত দিতে হয়েছে—তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয় কিছুকাল আগে। গ্যারাদি দেখিয়েছেন যে, মার্কসীয় শাস্ত্র একথা বলে না যে দেশ সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই করবে সেদেশে সমাজতন্ত্রের সাফল্যের জন্য একটিমাত্রই রাজনৈতিক দল থাকবে। এ ব্যাপারে তিনি লেনিনের বক্তব্যও উদ্ধৃত করেছেন নিজের বক্তব্য সমর্থন করতে গিয়ে। তিনি বলেছেন:

"...the principles of Marxism do not necessarily imply either that:

the existence of only one party is a necessary precondition for the construction of socialism; or that the dictatorship of the proletariat must of necessity be exercised through the Communist Party; or lastly that the socialist revolution necessarily postulates the limitation of the political rights of the bourgeoisie once the latter have lost their economic privileges." [The Turning Point of Socialism: By Roger Garaudy: P. 79]

অর্থাৎ:

(১) দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম সর্ত একপার্টি শাসনব্যবস্থা নয়, অথবা

(২) সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমেই পরিচালিত হবে এমন কথাও মার্কসবাদ বলে না, অথবা

(৩) বুর্জোয়া শ্রেণী তার অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বিপ্লবোত্তর কালে বিপ্লবী সরকার কর্তৃক বঞ্চিত হবার পর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের

জন্য বুর্জোয়া শ্রেণীকে রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে হবে—মার্কসবাদ একথাও বলে না।

রোজার গ্যারাদির এই তিনটি উক্তিই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে ধর্মতত্ত্ব-রূপে প্রচলিত মতবাদের মারাত্মক পরিপন্থী। মার্কসবাদীরা একথা শুনে চমকিয়ে উঠবেন। গ্যারাদি আরও বলেছেন রাশিয়ায় স্তালিনযুগে দেখান হয়েছে কাজের দ্বারা (১) কঠোর একপার্টি শাসনব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য, (২) সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব—তো আসলে শাসকদল কমিউনিস্ট পার্টিরই একনায়কত্ব—পার্টি একনায়কত্বের মধ্যে দিয়েই তো মেহনতী শ্রেণীর একনায়কত্ব রূপ পরিগ্রহ করে থাকে; (৩) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের জন্য শ্রমিক শ্রেণী ছাড়া অন্য শ্রেণীকে সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে হবে। গ্যারাদি বলেছেন এই ধারণার সঙ্গে তত্ত্বের কোনই সম্পর্ক নেই। অবশ্য রাশিয়ায় বিশেষ পরিস্থিতিতে যা অনুসৃত হয়েছে তাকে পৃথিবীর কাছে সমাজতন্ত্রের জন্য মডেল বলে চালানোর চেষ্টা ভুল। তিনি বলেছেন "To Canonize these laws as necessary and universal is to substitute the thought Stalin for that of Lenin."

বিপক্ষ দলের ভোট এবং অন্যান্য রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখার প্রশ্নে গ্যারাদি লেনিনের উক্তির আশ্রয় নিয়ে নিজের প্রতিপাদ্য বিষয়কে জনসমক্ষে খাড়া করেছেন:

"...the question of depriving the exploiters of the franchise is a purely Russian question...One must approach the question of restricting the franchise by studying the *specific conditions* of the Russian revolution and the *specific* path of its development...It would be a mistake however, to guarantee in advance that the impending proletarian revolutions in Europe will all, or the majority of them be necessarily accompanied by restriction of the franchise for the bourgeoisie." [The Proletarian Revolution And the Renegade Kantoky :—Lenin.]

"শোষকশ্রেণীকে ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রশ্নটি একটি সর্বদেশের জন্য প্রযোজ্য সার্বজনীন প্রশ্ন নয়—এটা সম্পূর্ণ রাশিয়ার নিজস্ব আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নটি অর্থাৎ বিরোধী শক্তিকে ভোটের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার প্রশ্নটিকে বিচার করার আগে দেশের বিশেষ পরিস্থিতির কথা ভেবে দেখতে হবে—কি বিশেষ পরিস্থিতিতে রুশ বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল—রাশিয়ার অগ্রগতির জন্য কোন্ বিশেষ রাস্তা অনুসরণ করা হয়—তা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। এটা ভুল হবে যদি আগে থেকেই ধরে নেওয়া হয় ইউরোপের অন্যান্য সকল দেশে অথবা বেশীর ভাগ দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সর্ত হিসেবে বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে বা তাদের রাজনৈতিক অধিকার নিয়ন্ত্রণই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সুনিশ্চিত সোপান।"

একথাগুলো কিন্তু লেনিনেরই। আর দেশের অভ্যন্তরে—শাসক কমিউনিস্ট দলের অভ্যন্তরে ভিন্নমত বা বিরুদ্ধ মতের সহ-অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা স্তালিনের হাতে ট্রট্স্কীর মর্মান্তিক আত্মদানের বহু বছর পরে তুলে ধরেছেন আরও জোরালোভাবে একজন চিন্তাশীল ফরাসী কমিউনিস্ট নেতা রোজার গ্যরাদি।

লেনিন 'democratic centralism' 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণের' নীতির মুখ্য প্রবক্তা ছিলেন। রুশ বিপ্লবে যে-সব বিভিন্ন সারির প্রতিভাধর বর্ণাঢ্য নেতা এসেছিলেন—তাঁরা শুধু যে খুব চিন্তাশীল ছিলেন তাই নয় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি তাঁদের ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ। গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা লেনিনেরও ছিল না। ক্ষমতার—রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক—কেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে 'গণতান্ত্রিক' নীতির ওপরও জোর দিতে হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে সমস্ত জিনিসটা যে-রূপ নিল—তাতে প্রকৃত রাজনৈতিক গণতন্ত্রই লুপ্ত হল। এই 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ' নীতির ফলশ্রুতি হল :

(১) দলের নেতৃত্বে যাঁরা থাকেন—তাঁরা নিজেরাই নিজেদের মনোনীত করেন (leadership always selects itself)—স্বাধীনভাবে গোপন ভোটে দলের কার্যকরী সমিতি বা পলিট বুরোর সভ্যদের নির্বাচন হয় না।

(২) পার্টির সাধারণ সভ্যদের প্রতি এবং সমগ্র দলের নেতৃত্বকে কৃত কর্মের জন্য কৈফিয়ৎ দেবার কোন দায়িত্বই থাকে না।

(৩) দলের নেতৃত্ব—সকল সমালোচনা ও সন্দেহের উর্ধ্বে।

(৪) নেতাদের নিঃসর্ত অনুসরণ ও অনুগমনই শুধু নয়—নেতারা যা ভাবেন এবং চিন্তা করেন—সেটাই নিভুর্ল এ বিশ্বাস দলের কর্মীদের অন্যতম ধর্ম।

(৫) দলের সকল সিদ্ধান্ত হওয়া চাই সর্বসম্মত (unanimous)।

(৬) দলের মধ্যে কোন গোষ্ঠী বা উপদলের (faction) স্থান নেই। স্তালিনের ভাষায় :

"...existence of factions is incompatible either with party's unity or with its iron-discipline. It need hardly be pressed that the existence of factions leads to the existence of a *number of centres*, and the existence of a number of centres connotes absence of one common centre in the party, the breaking up of the unity of will, the weakenning and disintegration of discipline, the weakening and disintegration of dictatorship." ["Foundations of Leninism," *Problems of Leninism* : Pp. 80-81]

"লৌহ-কঠিন দলীয় শৃঙ্খলা-তত্ত্ব এবং দলীয় ঐক্য তত্ত্ব—এবং দলের অভ্যন্তরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর অস্তিত্ব অকল্পনীয়,—দুটো পরস্পর-বিরোধী। দলের অভ্যন্তরে একাধিক গোষ্ঠীকে বাঁচিয়ে রাখার যৌক্তিকতা মেনে নিলে দলের ভিতরে বিভিন্ন চিন্তা-আদর্শের কেন্দ্রের অস্তিত্ব অনিবার্যরূপেই মেনে নিতে হয়। দলের ভিতরে একাধিক কেন্দ্রের অস্তিত্ব মেনে নেবার অর্থই হল দলের সাধারণ কেন্দ্রের বিলোপ সাধন। এতে দলের শৃঙ্খলা থাকবে না—সংহতি বিনষ্ট হবে —সর্বোপরি দলের একনায়কত্ব ধীরে ধীরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।" [স্তালিন]

এই যুক্তি প্রয়োগ করে লেনিনবাদীরা বা মার্কসবাদীরা যেমন নিজের দলের ভিতরে ন্যায়সঙ্গত 'বিরোধিতা—সমালোচনা—রাজনৈতিক আলোচনা তর্কবিতর্ক—সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে "ডেমোক্রাটিক সেণ্ট্রালিজম্"-এর দোহাই পেড়ে স্তব্ধ করে দিতে পারেন—তেমনি একই যুক্তিতে ভারতের প্রভাবশালী দলগুলিও—যেমন জাতীয় কংগ্রেস—পার্লামেণ্ট, রাজ্যসভা-বিধানসভা এবং দলীয় কার্যকরী নীতি-নির্ধারক সমিতিগুলিতে সকল ন্যায়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় সমালোচনার কণ্ঠরোধ করতে পারেন। প্রসঙ্গত ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী—কংগ্রেস সংসদীয় দলের বৈঠকে দলের মধ্যে

শৃঙ্খলাহীনতার তীব্র নিন্দা উল্লেখ্য। 'তিনি বলেন: "সদস্যদের অবশ্যই দল ও তার নেতৃত্বের সমালোচনার অধিকার আছে। কিন্তু তাঁদের জানতে হবে তাঁরা কি বলবেন এবং কোথায় বলবেন"। প্রধানমন্ত্রী বলেন: "সদস্যদের কাজ সম্পর্কে দল নির্দেশাবলী প্রস্তুত করেছে। তাঁদের কোন অভিযোগ থাকলে তাঁরা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন কিংবা দলের বৈঠকে সে সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে পারেন। কিন্তু দলে থেকে দলীয় রীতির বিরুদ্ধে কাজ করা সদস্যদের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত।..." [যুগান্তর পত্রিকা ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪]

"Action is taken whenever it is considered necessary." While considering candidates for the last election and forming government in States changes had been made even on the basis of *slight doubt*", said Mrs. Gandhi. Implied in it was a warning that the conduct of partymen would weigh in dimensions on similar occasions in the future. While she did not appear to be restricting their privileges as parliamentarians she wanted them to be careful about their utterance—"They should be clear on what to say where." She would like them to make greater use of the party forums and to raise issues in accordance with the guidelines set out for them. It is not right for the people to be in the party and violate its discipline or to speak against its accepted policies." [The Statesman, September 12, 1974].

[আমদানী লাইসেন্স—দুর্নীতি অভিযোগ নিয়ে পার্লামেন্টে খুব হৈ চৈ হয়। লোকসভা অধিবেশন সমাপনান্তে পরিষদীয় দলের সভায় তীব্র বাদানুবাদ—অভিযোগ—পাল্টা অভিযোগ—পরিষদীয় সংস্থা কর্তৃক আনীত অভিযোগের তদন্ত—এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিচ্ছিলেন।]

প্রধানমন্ত্রীও দলীয় শৃঙ্খলা, বিবদমান গোষ্ঠীর (group) অস্তিত্ব—দলীয় সংহতির ক্ষতিকারক সে কথার ওপর বিশেষ জোর দেন। শৃঙ্খলা, সংহতি,

আসন্ন নির্বাচনের রায়—এই সব তর্ক তুলে দলের অভ্যন্তরে ও বাইরে সমস্ত সমালোচনার কণ্ঠ স্তব্ধ করা যায়। ভারতে সেই সম্ভাবনা খুব প্রবল হয়ে উঠেছে।

"কোন্ কথা কোথায় এবং কখন বলতে হবে"—সঠিক ভাবে দলের কর্মীদের জানতে হবে। দলের ভিতরে ও বাইরে যে কায়েমী স্বার্থ বিদ্যমান এবং সক্রিয়; তার বিরুদ্ধে মুখ খুললেই বিপদ। কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে—ক্ষমতার অপব্যবহার—রাষ্ট্রীয় স্বার্থ-বিরোধী, জনস্বার্থ-বিরোধী কাজের সমালোচনা—দলের সদস্যরা দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখার জন্য কেন করতে পারবেন না—দলের ভিতরে ও বাইরে? দেশের স্বার্থে জনগণের বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে কেন দলের সদস্যরা অন্যায়ের মুখোস খুলে ধরতে পারবেন না? জনগণের নির্বাচিত পার্লামেন্ট, বিধানসভার সদস্যরাই যদি অন্যায় দুর্নীতি—অবিচার—বঞ্চনা শোষণের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে না পারেন—তাহলে দলের সাধারণ সদস্যদের অবস্থা কত অসহায় তা সহজেই অনুমেয়। পার্লামেন্টের সদস্যদের দেশের জনগণ নির্বাচিত করে পাঠিয়েছেন পার্লামেন্টে নির্ভয়ে পার্লামেন্টের সদস্যরূপে তাঁদের দায়িত্ব পালন করার জন্য—দলের সদস্যরূপে দলীয় শৃঙ্খলা-সংহতি এইসব কথা ভেবে মুখে কুলুপ লাগিয়ে—বসে থাকার জন্য নিশ্চয়ই নয়। "দলীয় ফোরামে" সদস্যরা কি বলছেন কতটুকু চেপে যাচ্ছেন তা নিয়ে জনগণের তত মাথা ব্যথা নেই। দলীয় ফোরামে কতটুকু বলা হবে—পার্লামেন্ট বিধানসভায় কতটুকু বলা হবে—"Thus far and no farther" "এই পর্যন্তই—আর নয়"—এই সীমানা সংকেতরেখা টেনে দেবেন কে? দলের নেতারা, প্রধানমন্ত্রী—মুখ্যমন্ত্রীরা—না দলের সাধারণ আদর্শ সচেতন অনুপ্রাণিত সদস্যরা? শাসকগোষ্ঠী বা শাসকশ্রেণী কোনদিনই তাঁদের স্বার্থের ও শাসনের পরিপন্থী কোন কথাই শুনতে চান না—শোনাতে চান না। শৃঙ্খলা 'দলীয় সংহতি বিনাশের' আতঙ্ক সৃষ্টি করে শাসক দল চিরদিনই স্বাধীন চিন্তা ও রাজনৈতিক সমালোচনা ও বিরোধিতার অধিকার কেড়ে নিতে উদ্যত হয়ে থাকে।

দলের অভ্যন্তরে (Party forum) যে-সমালোচনা করা হবে—সেখানেও কি কোন লাগাম থাকবে না? সেখানেও দলের নেতারা বলে দেবেন: "বক্তারা, এতদূর পর্যন্ত যেতে পারেন—তার বেশী এক পা-ও নয়"। গণতান্ত্রিক দলের

ভিতরে পরস্পর-বিরোধী চিন্তাধারা সহ্য করা হবে না স্টিমরোলার চালিয়ে সকল বিরোধী ভিন্ন মত চূর্ণ করা হবে? পার্টির কর্মীরা ক্রীতদাসের মত দলের নেতৃত্বের কাছে নতজানু হয়ে কয়েকটুকরো রুটির লোভে অথবা পদের মোহে মার্জনা ভিক্ষে করে গর্দান বাঁচাবে?

বিভিন্ন মতের প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়োজনীয়তার কথা লেনিন ট্রট্স্কী রোজা লুকসেমবুর্গ স্তালিন সবাই বলেছেন: জবরদস্ত নেতা স্তালিনও বলেছেন: ···iron discipline does not preclude but presupposes *criticism* and *control of opinion* within the party. Least of all does it mean that discipline must be "blind"·· (Stalin) দলের মধ্যে লৌহ-কঠিন শৃঙ্খলা চাই। তার মানে এই নয় যে, দলের ভিতরে সমালোচনা থাকবে না—প্রতিদ্বন্দ্বী মত থাকবে না। শৃঙ্খলা কখনই অনড় 'অন্ধ' নয়। (স্তালিন)

এ সবই তো *সুন্দর সুন্দর* কথা। অথচ দলের অভ্যন্তরে ন্যূনতম সমালোচনার অপরাধে বিপ্লবী দলের সেরা সেরা নেতাদের, সহস্র সহস্র কর্মী নাগরিকদের নির্বিচারে স্তালিনের ঘাতকরা হত্যা করেছে। সামান্যতম প্রতিবাদও হয়নি সে দেশে। আজও রুশ দেশে ৫০ বছরেরও বেশী 'সমাজতন্ত্রের' সাধনার পরও বিজ্ঞানী-সাহিত্যিক শিল্পীদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, —পাগলা গারদে—"পাগল" এই অপবাদ দিয়ে বন্দী করে রাখা হচ্ছে—বাধ্যতামূলক দাস-শিবিরে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদছে। বিজ্ঞান—সাহিত্য—শিল্প—সাধনা সব কিছুকেই দলের দাস্যবৃত্তি করতে হবে,—'পার্টি লাইন' বিশ্বস্ততার সঙ্গে সবাইকে অনুসরণ করতেই হবে।

দলের ভিতরে যদি খোলাখুলি আলোচনা না হয় (free debate) দলের সমস্যার সমাধানের সূত্র মিলবে কি করে? আবার যদি খোলাখুলি আলোচনা-সমালোচনা দলীয় 'ফোরামে' হয়ই তাহলে সেই আলোচনা যদি বাইরের সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হয়—যদি সেই সব তর্ক বহুল পরিমাণে প্রচারিত না হয় তাহলে দেশের জনমত তৈরী হবে কি করে? জাগ্রত সচেতন আলোক-প্রাপ্ত জনমতই তো গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ। জনগণের কাছে থেকে সব কিছু গোপন করা হবে, যা কিছু হবে সবই জনগণের দৃষ্টির আড়ালে হবে—তাহলে দেশের জনমত গড়ে উঠবে কি করে? প্রধানমন্ত্রী বলেছেন

বলে যে-সব কথা প্রচার করা হয়েছে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় তা সত্যি হলে অনেক প্রশ্নই জিজ্ঞাস্য মনে রয়ে যাবে। অতীতে কি প্রার্থী নির্ণয়ের সময়, কি বিভিন্ন রাজ্যে সরকার গঠনের সময় বড় বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে নাকি—সামান্য সন্দেহের ভিত্তিতেই। এতো নিশ্চয়ই গণতন্ত্রের পক্ষে সহায়ক পরিস্থিতি নয়। সিদ্ধান্তের ভিত্তি হবে কঠিন বাস্তবতা,—সন্দেহ নয়। দলের সমালোচনা করলে আগামী নির্বাচনে দলের মনোনয়ন মিলবে না—এই ভয় দেখিয়ে গণতান্ত্রিক দেশে একটি গণতান্ত্রিক দল আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের (Inner party democracy) কণ্ঠরোধ করতে পারে। গণতান্ত্রিক দলগুলিও কি এইভাবে ধীরে ধীরে 'ডেমোক্র্যাটিক সেন্ট্রালিজম্' বা 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণের' নীতির অক্টোপাশ বন্ধনে বেঁধে প্রকৃত রাজনৈতিক অবক্ষয় ঘটাবে না? গণতান্ত্রিক দলের সদস্যদের কি এ বিষয়ে সজাগ হবার সময় আসেনি?

কি মার্কসিস্ট দল কি গণতান্ত্রিক দল—একটা সাধারণ প্রবণতা দুই ধরনের দলেই লক্ষ্য করা যায়। দলের নেতৃত্ব যখন পাশব সংখ্যাধিক্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত—তখন দলের ভিতরে বিরুদ্ধবাদীদের—সমালোচকদের মুখ বন্ধ করার জন্য 'শৃঙ্খলা'—'আইন', 'সিদ্ধান্তের প্রতি সৈনিকসুলভ আনুগত্য'—'দলীয় সংহতি' এইসব কথার দোহাই পাড়া হয়। আবার এই নেতৃত্ব যখন সংখ্যালঘিষ্ঠতে পরিণত হবার আশঙ্কায় থাকে তখন 'গণতন্ত্র'—'স্বাধীনতা'—'ন্যায়-বিচার' সমালোচনার স্বাধীনতা অপরিহার্যতার কথা বলে থাকেন। দলের ভিতরে—বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করার আহ্বান জানান হয়। কিন্তু ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের আসন যখন নির্বিঘ্ন-নিরাপদ তখন দলের সভ্যদের ভেড়ার পাল, ব্যক্তিগত কেরিয়ারের তাঁতের মাকু—কেরিয়ারিস্ট রাজনীতিবিদদের 'মই' বলে গণ্য করা হয়। তখন নেতাদের সুর ও বচন ভিন্ন: 'দলে থাকতে হলে শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে—দলীয় নির্দেশনামা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করতে হবে।'

ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহম্মদ ১৯৬৯ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় 'বিবেক অনুযায়ী' ভোট দেবার প্রস্তাব করেছিলেন—যদিও দলের নিজস্ব প্রার্থী সেদিন ছিলেন শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি। অদৃষ্টের পরিহাস তিনিই যখন ১৯৭৪ সালে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য কংগ্রেস দলের প্রার্থী হলেন তখন কিন্তু "বিবেক অনুযায়ী" ভোট দেবার কথাটাই উঠল না। যেন বিবেক বলে

বস্তুটি ১৯৫৯ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন লগ্নেই আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং দলের নেতা ও কর্মীদের 'বিবেক' নামক বস্তুটি সেই নির্বাচনের পরই হিমঘরেই চিরবন্দী হয়ে থাকবে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিজেই শ্রীসঞ্জীব রেড্ডির নাম প্রস্তাব করে—দলের কর্মীদের নিজ নিজ বিবেক অনুযায়ী ভোট দেবার আহ্বান জানালেন। বিতর্ক স্থরু হল শ্রীভি. ভি. গিরি 'প্রগতিশীল' চিন্তা ভাব-ধারার বাহক আর শ্রীরেড্ডি জাতীয় 'কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল' দক্ষিণপন্থী শিবিরের প্রতিনিধি। জাতীয় কংগ্রেস দল দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ল। কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলি শ্রীগিরির প্রার্থী-পদ সমর্থন করলেন। বিরোধী দলগুলির সমর্থনের অনেকগুলি কারণ থাকতেই পারে। সর্বোপরি শক্তিমান শাসক কংগ্রেস দলকে দুর্বল করে দিয়ে কেন্দ্রে একটি দলের একটানা শাসনের অবসান ঘটাবার কৌশল—রাজনীতির হাতিয়ার হওয়া স্বাভাবিক। দলীয় নীতির দিক থেকে শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর অনুগামীদের সেদিনের ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ নীতি-বিগর্হিত। আবার ভি. ভি. গিরিকে সমর্থন করে রাজনৈতিক দলগুলি 'ডিফেকশনের' রাজনীতিকে সমর্থন করেছিল বৃহত্তর স্বার্থে কোন একটা লক্ষ্যে পৌছুবার তাগিদে। এখানে একটা বৃহত্তর স্বার্থ -একটা লক্ষ্য শ্রীগিরিকে সমর্থন জানাতে উৎসাহিত করেছিল। তাহলে বৃহত্তর স্বার্থ আদর্শ লক্ষ্যকে রক্ষা করার তাগিদেই সেদিন বিরোধী দলগুলি এগিয়ে এসেছিল। প্রশ্নটি অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার করা যায়। ইন্দিরা গান্ধীর মনোনীত সরকারী দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে শ্রীগিরির প্রার্থী-পদ সমর্থন দ্বারা দল ভাঙাভাঙির রাজনীতিতে বিরোধী দলগুলি মদত দিয়েছিলেন। কংগ্রেস দলের সদস্যরা শ্রীরেড্ডিকে অথবা শ্রীগিরিকে ভোট দেবেন এটা তাঁদের দলের হেঁসেল ঘরের ব্যাপার। কিন্তু ১৯৫৯ সালের এই গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনকে ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর গোষ্ঠী যাঁকে মনে মনে চেয়েছিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতিরূপে, তাঁর জয়লাভে সাহায্য করে বিরোধী দলগুলি ইন্দিরা গান্ধীর হাতই শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছিলেন। ১৯৫৯ সালের এই নির্বাচনে ডক্টর রামমনোহর লোহিয়ার অভাব—মৃত্যুজনিত শূন্যতার অভাব অনুভূত হয়েছিল। তিনি সেদিন জীবিত থাকলে ভারতের সমাজতন্ত্রীরা এই পথ বেছে নিতেন বলে মনে হয় না। ১৯৫৯ সালে ইন্দিরা গান্ধী দুই শিবিরের সমর্থন কুড়িয়ে নিলেন তাঁর পিতৃদেবের অনুসৃত অনুরূপ কূটনীতি আশ্রয় করে।

ভারতের বুকে একটি বিশেষ পরিবারের শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে এই কৌশলবাদী রাজনীতি। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং পরবর্তীকালে ডক্টর লোহিয়া এই রাজনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু দুই নেতার অকাল বিয়োগ সেই ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক বিরোধিতার রাজনীতিকে ভোঁতা করে দিল।

দেশের—কি শাসক কি বিরোধী—সকল দলের পরিচালনার ক্ষেত্রে দলের সভ্যদের আচরণ, ভূমিকা কি হবে—বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে মৌল সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে—সেটা নির্ধারণের ব্যাপারে কর্মীদের 'বিবেক' নিঃসন্দেহে খুব গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ। এই বিবেকের প্রশ্নটিকে অবলম্বন করেই আবার দলীয় আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রে (Inner Party Democracy) 'ডিসেন্ট' বা ভিন্নমত পোষণের মৌল অধিকারটি স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। ইংলণ্ডে শ্রমিক দলের ভিতরে বিভিন্ন সময় দেখা গেছে দলের কর্মী নেতারা নির্ভয়ে নিজ নিজ বিবেক অনুযায়ী ভোট দিয়েছেন। পার্লামেণ্টে সরকারী প্রস্তাব বা বিলের প্রকাশ্য বিরোধিতা করে ভোট দিতে দেখা গেছে শ্রমিকদলের এম. পি.দের। শ্রমিকদল সাময়িকভাবে মর্যাদার লড়াই-এ দুর্বল হয়েছে সময় সময়, কিন্তু দলের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য নষ্ট হয়নি—দলও ভেঙে যায়নি। কিন্তু কোন দেশের গণতান্ত্রিক কোন দলে দলের নেতা একটি বিশেষ প্রশ্নে একটি বিশেষ স্বার্থে একটি বিশেষ সময়ে বিবেকবোধকে জাগ্রত করার আহ্বান জানিয়ে জাতীয় দলের ও ব্যক্তি-জীবনের বাকী দিনগুলিতে সেই বিবেকবোধকে চিরতরে ভোঁতা করে দিয়ে—দলের সকল কর্মীদের মনুষ্যত্বকে চিরতরে খর্ব করে ক্রীতদাস বানিয়ে রাখার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোন গণতান্ত্রিক দেশে মিলবে না। শ্রীআলি আমেদ যখন রাষ্ট্রপতির পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলেন তখন কিন্তু দলীয় শৃঙ্খলার প্রশ্নটিই প্রাধান্য পেল। ১৯৬৯ সালে শৃঙ্খলার ওপরে স্থান পেল বিবেকের আহ্বান; ১৯৫৪ সালে প্রাধান্য পেল দলীয় শৃঙ্খলা। কে বেশী 'প্রগতিশীল', কে 'প্রতিক্রিয়াশীল' বা রক্ষণশীল এ প্রশ্নই উঠল না দলের সাংসদের কাছে। সে-সময় বিরোধী প্রার্থী ছিলেন সম্মিলিত বিরোধী দলগুলির প্রতিনিধি শ্রীত্রিদিব চৌধুরী। তাঁকে সকল বিরোধী দলগুলিই সমর্থন করেছিলেন। একটি বামপন্থী দলের নেতৃত্ব-পদ অলঙ্কৃত করা ছাড়াও শ্রীচৌধুরী দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে ছিলেন একজন নির্ভীক যোদ্ধা।

রাজনৈতিক দলের তিনটি জিনিস অপরিহার্য : (১) আদর্শ, (২) সংগঠন ও (৩) নেতৃত্ব। আদর্শের স্থান সবচেয়ে ওপরে। তারপর আসবে সংগঠন—যা আদর্শকে ধরে রাখবে—আদর্শকে অবক্ষয় ও বিচ্যুতির হাত থেকে রক্ষা করবে, বাস্তব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে আদর্শের মূল্যায়ন করবে—যুগোপযোগী ব্যবস্থা উপস্থিত করবে—দেশবাসী ও দলের কর্মী সমর্থকদের কাছে। তারপর আসবে নেতৃত্ব। কিন্তু আমরা কি দেখছি—নেতাকে স্থান দেওয়া হচ্ছে সব কিছুর ওপরে—আদর্শের ওপর, সংগঠনের ওপর। কোন কর্তৃত্ববাদী স্বৈরতান্ত্রিক দলের এটাই রীতি (Leader Principle)। নেতাই সব, নেতা অভ্রান্ত, দল অভ্রান্ত। দলের মধ্যে মত-পার্থক্য প্রকাশের উপযুক্ত পরিবেশ না থাকলে, মত-পার্থক্যের জন্য স্বাধীনভাবে বিবেক অনুযায়ী মতপ্রকাশ ও কাজের সুযোগ না থাকলে—মুখ বুঁজে দলের অন্যায়কে কর্মীদের সর্ব অবস্থাতেই মেনে নিতে হয়। 'সর্বহারার গণতন্ত্রে' তাই হয়ে আসছে। ভারতের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী সেই জিনিসকেই ভারতীয় গণতন্ত্রের নয়া সংস্করণ বলে চালাতে চাইছেন। মার্কসিস্ট আদর্শের ভিত্তিতে দল করতে গেলে সেই দলে সদস্যদের বিবেক শুভবুদ্ধি স্বাধীন চিন্তা বিচারবোধ অনুযায়ী মতামত প্রকাশের সুযোগ কেন থাকবে না? কোন্ যুক্তিতে?

রাজনৈতিক দলের আঙিনা থেকে ভিন্নমত পোষণ ও স্বাধীনভাবে নির্ভয়ে তা প্রকাশের অধিকারকে নির্বাসন দিলে দলের কর্মীদের, ভিন্নমতাবলম্বী কর্মীদের হয় উদাসীন হয়ে আত্মসন্তুষ্টিতে মগ্ন থাকতে হয়, নতুবা দল যা করছে সবই ঠিক—কেননা দল শেষ বিচারে অভ্রান্ত—এই আত্ম-প্রবঞ্চনামূলক চিন্তায় মশগুল হয়ে থাকতে হয়। লোকসভা ও বিধানসভার কংগ্রেস সদস্যরা বিবেক অনুযায়ী ভোট দিতে আহ্বান জানালে শ্রীআলি আমেদকেই হয়ত ভোট দিয়ে সমর্থন জানাতেন। কিন্তু বিবেকের প্রশ্নটা একেবারে তোলাই হল না। দেশ-বিভাগের প্রশ্নে কি জওহরলাল নেহরু প্যাটেল মৌলানা আজাদ জাতীয় কংগ্রেস নেতারা নীতি ও বিবেককে আদৌ আমল দিয়েছিলেন? তড়িঘড়ি করে ক্ষমতা দখলের নেশাই সেদিন কংগ্রেস দলকে পেয়ে বসেছিল। নেতাজী সুভাষ দেশ-বিভাগের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ব্যর্থ করার জন্য যে আহ্বান জানিয়েছিলেন তার প্রতি কর্ণপাত তো করা হয়নি। কংগ্রেস দল থেকে সুভাষচন্দ্রকে বহিষ্কার যখন করা হল তখন কি দলের সদস্যদের বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী মতামত দেবার

কথা বলা হয়েছিল? মানবতাবাদী সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশজী—সমস্ত জীবন যিনি নির্লোভ হয়ে আদর্শ ন্যায়নীতি সমাজতন্ত্র গণতান্ত্রিক অধিকার মূল্যবোধের জন্য নিরলসভাবে সংগ্রাম করে এসেছেন দেশের সেই মহান সন্তানের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা (dialogue) শুরু করে দেশের জাতীয় সঙ্কট থেকে জাতিকে রক্ষার জন্য প্রস্তাব করার অপরাধে দল থেকে সদস্যদের বহিষ্কার করা হয়েছে। কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য নেতা চন্দ্রশেখরও কারারুদ্ধ হলেন। দলের মধ্যে ব্ল্যাকমেইল, চরিত্র-হনন, জিঘাংসার ভয়াল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। কংগ্রেস দলের মধ্যে সুস্থ স্বাধীন মত প্রকাশ, মত প্রচার মত পার্থক্য ডিসেন্ট (dissent)-এর কোন স্থান নেই। বিবেকবোধের কোন স্থান নেই। যাঁরাই বিবেচনা করে বিবেক-অনুযায়ী কাজ করতে গিয়েছেন তাঁরাই নিগৃহীত অপমানিত হয়েছেন। সংবাদপত্র রেডিও দলের গ্রামোফোনের কাজ করেছে। ব্যক্তি-মানুষ 'এস্ট্যাবলিশমেন্টের' বহুমুখী আক্রমণের মুখে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত। সত্যাশ্রয়ী দলীয় কর্মীর কাছে তৃতীয় পথ: যা সত্য ও ন্যায়-গ্রাহ্য, দেশ ও জনহিতকর বলে বিবেচিত হবে যুক্তির বিচারে তার প্রতিষ্ঠায় সামিল হতে হবে। দলের ভিতরে বিভিন্ন চিন্তা ও ব্যাখ্যার ও প্রয়োগ সম্পর্কিত মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবধারাকে শৃঙ্খলার ডাণ্ডা দিয়ে স্তব্ধ করার চেষ্টা করলে বিদ্রোহ হবেই। রাজনৈতিক দলগুলির ভাঙা-গড়া তো হবেই। এর মধ্যে নিন্দার কি থাকতে পারে?

ভারতের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙতে ভাঙতে সি. পি আই. সি পি আই. (এম), সি. পি আই. (এম. এল.) তিন টুকরো হল। আদর্শগত কারণেই হয়েছে। 'ডিফেক্‌সন' বলে রব তুলে আদর্শের সংঘাত তো বন্ধ করা যায় না। আবার সি পি. আই. (এম) থেকে যাঁরা বহিষ্কৃত হয়েছেন তাঁদের মধ্যেও অনেক আদর্শবাদী উৎসর্গীকৃত কর্মী বুদ্ধিজীবী নেতা আছেন। তাঁরাও একটা পৃথক গোষ্ঠীরূপে কাজ করছেন। সি পি. আই. (এম. এল.) বহুভাগে বিভক্ত হয়েছে—দলের নীতির ব্যাখ্যা ও রূপায়ণ পদ্ধতি নিয়েই। দলের মধ্যে মতপার্থক্য উপযুক্ত মর্যাদা না দিলে, দলের আদর্শনীতি কর্মসূচী নিয়ে বাধামুক্ত সঠিক বিতর্কের অবাধ সুযোগ না থাকলে, দলের নেতৃত্ব পরিবর্তনের ক্ষমতা সাধারণ কর্মীদের না থাকলে হয় ভিন্নমতাবলম্বীদের 'কনফরমিস্ট' হয়ে মুখে কুলুপ এঁটে দলের নীতি, নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্তগুলিকে প্রশ্ন তর্ক সমালোচনার ঊর্ধ্বে

রেখে অন্যায় জেনেও অন্যায়কে মেনে নেওয়া, আর না হয় প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া। সর্বহারার গণতন্ত্র নামে প্রচারিত তত্ত্বে কি দলের মধ্যে ভিন্নমতাবলম্বীর স্থান আছে? যাঁরা কনফরমিস্ট হতে পারেন না তাঁরা ভিন্ন দল গঠন করেন আদর্শের ভিত্তিতে। অবিভক্ত সি. পি. আই. দলের সঙ্গে মতপার্থক্য হল—১৯৬৩ সালে তখন যাঁরা কনফরমিস্ট হতে পারলেন না তাঁরা ভিন্ন দল, আরও শক্তিশালী দল গঠন করলেন। কৌশল ও নীতি-সংক্রান্ত মৌল কতকগুলি প্রশ্ন নিয়েই দল ভাঙাভাঙি হয়েছিল সেদিন। একই দলের ভিতরে থেকে লড়াই চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না বলেই তো এইরূপ পৃথক দল গড়ার সিদ্ধান্ত।

রাজনৈতিক মতপার্থক্যের দলীয় সাংবিধানিক গ্যারান্টি মার্কস্‌বাদী দলে না থাকার ফল কি হতে পারে সেটা বোঝাবার জন্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে এবং বিশেষ করে বিয়াল্লিশের ঐতিহাসিক আগস্ট-বিপ্লব সম্বন্ধে ভারতের তৎকালীন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী ও ভূমিকা একটি বড় প্রশ্ন। আগস্ট-বিপ্লব ভারতের অভ্যন্তরে সংঘটিত সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তিযুদ্ধ। ভারতের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি এই মুক্তি সংগ্রামের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলে প্রচারে নেমেছিল। [এ বিষয়ে "মার্কসবাদ লেনিনবাদ—তত্ত্বে ও প্রয়োগে" গ্রন্থে আলোচনা করেছি।] এত বড় ঐতিহাসিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে কোন ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হল না দলের মধ্যে। অথচ আগস্ট-বিপ্লব সম্বন্ধে সি. পি আই. (অবিভক্ত) যে ভ্রান্ত নীতি নিয়েছিল সেদিন সেকথা দলের নেতৃত্ব ৩০ বছর পর স্বীকার করেছেন। এই রকম একাধিক হিমালয় পর্বত-প্রমাণ ভ্রান্তি দলের বার বার হয়েছে। তাতে দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ ত্বরান্বিত হয়েছে, না পিছিয়ে গেছে? জনগণের স্বার্থ দেশের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছে, না ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? দল সেদিন সঠিক পথ ধরে চলেছিল কিনা তার মূল্যায়ন করতে তিন দশকের বেশী কাল কেটে গেল।

অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি নেতাজী ও আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও দেশের মুক্তি সংগ্রামের ভূমিকা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করে এসেছে। দলের মধ্যে পূর্ণ মতবিনিময় প্রকাশ্য স্বাধীন বিতর্ক-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করায় এবং ভিন্নমতাবলম্বীর গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী কাজ করার

সুযোগ না থাকায় কমিউনিস্ট দলের মৌল সিদ্ধান্তগুলি দেশের স্বার্থের সহায়ক হয়নি। দেশবিভাগের পর ১৯৪৭ সালে খণ্ডিত ভারত যখন স্বাধীন হল—তখন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করল 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়।' সেদিনও দলের ভিতরে ও বাইরে দলের কর্মী সমর্থকরা কোন স্বাধীন মত বিনিময় ও গণ-বিতর্কে গেলেন না। দলের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হল কর্মীদের ওপর। আবার কিছুকাল যেতে না যেতেই এই স্লোগান পরিত্যক্ত হল। দলের নীতি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রমাণিত হল দেশবাসী ও দলের নেতা ও কর্মীদের কাছে। তবু তত্ত্বের খাতিরে বলতে হবে ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রীদের সুরে সুর মিলিয়ে: কমিউ-নিস্টরা ভুল অন্যায় করে না—'Communist can do no wrong'। আর সর্বহারার গণতন্ত্রে তো নয়ই!

মুসলিম লীগ দলের ঘৃণিত দ্বি-জাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতকে টুকরো করার সাম্রাজ্যবাদী প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছিল অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি। দলের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় তো দূরের কথা সমালোচনাও হয়নি। এতবড় মারাত্মক আত্মঘাতী একটা প্রস্তাব দল মেনে নিল। তখন বিয়াল্লিশের ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' গণবিপ্লবে দেশ উত্তাল। হাজার হাজার নেতা ও কর্মী কারান্তরালে। এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল অথচ দলের মধ্যে কোন স্বাধীন বিতর্ক মত বিনিময়ও হয়নি।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ১৯৫০ সালে ফরোয়ার্ড ব্লক দল আয়োজিত নেতাজী প্রদর্শনী উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণে স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁদের দল নেতাজীর ভূমিকা ও অবদানের মূল্যায়নে ভুল করেছিলেন। দল যে ভুল করেছিল এটা বুঝতে দলের লেগে গেল ২৫ বছরের বেশী সময়। একটা বিরাট ভুলের বোঝাকে বইতে হল দলের কর্মীদের ২৫ বছর ধরে। এতে দেশের বা দলের কি লাভ হল? তাও এই ভুল স্বীকার করতে হয়েছে দলের প্রথম সারির নেতাকে; দলের সাধারণ কর্মীরা সভা-সমিতিতে একথা বলতে পারেননি কেন? কর্মীদের গণতান্ত্রিক অধিকারটুকুই বা কোথায়? কমিউনিস্ট পার্টি এই মারাত্মক ভুল না করলে, ১৯৪১-৪২ সালে নেতাজীকে সমর্থন জানালে দেশের ইতিহাস নিঃসন্দেহে অন্যখাতে বইতে পারত। বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল সেদিন। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা জ্যোতি বসু তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেছিলেন:

"আমরা কমিউনিস্টরা অতীতে যেসব কথা বলেছিলাম তা ভুল। আমরা আজ আমাদের সে ভুল স্বীকার করছি। কারও পদানত হয়ে থাকবার জন্ত নেতাজী কখনও কারও সাহায্য নেননি।·· ভারতের স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া নেতাজীর অন্ত কোন উদ্দেশ্ত ছিল না। বিশেষ করে তাঁর মত সংগ্রামী নেতা অন্তরকম ভাবতে পারেন না। দেশের স্বাধীনতা অর্জনে গান্ধীজীর অহিংসার স্থান যেমন আছে, তেমনি আছে নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিরাট দান। নেতাজীর প্রেরণায় পরবর্তীকালে নৌ-পুলিশ ও জনসাধারণের বিভিন্ন অংশ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। নেতাজীর অস্ত্রের আঘাতের জন্তই ইংরাজকে বাধ্য হয়ে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে।" [আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯.১.১৯৫০] এই কথাগুলি যদি এই দল ১৯৪২ সালের "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের সময় বলত, তাহলে দেশের ইতিহাস অন্ত খাতে বইতে পারত।

রাশিয়ায় স্তালিন প্রায় ৩০ বছর ধরে তাঁর হৃদয়হীন রক্তাক্ত একনায়কত্ব চালিয়েছিলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিলেন, বাধ্যতামূলক দাস-শিবিরে বন্দী করে রেখেছিলেন, নির্বাসন দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আর একজন শক্তিশালী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চভ স্তালিনের কঠোর নিন্দায় মুখর হয়েছিলেন রুশ কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসে। ৩০ বছরের মধ্যে একটা ক্ষীণতম প্রতিবাদও উঠল না কেন সে দেশে? এই গণতন্ত্রকে 'শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্র' বলে বড়াই করতে হবে? ভুল স্বীকার করার, প্রতিবাদ করার অধিকার ক্ষমতাসীন নেতারই আছে 'সর্বহারার গণতন্ত্রে', কর্মীদের নাগরিকদের নেই। 'শৃঙ্খলাই' তাদের আদর্শ, দলীয় নির্দেশ মান্ত বিবেচনা করাই তাদের কর্তব্য—নির্দ্বিধায় বিনা তর্কে। মৃত রুশ প্রধানমন্ত্রীর কাজের ও নীতির নিন্দা করা সম্ভব হয়েছিল আর একজন ক্ষমতাসীন রুশ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষেই। আবার ক্রুশ্চভ যখন ক্ষমতাচ্যুত হলেন তখন স্তালিনী-যুগের বিভীষিকার অবসান ঘটাতে প্রয়াসী হয়েছিলেন—এরূপ কীর্তিমান একজন প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেলেন। দলের কাছে দেশের কাছে তাঁর কাজের নীতির নেতৃত্বের মূল্যায়নও হল না। আবার তাঁর সমালোচকদের সমালোচনা মূল্যায়ন ঐতিহাসিক সত্যের আসন দখল করে বসল সেনাবাহিনীর সমর্থন নিয়ে ক্ষমতার দাপটে। স্তালিনের যখন সমালোচনা করা হল তখন স্তালিনবাদীদের আত্মপক্ষ

সমর্থনের সুযোগও মেলেনি। তবু সর্বহারার গণতন্ত্রে আভ্যন্তরীণ-গণতন্ত্র (Inner Party Democracy) নামক বস্তুটির বড়াই করা হবে? আবার ক্রুশ্চভও পার্টির কাছে আত্মপক্ষ, নিজের অনুসৃত-নীতির সমর্থনে বক্তব্য রাখার মৌল অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। ইতিহাসে গিলোটিনের স্রষ্টাই গিলোটিনের শিকার হয়েছিলেন। যে-অগণতান্ত্রিক মনোভাব ও আচরণের শিকার হয়েছিলেন ট্রট্স্কী—স্তালিনযুগে সেই একই পদ্ধতিতে স্তালিনপন্থীরা ক্রুশ্চভপন্থীরা নির্বাসিত হয়েছেন রাজনীতির আঙিনা থেকে। কোন ক্ষেত্রেই বিতর্ক মত বিনিময়ের সুযোগ দেওয়া হয়নি। রাশিয়ায় লেনিন বিপ্লবের অব্যবহিত পরই 'War Communism' 'জঙ্গী কমিউনিজম' রক্তাক্ত শ্রেণীসংগ্রামের অপরিহার্য-তত্ত্ব পরিহার করে 'নূতন অর্থনৈতিক কর্মসূচী' NEP (New Economic Policy) গ্রহণ করলেন। তখন লেনিনের ভাষায় এটা ছিল রাজনৈতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে একটা বিরাট পিছু হটে আসা। কিন্তু দলের মধ্যে এক নীতি থেকে মূলগতভাবে ভিন্ন বিপরীত নীতির দিকে সমস্ত দল নিয়ে ঝুঁকে পড়ার আগে সেদিন দলের ভিতরে ও বাইরে হয়নি কোন তর্ক-বিতর্ক গণ-মত-বিনিময়। দলের নেতা যা বলেছেন তা-ই দল ও গোটা শ্রমিক শ্রেণীকে মেনে নিতে হয়েছে। ভারতেও শ্রীমতী গান্ধীর তথাকথিত বিশ দফা কর্মসূচী, জরুরী অবস্থার ঘোষণা, সর্বশ্রেণীর মানুষের গণতান্ত্রিক সকল অধিকার হরণ করে প্রগতির মুখোশ পরিয়ে একটি বিদেশী বৃহৎ শক্তিশালী কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে এদেশে এক দুঃসহ শ্বাসরোধকারী অবস্থাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। দলের মধ্যে হয়নি কোন বিতর্ক বা মত-বিনিময়।

রাশিয়ায় লেনিনের মৃত্যুর পর স্তালিনীযুগে আবার যখন বিপরীত দিকে গোটা দেশকে নিয়ে যাওয়া হল তখনও দেশ ও দলের মধ্যে হল না কোন গণ-বিতর্ক। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-স্তালিনবাদী তত্ত্ব যাঁরা তথ্যের আলোতে বিশ্লেষণ করেছেন তাঁরাই জানবেন যে-কোন মার্কসবাদী দলের কর্মীর জীবনে লৌহ-কঠিন শৃঙ্খলার স্থান 'সত্যের' ওপরে, বিবেকের আহ্বানের ওপরে। কিন্তু 'শৃঙ্খলার' সঙ্গে 'মতবাদের' সংঘাত দলের মধ্যে দেখা দেবেই কোন না কোন প্রকারে। দলের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সমন্বয় সূত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। নতুবা কিছু কর্মী-নেতাকে শৃঙ্খলা-শাস্তির ভয়ে হয় মুখ বুজে অন্যায়কে মেনে নিয়ে চলতে হবে আর না হয় প্রতিবাদে মুখর হতেই হবে। 'শৃঙ্খলার' সার্ব-

ভৌমত্বের দাবীতে প্রতিবাদীদের দলের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর হাতে তিরস্কৃত-ধিক্কৃত হতে হবে। আর যাঁরা আদর্শকে জীবনে প্রাধান্য দেবেন তাঁরা বিদ্রোহ করবেন অথবা নূতন পথে পা বাড়াবেন। প্রতিটি রাজনৈতিক দল সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য।

ভারতের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি যখন ১৯৫৩ সালে দ্বিখণ্ডিত হয়ে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি জন্ম নিল তখন দল দুটুকরো হবার পেছনে মার্কসবাদী তত্ত্বের ও ভারতের পরিস্থিতিতে তার প্রয়োগ-পদ্ধতির প্রশ্নটিই কি প্রাধান্য পায়নি? অন্তত সি. পি. আই. এবং সি. পি. এম. দুই দলের কর্মীরা তো তাই জানেন। তাহলে অলঙ্ঘ্যনীয় শৃঙ্খলা-তত্ত্বের ওপর আদর্শ রূপায়ণের গুরুত্বপূর্ণ তর্কই স্থান পেয়েছে। তাহলে শৃঙ্খলা ও গণতন্ত্র-স্বাধীনতা-মতবাদ-নীতি সম্পর্কিত জটিল প্রশ্নগুলি নিয়ে কর্মীরা কতদূর এগুতে পারেন, কোথায় গিয়ে থেমে যাবেন -আর এগুবেন না—সে সম্বন্ধে চূড়ান্ত মতামত কোন দলই দিতে পারেন না—সর্বহারার শ্রেণী শ্রেণী-ভিত্তিক দলও নয়! কোন্‌টা নীতি-আদর্শের প্রশ্ন—আর কোন্‌টা শৃঙ্খলার প্রশ্ন—এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা দলের ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের? দলের সভ্যদের প্রকাশ্য স্বাধীন বাধামুক্ত মতবিনিময় ও বিতর্কের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার থাকবে না? দলের 'রাজনৈতিক লাইন' তো নির্ধারণ করে থাকেন দলের নেতৃত্ব। যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমর্থনের ওপর নির্ভর করে দলের নেতৃত্ব এক এক সময় এক এক রকম নীতি অনুসরণ করে থাকেন—বিভিন্ন মৌল প্রশ্নে—আর সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতাও তো চিরস্থায়ী ব্যাপার নয়,—সেটাও সাময়িক (temporary)। আবার দল যদি ইচ্ছামত অথবা নিজেদের সুবিধামত কৌশল বিবেচনা মত সময় সময় নীতি বা 'রাজনৈতিক লাইন' পরিবর্তন করতে পারে কনভিনিয়েন্স-এর স্রোতে গা ভাসিয়ে কনভিক্‌শন-কে হিমঘরে পুরে রাখেন তাহলে দলের সদস্যরা নীতির প্রশ্নে আদর্শের ব্যাপার ও রূপায়ণের বা কৌশলের প্রশ্নে যুক্তির ভিত্তিতে বিবেকের নির্দেশমত সিদ্ধান্ত নিতে বা জন্ম নির্ণয় করতে কেন পারবেন না? দল যখন প্রয়োজন ও সুবিধামত তার নীতি বা 'পলিটিক্যাল লাইন' ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নতুন লাইন বেছে নেয় তখন সেটাও তো আভিধানিক অর্থে 'ডিফেকশন'। মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক লাইন বা তত্ত্ব হামেশাই অবিশ্বাস্যভাবে পালটিয়েছে। কখনও চীন-পন্থী নীতি, কখনও আবার রুশ ও চৈনিক নীতিকে

সমানভাবে সমালোচনা করা, কখনও বা রুশ-ঘেঁষা নীতি। কখনও ভারতের মাটিতে স্বতন্ত্র স্বাধীন নীতি [National Communism আদর্শের সমতুল্য তত্ত্ব]—অনুসরণ করে চলার সঙ্কল্প! কংগ্রেস দল সম্পর্কে একই বক্তব্য বলা চলে। দলের পলিটিক্যাল লাইন বদলাচ্ছে—সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক আদর্শ-বিধ্বংসী রাজনীতি অনুসৃত হচ্ছে। দলের নেতা ও সদস্যদের মুখে কুলুপ এঁটে দলের ওপরতলার নির্দেশ সুবোধ বালকের মত অনুসরণ করে চলতে হবে। দলের জবরদস্তি নীতি ও চরম স্বেচ্ছাচারীদের বিরুদ্ধে মুখ খুললেই দল থেকে বহিষ্কার করা হয়, চরিত্রহনন করা হয় অথবা চিরদিনের মত কোণঠাসা করে রাখা হয়। কয়েক ডজন ক্ষমতালোলুপ স্বার্থান্বেষী স্তাবক চাটুকারদের দ্বারা পরিবৃত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে অগণতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সকল পথ যখন বন্ধ তখন গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের আদর্শে বিশ্বাসী দলের সদস্যদের দেশ ও আদর্শের স্বার্থে 'ননকনফরমিজম'-এর পতাকা তুলে ধরা কি কর্তব্য নয়? 'দল কখনও ভুল করে না' 'রাজা কখনই অন্যায় করেন না' তত্ত্বের মতই কি মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার সমতুল্য অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নয়? মধ্যযুগীয় 'Divine Right of King' স্বেচ্ছাচারিতার ছাড়পত্র এই তত্ত্বের মত Theory of Divine Right of the Party—তত্ত্বকে কি কোন যুক্তিবাদী আদর্শবাদী মেনে নিতে পারেন? কমিউনিস্ট দলের বেলায় যে প্রশ্ন-তর্ক সেই একই প্রশ্ন বা তর্ক মার্কসবাদী দলগুলি সম্বন্ধেও করা চলে। দল যে আদর্শকে ঘিরে থাকে—তার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করে—সেই আদর্শ থেকে দল যখন সরে আসে,—যে যুক্তি দেখিয়েই হোক না কেন,—তখনই প্রশ্ন দেখা দেবে আদর্শটা বড় না দলের সাইনবোর্ড দলীয় তকমা, দলীয় শৃঙ্খলাটি বড়। কোন্‌টা প্রাধান্য পাবে? যদি সর্বঅবস্থাতেই দলীয় শৃঙ্খলাটা বড় হয়ে দাঁড়ায় তাহলে দলের সকল ভুল ভ্রান্তি অন্যায়কেই মুখ বুজে মেনে নিতে হয়। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এদেশে তাঁর দলের নাম নিয়ে যে স্বৈরতন্ত্রের রথ ছুটিয়েছেন যে গুরুতর অন্যায় কাজগুলি করে যাচ্ছেন, দেশের মৌল স্বাধীনতাগুলিকে যেভাবে হরণ করে নিলেন নয়া ফ্যাসিস্ট ও স্তালিনবাদী কায়দায় তা অমার্জনীয় অন্যায় অপরাধ জেনেও দলের সকলকে 'দলত্যাগীর' 'অপবাদের' হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য মেনে নিতে হয়। দলের মধ্যে আদর্শ নীতিটাই যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সর্বঅবস্থায় কর্মীদের আদর্শকেই

অনুসরণ করে চলা কর্তব্য একথা ডক্টর লোহিয়া একদিন সমাজতন্ত্রীদের শুনিয়েছিলেন। দলের ভ্রান্ত নীতির প্রতিবাদে তাঁকেও দল থেকে বার হয়ে এসে নতুন দল গড়তে হয়েছিল। আবার বৃহত্তর স্বার্থে সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টিকে ভেঙে দিয়ে কয়েকটি দলকে মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ সমাজবাদী দল গড়তে ডাক দিয়েছিলেন। মহানায়ক সুভাষচন্দ্রকেও একদিন তাই করতে হয়েছিল। চিন্তানায়ক মানবেন্দ্রনাথ রায়কেও দল গুটিয়ে চিরতরে অবলুপ্ত করে পার্টিবিহীন গণতন্ত্রের জন্য আহ্বান জানাতে হয়েছিল আদর্শ মূল্যবোধকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে। [New Humanism,—M. N. Roy; Beyond Communism—M. N. Roy] মার্কসিস্ট দলের আদর্শ-বিচ্যুতি কৌশল-সর্বস্বতা, শৃঙ্খলাতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব-তত্ত্বের অসারতা চিন্তানায়ক মানবতাবাদী মিলোভান জিলাস নির্ভীকভাবে ব্যক্ত করেছেন তাঁর স্মরণীয় রচনা—New Class ও The Unperfect Society—এই দুই মূল্যবান গ্রন্থে। মানবতাবাদী সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশজী স্বাধীনতা-উত্তর যুগে যিনি ভারতে স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে অহিংস গণবিপ্লবের নূতন পথ দেখিয়ে গণমুক্তির নব ভগীরথ হয়ে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রইলেন—তিনিও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অপরিহার্যতার কথা শোনালেন। পার্টিবিহীন গণতন্ত্রের কথা Communitarian Society-র কথা তিনিও জীবনের অপরাহ্ণবেলায় বিভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী দলগুলিকে কংগ্রেস দলের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সার্থকভাবে লড়বার জন্য দেশে গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত করার জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ পার্টি গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন। রাজনৈতিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দেশবাসী বিভিন্ন দলকে বিলুপ্ত করে ফেডারেল পার্টি গঠনের আহ্বানকে স্বাগতই জানাবে। কেননা বহুদলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রের সহায়ক হয় না। ইতিহাসের ইঙ্গিতও তাই। 'সর্বহারাশ্রেণীর গণতন্ত্রে' শোষণমুক্তির জন্য শ্রমিক ও মেহনতী শ্রেণীর জন্য চাই ব্যাপকতম গণতন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেখানে তত্ত্বগতভাবে শ্রমিকশ্রেণীর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার কথা—সেখানে শৃঙ্খলার অগ্রাধিকার-তত্ত্বের নামে, দলের ও নেতৃত্বের অভ্রান্ততা তত্ত্বের নামে শ্রমিকশ্রেণীকে এবং শ্রেণীসংগঠনগুলিকে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে দলীয় অনুশাসনের বেড়ি পরিয়ে শৃঙ্খলিত করে রাখার কোন যুক্তিই থাকতে পারে না। এস্ট্যাবলিশমেন্টের সঙ্গে সংঘর্ষে সংঘাতের অধিকার হরণ করার অর্থ শ্রমিকশ্রেণীর শ্বাসরোধ করা, নৈতিক দিক

থেকে শ্রমিকশ্রেণীকে পঙ্গু করে রাখা। তাছাড়া যেহেতু পুঁজিবাদী শাসন-ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর আত্মিক রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক বিকাশকে রুদ্ধ করার ষড়যন্ত্র চলে সেইহেতু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমাজবিবর্তনের নিয়মের পথে মনুষ্যত্বের বিকাশের অন্তরায় সকল বাধা ও বেড়িগুলিকেই সরিয়ে ফেলতে হবে। বঞ্চিত শ্রমিকশ্রেণীর জীবনকে সকল দিক দিয়ে ঝলমলিয়ে তোলার জন্যই গণতন্ত্রকে সর্বব্যাপী উদার গতিশীল জীবন্ত কবে তোলা অপরিহার্য। সমাজকে এগিয়ে যেতেই হবে সামনের দিকে। ক্রম-বিকাশকে ক্রম-বিনাশে পরিণত করার রাজনৈতিক চক্রান্তকে রাজনীতি-সচেতন সুশিক্ষিত সজাগ শ্রমিকশ্রেণী কখনই মেনে নেবে না।

৫

সমাজতন্ত্র ও বহু-দলীয় ব্যবস্থা

(ক)

সমাজতান্ত্রিক দেশে একাধিক দল থাকবে না কেন? তার পেছনে তত্ত্বগত যুক্তি কি আছে? মার্কসবাদীরা বলেন শ্রেণী-জর্জর সমাজেই বহু-দলের অস্তিত্ব সম্ভব—শ্রেণীহীন সমাজে নয়। এ প্রসঙ্গে জনৈক মার্কিন সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে স্তালিন যা বলেছিলেন তা উল্লেখ করছি:

"Once there are no classes, once the barriers between classes are disappearing, there remains only something in the nature of a not at all fundamental difference between various little strata of the socialist society. There can be no nourishing soil for the creation of parties struggling among themselves. Where there are not several classes there can not be several parties, for a party is part of a class." (Stalin): [Revolution Betrayed : p. 266—67 ; By L. Trotsky]

বিবদমান শ্রেণী-জর্জর সমাজই বিবদমান রাজনৈতিক দলের সূতিকাগৃহ। সমস্যাটাকে ভারতবর্ষের আঙ্গিকে বিচার করা যাক। এদেশে কমপক্ষে এক ডজন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল আছে। প্রতিটি দলই মার্কস এঙ্গেলস্-লেনিনের নৈষ্ঠিক অনুরাগী বলে দাবী করে থাকেন। তাহলে এই বিবদমান মার্কসিস্ট দলগুলিও কি শ্রেণী-ভিত্তিক? ভারতের সংঘাতশীল শ্রেণী-জর্জর সমাজ-ব্যবস্থাই কি এতগুলি বিবদমান মার্কসিস্ট দলের জন্ম-রহস্যের কারণ? এই বিপুল সংখ্যক দলগুলিতেও কি শ্রেণী-সংঘাত প্রতিফলিত হচ্ছে? [কিছুকাল পূর্বে কিউবা রাষ্ট্রের নেতা ফিডেল ক্যাস্ট্রো হ্যানয় সম্মেলন থেকে হাভানায় প্রত্যাবর্তনের পথে স্বল্পক্ষণের জন্য দমদম বিমানবন্দরে অবস্থানকালে পশ্চিম বাংলার বেশ কয়েকটি মার্কসবাদী দল তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে গেলে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদী এক বিশিষ্ট নেতাকে বিস্ময়সহকারে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"এদেশে এতগুলি মার্কসবাদী দল গজিয়ে উঠল কি ভাবে?" মার্কসিস্ট নেতারা

পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছিলেন। এই সোজা প্রশ্নের কোনই উত্তর দিতে পারেননি] ভারতের বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার এতগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কসবাদী দলের সকল সদস্যরাই—তর্কের খাতিরেই ধরে নিতে হবে—মেহনতী-শোষিত-বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষ। তাহলে এই শোষিত মেহনতী শ্রেণীর মানুষরা বা নাগরিকরা কেন মিলে-মিশে একটি জাতীয় সর্বভারতীয় মার্কসিস্ট-দলের সভ্য হয়ে অন্যান্য মার্কসিস্টদলের অস্তিত্বের অবসান ঘটাচ্ছেন না? মেহনতী শ্রেণীর মানুষের স্বার্থ সঠিকভাবে কোন্ দল রক্ষা করতে সক্ষম—কোন্ দলের এ ব্যাপারে সততা নিষ্ঠা ও সংগ্রামমুখিনতা বেশী—কোন্ দল মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে অথবা সমাজতান্ত্রিক মতবাদকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে তাকে নিভুর্ল পদ্ধতিতে রূপায়িত করতে সক্ষম—এইসব জটিল প্রশ্ন নিয়েই কি তাহলে এই দলগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত? তাই যদি হয়—তাহলে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় ভারতে একটিমাত্র সমাজতান্ত্রিক বা মার্কসবাদী দল থাকবে (One-Party State) তার যুক্তি কি?

এ সম্বন্ধে অপর এক গ্রন্থে আলোচনা করেছি [মার্কসবাদ-লেনিনবাদ: তত্ত্বে ও প্রয়োগে] প্রতিভাধর চিন্তাবিদ মহা-বিপ্লবী ট্রট্স্কী—যিনি রুশ-বিপ্লবের অন্যতম মুখ্য নায়ক ছিলেন—তিনি নিজেই স্তালিনের এই যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করেছেন। মেহনতী শ্রেণীর মধ্যেও তো দ্বন্দ্ব-সংঘাত রয়েছে। ট্রট্স্কী বলছেন:

"In reality classes are heterogeneous; they are torn by inner antagonisms and arrive at the solution of the common problems no otherwise than through an inner struggle through tendencies, groups and parties. It is possible with certain qualification to conclude that 'a party is part of a class.' *But since a class has many 'parts' some look forward some look back—one and the same class may create several parties.* For the same reason one party may rest upon parts of different classes. An example of only one party corresponding to one class is not to be found in the whole course of political history—provided of course you do

not take the police appearance for reality." [Revolution Betrayed ; L. Trotsky—P. 267.]

বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে শ্রেণীগুলিও যেন এক একটি পাঁচমিশালি ব্যাপার। এক একটি শ্রেণী এক একটি বিশিষ্ট সুরেই সামগ্রিক-ভাবে বাঁধা নয়। একই শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত রয়েছে। এই আভ্যন্তরীণ সংঘাত রূপ নিয়ে থাকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে, বিভিন্ন দলের মধ্যে দিয়ে। আবার কখনও বা একই দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী ঝোঁক বা প্রবণতার মধ্য দিয়ে। কিছুটা ব্যাখ্যাসহ বলা যেতে পারে রাজনৈতিক দল একটি শ্রেণীর অংশ মাত্র এবং যেহেতু প্রতিটি 'শ্রেণীর'ই অনেকগুলি 'অংশ' আছে—কিছু 'অগ্রাভিমুখী' কিছু 'পশ্চাদাভিমুখী'—একই শ্রেণী একাধিক দলের প্রেরণা জোগাতে পারে। আর এই একই কারণে একটি রাজনৈতিক দল বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন অংশের সমর্থন-পুষ্ট হতে পারে। সমস্ত রাজনৈতিক ইতিহাসে একটিমাত্র দলই একটিমাত্র শ্রেণীকে প্রতিনিধিত্ব করেছে—এর নজির মিলবে না।

ট্রট্স্কী স্তালিনের যুক্তির অন্তঃসারশূন্যতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলেন যদি স্তালিনের বক্তব্য যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হয় তাহলে সমাজ-তান্ত্রিক রাশিয়াতে বিভিন্ন দলের অস্তিত্বই নয়—এমনকি একটি দলের অস্তিত্বের বাস্তব বা তাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তাও থাকে না।

"...From his reasonings it follows not only that there can be no *different* parties in the Soviet Union, but there can not even be *one* party For where there are no classes there is in general no place for politics. Nevertheless, from this law Stalin draws a 'sociological' condition in favour of the party of which he is the General Secretary."

"রাশিয়াতে যদি সত্যি বিভিন্ন বিবদমান শ্রেণী বিলুপ্ত হতেই থাকে তাহলে রাশিয়াতে কোন দলেরই অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এরকম সমাজে রাজনীতির সুযোগই তো নেই বা থাকতে পারে না। তবে স্তালিন তাঁর নিজস্ব তত্ত্বকে এক-পার্টি একনায়কত্বের সমর্থনে ব্যবহার করে গেছেন মাত্র।"

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অনেক মৌল প্রশ্ন শাসকদল বা দলের সদস্য-সমর্থক ও জনসাধারণের কাছে উত্থাপিত হবেই। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে কিভাবে দল ও দেশ

এগুবে? অগ্রগতির হার বা বেগ কি রকম হবে? 'লক্ষ্য' যেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন—যে-পথ ধরে লক্ষ্যের অভিমুখে যাওয়া হবে—সেই 'পথের' প্রশ্নটিও ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কোন্ পথ ধরে লক্ষ্যের দিকে এগুনো হবে—সেটা কে স্থির করবে? আর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বের উৎসই যদি সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে থাকে যা স্তালিন দাবী করেছেন—তাহলে একাধিক দলের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ করার প্রয়োজনই বা থাকে কি করে? বরং বিপরীতটাই হওয়া উচিত। দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ওপর আরোপিত সমস্ত বিধি-নিষেধ-নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়াই তো যুক্তিযুক্ত এবং দলের ঘোষিত কার্যসূচীর সঙ্গে সেটা সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

"There are other questions : How go toward socialism, with what tempo etc. The choice of the road is no less important than the choice of the goal. Who is going to choose the road? If the nourishing soil for political parties has really disappeared then there is no reason to forbid them. On the contrary, it is time, in accordance with the party programme to abolish "all limitations of freedom whatsoever" [Leon Trotsky : Revolution Betrayed, P. 268]

এই কথাগুলি সকল 'সমাজতান্ত্রিক' দেশ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। একটি তথাকথিত শ্রেণী-ভিত্তিক মার্কসবাদী দলের মধ্যে কতগুলি অংশ ('parts') থাকতে পারে তার প্রমাণ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের (বিজয়ওয়াড়া অধিবেশন) রিপোর্ট থেকেই বোঝা যায়। দলের মুখপাত্র সম্মেলনের সাফল্যের কথা বিবৃতি দিয়ে প্রচার করতে গিয়ে হিসাব দিয়েছেন যোগদানকারী প্রতিনিধিদের মধ্যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতিনিধি কত, শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর প্রতিনিধি কত, গরীব ও মাঝারি কৃষকদের প্রতিনিধি সংখ্যার আনুপাতিক হার কত, যুবকদের সংখ্যা কত ইত্যাদি। [আনন্দবাজার পত্রিকা, Statesman প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত পার্টির প্রতিবেদন]

আবার ধরা যাক বিজয়ওয়াড়ায় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট কংগ্রেসকে কেনই বা 'কংগ্রেস অব ইউনিটি' বলে ঘোষণা করা হল? কি চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, কি রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিও এই রকম ঘোষণা করে থাকে? ভারতের

সি. পি. আই. ; সি. পি. এম.-এর সঙ্গেও এ ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। যদি মতভেদ না-ই থাকবে দলের পথ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে, তাহলে ঐক্যের কথাই বা বলা কেন? বিজয়বাড়ায় সি. পি. আই. দলের 'মধ্যপন্থীরা' জয়ী হয়েছেন। যাঁরা শাসক দলের সাথে প্রকাশ্যে ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের মত যেমন গ্রাহ্য হয়নি, তেমনি আবার যাঁরা বর্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের তথাকথিত প্রগতিশীল অংশের চাইতে দেশের 'বামপন্থী' দলগুলির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবার ওপর জোর দিয়েছিলেন তাঁদের পরামর্শও অগ্রাহ্য হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, দলের মধ্যে মতভেদ স্পষ্টতই রয়েছে। রাজনৈতিক পথ (Political line) কি হবে—তা নিয়ে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট (এম. এল.) দলের মধ্যেও দ্বন্দ্ব-সংঘাত রয়েছে। দল ডানে হেলবে, কি বামে হেলবে অথবা মাঝ-পথ ধরে এগুবে এ নিয়ে সব সময় বিতর্ক দলের মধ্যে থাকবে। তাহলে একটি মার্কসবাদী দলের মধ্যেই তো চিন্তার বিভিন্নতার, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রবণতা বা বিশেষ ঝোঁকের 'নারিশিং সয়েল' (স্তালিনের কথা) থেকে যাচ্ছে। তাহলে সমাজতান্ত্রিক সমাজে রাজনৈতিক বিরোধিতার অধিকার কেন কেড়ে নেওয়া হবে অথবা স্বাভাবিক কারণে তা লুপ্ত হবে? এর পেছনে তাই কোন দৃঢ় রাজনৈতিক দর্শন বা তত্ত্ব নেই—আছে শাসন ও প্রভুত্বের—একচেটিয়া অধিকার ভোগ করা—পুলিশ, গোয়েন্দা, মিলিটারি এবং উচ্চ-পর্যায়ের আমলাদের যোগসাজস।

একটি শ্রেণী-ভিত্তিক মার্কসবাদী দল সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের শ্রেণী-ব্যাখ্যা এভাবে করছেন কেন? এরূপ দলে তাহলে বিভিন্ন প্রবণতা, ঝোঁক, 'গ্রুপিং' তো থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং বহু-দলীয় গণতান্ত্রিক রাজ-নীতি ও সমাজতন্ত্র পরস্পর-বিরোধী বা সঙ্গতিবিহীন যাঁরা বলেন তাঁরা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প যাঁদের রাজনৈতিক আদর্শ তাঁদের ভ্রান্ত তত্ত্বের ও একপেশে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ইতিহাস ব্যাখ্যার আড়ালে এদেশে একদলীয় স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা আমদানির বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হবে। এমনিতেই তো মস্কো-অনুগত একজন কংগ্রেস এম. পি. প্রকাশ্যেই 'সীমিত একনায়কত্বে'র পক্ষে প্রকাশ্যে ওকালতি করেও সরকারীভাবে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কর্তৃক তিরস্কৃত বা নিন্দিত হননি। কংগ্রেসের 'প্রগতিশীল' অংশ বলে প্রচারিত গোষ্ঠী এই মারাত্মক তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি মন্তব্যও করেননি।

একটি মার্কসবাদী দলের বিভিন্ন ফ্রন্টীয় সংগঠন থাকে—যেমন, কৃষক সংগঠন, শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, যুব সংগঠন, ছাত্র সংগঠন ইত্যাদি। এও তো বলা যেতে পারে 'শ্রেণী সচেতন' সংগ্রামী 'শ্রেণী'র—এগুলি বিভিন্ন অংশ ('parts')। প্রতিটি অংশের সদস্যরাই একইভাবে চিন্তা করবেন—কাজ করবেন এ কি করে সম্ভব? এইসব বিভিন্ন অংশের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত থাকা একান্ত স্বাভাবিক। দ্বন্দ্ব-সংঘাত বিভিন্ন প্রবণতা সত্ত্বেও তার বাহ্যিক প্রকাশ না থাকলে বুঝতে হবে পুলিশী সন্ত্রাসের ভ্রূকুটির সম্মুখে তা স্তব্ধ। এইসব ফ্রন্টীয় সংগঠনগুলিই তো বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দলের 'nourishing soil'—উর্বর ভূমি। রুশ অনুগত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে একাধিক প্রবণতা বা ঝোঁক পরিলক্ষিত হচ্ছে কেন? তাহলে কি কমিউনিস্ট পার্টিও প্রতিদ্বন্দ্বী সংঘাতশীল শ্রেণীর মিলনভূমি? আর বিভিন্ন বিবদমান শ্রেণী-স্বার্থ এই দলে মিলিত হয়ে রয়েছে বলেই কি এই দল বিভিন্নমুখীনতা বা আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্বের উপযোগী 'উর্বর ভূমি'? একই জিজ্ঞাসা অন্যান্য মার্কসবাদী দল সম্বন্ধেও খুবই স্বাভাবিক।

দেশে একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল যদি না থাকে তাহলে সাধারণ নির্বাচনও একটা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। ভিক্টর সার্জে প্রশ্ন করেছিলেন: "What remains of October Revolution if every worker who permits himself to make a demand or expresses a critical judgment is subject to imprisonment? Oh, after that you can establish as many secret ballots as you please!"

"সমাজতান্ত্রিক 'অক্টোবর বিপ্লবের' পরিণতি কি এই যে, শ্রমিক কোন দাবী পেশ করলে অথবা সমালোচনা করলে তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে জেলে বন্দী করে রাখবে? সত্যিই তো এদের সবাইকে জেলে বন্দী রেখে যত ইচ্ছা গোপন স্বাধীন ভোটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে!" [স্বাধীন বাধামুক্ত ন্যায়-ভিত্তিক নির্বাচন সম্বন্ধে ভারতবর্ষেও সকল বিরোধী দলগুলি এবং বিশেষ করে সর্বোদয় নেতা মানবতাবাদী জয়প্রকাশ নারায়ণ এই মৌল প্রশ্নই তুলেছেন। আর, অথচ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও জয়প্রকাশ নারায়ণের স্বাধীনতা-উত্তর যুগের ভারতের বৃহত্তম অহিংস গণ-আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করে যাচ্ছেন—এর মধ্যে কোনই আকস্মিকতা নেই।] রাশিয়ায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী সমাজতন্ত্রের বাধাহীন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরও সেই দেশ একটিমাত্র দলেরই অস্তিত্বের

উপযোগী 'উর্বর-ক্ষেত্র' ('nourishing soil') বলে গণ্য হবে কোন্ যুক্তিতে? শ্রেণী-হীন সমাজ-ব্যবস্থা কেন পার্টি-হীন গণতন্ত্রে তথা—'নৈরাজ্যবাদে' (Anarchism) রূপান্তরিত হল না? ট্রট্স্কী প্রশ্ন করেছিলেন:

"The ruling party which enjoys a monopoly in the Soviet Union in the political machine, in the bureaucracy which in reality has something to lose and nothing more to gain. It wishes to reserve the nourishing soil for itself alone."

[Leon Trotsky]

রাশিয়ায় রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন আমলাতন্ত্রেরই রাজনৈতিক হাতিয়ার মাত্র। এই ব্যুরোক্র্যাসীর আর নূতন করে পাবার কিছু নেই। তবে হারাবার ভয় আছে। তাই এই আমলাতন্ত্র নিজের একচেটিয়া ক্ষমতাকে আঁকড়িয়ে থাকার জন্যেই—নিজের অস্তিত্বের উপযোগী 'পুষ্টিকর জমিকে' রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। অনগ্রসর পিছিয়ে-পড়া দেশে পুঁজিবাদী শোষণ-অশিক্ষা-দুর্নীতি-দারিদ্র্য-অবক্ষয় জনগণের অপরিসীম অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে স্বার্থপর ক্ষমতালোভী ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা কুচক্রী আমলা পুলিশ মিলিটারির সাহায্য নিয়ে নিজেদের গোষ্ঠীতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং দীর্ঘমেয়াদী করার জন্য এই ধরনের 'nourishing soil' তৈরী করার জন্য স্তালিনবাদী কায়দার আশ্রয় নিতে পারে। গণতন্ত্র-সচেতন রাজনীতি-সচেতন নাগরিকদের সে বিষয়ে সজাগ থাকা কর্তব্য। আর এই ধবনের 'nourishing soil'-এর সবুজ বিপ্লব থেকে লাভবান হয় হৃদয়হীন কলুষ-ক্লিষ্ট আমলাতন্ত্র। আমলাতন্ত্রই পছন্দসই সাজান নেতাদের ও তাঁদের আশ্রিত দলকে 'পোলিটিক্যাল মেশিন'-রূপেই ব্যবহার করে থাকে। কমিউনিস্ট শাসন-ব্যবস্থা তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্তমাত্র।

ভারতবর্ষে এই রাজনৈতিক তর্ককে কেন্দ্র করে জনমত সংগঠিত হওয়া উচিত। শাসকদলের ভিতর থেকেই এই রাজনৈতিক তর্ক সুরু প্রয়োজন ছিল। দুঃখের কথা, শাসকদলের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী এই সব তর্ককে সর্বশক্তি দিয়ে চাপা দিয়ে যে-কোন প্রতিদ্বন্দ্বী মত বা দৃষ্টিভঙ্গীকে হুমকি দিয়ে কখনও পোষা গুণ্ডার সন্ত্রাস, কখনও পুলিশ লেলিয়ে জেলের ভয়, রুটি-রুজি কেড়ে নেবার ভয়, কখনও বা রাজনৈতিক ব্ল্যাক মেইল দ্বারা স্তব্ধ করতে সদা চেষ্টিত।

রাশিয়া, পূর্ব-ইউরোপের বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশ—চীন ও অন্যান্য দেশের ইতিহাস থেকে অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে। যে-দল নিজের দলের ভিতরে ভিন্ন-মতাবলম্বীদের প্রতি সহনশীলতার পরিচয় দিতে দ্বিধা করে—সে দলের নেতৃত্ব বিরোধী দলের অস্তিত্বের প্রতি কি মনোভাব নিতে পারে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। রাশিয়াতেও বিপ্লবের সময় সাম্য, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি শোনান হয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবের অব্যবহিত পরই লেনিন গণ-পরিষদ (Constituent Assembly) ভেঙে দিলেন কেন? রাজনৈতিক বিরোধীদের অস্তিত্ব বিলোপ করা হল কেন সে দেশে?

ব্যক্তি-নেতার—তিনি যত মহানই হোন না কেন—ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা সদিচ্ছার মধ্যে এই গ্যারান্টি খুঁজতে যাওয়া হবে চরম মূঢ়তা। এই প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাবে প্রাপ্ত-বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত অবাধ স্বাধীন নির্বাচন-ব্যবস্থা দ্বারা নির্বাচিত পার্লামেণ্ট, সজাগ সচেতন বলিষ্ঠ জনমত, রাজনৈতিক বিরোধিতার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ব্যক্তি-মানুষের মানবিক অধিকারের স্বীকৃতি মর্যাদা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, স্বাধীন নির্ভীক সংবাদপত্র এবং স্বাধীন নির্ভীক নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থার মধ্যেই। এই গণতান্ত্রিক রক্ষাকবচগুলি বিনষ্ট করে দেশে গণতন্ত্র বা 'জনগণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার বাগাড়ম্বর যাঁরা করেন তাঁদের শাসন শোষণের স্থায়িত্বের গ্যারান্টি বন্দুকের নলের প্রহরা, সন্ত্রাস, গণভীতি, গণ-অজ্ঞতা।

(খ) সমাজতন্ত্র ও বহু-দলীয় ব্যবস্থা

রাশিয়ায় ১৯৩৬ সালের স্তালিন-সংবিধানকে স্তালিন নিজেই সবচেয়ে গণতান্ত্রিক সংবিধান বলে ঘোষণা করতে গিয়ে সমালোচকদের সমালোচনার উত্তরে বলেছিলেন :

"I must admit that the draft of the new Constitution does preserve the regime of the dictatorship of the working class, just as it also preserves unchanged the present leading position of the Communist Party of the U. S. S. R.······We Bolsheviks regard it as a merit of the Draft Constitution.

As to freedom for various political parties, we adhere to somewhat different views A party is a part of a class, its most advanced part. Several parties and consequently freedom for parties can exist only in a society in which there are antagonistic classes whose interests are mutually hostile and irreconcilable—in which there are, say, capitalists and workers, landlords and peasants, kulaks and poor peasants etc. But in the U. S. S. R. there are no longer such classes as the capitalists, landlords, kulaks etc. In the U. S. S. R. there are only two classes—workers and peasants whose interests far from being mutually hostile are, on the contrary, friendly. Hence there is no ground in the U. S. S. R. for the existence of several parties and consequently for the freedom for those parties. *In the U. S. S. R. there is ground only for one party, the Communist Party. In the U. S. S. R. only one party can exist*, the Communist Party which consequently defends the interests of the workers and peasants to the very end." [From Report To The Eighth Congress Of Soviets, November 25, 1936]

"একথা আমি অবশ্যই স্বীকার করব সোভিয়েট রাশিয়ার খসড়া নূতন সংবিধানে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বকে এবং রুশ কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রণী ভূমিকাকে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। আমরা বলশেভিকরা সংবিধানের এই দুই বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ অলঙ্কার বলেই মনে করি। বিভিন্ন ও বহুবিধ দলের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি কিন্তু। একটি দল একটি শ্রেণীর একটি অংশ-বিশেষ—এবং সেই শ্রেণীর সবচাইতে অগ্রগামী অংশ। যে-সমাজে পরস্পর-বিরোধী শ্রেণী আছে—সেই সমাজেই একাধিক দল থাকতে পারে এবং তাই তাদের স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠতে পারে। পুঁজিপতি, শ্রমিক, বড় জোতদার ও কৃষক, গরীব কৃষক এদের স্বার্থের সমন্বয় সম্ভব নয়। রাশিয়াতে এই ধরনের বিবদমান প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণীই নেই। এদেশে আছে কেবল শ্রমিক আর কৃষক শ্রেণী। এদের পরস্পরের মধ্যে কোন স্বার্থের দ্বন্দ্ব-সংঘাত নেই। এদের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ। তাই রাশিয়ায় বহুবিধ দলের অস্তিত্বের কোন অবকাশই নেই। তাই কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্য কোন দলের স্বাধীনতার কথাই উঠতে পারে না। এদেশে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিরই টিকে থাকার অধিকার আছে। এই দলই সাহসের সঙ্গে শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করে চলবে শেষ পর্যন্ত।"

[স্তালিন: নভেম্বর, ১৯৩৬]

একই কথা স্তালিন অন্যভাবেও অন্যত্র বলেছেন। আগের এবং ওপরের দুটো বক্তব্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কমিউনিস্ট রাশিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্য কোন দলের কোন স্থান নেই একথাটা খুব পরিষ্কারভাবেই বলেছেন। স্তালিনের বক্তব্যের পেছনে যে-যুক্তি তিনি উত্থাপন করেছেন তা কত দুর্বল তা আলোচনা করেছি। এখন প্রশ্ন, ভারতের মার্কসবাদী দলগুলি স্তালিনের এই বক্তব্যের সঙ্গে কি একমত হবেন? সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে পরিচালিত সর্বভারতীয় আন্দোলনে সি. পি. আই. ছাড়া অন্যান্য মার্কসবাদী দলগুলি সামিল হতে চান বলে বলা হচ্ছে। 'সর্বাত্মক বিপ্লব'— ত্বরান্বিত করার আন্দোলনের মূল ভিত্তি গণতান্ত্রিক-মানবিক মূল্যবোধ। এক-পার্টি শাসন-ব্যবস্থার স্তালিনবাদী ব্যাখ্যার সঙ্গে জয়প্রকাশজীর দৃষ্টিভঙ্গীর কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে কি? আবার জাতীয় কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে ভারতের বন্ধু রাষ্ট্র রুশ কমিউনিস্ট পার্টি ও রুশ-অনুগত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গীরই কি কোন সাদৃশ্য আবিষ্কার করা যাবে?

জাতীয় কংগ্রেসের সহযোগী মিত্র দল সি. পি. আই. কি এই স্তালিনবাদী ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত? ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের হাতে কোন দিন কোন কারণে গেলে তারা কি স্তালিনবাদী কায়দায় সি. পি. আই. ভিন্ন অন্য সকল রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ করবে না?

গণতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের মার্কসবাদী দলগুলির কাছ থেকে বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট মতামত দাবী করা উচিত। জয়প্রকাশজী যে 'দলহীন গণতন্ত্রে'র কথা আদর্শ হিসাবে জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন—ভারতের মার্কসবাদীরা, আজ যাঁরা তাঁর অনুগামী হতে চাইছেন তাঁরাই কি সেই আদর্শে বিশ্বাসী আদৌ? যদি মার্কসীয় শ্রেণী-ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়াও যায়—তাহলে শ্রেণীহীন সমাজে কোন দলেরই অস্তিত্বের প্রয়োজন হবে না। কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বের অবকাশও তো থাকবে না। কমিউনিস্টরা কোন দেশে ক্ষমতায় এলেই ঘোষণা করে থাকেন সে দেশে ধনিক শ্রেণী লুপ্ত হয়েছে—শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর শাসন চালু হয়েছে। তাহলে কমিউনিস্ট দলের একনায়কত্ব বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন কোথায়?

মার্কসিস্টরা 'দলহীন গণতন্ত্রের' আদর্শ মেনে নেবেন না। কিন্তু জয়প্রকাশজীর শরিক হয়ে অন্তত কমিউনিস্ট দলের 'অগ্রণী ভূমিকা' ('leading role')-তত্ত্বও কি বর্জন করতে রাজী হবেন? এই সব মৌল প্রশ্ন এড়িয়ে যদি কৌশল হিসাবে নিছক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই 'সার্বিক বিপ্লবের' স্লোগান মার্কসবাদী মঞ্চ থেকে সমর্থন করা হয় তাহলে দেশের জনগণ তো এটা কৌশল-সর্বস্ব রাজনীতিরই অঙ্গ হিসাবে ধরে নেবেন। কৌশল-সর্বস্ব রাজনীতির হাঁড়ি-কাঠে সার্বিক বিপ্লবের আদর্শ বলি হবে। গণতন্ত্র বাঁচাবার জন্য যে লড়াই সেই লড়াই কি শেষ পর্যন্ত 'গণতন্ত্রকে' প্রকৃত লক্ষ্যরূপে রেখেই এগুতে পারবে? ভারতের মার্কসবাদীরা তাঁদের নিজ নিজ মঞ্চ থেকেই চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট নেতা আলেকজাণ্ডার ডুবচেকের মত, যুগোশ্লাভিয়ার চিন্তাবিদ অনন্ত-সংগ্রামী প্রাক্তন কমিউনিস্ট মানবতাবাদী নেতা মিলোভান জিলাস্ অথবা ইতালীর প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা টগ্লিয়াত্তির মত গণতান্ত্রিক আদর্শকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে পারেন। ভারতেও তাঁরা ডুবচেক্-টগ্লিয়াত্তি-জিলাসের মত একটা নূতন উজ্জ্বল নজির সৃষ্টি করতে পারেন। এ পরিবর্তন হবে হৃদয়ের পরিবর্তন। সমাজতন্ত্রকে গণতন্ত্রের সঙ্গে সমন্বিত করার মৌল প্রশ্নটি মোটেই

কোন রাজনৈতিক কৌশলের প্রশ্ন নয়, আদর্শের প্রশ্ন। আবার ভারতের সি. পি. আই. কি করে যৌথভাবে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে জয়প্রকাশ-বিরোধী অভিযানে পার্টনার হতে পারেন বোঝা দুষ্কর। সি. পি. আই. সর্ব অবস্থাতেই সোভিয়েট শাসন-ব্যবস্থার সমর্থক—রুশ কমিউনিস্ট পার্টির অনুগত। এই দল কি নীতিগত তত্ত্বগত কারণে এক-পার্টি শাসন-ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছেন? ডিক্টেটরশিপের নীতিতে এই দল অটল। এই দলই আবার গণতন্ত্র রক্ষার জন্ত কংগ্রেসের শরিক হয়ে জয়প্রকাশজীর সমর্থকদের 'গৃহযুদ্ধের' জুজুর ভয় দেখাচ্ছেন।

ভারতের মার্কসবাদী রাজনৈতিক দলগুলি ডুবচেক-জিলাসের দৃষ্টান্ত থেকে যেমন প্রেরণা নিয়ে মার্কসবাদী মঞ্চ থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে নূতন 'ম্যাগ্‌না কার্টা' ('Socialism with human face') উত্থাপন করতে পারেন—তেমনি তাঁরা কাউৎস্কীর বক্তব্যটিও 'সাবিক বিপ্লব'-তত্ত্বের আঙ্গিকে পুনর্বিবেচনা করে গণতন্ত্রের আদর্শকে তুলে ধরতে পারেন। কাউৎস্কী বলেছিলেন :

"Moreover, the road of force requires greater sacrifices than the road of democracy. It is much easier to prevail upon a person to vote Socialist than it is to move him to give up his job or life.

Force is therefore not a method by which working class party can advance in a democracy or achieve results that can not be achieved by democratic methods. Democracy is the shortest, surest and least costly road to Socialism, just as it is the best instrument for the development of the political and social pre-requisites for socialism. Democracy and Socialisim are inextricably entwined."

[Karl Kautsky : Social Democracy versus Communism.]

"গণতন্ত্রের পথ ছেড়ে হিংসার পথ ধরে এগুতে গেলে অনেক বেশী ত্যাগ ও কষ্ট বরণ করার জন্ত প্রস্তুত থাকতে হয়। অনেক সহজে একজনকে সমাজতন্ত্রীকে ভোট দিতে রাজী করান যায়, কিন্তু সেই একই ব্যক্তিকে নিজের জীবন ও

জীবিকা উৎসর্গ করতে রাজী কয়ান অনেক কঠিন কাজ। তাই গণতন্ত্রে কোন শ্রমজীবী শ্রেণীর শরিক দলের পক্ষে হিংসার পথে এগুনো অনেক কঠিন কাজ এবং এই হিংসার পথে লক্ষ্যে পৌছুনও অনেক কঠিন। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌছুতে গণতন্ত্রই সবচেয়ে ছোট, সুনিশ্চিত এবং সবচেয়ে কম কষ্টসাধ্য পথ, সমাজতন্ত্রের উপযোগী ও সহায়ক সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্র-ভূমি তৈরির শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র দুটো তত্ত্বই অচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি করেইপ্লতিয়ে ওঠে।" [কার্ল কাউৎস্কী]।

জয়প্রকাশজীর সকল সমর্থকরা এই বক্তব্যকে সমর্থন করতে রাজী আছেন তো? জয়প্রকাশজীর নিজের জীবন-দর্শন নিঃসন্দেহে এই সমন্বয় দর্শনের ওপরই সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অন্য সকলেই কি সমাজতন্ত্রকে সমান আগ্রহ ও নিষ্ঠাসহকারে গ্রহণ করেছেন বা করবেন? সকলেই কি আবার সমান আন্তরিকতার সঙ্গে গণতন্ত্রের আদর্শকে গ্রহণ করবেন? সার্বিক বিপ্লব তত্ত্বের সমর্থকদের কাছে এটা সত্যিই একটা চ্যালেঞ্জ। জয়প্রকাশজী গণতন্ত্র ও অহিংসার নীতিতে অটল। তিনি তাঁর চিন্তাধারা দিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের এমন কি পশ্চিমবাংলার উগ্রপন্থী বলে পরিচিতদেরও প্রভাবান্বিত করতে পারছেন। এটাও তাঁর একটা বড় অবদান। অদৃষ্টের পরিহাস, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেসের তথাকথিত 'প্রগতিশীল' অংশ তাঁর নিরলস ঐতিহাসিক প্রচেষ্টাকে 'ফ্যাসিস্ট' ও গণতন্ত্র-বিধ্বংসী বলে বিরামহীন প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন।

গণতন্ত্র যেমন অহিংসার নীতিকে, শান্তিপূর্ণ গণ-আন্দোলন ও সংগ্রামের অপরিহার্যতা মেনে নেয় তেমনি গণতন্ত্রই বহুমত প্রকাশের 'উর্বর ভূমি' ('nourishing soil')। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কখনই এক-পার্টির অস্তিত্বের 'উর্বর ভূমি'রূপে গণ্য হতে পারে না। যতদিন না আচরণের দ্বারা ভারতের মার্কসবাদীরা বা কমিউনিস্টরা দেশের গণ-মানসে ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারবেন যে, তাঁরা স্তালিনবাদী বা লেনিনবাদী একদলীয় শাসন-ব্যবস্থার বিরোধী এবং সমাজবাদী রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় শাসক কমিউনিস্ট দলকেই একমাত্র দলরূপে কাজ করতে দেবার অধিকার-তত্ত্বটি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাহসিকতার সঙ্গে খণ্ডন করছেন, ততদিন কমিউনিস্ট বা মার্কসিস্টদের 'গণতন্ত্র রক্ষার' আন্দোলন সীমিত লক্ষ্য সাধনের হাতিয়াররূপেই চিহ্নিত হয়ে আসবে। কথায় ও কাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে আত্মীয়তা অর্জন করতে

হবে, শুধু 'ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।' মার্কসবাদীদের কাছে জয়প্রকাশ নারায়ণের অহিংস গণ-আন্দোলন তত্ত্ব এক অগ্নিপরীক্ষায় সমতুল্য। বৃহত্তর লড়াই-এর দিকে পিঠ ফিরিয়ে শুধুমাত্র 'সিভিল লিবার্টি' প্রতিষ্ঠার লড়াইকে দেশবাসীর একটি বৃহৎ অংশ কৌশল-সর্বস্ব রাজনীতির অঙ্গ হিসাবে চিহ্নিত করলে তাকে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত মন্তব্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। আর ভারতের বিভিন্ন দলের মার্কসবাদীরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এক-পার্টি শাসনের অপরিহার্যতা-তত্ত্ব খণ্ডন করে এবং সে-রাষ্ট্রে রাজনৈতিক বিরোধিতার অধিকারকে সমাজতন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ বলে স্বীকার করে নিয়ে 'গণতন্ত্র রক্ষায়' লড়াই-এ এগুলে, ভারতের মাটিতে ভারতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি-মনীষা ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে সমন্বিত 'ভারতীয়' সমাজতান্ত্রিক ভাবধারাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করবেন। তাঁদের প্রতি পদে রাশিয়া অথবা চীনের পথ-নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণার জন্য চেয়ে থাকতে হবে না। সে সমাজতন্ত্র হবে ভারতীয়তার মৌল স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জল। সেই পথে কি মার্কসবাদীরা এগুবেন?

মার্কসবাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যাকে অবলম্বন করে ভারতে অনেকগুলি মার্কসবাদী দল গড়ে উঠেছে। এ দলগুলি মিলে-মিশে একটি মাত্র মার্কসিস্ট দলে রূপান্তরিত হতে পারেনি আজও। তত্ত্বের বিভিন্ন ব্যাখ্যার ব্যাপারে কোন দলই সূচ্যগ্র জমিও ছাড়তে রাজী নন। তাহলে প্রশ্ন করা যেতে পারে, ভারতে যদি কোনদিন মার্কসিস্ট দলগুলির সম্মিলিত মোর্চা কেন্দ্রে একক-সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে শাসনভার গ্রহণ করে তাহলে কি সেই সব দলগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে তারা একটি সর্বভারতীয় মার্কসবাদী দল গড়তে পারবে? তখন কি এই দেশ একটি মাত্র শ্রমিক কৃষকদের 'স্বার্থ-সংরক্ষক' দলের অস্তিত্বের 'উর্বর ভূমি' ('nourishing soil') বলে গণ্য হবে সকল গোষ্ঠীর মার্কসিস্টদের কাছে? না—তখনও মার্কসবাদী যুক্ত-ফ্রন্টের সকল শরিক দলই নিজ নিজ পৃথক অস্তিত্ব রক্ষা ও ক্ষমতার মাধ্যমে প্রভাব বৃদ্ধির জন্যই সদা-সচেষ্ট থাকবেন? ভারতের বুকে যুক্ত-ফ্রন্টীয় যুগের শাসন থেকে জনগণ সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাই একদলীয় শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে স্তালিনবাদী ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা সেই ধারণাকে নস্যাৎ করেছে।

বহু-দলীয় সমাজতন্ত্রের তত্ত্বটিকে অন্যদিক থেকেও বিচার করা যেতে পারে। ধরে নেওয়াই গেল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একটিমাত্র সমাজতন্ত্রী দল থাকতে পারে।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কৃষি-নীতি কি হবে, শিল্প-নীতি কি হবে, বৃহৎ শিল্পের ভূমিকা এবং ক্ষুদ্র কুটির-শিল্পের ভূমিকা কি হবে, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে কৃষিখামারে বুরোক্র্যাট টেক্‌নোক্র্যাট ম্যানেজারদের ক্ষমতা কতটা থাকবে, কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার কতটা থাকবে, ধর্মঘটের, আন্দোলনের অধিকার থাকবে কিনা, প্রতিরক্ষা, পুলিশ প্রশাসন খাতে কতটা ব্যয় হবে এবং উন্নয়ন খাতেই বা ব্যয় কতটা হবে—ভোগ্যপণ্য উৎপাদন-বৃদ্ধি বেশী গুরুত্ব পাবে, না স্টীল উৎপাদন প্রতিরক্ষা সম্ভার উৎপাদন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে, রুটি-মাখনের জোগান বেশী করতে হবে—না বন্দুক-রাইফেল উৎপাদন ত্বরান্বিত করতে হবে, সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণ করতে হবে কিনা, কৃষি-শ্রমিক ও শিল্প-শ্রমিকের বেতনহার কি হবে, প্রশাসন ক্ষমতা অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত হবে—না বিকেন্দ্রিত হবে—এসব মৌল প্রশ্নগুলি নিয়ে শাসক সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট দলে প্রচণ্ড বিতর্ক হবেই। কিন্তু মার্কসিস্ট দলের মধ্যে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ ও প্রচারের, ভ্রূকুটি-মুক্ত বিতর্কের সুযোগ কোথায়? দেশের এই মৌল প্রশ্নগুলি নিয়ে কি জনগণের মতামত নেওয়া হবে না? সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কি শুধু দলের কর্মী নেতাদেরই? জনগণ কি রাজনৈতিক দলের হাতে মাটির তাল মাত্র—যা দিয়ে নেতারা ইচ্ছামত মূর্তি তৈরী করবেন? তাহলে সমাজতন্ত্রকে 'শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্র' বলে অভিহিত করাটা কি পরিহাস নয়? জনমতকে যদি প্রভাবিত করতে হয় অথবা জনগণের মতামতের ছাঁকনিতে যদি সিদ্ধান্তগুলি ঝাড়াই-বাছাই-ই করতে হয় তাহলে পত্র-পত্রিকা, প্রকাশন সংস্থা, মুদ্রণ-শিল্পের স্বাধীনতা থাকা চাই। তাই মার্কসবাদী ভাবধারায় পরিচালিত একটি রাষ্ট্রে যে একমাত্র দল কাজ করার সুযোগ ও অধিকার পাবে—সেই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সেই দলের মধ্যে ভিন্নমতাবলম্বীদের স্বাধীনভাবে নির্ভয়ে কাজ করার 'উর্বর ভূমি' ('nourishing soil') বলে সেই শাসকদলকে কি স্বীকৃতি দেবেন? স্তালিনবাদীরা এই প্রশ্নেরই বা কি উত্তর দেবেন?

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্র যদি একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্বের 'উর্বর ভূমি' বলে গণ্য হয় তাহলে সেই পার্টি এক এক সময় 'অতিবাম' (Ultra left), 'সঙ্কীর্ণতাবাদী' ('Sectarian'), 'রক্ষণশীল', 'উদারপন্থী'দের 'উর্বর ভূমি' হলো কেন? গোঁড়ামি (Dogmatism) অথবা শোধনবাদের (Revisionism) উর্বর ভূমি স্বাভাবিক নিয়মেই হতে পারে সেই দল। যুক্তির দিক

থেকে তাতে আপত্তিরই বা কি থাকতে পারে? তাহলে বিভিন্ন সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব কেনই বা 'অতিবাম', 'হঠকারী', 'শোধনবাদী', 'সঙ্কীর্ণতাবাদী'দের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে থাকেন? কেনই বা 'Capitulation' (আত্ম-সমর্পণ), 'Betrayal' (বেইমানী) বলে সোরগোল ওঠে বার বার কমিউনিস্ট দুনিয়ায়? 'Right deviation', 'Left deviation', 'ডান বিচ্যুতি', 'বাম বিচ্যুতি' সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে সমাজতন্ত্রের 'উর্বর ভূমিতে'ই তো অঙ্কুরিত হচ্ছে? তাহলে এই প্রবণতা দমন করার চেষ্টাই বা কেন হয়?"

রাশিয়ায় ট্রট্স্কী, জিনোভিভ্-পন্থীরা 'অক্টোবর বিপ্লবের' পর গ্রামাঞ্চলে 'তৃতীয় বিপ্লব' ত্বরান্বিত করার ডাক দিয়েছিলেন। শ্রেণীসংগ্রাম গ্রামাঞ্চলে তীব্রতর করার নামে সেই 'তৃতীয় বিপ্লবের' আন্দোলনকে দমন করা হল কেন? স্তালিন রাশিয়ার কৃষিনীতির নামে এক-এক সময় এক-এক ধরনের নীতি ঘোষণা করেছিলেন। খামারের রাষ্ট্রীয়করণ (Collectivization) নীতি এক-এক সময় এক-এক ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন কেন? কৃষিদ্রব্যের দাম-নীতি সম্বন্ধেও এই সুবিধাবাদী নীতি তিনি নিয়েছিলেন। তিনি যখন যে নীতিই নিয়েছেন রুশ দেশ তখন সেই নীতির 'nourishing soil' ছিল বলে ধরে নিতে হয় তাহলে। তাঁর অবিশ্বাস্য গণহত্যা ও গণ-নিপীড়ন নীতিও এইভাবে স্তালিনবাদীরা হয়ত সমর্থন করবেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে দল বা দলের আদর্শ-নীতি-কর্মসূচী বড় নয়—আসল কথা দলের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর প্রাধান্য। এই ক্ষমতালোভী গোষ্ঠীই নিজের প্রভুত্বের লোভে অন্য দলের অস্তিত্বই বিলুপ্ত করে না শুধু—দলের ভিতরে ও বাইরে অন্য কোন ভিন্ন-মতাবলম্বীদের অস্তিত্বও মেনে নেয় না। এই আচরণের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের কোনই সম্পর্ক নেই। স্তালিনবাদ আর যাই হোক সমাজবাদ নয়—সমাজবাদের বিকৃত অমানবিক দানবীয় রূপ।

দলে গণতন্ত্র ও আভ্যন্তরীণ সাংবিধানিক বিরোধিতা

কোন দেশের শাসকদল মুখে গণতন্ত্রের কথা ঘন ঘন ঘোষণা করলেই দেশবাসী ধরে নেবেন না যে, সেই দল সত্যি সত্যি গণতন্ত্রের আদর্শে প্রকৃতই বিশ্বাসী। দলের সংবিধান গঠনতন্ত্র আচরণ-বিধির কষ্টিপাথরেই তা যাচাই হবে। ক্ষমতাসীন দল হিসাবে অন্যান্য বিরোধী দলগুলির কাছে গণতান্ত্রিক আচরণ প্রত্যাশা করবে—অথচ নিজের দলের পরিচালনায় গণতন্ত্রের বাষ্পমাত্রও থাকবে না—এই দ্বৈত আচরণ কি দেশের ভিতরে, কি দলের ভিতরে গণতন্ত্রের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারে না। একটি দলের কার্যনির্বাহক সমিতি বা কেন্দ্রীয় কমিটি পলিট ব্যুরোতে যাঁরা সদস্য নির্বাচিত হন বছরের পর বছর যদি সেই একই সদস্যরা কার্যনির্বাহক সমিতি বা পলিট ব্যুরোতে বহাল থাকেন তাহলে দলের মধ্যেই একটা কায়েমী স্বার্থ গড়ে ওঠে। তাদের 'এস্‌ট্যাবলিশমেণ্ট'-এর প্রতিভূ বলা চলে। একটি দলে বছরের পর বছর একই ব্যক্তি যদি 'চেয়ারম্যান' অথবা 'সেক্রেটারী জেনারেল' থেকে যান তাহলে বুঝতে হবে দলের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীনভাবে মতামত বিনিময়ের কোন অবকাশ নেই। গণতন্ত্রের স্বার্থে এই অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। এ বক্তব্য—কি মার্কসবাদী দল, কি জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক দল সম্বন্ধে সমভাবে প্রযোজ্য।

যুগোশ্লাভিয়ায় সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা চলেছে দীর্ঘদিন ধরে সে দেশের নেতা মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে। বহু বিতর্ক বহু ঘাত-প্রতিঘাত-অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে যুগোশ্লাভিয়ায় 'লীগ অব কমিউনিস্ট দল' এগিয়ে চলেছে। সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রকে সমন্বিত করার বিরাট পরীক্ষা চলেছে সেদেশে। দলের নূতন সংবিধানে এখন প্রতি নির্বাচনে দলের নির্বাচিত কার্যকরী সমিতির সদস্যদের এক-চতুর্থাংশের পরিবর্তন আবশ্যিক করা হয়েছে (Rotation of party office)। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা গোপন ব্যালটে (Secret ballot) নির্বাচিত হবেন। থিওরির দিক থেকে অন্তত গোপন ভোটের মাধ্যমে অবাঞ্ছিত নেতাদের নেতৃত্ব থেকে অপসারণ করা সম্ভব। আর পরিবর্তন যাঁরা দাবী করবেন তাঁদেরও

থিওরির দিক থেকে শিরশ্ছেদের ভয় নেই। যুগোশ্লাভ পার্টির নূতন সংবিধানে নেতাদের প্রকাশ্য সমালোচনার অধিকারও দেওয়া হয়েছে। নূতন পার্টি সংবিধান সম্বন্ধে সরকারীভাবে বলা হয়েছে :

"The principle of democratic centralism should mean not only that decisions are made after free discussions or by democratically elected organs, but also that people who have not been convinced that decisions are correct, are allowed even after the decision has been made, in an appropriate manner and at appropriate places, to continue propagating their separate opinion , of course they are not allowed to slow down practical implementation of the decisions already made.…"

যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিস্ট দল মার্কসবাদী দল হিসাবে লেনিনের 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ'-নীতির (Democratic Centralism) পরিধি সম্প্রসারিত করেছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সাংগঠনিক সংস্থাগুলিতে অবাধ আলোচনা তর্ক-বিতর্কের পরই যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তাই নয়—যে সব সদস্যরা দলের সিদ্ধান্তগুলির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান থাকবেন তাঁদের দলের সদস্যরূপে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পরও বিপক্ষ মত প্রচারের স্বাধীনতা থাকবে। তাই বলে অবশ্য গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির কার্যকারিতাকে নষ্ট করার অধিকার স্বীকার করা হয়নি।

এই নীতি দলের মধ্যে অলিখিত অঘোষিত সাংবিধানিক বিরোধিতার অধিকারকে স্বীকার করারই নামান্তর। নিঃসন্দেহে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় এটি একটি খুব বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। অবশ্য রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে এখনও এই বিরোধিতার সুযোগই নেই। কমিউনিস্ট নেতা কার্ল র‍্যাডেক (Karl Radek, এঁকে স্তালিনের জল্লাদরা গুলি করে মেকী বিচারের নামে হত্যা করেছিল) সোভিয়েট রাষ্ট্র-ব্যবস্থার নিষ্ঠুর নিষ্পেষণী শক্তির সমালোচনা করতে গিয়ে এক সময় বলেছিলেন :

"Once Russia was under the rule of a matriarchy, then a patriarchy ruled ; now we are entering the age of *secretari-*

"রাশিয়ার সমাজ-ব্যবস্থায় অতীতে একসময় পরিবারের কর্ত্রীস্বরূপ নারীরই কর্তৃত্ব বা শাসন ছিল। তারপর এল পরিবারের পুরুষ-কর্তার প্রভুত্বের যুগ। এখন আমরা সেক্রেটারী-তন্ত্রের যুগে প্রবেশ করছি।" দলের শাসনের নামে দলের সেক্রেটারীরই প্রভুত্ব চলে থাকে।

র‍্যাডেকের কথাটা ছোট্ট হলেও একটা মূল সত্য এতে রয়েছে। পার্টি শাসনের যুগে সর্বত্র একটা সন্দেহ ও ভীতির পরিবেশ থাকে। দলের অন্যায়ের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোন সদস্যই মুখ খুলতে সাহস পান না। কারুর সম্মান ও জীবন খোয়ানোর ভয়, কারুর বা পদোন্নতির লোভ। দুর্বিনীত জবরদস্ত পার্টি আমলাদের (Party bureaucrats) দখলে থাকে রাজনৈতিক দলের কার্যালয়। পিরামিডের মত স্তরে স্তরে ছোট-বড় পার্টি আমলারা দলকে পরিচালিত করেন। নিরীহ নিগৃহীতের আর্তনাদের প্রতি তাঁরা উদাসীন। সাধারণ সদস্য ও নাগরিকের দল ক্ষমতা ও সাফল্যের পূজারী এবং অনুগামী হয়ে পড়েন।

দলের ভিতরে ও বাইরে সন্দেহ ভীতির পরিবেশ আবার দলের সভ্যদেরই শুধু নয়, অন্য দলের সদস্য ও নেতৃত্বকেও অনুকরণের মোহে আচ্ছন্ন করে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টি শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়ে বুর্জোয়া দলের (Clerical party) পদ্ধতি অনুকরণ করে। বিরোধী গণতান্ত্রিক দলগুলিও কমিউনিস্ট দলের পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে থাকে। কেন্দ্রীয় পার্টি-যন্ত্র (Party machine) একটা যন্ত্র-দানবে পরিণত হয়। ক্ষমতা দ্বারাই ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ এবং বশীকরণ (Taming of power), ক্ষমতার বিকীরণের দ্বারাই ক্ষমতার দাপট নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ করা সম্ভব। সেইজন্যে দলের ভিতরে দলের প্রভাবশালী আমলা, মাতব্বর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের দোর্দণ্ড প্রতাপ খর্ব করা প্রয়োজন। তার জন্যই দরকার দলের অভ্যন্তরে দলীয় সংবিধান (Party statutes) দ্বারা ক্ষমতার বিভাজন ও বিকেন্দ্রীকরণ। দলের ভিতরে ও বাইরে সাংবিধানিক বিরোধিতার (Constitutional opposition) পরিবেশ সৃষ্টি শুধু আচরণ-বিধি দ্বারাই নয় বিরোধিতার, প্রকাশ্য সমালোচনার অধিকারকে সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক গ্যারান্টি সৃষ্টি করার প্রয়োজন আছে।

পার্টি তহবিল আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। রাজনৈতিক দলগুলি বিপুল অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় করে থাকে ইচ্ছামত। কোথা থেকে এই বিপুল অর্থ (নির্বাচনের খরচ আরও বিপুল অর্থ সংগৃহীত হয়, মার্কসবাদী দল সমেত সব দলই করে

তবে কম বেশি) কিভাবে ব্যয় হয়, সংগৃহীত হয় তার কৈফিয়ৎ হিসাব-নিকাশ দেশবাসীকে বা দলের সাধারণ কর্মীদের দেওয়া হয় না। লোকচক্ষুর আড়ালে এই অর্থ সংগ্রহ ও যথেচ্ছ ব্যয়ের অবাধ সুযোগ দলের মধ্যে নৈতিক মানের অবক্ষয় টেনে আনে অনিবার্যভাবেই। দলের নৈতিক জীবন কলুষিত হয়। এই সব দলের গোপন খবর জানার অধিকার শুধুমাত্র দলের চালকশক্তি গোষ্ঠীতন্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যদি দলের আভ্যন্তরীণ জীবন অর্থ ও নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা দ্বারা কলুষিত হয় তাহলে জনজীবনও কলুষিত হতে বাধ্য। "নিজেদের বেলায় দোষ হবে না—জনগণের বেলায় যত দোষ—অথবা শাসনকারী দলের বেলায় যত দোষ" এ যুক্তি অচল হয়। রাজহংসের জন্য যা চাট—রাজহংসীর জন্যও তাই হবে না—কেন? তাই দেশে কোনদিনই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যতদিন না শাসকদল গণতন্ত্রের মৌল নীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠছে। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হাতে যখন অবাধ একচেটিয়া রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রাভূত হয় আর সেই ক্ষমতার অধিকারীরূপে যখন সেই দলের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীই (Caucus) সমগ্র দলকে চালনা করে তখন দলের সাধাবণ সদস্যদের মধ্যে আসে একটা প্রচণ্ড উদাসীনতা। তার থেকে দলের আদর্শ-কর্মসূচী সম্বন্ধে সদস্যদের মনে ঔদাসীন্যের ভাব জাগে। গণতন্ত্রের ভিত্তি য দ সদা-সচেতন সদা-জাগ্রত গণমত বলেই গণ্য হয়—তাহলে যে-দল গণতন্ত্রের আদর্শেব ঢাক পিটোবে সেই দলের সদস্যদের বেলায়ও কি ঐ একই যুক্তি প্রযোজ্য হবে না? যে দল নিজের দলের সাধারণ সভ্যদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখে সেই দল কি কখনও দেশে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারবে? "মুখে যা বলি তাই কর—আমরা কাজে যা দেখাই তা অনুসরণ করো না"—এই দ্বৈত নৈতিকতা আজ সকল রাজনৈতিক দলের আচবণকে গ্রাস করেছে। এ অবস্থা থেকে কি পরিত্রাণ নেই? দলতন্ত্র কি তাহলে গণতন্ত্রেব অবলুপ্তিরই সূচনা করে? পার্টি শাসন-ব্যবস্থা কি গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার সহায়ক হতে পারে না? রাজনীতিতে কিন্তু এই নৈরাশ্যের এই অবিশ্বাসের কোন স্থান নেই। দলের মধ্যে 'contest of opinion', 'free competition [illegible]' থাকা চাই। তা না হলে দলতন্ত্রের নামে গোষ্ঠীতন্ত্রের একনায়[illegible] [illegible] হবে দেশে একদিন।

ইগ্‌নেজিও সিলোন্‌, ইতালীয় প্রখ্যাত সমাজতান্ত্রিক নেতা, সমাধান হিসাবে কয়েকটি প্রস্তাব রেখেছিলেন :

(1) The members of the party bureaucracy must be guaranteed a living standard equal to that of number of corresponding categories in private (only a non-precarious economic situation can free the officials from their obligation to serve the ever-shifting leaders).

(2) No bureaucrats of whatever rank can serve as delegates to the Conventions (This rule has the same political and moral justification as the law which forbids political activity to State officials).

(3) The members of the party executive and of the national administration can not be candidates for political elections (This rule which to the interested parties may seem sheer folly is currently in force in some Scandinavian Workers' Parties and was also a regulation of Italian Socialist Party before 1919, with excellent results).

(4) A Commission appointed at the party or union convention including the representatives of the minorities, must be able to examine the financial reports, and, if necessary, all the administrative documents of the organisation. This same control must be put into effect on the local level.

(5) Free contacts, exchanges and friendships among members ought to be fostered by the organisation of clubs and by periodicals devoted to cultural and political matters. [Article By—Ignazio Silone : "Party Machire and Democracy"—Published in Magazine 'DISSENT'—Winter 1958, pp. 50—54]

(১) দলের আমলাদের মর্যাদা নিয়ে খেয়ে-পড়ে বাঁচার মত জীবিকার মান সুনিশ্চিত করা দরকার। তাঁদের মত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবনে যা উপার্জন করে থাকেন পার্টির কার্য-নির্বাহক সমিতির সদস্যদের জন্য সেই ধরনের ব্যবস্থা থাকা দরকার। পার্টির কর্মকর্তাদের যদি প্রতিনিয়ত বাঁচার জন্য দলের বড় কর্তাদের দয়ার ওপর নির্ভর করে থাকতে হয় তাহলে স্বাধীনভাবে বিবেকসম্মত উপায়ে তাঁদের কাজ করা সম্ভব হয় না। নেতৃত্বের পরিবর্তন হলেও এই ধরনের পার্টি আমলারা সকল অবস্থাতেই যাঁরাই নেতা হয়ে আসুন তাঁদেরই কুর্ণিশ করতে অভ্যস্ত হন।

(২) দলের কোন আমলা কোন সম্মেলনে বা কনভেনশনে দলের প্রতিনিধিরূপে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী হতে পারবেন না। সরকারী অফিসার বা কর্মচারীরা রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ নিতে পারেন না এই ধরনের যে বিধিনিষেধ আছে, পার্টি আমলাদের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত এই নিয়ন্ত্রণ অনেকটা এই ধরনেরই।

(৩) দলের কার্য-নির্বাহক সমিতির সদস্যরা অথবা জাতীয় প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত নেতারা দেশের রাজনৈতিক নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। ইতালীর সমাজতন্ত্রী দলে ১৯১৯ সালে এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ চালু ছিল। সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতি দেশের শ্রমিক দল ও ইউনিয়নগুলিতে এই ধরনের আইন বলবৎ রয়েছে।

(৪) দলকে নিয়মিতভাবে কমিশন নিয়োগ করতে হবে। এই কমিশন দলের অর্থসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পরীক্ষা করে রিপোর্ট পেশ করবেন। শুধু তাই নয়—দলের প্রশাসন সংক্রান্ত ও সমুদয় বিষয়গুলি এই কমিশনের বিচারের অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। এই কমিশনে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিও থাকা চাই। এই ধরনের কমিশন গঠন করে নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষা-ব্যবস্থা দলের কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে আঞ্চলিক পর্যায়েও প্রসারিত করতে হবে।

(৫) অবাধ মত-বিনিময় যোগাযোগ বন্ধুত্ব সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে দলকে সদস্যদের জন্য। এই ধরনের কাজে সকল সদস্যদের উৎসাহিত করার দায়িত্ব নিতে হবে দলকে। তার জন্য প্রয়োজন ক্লাব সংসদ সমিতি [illegible] এবং সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলি নিয়ে নিরন্তর আলোচনা ও [illegible]কাশের জন্য পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করতে হবে বা সেই কাজে উৎসাহ দিতে হবে।

মার্কসবাদী সমাজবাদী আন্দোলনে জীবন উৎসর্গ যাঁরা করেছিলেন তাঁদেরই একজনের মনে এইসব প্রশ্ন জেগেছিল। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ভাবাদর্শে যারা অনুপ্রাণিত তাদেরও অতীতের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক দলগুলির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে দলের মধ্যে গোষ্ঠীতন্ত্রের যথেচ্ছাচারের উলঙ্গ বিকাশকে প্রতিরোধ করার জন্য দলের অভ্যন্তরেই সাংবিধানিক বিধি-নিষেধের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ও সামঞ্জস্য আনার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি দলের নেতাদের শুভেচ্ছা বা সদিচ্ছার ওপর অথবা আত্ম-সংযম বোধের ওপর কখনই ছেড়ে দেওয়া যায় না। রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বেচ্ছাচারিতার উদ্ভবকে রুখতে আত্ম-সংযম, স্বেচ্ছা-নিয়ন্ত্রণ অথবা শুভবুদ্ধির শাসন যে কত দুর্বল প্রতিষেধক, ইতিহাস তার ভূরি ভূরি সাক্ষ্য বহন করছে। 'দলের নেতা খুব মহৎ, অতএব ব্যাপারটা তাঁর ওপর ছেড়ে দেওয়া হোক' এই ধরনের মনোভাব শুধু অবৈজ্ঞানিক অরাজনৈতিকই নয়, অন্ধ নেতা-পূজার আবিল মানসিকতা থেকেই এর জন্ম হয়।

অনেক রাজনৈতিক দলে বেতনভুক্ সর্বক্ষণের (whole-timer) কর্মী ও নেতা আছেন, বিশেষ করে মার্কসবাদী দলগুলিতে। দলের নেতৃত্বের পরিবর্তন হলে এই সর্বক্ষণের কর্মী ও মাঝারি নেতাদের ভাগ্য পরিবর্তন ঘটে থাকে।

যে-সব কর্মী ও নেতা দীর্ঘদিন ধরে দলের সর্বক্ষণের কর্মীরূপে দলের আদর্শে জীবন উৎসর্গ করেছেন—তাঁরা দলের নীতি বা নেতৃত্বের সমালোচনা নির্ভয়ে করেন না কেন? আইনগত তো কোন বাধা নেই, নীতিগত বাধা তো নেই-ই। পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তরের বড় আমলাবা দলের তহবিল নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। কোন্ কোন্ সর্বক্ষণের কর্মী বা নেতা প্রতিমাসে কত মাসোহারা বা ভাতা পাবেন সেটা তো দলের সেক্রেটারিয়েট অথবা প্রভাবশালী ক্ষমতাশীল নেতাই স্থির করে থাকেন। দলের সাধারণ সম্পাদকই (মার্কসবাদী দলে বিশেষ করে) সর্বেসর্বা। তাঁর সমালোচনা হলে দলের কাছ থেকে শাস্তি পেতে হবে—সাময়িক বহিষ্কারের খাঁড়া সর্বক্ষণের কর্মীদের মাথার ওপর ঝুলবে। দীর্ঘদিন দলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যারা জড়িত—তাদের যদি দল থেকে সমালোচনার জন্য বহিষ্কার করা হয় কোন অলীক অপবাদ দিয়ে, তাঁরা যাবেনই বা কোথায়, করবেনই বা কি? নূতন কোন সংস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয় না, বিশেষ করে

কোন মার্কসবাদী লেনিনবাদীর পক্ষে একটি মার্কসবাদী দল থেকে বহিষ্কৃত হবার পর। দীর্ঘদিন ধরে যে রাজনৈতিক দলীয় সৌভ্রাতৃত্বের ছায়াতলে যাঁরা কাটিয়েছেন সেই সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিন্ন করে নিঃসঙ্গ একাকীত্বের পথে কোন কর্মী কি পা বাড়াতে চান? অনিশ্চিতের পথে পা বাড়াতে সাহস পান না তাঁরা। যে-দেশে মার্কসবাদী দল রাজনৈতিক ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত সেখানে কোন দলের সদস্য নেতৃত্বের বা দলীয় কার্যকলাপের সমালোচনা করলে কি মূল্য দিতে হয় তা কমিউনিস্ট দেশগুলির শাসক পার্টিগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। যুগোস্লাভ কমিউনিস্ট দলের যশস্বী সংগ্রামী মার্কসবাদী মননশীল নেতা মিলোভান জিলাস দলের সমালোচনা করে বছরের পর বছর নিজের দেশের কারাগারেই কাটিয়ে দিলেন। বিশ্ব-সাহিত্যিক সলঝেনিৎসিনকে নিজের মাতৃভূমি থেকে নির্বাসিত হতে হল অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদের মূল্যস্বরূপ।

মার্কসবাদে বিশ্বাসী যাঁরা তাঁরা বলেন অর্থনীতি নাকি রাজনীতি সংস্কৃতি কৃষ্টির নিয়ামক। তাহলে একটি দলের অর্থ এবং তহবিল যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁরাই তো সেই নিয়মে দলের রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত করবেন। আবার দলের নীতি-কৌশল-রাজনীতি—সেক্রেটারিয়েটের যে আমলারা (Party bureaucrats) যাঁরা ক্ষমতাবলে পদাধিকার বলে এবং দলীয় সংবিধানবলে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন—(Party statutes) দলের তহবিল সংগ্রহ ও বন্টনের চাবিকাঠিও তাঁদেরই হাতে থাকবে। সাধারণ সদস্যরা তর্ক বিচার না করে—নেতারা যেদিকে যাবেন তাঁরাও সেই পথ অনুসরণ করবেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে দলের সংবিধানে যদি দলীয় গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক বিরোধিতার অধিকার সংরক্ষিত না হয়—সাংবিধানিক গ্যারান্টি দ্বারা যদি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ও বিকেন্দ্রীভূত না হয়—ক্ষমতাসীন বা বিরোধী রাজনৈতিক দল প্রকৃত গণতন্ত্রের শক্ত জমিতে দাঁড়াতে কখনই পারে না।

সিলোন্ নির্দিষ্ট সময় অন্তর পার্টি কমিশন বসিয়ে দলের প্রশাসন ব্যবস্থা নীতি-কৌশল-সিদ্ধান্ত-কার্যসূচী-তহবিল-আয়-ব্যয় সব কিছু নিয়ে সমীক্ষার কথা বলেছেন। গণতন্ত্রের স্বার্থে এটা একান্ত প্রয়োজন। এই সব কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা দরকার যাতে দেশবাসী ও দলের সকল স্তরের কর্মীরা সবকিছু জানতে পারেন। গোপনীয়তার অজুহাতে, বিরোধীদের শত্রুপক্ষের হাত জোরদার করার অজুহাতে এই সব সমীক্ষা কখনই বন্ধ হওয়া উচিত নয়।

সাধারণ নির্বাচনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়। কোথা থেকে এই বিপুল অর্থ আসছে—কারা দাতা—কারা গ্রহীতা—অর্থ কিভাবে সংগ্রহ এবং ব্যয় করা হয়েছে—এ সব কিছুই জনগণের চোখের আড়ালে—দলের সাধারণ সভ্যদের আড়ালে হবে কেন? নেতারা কি নিজেদের সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে প্রমাণ করতে আগ্রহী হবেন না? প্রতি নির্বাচনের পর ভারতে যে রাজনৈতিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি হয়ে থাকে প্রকাশ্যে তা চিরতরে বন্ধ করার জন্যও তো প্রকৃত তথ্য জনসমক্ষে আনা দরকার। এই ধরনের কমিশন গঠনে—নিয়মিত আভ্যন্তরীণ তদন্ত-পার্টির আয়ের উৎস, পার্টির সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ সম্বন্ধে জবাবদিহি যাঁরা করতে চাইবেন না—তাঁদের সদিচ্ছা সম্বন্ধে জনমানসে গভীর সন্দেহের উদ্রেক হবেই। কেন দেশের ছোট বড় রাজনৈতিক দলগুলি এ ব্যাপারে নূতন নজির সৃষ্টির জন্য এগিয়ে আসবেন না? ভারতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি যখন নির্বাচনের মাধ্যমে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে আস্থাবান (মুখে অন্তত) তখন এই নির্বাচনকে কলুষ-মুক্ত করা সকল দলেরই কর্তব্য। রাজনৈতিক দলগুলি বিপুল অর্থ ব্যয় করে থাকে। অর্থব্যয় করে নির্বাচনকে অন্যায়ভাবে ভাবিত করা হয়। অতএব দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের চাবিকাঠি এই নির্বাচন যাতে স্বাধীন এবং বাধামুক্ত (free and fair) হতে পারে, অর্থের দাপটে পার্টি আমলারা যাতে অবৈধভাবে দলকে প্রভাবিত করতে না পারেন তার রক্ষাকবচ দেশের নির্বাচন-সংক্রান্ত আইনে এবং দলের গঠনতন্ত্রেও থাকা চাই।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিরূপে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর হরিপুরার ঐতিহাসিক ভাষণটি বহু দিক দিয়ে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় দলিল বলে গণ্য। এই মহান নেতার বহুমুখী সৃজনশীল রাজনৈতিক প্রতিভা মনন ও গভীর দূরদর্শিতার স্বাক্ষর রয়েছে এই ভাষণে। সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা সম্বন্ধে বহু ভ্রান্ত ধারণা দেশের পাশ্চাত্য-ঘেঁষা বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী মহলে চালু আছে। অবশ্য আস্তে আস্তে সেই ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অপপ্রচারের মুখোশ অপসৃত হচ্ছে। রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও সমাজ-তন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর গভীর অনুরাগ এই ঐতিহাসিক ভাষণে উৎকীর্ণ রয়েছে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর রাজনৈতিক দল হিসাবে জাতীয় কংগ্রেস দলের কি ভূমিকা হবে সে বিষয়ে তিনি সুস্পষ্ট বক্তব্য দেশবাসীর কাছে রেখেছিলেন।

হালফিলের কিছু কংগ্রেস নেতা ও সভ্য প্রচার করে থাকেন কংগ্রেস দলকে দরিদ্রশ্রেণীর মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণের হাতিয়াররূপে গড়ে তোলার প্রয়াস নাকি ১৯৭১ সালেই সুরু। একথা আদৌ সত্য নয়। সুভাষচন্দ্র হরিপুরা ভাষণে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছিলেন :

"Moreover, if after the capture of political power, national reconstruction takes place on Socialistic lines, as I have no doubt it will,—it is the 'have-nots' who will benefit at the expense of the 'haves' and the Indian masses will have to be classified as 'have-nots'. [Haripura Address, February, 1938]

সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের যুগে যাঁরা দুধে-ভাতে আছেন সমাজে তাঁদেরই যারা নিঃস্ব রিক্ত পেছিয়ে-পড়া অবহেলিত তাদের উন্নতি সাধনের দায়িত্ব ও ব্যয়ভার বহন করতে হবে। ভারতের জনগণ রিক্ত নিঃস্ব শ্রেণীভুক্ত বলেই বিবেচিত হবেন। আর রাষ্ট্রের লক্ষ্য হবে রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন। তাই দারিদ্র্য নির্মূলীকরণের লক্ষ্য সুস্পষ্টভাবে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রই ঘোষণা করেছিলেন।

দেশের গণতান্ত্রিক বুনিয়াদ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বললেন : যাঁরা মনে করেন স্বাধীনতা অর্জনের পর কংগ্রেস দলকে দেশের শাসনভার অর্জন করার অর্থ এদেশে সমগ্রতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা (totalitarian) পত্তন করার পথ প্রশস্ত করা, তাঁরা ভ্রান্ত। এই অভিযোগ খণ্ডন করে তিনি বলেছিলেন :

" · · The State will possibly become a totalitarian if there be only one party as in countries like Russia, Germany and Italy. But there is no reason why other parties should be banned. Moreover, the party itself will have a democratic basis, unlike, for instance, the Nazi Party which is based on the 'leader principle'. The existence of more than one party and the *democratic basis* of the Congress party will prevent the future Indian State from becoming a totalitarian one. Further, the democratic basis of the party

will ensure that *leaders are not thrust upon the people from above but are elected from below.*" [Haripura Address]

"রাষ্ট্র সর্বস্ববাদী সমগ্রতান্ত্রিক হয়ে উঠবে যদি রাশিয়া (কমিউনিস্ট) জার্মানী (নাৎসী) ও ইতালীর (ফ্যাসিস্ট) মত অন্য কোন দ্বিতীয় দল কাজ করার সুযোগই না পায়। কিন্তু আগামী দিনের স্বাধীন ভারতে অন্য দলের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ করার কোন কারণই নেই। তাছাড়া কংগ্রেস দলকে গণতন্ত্রের ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। নাৎসী দলের মত নেতা-ভিত্তিক দল-রূপে কংগ্রেস বেঁচে থাকবে না। দেশে একাধিক দলের অস্তিত্ব এবং কংগ্রেসে দলের গণতান্ত্রিক ভিত্তি একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্ররূপ পরিগ্রহের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ-রূপে কাজ করবে। তাছাড়া যেহেতু কংগ্রেস দল গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, দলের নেতৃত্ব পার্টির সদস্যদের ওপরে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হবে না। নেতা নির্বাচন করবে দলের সাধারণ সদস্যরা।" নেতা-ভিত্তিক নাৎসী ধাঁচের দলের নেতৃত্ব ওপর থেকেই চাপিয়ে দেওয়া হয় দলের ওপর। সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যে কোন গোঁজামিল আছে কি? কোন জটিল তত্ত্ব কথার কচকচি নেই এই বক্তব্যে। গণতন্ত্রের অতি নিশ্চিত রূপটিই তিনি আমাদের কাছে তুলে ধরেছিলেন। দেশে যখন সমাজতান্ত্রিক রূপায়ণের কাজ সুরু হবে তখন দেশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপ রক্ষা করতে হবে দুটি উপায়ে :

(১) একাধিক অ-কংগ্রেস দলের রাজনৈতিক অস্তিত্ব এবং কাজ করার অবাধ অধিকার স্বীকার। তাহলে দেখা যাচ্ছে খাঁটি সমাজতন্ত্রী শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু বহু-দলীয় সমাজতন্ত্রের (multi-party socialism) সমর্থক ছিলেন। এখানে মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মৌল পার্থক্য ছিল। আবার সুভাষচন্দ্র সমাজতন্ত্র রূপায়ণের জন্য রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে পরিহার করার পরামর্শও দেননি। এখানেও মার্কসবাদীদের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী-জনিত মত-পার্থক্য সুস্পষ্ট। (২) শাসক দলকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে কাজ করতে হবে।

সুভাষচন্দ্র গণতন্ত্রকে মার্কসবাদী অথবা একশ্রেণীর তথাকথিত জাতীয়তাবাদী বা সমাজতন্ত্রীর মত নিছক কৌশল (strategy) হিসাবে দেখেননি আদৌ। কংগ্রেস দলের ভিতরে 'আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র' (Inner-Party Democracy) বিরোধীদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে

সুভাষচন্দ্রের অনুরাগ যে কত গভীর ও আন্তরিক ছিল তাও তাঁর হরিপুরা ভাষণ থেকে উপলব্ধি করা যায়। তিনি শুধুমাত্র একাধিক দলের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তার ওপরই জোর দেননি; কংগ্রেস দলের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেবার জন্য, দেশকে সমাজতন্ত্রের জন্য প্রস্তুত করার জন্য 'কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলকে' বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, কংগ্রেস সভাপতিরূপে কংগ্রেস দলের মধ্যে বামপন্থী শক্তি গোষ্ঠীগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই রাজনৈতিক উদারনৈতিকতার পরিচয় লেনিনও দিতে পারেননি। এই উদারতার পরিচয় মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও দিতে পারেননি। ইতিহাসের স্মৃতচারণ যাঁরা করবেন নিশ্চয়ই এইসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না।

সেদিন কংগ্রেসের অভ্যন্তরে 'কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের' সহাবস্থানের প্রতিবাদে যাঁরা মুখর ছিলেন, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের সদস্য না হয়েও সুভাষচন্দ্র তাঁদের সঙ্গে একমত না হয়ে ঘোষণা করলেন:

"Nevertheless, I must say that I have been in agreement with its (Congress Socialist Party) general principles and policy from the very beginning. In the first place, it is desirable for the leftist elements to be consolidated into one party. Secondly, a leftist bloc can have a *raison detre* only if it is socialist in character···· the role of the Congress Socialist Party or any other party of the same sort should be that of a left-wing group. Socialism is not an immediate problem for us. Nevertheless, socialist propaganda is necessary to prepare the country for socialism when political freedom has been won." [Haripura Address]

"কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের নীতি ও আদর্শের সঙ্গে আমি একমত শুরু থেকেই। প্রথমত, দেশের বাম-শক্তিগুলির সংহত হওয়া প্রয়োজন—একটি দলের মধ্যে। কংগ্রেসের ভিতরে বামপন্থী ব্লকের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা খুঁজতে

হবে তার সমাজতান্ত্রিক চরিত্রের মধ্যে। 'সমাজতন্ত্র' এখনই দেশের সমস্যা নয় (তখন দেশে মুক্তি আন্দোলনের যুগ)। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর দেশকে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে নিয়ে যাবার জন্য—দেশকে সমাজতন্ত্রের জন্য প্রস্তুত করার জন্য সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পক্ষে প্রচার দরকার। আর সেই কাজ করতে পারবে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের ন্যায় একটি সমাজতান্ত্রিক দল।"

[সুভাষচন্দ্র]

কংগ্রেসের সভাপতিরূপে দলের ভিতরে যিনি একটি সমাজতান্ত্রিক দলকে বামপন্থী সংহত গোষ্ঠী বা 'ব্লক'-রূপে কাজ করার অবাধ সুযোগ দেবার ওপর এত গুরুত্ব দিয়েছিলেন তিনি ক্ষমতালাভের পর দেশে রাজনৈতিক বিরোধী দলকে বাঁচাবার জন্য কত বেশি আন্তরিক ও আগ্রহী হবেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। দলের মধ্যে মতবাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মতামতের বাধাহীন প্রতিদ্বন্দ্বতা, 'contest of opinions', 'struggle of opiniors' 'competition of thoughts' প্রভৃতি যে-সব গুরুত্বপূর্ণ মৌল তত্ত্ব-কথাকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন রোজা লুক্সেমবুর্গ, ট্রট্স্কী প্রমুখ নেতারা—সেসব প্রশ্নে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতিরূপে সুস্পষ্ট ঘোষণা দেশবাসীর কাছে রেখে গেছেন। কংগ্রেসের প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের বাম-ঐতিহ্য এযুগে কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা বিস্মৃত। সমালোচনার মুখ বন্ধ। কুৎসিত চরিত্র হনন, পুলিশী তৎপরতা ও রাজনৈতিক ব্ল্যাক মেইল নির্ভীক সমালোচকদের প্রাপ্য বকশিস! প্রতিবাদ, সমালোচনা দলদ্রোহিতার সমতুল্য। নেতাদের প্রাক্-নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এবং নির্বাচনত্তোর যুগের সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ এবং সেই আচরণের কৈফিয়ৎ ও সমর্থন-সূচক ভাষণ, নেতাদের সংবাদপত্রের বিবৃতিই দলের রাজনৈতিক ইস্তাহার বা থিসিস (Manifesto)! নিজেদের আচরণ—নিজেদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও ঘোষণার প্রতি বিকট অট্টহাসি হানে—'রাজ মুকুটেরে করে নিত্য অপমান।'

৭

অর্থনৈতিক গণতন্ত্র

(ক)

রাজনৈতিক গণতন্ত্রের বিবর্তনের ইতিহাস এক অর্থে এবং গুরুত্বপূর্ণ অর্থেই কয়েকটি মৌল উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে দীর্ঘায়িত অসফল সংগ্রামেরই ইতিহাস। এই মূল লক্ষ্যগুলি কি? (১) স্বেচ্ছাচারী অত্যাচারী খামখেয়ালী শাসক বা শাসকশ্রেণীকে প্রতিহত করা, সংযত করা, (২) আইন-শৃঙ্খলার নামে স্থায়িত্বের (stability) নামে স্বেচ্ছাচারী শাসনের জায়গায় ন্যায়-ভিত্তিক সাংবিধানিক গণ-ইচ্ছা-নির্ভর জনকল্যাণধর্মী শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা, (৩) দেশের শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণকে প্রত্যক্ষ অংশীদার করা। এই দীর্ঘায়িত অসফল অসমাপ্ত সংগ্রামের মধ্যে অন্ধকারের পর পালাক্রমে আলোর যুগও এসেছে। কি উদারতন্ত্রের নামেই, কি শ্রেণী-অত্যাচার শ্রেণী-শোষণের অবসান, কি সমাজতন্ত্রের নামেই হোক—পৃথিবীর সকল দেশের সকল লড়াই সকল বিপ্লবের পেছনে এই আকাঙ্ক্ষাগুলিই আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু বিপ্লবের অব্যবহিত পরই বিপ্লবীদের বিপ্লবের কোর্তা ছেড়ে জবরদস্ত দক্ষ বাস্তববাদী শৃঙ্খলাবাদী কর্তৃত্ববাদী প্রশাসকের ভূমিকা নিতে হয়েছে, স্থিতাবস্থা বা প্রচলিত ব্যবস্থার প্রশংসাকীর্তনে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক'—এই শ্লোগান দেবার অধিকার বিপ্লবোত্তর কালে দেশের শাসকরা কেড়ে নিয়েছেন। 'বিপ্লব' মতবৈষম্য সেখানে দেশদ্রোহিতার দলদ্রোহিতার সমতুল্য বলে প্রচার করেছেন নয়া শাসকশ্রেণী।

রাজনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার লড়াই কিন্তু সুরু হয় ওপরতলার থেকেই ইংলণ্ডে। 'ম্যাগ্‌না-কার্টার' পেছনের ইতিহাস তাই বলে। ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের যুগে ব্যারন শ্রেণী-ই ছিল শক্তিশালী শ্রেণী। তারাই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে রুনীমিডের প্রান্তরে (Runnymede) ১২১৫ সালে সমবেত হয়ে রাজা জনের কাছ থেকে গণতান্ত্রিক অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছিল। তারপর ৭ শ' বছর ধরে চলেছিল একটার পর একটা সংগ্রাম, নানা উত্থান নানা পতন; দশ বছরের সামরিক একনায়কত্ব; রাজার মুণ্ডচ্ছেদ পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে

এসেছে সে দেশে নানাবিধ অধিকার, দলগঠনের অধিকার। ১৯১৭ সালে ইংলণ্ডে প্রথম নারীরা ভোটের অধিকার অর্জন করেন। রাজনৈতিক-অর্থ-নৈতিক অধিকারগুলি ওপরতলা থেকে ধীরে ধীরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নীচের তলার লোকেদের কাছে এসেছে।

ভারতবর্ষে ১৯৩৫ সালের ভারত আইনে নির্বাচন হয়েছে—সম্প্রদায় ভিত্তিতেই শুধু নয়, অতি সীমিত ভিত্তিতেও। শতকরা ১৩ জনের ভোটের অধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন হয়ে আসছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর সার্বজনীন যৌথ ভোট দানের ব্যবস্থা চালু হল। ইংলণ্ডের মত ভারতবাসীদের এই ভোটের জন্ম কয়েক শতাব্দী অপেক্ষা করতে হয়নি সত্যি। কিন্তু অধিকারকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখে গণতান্ত্রিক অধিকারের সার্থক রূপায়ণ বলে ব্যাখ্যা করলে ভুল হবে। রাজনৈতিক গ্রামোফোনে ফরমাসী গান বাজানোর সমতুল্য হবে। অর্থ নৈতিক গণতন্ত্রকে অবহেলা করে কেবলমাত্র ভোটের অধিকারকেই রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রকৃত চাবিকাঠি মনে করা মস্ত ভুল। 'রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে একটা বিশেষ কাঠামো-সর্বস্ব মনে করার খেসারত দিতেই হবে। দেশে একটার বেশি দলের অস্তিত্ব, একটা স্বাধীন বিচারালয় ও প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত বিচার-ব্যবস্থা, নির্বাচন-ভিত্তিক একটা আইনসভা, নির্দিষ্ট কয়েক বছর অন্তর অন্তর সাধারণ নির্বাচন এগুলো একটা দেশে থাকলেই ধরে নেওয়া হয়—দেশটি গণতান্ত্রিক। কিন্তু এটাই সব নয়; রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অবগুণ্ঠনের অন্তরালে স্বেচ্ছাতন্ত্রের তাণ্ডবও চলে থাকে। একথা ভুললে চলবে না।

যেখানে সমাজে অর্ধেকেরও বেশি লোক হঠযোগ অভ্যাস করে, অর্ধাহারে উপবাসে থেকেও শাসকশ্রেণীর সমস্ত ঘোষণা 'না খেয়ে কাউকে মরতে দেব না' —একথা প্রমাণ করার জন্ম টিকে থাকে—বেঁচে থাকে না, সে দেশের সেই হঠযোগীর দল প্রতিদিন খবরের কাগজ কিনে দেশ-বিদেশের খবর জানবে? রেডিও কিনে—'সংবাদ-পরিক্রমা' শুনবে? 'পল্লীমঙ্গল আসরের' কথা শুনে জানবে: গ্রামে গঞ্জে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম হু হু করে পড়ে যাচ্ছে, চোরাকারবারীদের মজুতদার মুনাফাবাজীদের শায়েস্তা করার সরকারী কৃতিত্বের সঙ্গে নিজেদের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে নেবার জন্ম? অথচ সংবাদপত্র রেডিও এগুলো তো জনমত তৈরীর গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আইনের শাসন (Rule of Law)? বিচারালয়কে যেখানে খোঁড়া করে রাখা হয়,

বিচারপতিদের স্বাধীন ও নির্ভীকভাবে কাজ করার অধিকার যেখানে খর্বতার অপমানে অপমানিত সেখানে আইনের শাসনের কথা উচ্চারণ করা কায়েমী স্বার্থের কপট আত্মদম্ভ ছাড়া আর কিছু নয়। বিনা বিচারে বছরের পর বছর শত শত মানুষকে কারাগারে বন্দী করে রাখার ব্যবস্থাকে, জেলখানায় বিচারাধীন বন্দীদের হত্যার প্রশ্রয় দেওয়াকে 'আইনের শাসন' 'রুল অব ল' বলে প্রচার করা দুঃসহ রাজনৈতিক প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়। শাসকশ্রেণীর স্তাবকতার নামে যে সমাজে জো-হুজুরের-দলে ভারী, রাজনৈতিক চাপরাশিবৃত্তি সৃষ্টি করার দিকে রাজনৈতিক নেতারা আগ্রহী, ভিন্ন সুরে কথা বলাটা যেখানে নিন্দিত—বিচারে নির্ভীক স্বাধীন রায় ঘোষণার মধ্যে সন্দিগ্ধ রাজনীতিবিদরা যেখানে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপকে আমন্ত্রণ জানাবার ভূত দেখেন – সেখানে গণতন্ত্র নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচার অধিকার থেকেই বঞ্চিত। শিশুর ভূমিষ্ঠ হবার অধিকার স্বীকৃত হল; আত্মীয়-স্বজনবা আনন্দে নূতন অতিথিকে শাঁখ বাজিয়ে অভিনন্দিত করলেন—অথচ শিশুকে মানুষ হয়ে বাঁচতে দেওয়া হবে না। স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থার টুঁটি টিপে ধরা হবে আর মুখে বলা হবে: আমরা আইনের শাসনে বিশ্বাসী, জঙ্গলের হিংসার আইনে নই!

আমাদের দেশে গণতন্ত্রের আকৃতিগত বাহ্যিক রূপটিই সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে। নিঃসন্দেহে এই কাঠামোটা গণতন্ত্রের কার্যকারিতার খুব বড় দিক। কিন্তু অন্তঃসারশূন্য কাঠামো-সর্বস্ব গণতন্ত্রকে খাঁটি গণতন্ত্র বলা যায় না। যেমন ধরা যাক, বহুদলীয় রাজনীতির প্রশ্নটা। এটাও তো গণতন্ত্রের বাহ্যিক রূপের একটা দিক। যে-দেশে দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের জীবনে প্রতিদিন দুবেলা এক-মুঠো অন্নের গ্যারান্টি নেই সে দেশে বা সেই সমাজে বিরোধী দল মেরুদণ্ড খাড়া করে দাঁড়াবে কি করে? দল যদি জনগণের দল হয়—তাহলে মুমূর্ষু ক্ষুধার্ত দারিদ্র্য-জর্জরিত মানুষদের নিয়ে দল হবে? সেখানে লঙরখানাই সমস্যার প্রতিকার বলে বিবেচিত হয়। লঙরখানার সাম্যবাদ-ধন্য পৃথিবীতে কোন দেশে মুমূর্ষু মানুষরা করেছে কখনও বিদ্রোহ? বিদ্রোহ করতে যাতে না পারে তার জন্যই তো লঙরখানার দানছত্র। বিদ্রোহ করার কথা ছেড়েই দেওয়া যাক। লঙরখানার দু-এক হাতা খিচুড়ি দিনের পর দিন আহার করে কবে কোথায় কোন্ সমাজে মানুষ শিরদাঁড়া সোজা করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পেরেছে? পরাধীন ভারতে অবিভক্ত বাংলায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

সময় প্রায় ৫০ লক্ষ বাঙালী প্রতিদিন 'ফেন দাও—ফেন দাও' করে কেঁদে মাথা কুটে নিষ্ফল আর্তনাদে অনাহারে মৃত্যু-যন্ত্রণা বরণ করেছিল (১৩৫০)। তখন দেশের মার্কসবাদী 'বিপ্লবীরা' 'জনযুদ্ধ-পন্থীরা' ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 'আগস্ট-বিপ্লব' এবং নেতাজীর নেতৃত্বে সংগঠিত আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মুক্তিযুদ্ধকে রুখবার জন্যে এই বাংলায় লঙরখানা খুলেছিলেন অগণিত। লাখ লাখ মানুষ মরেছে তবু খাবারের দোকান, খাদ্যশস্যের গুদাম কেউ লুঠও করেনি। কোন বিদ্রোহ তো হয়নি। দেশের মুক্তিযোদ্ধারা তখন কারান্তরালে।

দুবেলা জঠরের জালায় যারা তাড়িত হয়ে বেড়ায় তাদের কাছে 'গণতন্ত্র' 'বিপ্লব' এসব কথা অর্থহীন শিশুসুলভ প্রগলভতা। ঠাকুর বলতেন: 'পেটে খেলে তবেই ধর্ম সয়।' রুটির চিন্তায় যারা দিনরাত মগ্ন তারা অন্য চিন্তা করার সময় পাবে কি করে? অন্ন, ন্যূনতম-শিক্ষা, রোগে চিকিৎসা, মাথা গোঁজার নির্ভরযোগ্য স্থায়ী আশ্রয়, পরিধানে মোটা বস্ত্র, কর্মসংস্থান—এগুলিই ভোটের অধিকারকে প্রকৃত অধিকার রাজনৈতিক পরিবর্তনের মূল্যবান মাধ্যমে রূপান্তরিত করতে পারে যেখানে এগুলো নেই সেখানে ভোটের মাহাত্ম্য কীর্তন আত্মপ্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।

খেয়ে-পরে মাথা তুলে নাগরিকরা যেদেশে দাঁড়াতে পারে, যেদেশে সরকারী দাক্ষিণ্যের ওপরই দেশের সকল নাগরিকরা জীবিকার জন্য নির্ভরশীল নন সেখানে দলের অর্থের জন্য ব্যবসাদারদের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকদের শরণাপন্ন হতে হয় না। কর্মক্ষম কর্মরত নাগরিকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চিত দান ও সাহায্যের ওপর দল দাঁড়াতে পারে।

যেমন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের কথা ধরা যাক। সোভিয়েট রাশিয়ায় সকল চাকুরীই—কি খামারে, কলে-কারখানায়, কি অফিসে—সরকারী চাকুরী। বেসরকারী চাকুরীর কোন সুযোগ নেই। সরকারী চাকুরীয়াদের রাজনীতি নিষিদ্ধ হলে—সরকার-বিরোধী রাজনীতিতে নাগরিকদের অংশ নেওয়া কি ভাবে সম্ভব? সরকারের বিরোধিতা করলে চাকুরীই বা মিলবে কি করে? দানাপানির জন্য কনফরমিজ্‌ম্-এর পতাকা উড়িয়ে প্যারেড করতেই হবে সরকারী দলের সমর্থনে। আর এই ব্যবস্থাকেই 'শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্র' বলে প্রচার করতে হবে! স্তালিনোত্তর কালে ক্রুশ্চভ স্তালিনবাদের বীভৎসতায় ধিক্কার

জানিয়ে গণতন্ত্রীকরণের পথে চলার দিকে পদক্ষেপ যখন নেন তখন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ সংবাদ-সমালোচক সাংবাদিক পরলোকগত লুই ফিশার দিল্লীতে আয়োজিত এক সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন :

"There is fear even in democracies fear of being oneself, fear of telling the truth, fearing of differing with those in power. How much more so in a dictatorship where, even after de-Stalinization all jobs are government jobs ? There is no private employment in the Soviet Union. All publication is in the hand of the State. Every newspaper, book publishing firm, magazine, all films, television, radio, everything is in the hand of the State. Krushchev can, and a smaller Krushchev can, decide the economic and social fortune of any individual in the Soviet Union."

[Louis Fischer on 'Some Recent Changes In The Communist World' : A Pamphlet : P. 7]

" ..গণতন্ত্রেও নাগরিকদের ভয় আছে—সত্য কথা বলার অপরাধে ক্ষমতাসীনদের থেকে ভিন্নমত প্রকাশ বা প্রচার করার অপরাধে নিঃসঙ্গ হবার ভয়। গণতন্ত্রেই যদি এটা সম্ভব হয় তাহলে একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় কি হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। সোভিয়েত রাশিয়ায় নিস্তালিনীকরণের (De-Stalinization) পরও দেশের সমস্ত চাকুরী রাষ্ট্রের হাতে, বেসরকারী কর্মসংস্থানের কোনই সুযোগ নেই সেখানে। সকল সংবাদপত্র, প্রকাশনী সংস্থা, পত্র-পত্রিকা, সমস্ত সিনেমা-ছবি, রেডিও-টেলিভিশন সব কিছুই রাষ্ট্রের করায়ত্ত। সেই দেশে ক্রুশ্চভ কেন, একজন খুদে ক্রুশ্চভ-ও দেশের যে কোন নাগরিকের সামাজিক অর্থ নৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারেন চূড়ান্ত ভাবে।..." [লুই ফিশার]

রুজি-রোজগার, খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার অধিকার যদি রাজনৈতিক দলের কর্তাব্যক্তি মাতব্বরদের অনুগ্রহ বিতরণের ওপর নির্ভর করে তাহলে সেদেশে গণতন্ত্র খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পুলিশী জুলুম ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কাঠের নকল পায়া অবলম্বন করেই হাঁটে। আইনসভার প্রাধান্য ? আইনসভাকেও গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ বলা হয়ে থাকে। স্বাধীন নির্বাচন না হলে সাংবিধানিক

গণতন্ত্রের নৈতিক ভিত্তি বলে, কিছু থাকে কি? টাকা ছড়িয়ে অথবা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে অনুষ্ঠিত নির্বাচনকে প্রকৃত সচেতন গণমতের বহিঃপ্রকাশ বলে ধরা হবে কি? অসৎ উপায়ে, টাকা ছড়িয়ে নির্বাচনে যাঁরা জয়ী হয়ে আসেন আইনসভায়—কি বিধানসভায়, কি লোকসভায়—তাঁরা সংযত করবেন স্বার্থোন্মত্ত শাসক গোষ্ঠীকে? দলনেতাদের অন্যায় অবৈধ কাজের বিরুদ্ধে, দলের শাসন-রথের লাগাম টেনে ধরতে পারেন কখনও?

এই যে ভারতের সুপ্রীম কোর্টের নির্বাচনী ব্যয়-সংক্রান্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ রায়টিকে নাকচ করে দিয়ে কেন্দ্রীয় আইন-মন্ত্রক যে অর্ডিন্যান্সটি জারী করলেন—কই, তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ লোকসভার শাসকদলের কোন নির্বাচিত সদস্য তো করতে পারলেন না? অথচ এই অর্ডিন্যান্স ভারতে নির্বাচন-ভিত্তিক পরিষদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি টলিয়ে দেবে নিঃসন্দেহে। গরীব দেশের জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে লোকসভায় নির্বাচিত হতে হলে আইন মাফিক ৩৫,০০০ টাকা ব্যয়ের উর্ধ্বতন সীমাও যথেষ্ট বিবেচিত হচ্ছে না এখন। এর ওপর যে দলের তিনি প্রার্থী সেই দল পৃথক যে কোন পরিমাণ টাকা ব্যয় করতে পারবে। দলছাড়া প্রার্থীর তথাকথিত অনুরাগী সংস্থা যে কোন অঙ্কের টাকা ব্যয় করতে পারবেন। যে দেশের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি লোক অর্ধাহারে দিন কাটায় সে দেশের নির্বাচনে এই বিপুল ব্যয়ের অনুমোদনসূচক অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে না—কি বিচিত্র এ গণতন্ত্র! সংবাদপত্রগুলিও কেমন নীরব। কি বিচিত্র স্বাধীন সাংবাদিকতা! আর টাকা যারা ছড়াবে তারা তো এমনি এমনি টাকা ছড়াবে না। তারা নির্বাচিত প্রার্থীদের টিকি ধরে যখন-তখন তো টানবেই। নির্বাচনে যে প্রার্থীদের জন্য দল এত বিপুল অর্থব্যয় করবে—ভারতের মত গরীব দেশে, যেখানে দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে রয়েছে, এই বিপুল অর্থ আসবে কোথা থেকে? গরীব জনগণের কাছ থেকে তো নিশ্চয়ই নয়। কায়েমী স্বার্থের তল্পিবাহীদের কাছ থেকে, শিল্পপতি ও শেঠজীদের কাছ থেকেই। তাই বিধানসভা নির্বাচনে—শাসক শ্রেণীর ওপর প্রভাব বিস্তারের ব্যাপারে জনগণের কোন ভূমিকাই থাকছে না,—ভোটবাক্সে ভোটপত্র নিক্ষেপ করা ছাড়া। তাহলে গণতন্ত্রের যে তিনটি মূল 'লক্ষ্য' সম্বন্ধে আলোচনার সুরুতে উল্লেখ করেছিলাম—সেই লক্ষ্য রূপায়ণে 'অর্থনৈতিক গণতন্ত্র' ব্যতিরেকে শুধুমাত্র ভোটের অধিকার কখনই রক্ষাকবচরূপে কাজ

করতে পারে না। এই সহজ সত্যটা গত ২৫ বছরের অভিজ্ঞতার আলোয় স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত।

নির্বাচনে দলের প্রার্থীর টাকা দলই জোগায়। তা না হলে লোকসভার নির্বাচনে একজন গুণী যোগ্য ব্যক্তি অর্থের অভাবে প্রার্থীই হতে পারবেন না। বিধানসভার প্রার্থীর ক্ষেত্রেও এই একই প্রশ্ন উঠবে। দেশের আইনসভার প্রাধান্য স্বীকার গণতন্ত্রের পথে অপরিহার্য, অথচ আইনসভায় যোগ্য ব্যক্তি, বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা, বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরা নির্বাচিত হবার সুযোগই পাবেন না। হাত তোলার লোক দিয়ে পরিষদের দলের বেঞ্চগুলি, বিধান-সভার আসনগুলি ভরিয়ে দিয়ে আর যাই হোক, কুশাসন, দুর্নীতি, অবিচার, স্বেচ্ছাচার, জুলুম কখনই বন্ধ করা যায় না। সেক্ষেত্রে বিধানসভা—লোকসভা দলনেতার খেয়াল-খুশি চরিতার্থতার হাতিয়ার হয় মাত্র। আইনসভা স্বেচ্ছাচারী দুর্বিনীত শাসকশ্রেণীর হাতের রবার স্ট্যাম্প হয়ে দাঁড়ায়। তাই শুধু আইন-সভা আছে বলেই ধরে নেওয়া চলে না দেশ গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছে।

মোটা ভাত মোটা কাপড়ের দানাপানির ন্যূনতম ব্যবস্থা হলেই যে দেশের সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করবেই এমনও কথা নেই। দানাপানির ব্যবস্থাকে সমাজ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা বলে মনে করে না। এটা যে-কোন সমাজ-ব্যবস্থার অবশ্য করণীয় প্রাথমিক কর্তব্য। যে-রাষ্ট্র এই প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় বা অবহেলা করে তার কর্ণধারদের 'গণতন্ত্রের' বড়াই করা শোভা পায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নিজের দেশে 'নিউ ডিল' কর্মসূচীর প্রবর্তন করে রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে শক্ত অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়ে-ছিলেন। রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁরই একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি।

আধুনিক সভ্য সমাজ গড়ার প্রথম কাজই দেশের নাগরিকদের জীবনে ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। তাদের অন্ন বস্ত্র শিক্ষা আশ্রয় চিকিৎসার গ্যারান্টি থাকা চাই। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের এটা যেমন ভিত্তি, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থারও এটা ভিত্তি। এই সহজ কথাটা বুঝতে মার্কস-লেনিন-চেগুয়েভারা-ক্যাস্ট্রোর মুখাপেক্ষী হবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ন্যূনতম সামাজিক ব্যবস্থা পত্তন করলেই দেশের নাগরিক গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি কোন স্বাভাবিক নিয়মে আকৃষ্ট হয় না। দুটোর মধ্যে তাই কোন

কার্যকারণ সম্পর্ক (Cause-and-effect-relation) নেই। গণতন্ত্র বলতে আমরা বুঝি দেশের নাগরিকদের মধ্যে যে সুপ্ত সম্ভাবনা ও গুণাবলী আছে সেই সম্ভাবনা ও গুণাবলীর বিকাশের পথে সকল বাধার দূরীকরণ। মানুষের জৈবিক মানসিক আত্মিক শক্তির উন্মেষ চাই। যে-সমাজ পুঁজিপতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও তাদের স্বার্থে চালিত সেখানে সেটা কখনই সম্ভব নয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও অনিবার্য কোন নিয়মে মনুষ্য-জীবনের সেই সার্বিক বিকাশ ঘটে না যদি না সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় অর্থ নৈতিক সকল বাধা ও শৃঙ্খল সরাবার সাথে সাথে রাজনৈতিক বাধাগুলিও দূর করা হয়। এইখানেই রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সুষ্ঠু সমন্বয় দরকার। চিন্তানায়ক মানবেন্দ্রনাথ রায় একসময়ে লিখেছিলেন:

"But it does not necessarily follow that wherever economic well-being is given freedom and cultural progress are guaranteed. In other words, it is fallacious to draw a causal relation between economic well-being and freedom." [Cultural Requisites of Freedom: An article. Modern Age and India: Published by Leftist Book Club, Calcutta —p. 177]

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। একথা রাজনৈতিক সাহিত্যের অলঙ্কার নয়। যদি সত্যি এই অধিকার জন্মগত অধিকার বলে গণ্য হয় তাহলে এই অভিজ্ঞতা কখনই ওপরতলার সুবিধাভোগী বিশেষ শ্রেণীর একচেটিয়া ব্যাপার হতেই পারে না। এটা সাধারণ মানুষের, সর্বস্তরের মানুষের অভিজ্ঞতার অঙ্গ হবেই। তাহলে এ অভিজ্ঞতা আস্বাদনের ক্ষমতা সকল মানুষেরই আছে। রুটি রুজি শিক্ষা আশ্রয়ের ন্যূনতম ব্যবস্থা করেই সরকার কেন সেই অনাস্বাদিত অথচ আয়ত্বাধীন অভিজ্ঞতাকে ছোঁওয়ার সকল প্রয়াসকে শৃঙ্খলিত করার চেষ্টা করবে? এইভাবে শৃঙ্খলিত করার উদ্দেশ্যে এক একটা পদক্ষেপ এইরূপ: (১) এক-পার্টি শাসন-ব্যবস্থার জোয়াল জনগণের কাঁধে চাপিয়ে রাখা, (২) ভিন্ন মত প্রকাশ ও প্রচারের অধিকার হরণ করা, (৩) বিচার-ব্যবস্থাকে শাসকদলের সেবাদাস করা—আইনের শাসনের জায়গায় একনায়ক-তন্ত্রী দলের এক শাসন চালু রাখা, (৪) আইনসভাকে দল বা পার্লামেন্টকে

শাসকশ্রেণী কর্তৃক দলের 'রাবার স্ট্যাম্প' রূপে ব্যবহার করা, (৫) পুলিশী সন্ত্রাস, গণ-নিপীড়ন, বন্দুকের নলের শাসানি এবং আইন-বহির্ভূত শাস্তি দানের (extra-legal punishment) ব্যবস্থা।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তিনটি : (১) প্রতিটি কর্মক্ষম নাগরিকের কর্মের সংস্থান ; বেকারী রোগ বার্ধক্য-জনিত অনিশ্চয়তা ও সকল দুর্ভাবনার আক্রমণ থেকে নাগরিকদের রক্ষা করা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য (Social security measures)। (২) দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যাতে জাতীয় সম্পদের (মনুষ্য সম্পদও তার অন্তর্ভুক্ত) পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়—যাতে সকল কর্মক্ষম ব্যক্তির কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত হয়—এবং উৎপন্ন ভোগ্য-পণ্য ও সম্পদের সুষম বণ্টন সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে হয়। (৩) অর্থনীতির সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ : অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য তাই।

শাসকদলের সদস্যদের শৃঙ্খলার তত্ত্বকথা শুনিয়ে, সম্ভাব্য রাষ্ট্রপতি শাসনের জুজুর ভয় দেখিয়ে, আগামী নির্বাচনে মনোনয়ন না পাবার আতঙ্ক সদস্যদের সামনে ঝুলিয়ে রেখে, রাজনৈতিক ব্ল্যাক মেল-এর ভয় দেখিয়ে শাসকদলের পরিষদীয় শাখার সদস্যদের মুখ বন্ধ করে পরিষদীয় গণতন্ত্রের মূকাভিনয় হতে পারে—কিন্তু আইনসভা জন-মানসের প্রকৃত দর্পণের মর্যাদা পায় না। এতে গণতন্ত্রই খর্ব হয়—গণতন্ত্রের কার্যকারিতার প্রতি জনগণের আস্থাই লোপ পায়। ক্ষুধার্থ মানুষের দল আইনসভার দিকে তখন তাকিয়ে থাকে না। যে-কোন শাসকদল ক্ষমতাসীন আসুক পার্লামেন্ট বা বিধানসভায় শাসক দলের সদস্যরা দলের অন্যায়ের ও ভ্রান্ত নীতির সমালোচনা করতে চান না।

অর্থনৈতিক দিক থেকে যারা পঙ্গু বিপর্যস্ত রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী তাদের দিক থেকে সাধারণত আসে না। আগামীকাল কি খাবে, কিভাবে অন্ন সংগ্রহ করবে এই দুশ্চিন্তায় যারা কাতর তারা আইনের শাসন, বহুদলীয় গণ-তন্ত্রের কৌলিন্য, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা, আইনসভার প্রাধান্য-তত্ত্ব, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থা এই সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দিয়ে মাথা ঘামাতে পারে না—ঘামায়ও না। গণতন্ত্রের এই সব দাবী অপেক্ষাকৃত সুযোগ-সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবী এবং অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী শ্রেণীর কাছ থেকেই এসেছে। এই মানসিকতার সুযোগ নিয়ে থাকেন কমিউনিস্ট ও ফ্যাসিস্টরা। পৃথিবীর

বিভিন্ন দেশের ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই বহন করে। এমনকি সোভিয়েত রাশিয়ায় নিস্তালিনীকরণ (de-Stalinization) নীতি ঘোষণা করতে রুশ প্রধানমন্ত্রী ও কমিউনিস্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারী ক্রুশ্চভ বাধ্য হয়েছিলেন এই নতুন শক্তিশালী শ্রেণীর চাপেই—যেমন, ইংলণ্ডে রাজা জন সে দেশের ব্যারণদের চাপেই 'ম্যাগনা কার্টা' ঘোষণা করতে রাজী হয়েছিলেন।

সোভিয়েট রাশিয়ায় ব্যাপক ও দ্রুত শিল্পোন্নয়ন সামরিকিকরণ—অর্থনৈতিক উন্নয়ন—সেদেশে একটি 'নূতন শ্রেণীর' উদ্ভব ঘটিয়েছে। এই শ্রেণী নীচের তলার সাধারণ মানুষের চাইতে অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধা মর্যাদা ভোগ করে থাকেন। এদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগের বেশী নয়। এদের জীবনে নিরাপত্তার জন্য, সুযোগ-সুবিধার স্থায়ীকরণের জন্য গণতন্ত্রের দাবী উঠেছিল। ক্রুশ্চভ সে দাবী উপেক্ষা করতে পারেননি। De-Stalinization নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রের লক্ষ্যে একটি বলিষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল। রুশ রাষ্ট্র নেতারা 'গণতন্ত্রের' মৌল আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্তালিনবাদের নিন্দা করেন নি। তাঁরা বুঝেছিলেন এই 'নিস্তালিনীকরণ' নীতি প্রশাসনিক দক্ষতা আনবে—তাঁরা নিজেদের জীবনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (Personal safety) চেয়েছিলেন। গোয়েন্দা-ভীতি, পুলিশী-সন্ত্রাস, বাধ্যতামূলক শ্রম তাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। স্তালিন-বেরিয়ার অত্যাচারের একটানা ইতিহাস এবং জীবনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অভাব প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর নেতাদের মধ্যে যে আতঙ্কের কালো ছায়া বিস্তার করে রেখেছিল তা থেকে বাঁচার পথ খুঁজছিলেন তাঁরা। সাধারণ শ্রমিক-কৃষক কর্মচারীরা এই গণতন্ত্রীকরণের অন্দোলনে নেতৃত্ব দেননি। তাদের কাছে 'দিল্লী অনেক দূর'-এর মত 'মস্কো অনেক দূর'। এক-পার্টি শাসনের জোয়াল টানার জন্যই যেন তারা ভূমিষ্ঠ হয়েছে। কলুর বলদের মতই দলীয় শাসন-শোষণের ঘানি টেনে চলতে হবে সমাজতন্ত্রের নামে।

'রাষ্ট্র' বলতে কি বোঝায়? পুঁজিবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের মন্তব্যটি তুলে ধরা যাক:

"দেশের জনসাধারণ নিয়ে যে সংগঠিত সমাজ তারই যোগ্য প্রতিনিধিরাই রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরিচালক। এই জনগণই নিজেদের পারস্পরিক সাহায্য কল্যাণ শ্রীবৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই নিজেদের উপযুক্ত প্রতিনিধিদের দিয়ে রাষ্ট্র গঠন করে থাকেন। 'রাষ্ট্র' অথবা 'সরকারের' মাধ্যমেই এই পারস্পরিক সাহায্য

ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সাধিত হয়ে থাকে। আদিম মানুষ যখন গুহায় বাস করত তখন জীবন ধারণের জন্য প্রতিনিয়ত যে-সংগ্রাম তাদের করতে হত সেই সংগ্রামে কারুর কাছ থেকে কোন সাহায্যই আসত না, এমন কি বেঁচে থাকার এই জীবন-মরণ সংগ্রামে প্রতিবেশীর কাছ থেকে সহযোগিতার পরিবর্তে বিরোধিতাই জুটত। কিন্তু আজ আমাদের দেশে দুর্বলতম দরিদ্রতম ব্যক্তিও সর্বপ্রকারের সাহায্য পেয়ে থাকেন। রাষ্ট্রীয় কর্তব্য সকল শক্তি দিয়ে দুর্বল-শ্রেণীকে রক্ষা করা সর্বতোভাবে।

আমাদের সরকার জনগণের প্রভু নয়; জন-কল্যাণের মনুষ্য-সৃষ্ট হাতিয়ার মাত্র। রাষ্ট্র তার নাগরিকদের প্রতি যে দায়িত্ব বা কর্তব্য পালন করে থাকে সেটা 'ভৃত্য' রূপে 'প্রভুর' প্রতি কতব্য পালনেরই সমতুল্য। জনগণ যৌথ সম্মতি দ্বারা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এই সম্মতিই রাষ্ট্রের ও সরকারের স্থায়িত্বের ভিত্তি। অপরের সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে যারা জীবন সংগ্রামে টিকে থাকতে পারে না, আর্থিক অনিশ্চয়তা ও দুরবস্থার যারা শিকার হন, রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্যই সর্বাগ্রে তাদের রক্ষা করা। প্রতিটি সভ্য সমাজেই এই প্রাথমিক কর্তব্য পালন আবশ্যিক হওয়া চাই। এই দুঃস্থ দারিদ্র বিপন্ন শ্রেণীর রক্ষার জন্য এগিয়ে এসে রাষ্ট্র যে-সাহায্য করে থাকে সেটাকে রাষ্ট্রের 'দয়ার দান' বলে যেন কখনই মনে করা না হয়। নাগরিকদের জীবনকে অনিশ্চয়তা অসহায়তা ও দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে রক্ষা করার কাজটি হল রাষ্ট্রের 'সামাজিক কর্তব্য' মাত্র।" [রুজভেল্ট]

এই চিন্তাই জনকল্যাণ-ধর্মী রাষ্ট্রের ভিত্তি; সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরও ভিত্তি। বিদ্রোহী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তি বিশেষভাবে স্মর্তব্য:

"ভারতে আজ পর্যন্ত যত ধর্ম হয়েছে সেগুলির দোষ এই যে, তাদের মধ্যে দুটি কথা স্থান পেয়েছে— ত্যাগ ও মুক্তি। জগতে কেবল মুক্তিই চাই? গৃহীদের জন্য কি কিছু বলবার নেই? আমি কিন্তু গৃহীদের সাহায্য করতে চাই। শাস্ত্র যদি কেবল সন্ন্যাসীর পথপ্রদর্শক হয়, গৃহীর জীবনের কোনো কাজে না লাগে তবে সেই একদেশদর্শী শাস্ত্রে গৃহস্থের কি কাজ? শাস্ত্র যদি কর্মচঞ্চল এই পৃথিবীতে হাড়ভাঙা খাটুনি, রোগ, শোক, দারিদ্র্যের মধ্যে সাধনার সন্ধান না দিতে পারে, হতাশের হৃদয়ে, নিপীড়িতের আত্মগ্লানিতে, যুদ্ধের ভয়ঙ্করতায়,

পরাজয়ের অন্ধকারে, মৃত্যুর গহ্বরে আশার আলো না জ্বালাতে পারে, তাহলে দুর্বলের পক্ষে তেমন শাস্ত্রের প্রয়োজন নেই।

যে ধর্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন করতে পারে না, অথবা অনাথ শিশুর মুখে একমুঠো খাবার দিতে পারে না, আমি সে ধর্মে বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।

প্রাচ্যে সবচেয়ে বড় অভাব ধর্ম নয়। ধর্ম তাদের যথেষ্ট আছে। ভারতের কোটি কোটি আর্ত নর-নারী শুষ্ক কণ্ঠে কেবল দুটি অন্ন চাইছে। আমরা তাদের পাথর দিচ্ছি। ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা বলা, বা দর্শনশাস্ত্র শোনানো অপমান করা। তিনি প্রেমরূপে সর্বভূতে প্রকাশমান। আবার কি কাল্পনিক ঈশ্বরের পূজো রে বাপু; বেদ, কোরাণ, পুরাণ, পুঁথি-পাতড়া এখন কিছুদিন শান্তি লাভ করুক, প্রত্যক্ষ ভগবানের প্রতি দয়া প্রেমের পূজা দেশে হোক।"

[স্বামী বিবেকানন্দ]

এই তো বৈদান্তিক সাম্যবাদ। নির্যাতিত অবহেলিত নীচের তলায় পড়ে পড়ে মার খাওয়া শ্রেণীর হয়ে এমন করে আর কে কবে বলেছেন? 'অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের' কাজই হল স্বামীজির আহ্বানকে বাস্তবায়িত করা। চাঁদে মানুষ পৌঁছুচ্ছে, মহাকাশ মানুষ জয় করছে। কিন্তু দারিদ্র্য বিজয়ের জন্য কেন নেই কোন আন্তরিক প্রচেষ্টা?

ভারতে 'রাজনৈতিক গণতন্ত্র' পঙ্গু হয়ে থাকার একটা বড় কারণ গ্রামে-গাঁথা এই বিশাল দেশের সুবিস্তীর্ণ গ্রামীণ অংশকে মধ্যযুগীয় অন্ধকারের মধ্যে রেখে দেওয়া হল। আধুনিকীকরণের কোন আন্তরিক চেষ্টাই হল না। কৃষি-নির্ভর এই দেশের কৃষি-ব্যবস্থা আকবর-কার্জনের যুগেই পড়ে আছে। সব কিছু আজও মৌসুমী বায়ুর খেয়াল-খুশীর ওপরই নির্ভরশীল। অথচ আমরা আণবিক বোমা ফাটিয়ে বিশ্বে চমক লাগিয়েছি। আমরা কিসিঙ্গার-কসিগিনের কাছ থেকে 'বিশ্বশক্তি'-রূপে বন্দিত হয়েছি! আমাদের দেশে হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে (ভুল বলে ফেললাম! অনাহারে নয়, অপুষ্টিজনিত রোগে জীবদেহের খোলস পরিত্যাগ করছে)!

গত ২৫ বছরে—কি কেন্দ্র কি রাজ্যের—কৃষি ও ভূমি নীতি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যর্থতার জন্য জনসংখ্যা-স্ফীতির সাফাই শুধু গাওয়া হয়। আমাদের দেশে জনসংখ্যা বাড়ছে কিন্তু দেশের সামগ্রিক সম্পদের

সদ্ব্যবহার হচ্ছে না, উৎপাদন সে হারে বাড়ছে না। শস্য উৎপাদনের পদ্ধতিও সেই মোঘল সম্রাট আকবরের যুগের। নতুন আধুনিক টেকনোলজির প্রয়োগ নেই। মান্ধাতার আমলে চাষের জন্য যে পুরান হাল ব্যবহার হত আজও তাই হচ্ছে। শীর্ণকায় বলদ নিয়েই আজও চাষ হয়। বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা স্বপ্ন-বিলাস মাত্র। পৃথিবীর কোন উন্নয়নশীল সমাজ—কৃষক সমাজ বিশেষ করে গরীব কৃষকদের এবং কৃষিকার্যকে এত চরম অনাদর অবহেলা করেনি যা ভারতবর্ষে করা হয়েছে।

গ্রামের হাঁটু-ভাঙ্গা কাদা খানা-খন্দের রাস্তায় অশোক-চক্র-লাঞ্ছিত রোলস্ রইস্ মোটর গাড়ী চালাবার গলদঘর্ম প্রয়াস চলেছে পরিকল্পিত অর্থনীতির নামে। আজও গ্রামে মহাজনী শোষণ, মহাজনী বন্ধকী কারবার, দাদন-ব্যবস্থা মোটা সুদে মহাজনী-ঋণ প্রথা অব্যাহত রয়েছে। জোঁকের মত গরীব কৃষকদের রক্ত চুষছে সুদখোররা। ২৫ বছরেও এই কুৎসিত শোষণ প্রথা বিলুপ্ত হল না। আধুনিক জীবনের সমস্ত সুযোগ থেকে গ্রামের কৃষক, ভূমিহীন কৃষক, কৃষি-শ্রমিক, গ্রামীণ গৃহস্থালী ঠিকা-শ্রমিক মৎস্যজীবী, মুচি, কুম্ভকার তন্তুজীবী বেত-শিল্পী কর্মকার আদিবাসীরা সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত। অথচ এরাই প্রতি গ্রামের শতকরা ৮০ জন। অবর্ণনীয় এদের দুর্গতি।

গ্রামের রাস্তা তৈরীর জন্য টাকা মেলে না, কিন্তু শহরে বিনোদনের জন্য ফোয়ারার ব্যবস্থা, আলোর দীপাবলি, বহুতলবিশিষ্ট বিরাট বিরাট বাড়ীর প্রকল্প। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা একটা নিছক প্রহসন। যে স্কুলের ঘর আছে—তা গোয়ালঘরের অধম। গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষার নামে চলেছে প্রচণ্ড ধাপ্পা। ওরা চিরদিন অজ্ঞতার অন্ধকারেই হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে হোঁচট খেয়ে বেড়াবে। গ্রামে উপযুক্ত চিকিৎসাকেন্দ্র নেই —ডাক্তার আছে তো ওষুধ নেই। উন্নতি হবে না; অজুহাত তৈরী আছে: টাকা নেই। সব সরকারের একই অজুহাত। শুধু ওদের জন্যই টাকার অভাব। অর্থ প্রয়োজন গ্রামোন্নয়নের জন্য, খাদ্যোৎপাদনের জন্য; কৃষি উন্নয়ন, ক্ষুদ্র সেচ, মৎস্য-চাষ, হাঁস-মুরগী পালন, গোপালন, ক্ষুদ্রশিল্প খাতে সুষ্ঠুভাবে অর্থ বিনিয়োগ করলে দেশের রূপান্তর ঘটত। ভারতকে আমেরিকা রাশিয়ার কাছে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘন ঘন ছুটতে হত না।

চীনের কৃষকদের মত ভারতের কৃষকরাও নিদারুণ অত্যাচার শোষণ সয়েছে।

কিন্তু ভারতে কোন কৃষক বিপ্লব হয়নি। দেশের বামপন্থী দলগুলি সংগঠিত শহরের শ্রমিক কর্মচারীদের নিয়ে বহু আন্দোলন করেছেন বটে কিন্তু তাদের ভ্রান্ত রাজনীতি, ভোট কুড়োবার রাজনীতির শিকার হয়েছে কৃষক ও গ্রাম ভারতের বঞ্চিত মানুষরা। আন্দোলনের পর আন্দোলন হয়েছে বৃহৎ শিল্পের সংগঠিত শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি বোনাস ওভার টাইম মাগ্‌গীভাতার জন্য, নানাবিধ প্রান্তিক সুবিধা আদায়ের জন্য। কিন্তু হয়নি কোন সংগ্রাম কৃষি-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী বেঁধে দেবার কার্যকরী করার দাবীতে। অথচ ভুখামিছিলে, সভা-সমাবেশে, 'বাম' নামে প্রচারিত দলগুলির শক্তি জাহির করার মহড়ায় এই অবহেলিত গ্রামের মানুষরাই এইসব দলকে মদত জুগিয়ে আসছে। ভোটের লোভে মধ্যে মধ্যে বকেয়া কর অথবা রাজস্ব মুকুব করা হয়েছে দফায় দফায়। খবরের কাগজের প্রথম পাতার খবর হয়, বাহবাও জোটে, কিন্তু গরীবদের সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান তো হয় না তাতে। পায়নি তারা কোন সুবিচার।

এত বড় অন্যায় শোষণ অবিচার দেখেও শহরের বিপ্লবীরা কৃষক বিদ্রোহের ডাক দেয়নি। 'অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের' প্রতিষ্ঠার জন্য যারা এগিয়ে আসবেন হয় আইন মাধ্যমে ও আইনের নিঃশঙ্ক সাহসিকতাপূর্ণ প্রয়োগের দ্বারা এই অবহেলিত ভারতবাসীদের জীবনে রূপান্তর আনতে হবে—আর না হয় সরাসরি দেশকে—গ্রাম ভারতের কৃষকদের—কৃষক বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। কৃষক বিপ্লবের অন্যতম লক্ষ্য হবে গ্রামজীবনের সামগ্রিক সমন্বিত জীবন-পদ্ধতির সার্বিক রূপান্তব। গ্রাম-নির্ভব কৃষিপ্রধান দেশে রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে বাঁচাতে প্রয়োজন হল কল্যাণ-সচেতনআত্মনির্ভরশীল স্বাধীন কৃষক ও কৃষি-শ্রমিক শ্রেণী। তাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সামাজিক নির্ভাবনার জন্য যে সংগ্রাম প্রয়োজন সেই সংগ্রাম তাদের নৈতিক-সাংস্কৃতিক আত্মিক বিকাশের দাবীকেও সমধিক গুরুত্ব দিয়ে সমাজের কাছে তুলে ধরবে।

ভারতে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের বুনিয়াদ মজবুৎ করার জন্য চাই ছোট ছোট জোতের চাষীদের, মাঝারী চাষীদের সুসংগঠিত করা এবং অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আধুনিক জাপানের দৃষ্টান্ত আমাদের পথ দেখাতে সাহায্য করবে। জাপানের সমৃদ্ধির অন্যতম সোপান হল ছোট ছোট স্বাধীন কৃষকদের জোত-নির্ভর কৃষি-ব্যবস্থা। এই কৃষকদের জমির হস্তান্তর

এবং বিভক্তিকরণ (fragmentation) বন্ধ করতে হবে। চকবন্দী ব্যবস্থা (Consolidation of holdings) ও সমবায়ভিত্তিক কৃষি উন্নয়ন, কৃষিতে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রয়োগ বিস্তার প্রবর্তন, মহাজনী শোষণের অবসান, গরীব চাষীর হাত থেকে ধনী চাষীর ও শহরের ও গ্রামের ব্যবসায়ী শ্রেণীর হাতে জমির হস্তান্তর রদ ইত্যাদি কৃষি উন্নয়নে রূপান্তর আনতে পারে। কৃষিতে বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর এবং শিল্পপতিদের অনুপ্রবেশ, বেনামীতে গ্রামের চাষযোগ্য জমির খরিদ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির নামে এক শ্রেণীর নূতন মহাজন ও বৃহৎ ভূমি মালিকদের ভাগ্যে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের অঢেল সাহায্য লাভ এক দারুণ উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। ছোট ছোট জোতের কৃষকরা দেনার দায়ে মহাজনী ঋণ এবং সরকারী ঋণ পরিশোধের নামে জমি হস্তান্তর করে ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে। সমবায় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক এর সুদের হারও অত্যন্ত চড়া। গরীবের নাগালের বাইরে। এ পরিস্থিতি কি অর্থ নৈতিক গণতন্ত্রের সহায়ক হতে পারে? রাষ্ট্র তো দুর্বলকে প্রবলের অত্যাচার ও আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্ম বৃহৎ ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসছে না? ভূমিহীনদের মধ্যে অনুন্নত আদিবাসীদের মধ্যে ভূমিবণ্টন ঘটা করে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে প্রচার করে লাভ কি যদি জমি পাবার পর দেনার দায়ে গরীব কৃষকদের মহাজনকে জমি হস্তান্তর করতেই হয়? এ কেবল ফুটা পাত্রে দিবারাত্র জল ঢালার মত ব্যাপার, গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢালার সমতুল্য। ছোট, মাঝারি ও প্রান্তিক চাষীকে রক্ষা করার জন্ম রাষ্ট্রকে বিরাট ভূমিকা নিতে হবে।

'অর্থ নৈতিক গণতন্ত্রের' অন্যতম স্তম্ভ ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পের ব্যাপক প্রসার, স্ব-নিয়োগ মাধ্যমে কর্মসংস্থানের (Self-employment) ক্ষেত্র সম্প্রসারণ এবং গ্রামীণ ও কুটীর শিল্পের পুনরুজ্জীবন। এ ব্যাপারেও রাষ্ট্রের ভূমিকা বিরাট। এ দায়িত্ব পালন রাষ্ট্রের কর্তব্য। এ ব্যাপারেও শিল্পোন্নত জাপানের ও পশ্চিম জার্মানীর দৃষ্টান্ত অনুসরণীয়। শিল্পোন্নত ইউরোপ রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মডেল হিসাবে অনুকরণের যে নেশা আমাদের দেশের রাষ্ট্রনায়ক, শিল্পপতি আমলা ও এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের পেয়ে বসেছে সেটা দেশের সর্বনাশই ডেকে আনছে। এ দেশের বিপুল কর্মক্ষম মানুষকে কর্মযজ্ঞে নিযুক্ত রাখতে হলে ছোট ছোট জোতের সুসংহত জোত-ভিত্তিক আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কৃষি-ব্যবস্থা এবং ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণ ও কুটীর ও গ্রামীণ শিল্পের

পুনরুজ্জীবন, বিজ্ঞান, কারিগরি জ্ঞান ও আধুনিকতম টেকনলজিকে প্রাধান্য দান আবশ্যক।

ভারতে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের বুনিয়াদ সুদৃঢ় করার প্রথম সোপান হবে কৃষি ও কৃষি-উৎপাদনের ব্যাপক উন্নতি বিধান। কৃষি-ব্যবস্থার বৈপ্লবিক উন্নতি সাধনের সঙ্গে—খাদ্যশস্য ও কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত গ্রামের লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন মানুষের সারা বছরের কর্মসংস্থানের সমস্যাটি। গামের দারিদ্র্য-সীমার নীচে যে বিপুল সংখ্যক মানুষ রয়েছে তাদের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত হবে যদি দেশের একফসলী জমিগুলোতে দুটো তিনটে ফসল বছরে উৎপন্ন হয়। মাঠে কাজ না থাকায় ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেত-মজুররা বছরে প্রায় ১১০ দিন কাজ পায় না। কি দুঃসহ অবস্থা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ হলে ক্ষেত-মজুররা সারা বছর কাজ পাবে সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির ভিত্তিতে, এই বিপুল শ্রেণীর মানুষের হাতে তবেই আসবে ক্রয় ক্ষমতা।

আর এই বিপুল সংখ্যক মানুষের ক্রয় ক্ষমতা থাকলে দেশের ভোগ্য পণ্য সামগ্রীর চাহিদা হবে, শিল্পে মন্দা কাটবে। হাতে পয়সা থাকলে তবেই না গ্রামের মজুররা গরীবরা ভোগ্যপণ্য কিনতে পারে? এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে সব ভূমিহীনকে জমি পাইয়ে দিয়ে—৩।৪ বিঘা জমি দিয়ে—ভূমি সমস্যার সমাধান কখনই করা সম্ভব হবে না। 'পাইয়ে দেবার' রাজনীতিকে আশ্রয় করে বিশেষ বিশেষ দলের ভোটের রাজনীতিতে সভা সমিতি সমাবেশে গ্রামের লোক জমায়েতের ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা হতে পারে, কিন্তু গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও পল্লী-জীবনের ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব হবে না। ভূমি বণ্টনের সঙ্গে দেশের সম্পত্তি সংক্রান্ত উত্তরাধিকার আইনটিও জড়িত। সেই আইনকে কেন্দ্র করে গরীবের সম্পত্তিও ভাগ বণ্টন হয়ে থাকে। চাষের জোতগুলি, ছোট চাষীর জোতগুলিও টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছে। এত ছোট ছোট টুকরো টুকরো জোতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় উন্নত পদ্ধতিতে চাষ কি করে সম্ভব হবে?

আরও মনে রাখতে হবে কৃষিতে উৎপাদন পর্যাপ্ত ঘটিয়ে লাভের উদ্বৃত্ত (surplus) শিল্পে বিনিয়োগ করা চাই। যে কোন দেশে শিল্পোন্নয়নের পেছনের কাহিনী কিন্তু সেটাই। রাশিয়াতেও নেতারা তাই করেছিলেন। দেশে কল-কারখানা যখন ব্যাপকভাবে গড়ে উঠবে তখন আবার কর্মক্ষম বেকারদের

শিল্প-শ্রমিকরূপে শিল্পে নিযুক্ত করতে হবে। শিল্প সম্প্রসারণের জন্য কৃষিতে বিশেষ গুরুত্ব দিতেই হবে। কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে, অনিবার্যভাবেই তাতে কর্মসংস্থানের পথও বিপুলভাবে সম্প্রসারিত হবে। কৃষি উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিলে দেশের অসংখ্য গ্রামগুলি স্ব-নির্ভর হয়ে উঠবে। পঞ্চায়েতী শাসনের শক্ত ভিত্ রচনা করবে এই সমৃদ্ধ গ্রামগুলি।

গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছে দিলে কুটীর শিল্প ও গ্রামীণ কর্মোদ্যোগ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। বিদ্যুৎ সরবরাহ আর যথার্থ পঞ্চায়েতী শাসন সুনিশ্চিত করলে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক রূপটি প্রতিষ্ঠিত হবেই। গ্রামের মানুষকে ক্ষুধা, বাধ্যতামূলক বেকারী, অশিক্ষা, মহাজনী শোষণ ও গ্রামের হাঙরদের থেকে বাঁচাবার জন্য, রুজি রুটির জন্য গ্রাম ছেড়ে শহরের বুকে পাড়ি জমাতে হবে না। গ্রামগুলি অনাদরে অবহেলায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এই নিদারুণ মর্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছিল পশ্চিমের অমর কবির কবিতায়। দেশে পুঁজিপতিদের, বড় বড় শিল্পপতি ব্যবসাদারদের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হচ্ছে, বড় বড় শহর, কল-কারখানা আকাশ-ছোঁয়া বাড়ী উঠছে, কিন্তু মানুষ শেষ হয়ে যাচ্ছে। "Where wealth, accumulates and men decay" ['The Deserted Village'—Oliver Goldsmith] কবি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন:

"But a bold peasantry—their country's pride
When once destroyed can never be supplied"
[The Deserted Village]

মানবিক মূল্যবোধহীন যন্ত্র-শিল্প সভ্যতা ও পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের মোহে আমরা যেন কখনও এই সাহসী আত্ম-নির্ভরশীল স্বাধীন কৃষক সমাজকে ধ্বংস করতে উদ্যত না হই। রাজনৈতিক স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের সংগ্রামে সাহসী, আত্ম-সচেতন স্বাধীন শোষণ-মুক্ত কৃষক সমাজ স্থায়ী শক্তি হবে সন্দেহাতীতভাবে।

(খ) অর্থনৈতিক গণতন্ত্র : গণতান্ত্রিক সমাজবাদ

নাগরিকের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক দাসত্ব হাত-ধরাধরি করে চলতে পারে না। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অসঙ্গতি ও ব্যর্থতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে কয়েকটি ক্ষেত্রে। (১) ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বেকারী রোধের ক্ষমতা নেই। ফলে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, যতদিন অর্থনৈতিক কাঠামো ধনবাদী থাকবে ততদিন সমাজে বেকারী থাকবে। তাই এই ব্যবস্থায় স্বাধীন মানুষের কল্যাণ-সাধন অসম্ভব। (২) দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক নির্ভর-শীলতার দ্বন্দ্ব সংঘাত ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠছে। কথার জাল বুনে এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে আর ঢেকে রাখা যাচ্ছে না। এর ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যারা জড়িত সেই শ্রমিক-কর্মচারীরা উৎপাদন-ব্যবস্থা থেকে ক্রমশই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় 'বড়রা' 'ছোট'দের গ্রাস করে ফেলে। সম্পদ পরিশেষে কতিপয়ের হাতেই কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। বড় বড় দানবাকার শিল্প সংস্থা (Corporate enterprises) ছোট মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলিকে গ্রাস করে তাদের বিনাশ ঘটায়। এইসব ছোট মাঝারি শিল্প প্রয়াস, কুটীর গ্রামীণ শিল্প বৃহৎ পুঁজির মালিক আধুনিক যুগের কোম্পানী বা শিল্প সংস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতেই পারে না। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা বা টেক্‌নোলজির প্রয়োগও ছোট ও মাঝারি শিল্পপতিদের করা সম্ভব নয়। তাই প্রতিযোগিতায় দাঁড়ান আরও সম্ভব নয়। এদিকে গত এক শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশে - ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও—রাজনৈতিক অধিকার বা স্বাধীনতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, দুর্ভাবনা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ক্রমবর্ধমান 'বিচ্ছিন্নতার' ফলে একটা হতাশা এসেছে এবং আসবেই। রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে উদারনৈতিকতার বসন্তকাল অর্থনৈতিক স্বাধিকারের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা ও নৈরাশ্যের হেমন্ত-কালের মধ্যে বিদ্যমান অসঙ্গতিই মানুষকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের লক্ষ্যের দিকে ধাবমান করেছে।

'রাজনৈতিক গণতন্ত্রের' ক্ষেত্রে একটি মৌল নীতি স্বীকৃত। অবশ্য কমিউনিস্ট দেশগুলিতে এই নীতি গ্রাহ্য নয়। এই নীতি হল : শাসক শ্রেণী তার কাজের জন্য জনগণের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। আর এই নীতির অন্যতম ফলশ্রুতি

হল সার্বজনীন অবাধ ভোটের ভিত্তিতে জনগণের আস্থা ও সমর্থন যাচাই। রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগণের স্বার্থেই—শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থে নয়—ব্যবহৃত হবে। এই মৌল নীতি তবে কেন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে না? পুঁজির মালিকরা কেন তাদের কাজ ও নীতি প্রণয়ন-রূপায়ণের ক্ষেত্রে জনগণের কাছে, ক্রেতা-ভোক্তাদের, শ্রমিক শ্রেণীর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হবেন না? পুঁজির মালিকরা, বিশেষ করে একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা, বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী। প্রতিনিয়তই তাঁরা এমন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন যার প্রতিক্রিয়া সুদূর-প্রসারী এবং জনস্বার্থ পরিপন্থী। এই সব অন্যায় অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের বোঝা অবলীলাক্রমে শ্রমিক ও জনগণের কাঁধের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

যেমন মূল্যনীতি নির্ধারণের কাজটা। এ ব্যাপারে পুঁজির মালিকরা মর্জি-মাফিক কাজ করে চলে থাকেন। জনগণ নীরব দর্শক মাত্র। শ্রমিক শ্রেণীকে ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলি রাজনৈতিক আদর্শ ও চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ করে না। বেতন বৃদ্ধির লড়াই ছাড়া পুঁজির মালিকদের অর্থনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার আহ্বান জানান হয় না। শ্রমিক শ্রেণীর 'লড়াকু' ইউনিয়নগুলিকেও নেতাদের—শ্রমিক কর্মচারীদের বর্ধিত বেতন, বোনাস ও প্রান্তিক সুযোগ-সুবিধার টোপ দিয়ে পুঁজিবাদী শোষণের বঁড়শিতে গেঁথে তোলা হয়। [লেনিন তাঁর ১৯০৪ সালে প্রকাশিত 'What Is To Be Done?' রচনায় যে মত প্রকাশ করেছিলেন ভারতের মার্কসবাদী দলগুলি তার প্রতি কোন গুরুত্ব দিয়েছেন বলে মনেই হয় না।]

দেশের উৎপাদন ও বণ্টননীতি সম্পর্কিত মৌল সিদ্ধান্তগুলি নেবার প্রকৃত মালিক দেশের জনগণ তথা রাষ্ট্র; ব্যক্তিগত পুঁজির মালিক-গোষ্ঠী নন। (১) একচেটিয়া পুঁজি-বিরোধী আইন ও ব্যবস্থা (fiscal measures) যেমন নিতে হবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে, তেমনি, (২) জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ও জনকল্যাণের সহায়ক প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাদিও নিতে হবে রাষ্ট্রকে। ১৯৪৫ সালে ইংলণ্ডের 'শ্রমিক দল' সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন দেশের মূল-শিল্প ও সেবা সংস্থাগুলি (Services) রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়া চাই। দেশের যাবতীয় সম্পদের ও সংস্থানের সার্থক প্রয়োগ ও সমন্বয় জনকল্যাণের কাজে নিয়োজিত করার জন্যই এই নীতি গ্রহণ আবশ্যিক হয়ে ওঠে। কোন থিওরির গোঁড়ামির টানে নয়।

এখানেও কমিউনিস্টদের সঙ্গে মতপার্থক্য রয়ে যায়। কমিউনিস্টরা বা মার্কসবাদীরা দেশের যাবতীয় অর্থনৈতিক সংস্থার রাষ্ট্রীয়করণ অর্থনৈতিক সঙ্কটের সমাধান-সূত্র বলে মনে করেন। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীরা এই গোঁড়ামীর পেছনে কোন গ্রহণযোগ্য বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক সূত্র আছে বলে মনে করেন না। মৌল শিল্পগুলির (Basic and Key Industries) রাষ্ট্রীয়করণ প্রয়োজন কেননা তাতে দক্ষতা ও বর্ধিত উৎপাদন সম্ভব হবে।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীদের দুটি মৌল সিদ্ধান্তে অবিচল থাকতে হবে। সেই দুটি সিদ্ধান্ত হলঃ (১) রাষ্ট্রের মৌল কর্তব্য ও দায়িত্ব প্রতিটি নাগরিককে বেকারী, দারিদ্র্য, অনাহার, অশিক্ষা, রোগ ও বার্ধক্য-জনিত অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করা—নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি রচনা করে। (২) রাষ্ট্রকে জাতীয় পরিকল্পনা এমনভাবে রচনা করতে হবে এবং জাতীয় সম্পদের ব্যবহার এমনভাবে করতে হবে যাতে দেশে সকল কর্মক্ষম মানুষের জন্য কর্মের সংস্থান এবং সম্পদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে জাতীয় আয়ের ন্যায্য অংশ সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের প্রতিশ্রুতি থাকে। এই দুটি মৌল সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হচ্ছে কিনা সে বিষয় সুনিশ্চিত হবার জন্য দেশে থাকা চাই পূর্ণ 'রাজনৈতিক গণতন্ত্র', মত প্রচার ও প্রকাশ, প্রতিবাদ সমালোচনার পূর্ণ-অধিকার, প্রতিষ্ঠিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার সাংবিধানিক অধিকারের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি।

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের পরবর্তী পর্যায়ের—উচ্চতর পর্যায়ের—লড়াই সাথে সাথেই চলবে। এই উচ্চতর পর্যায়ে লক্ষ্য হবে গোটা সমাজে সাম্যবাদী অধিকার মানবিক অধিকার মূল্যবোধগুলিকে অবিনশ্বর আদর্শরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা। নাটকীয় পদ্ধতিতে হিংসা বলপ্রয়োগের দ্বারা শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখল হলেই যে মানবিক সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় না—কোন কল্পিত বৈজ্ঞানিক নিয়মে বা কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে—ইতিহাসই তার সাক্ষ্য বহন করছে। সেই লড়াইএর লক্ষ্যই হল নতুন সামাজিক নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা। এর জন্য চাই বিবেকবোধের উন্মেষ ও জাগরণ এবং গণসাহসিকতা, গণ-সঙ্কল্প দৃঢ়চেতা বিবেকবান ব্যক্তি-মানুষের স্বাতন্ত্র্য সর্বোপরি সংঘবদ্ধ প্রয়াস। সেই সঙ্কল্প ও প্রয়াস নিবদ্ধ থাকবে দাসত্বের বিরুদ্ধে অবিচার অসাম্য যুদ্ধ ও হিংসার বিরুদ্ধে।

রাষ্ট্রীয়করণের কারণ বহুবিধ হতে পারে। কোন সুনির্দিষ্ট ফরমুলা নেই যার

নিরিখে বিচার করা হবে কোন্ শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে। একটি বৃহৎ শিল্প যা ব্যক্তিগত মালিকানায় চলতে পারে না অথচ দেশের অর্থনীতিতে যার গুরুত্ব বিকট তার জাতীয়করণ প্রয়োজন। দেশের প্রতিরক্ষার সঙ্গে যে শিল্প বাণিজ্য জড়িত তার পরিচালন-ব্যবস্থাও ব্যক্তিমালিক বা ব্যক্তিমালিক গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত কোম্পানীর হাতে ছেড়ে দেওয়া চলে না।

'অর্থনৈতিক গণতন্ত্র'—দেশের মূল শিল্পের জাতীয়করণের দাবীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকতে পারে না। উৎপাদন-সংক্রান্ত মূল সিদ্ধান্তগুলি (কোথায় কোথায়, কি পরিমাণ, কোন্ কোন্ বস্তু, দ্রব্য-সামগ্রী এবং কি পদ্ধতিতে উৎপন্ন হবে) (Pro luction decisions) এবং বণ্টন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি (বিভিন্ন শ্রেণী বা সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় আয়ের বণ্টন) এই দুটি প্রশ্নই রাজনৈতিক মহলে আলোচিত হয়ে থাকে। আর প্রশ্ন দুটি অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে কেন্দ্র করেই। কোন জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রই এই ক্ষমতা পুঁজির মালিকদের কাছে ছেড়ে দিতে রাজী হতে পারে না। বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে বিভিন্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের একচেটিয়া মালিকরা এই ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বটে। পরবর্তীকালে এই ক্ষমতা তাঁদের ছাড়তে হয়েছে। এ কোন স্বেচ্ছা-পূর্বক ক্ষমতা ত্যাগ নয়। অবস্থার চাপেই এটা হয়েছে।

সমাজবাদী চিন্তাবিদ জি. ডি. এইচ কোল্ গণতান্ত্রিক সমাজবাদী চিন্তাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। ওয়েব্স দম্পতির মত কোল্-দম্পতিও বহু অনুপ্রাণিতদের প্রেরণার উৎস ছিলেন। কোল্ বলেছিলেন রাষ্ট্রকে উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন যন্ত্রের একটি বৃহৎ অংশকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। চিন্তাবিদ অধ্যাপক কোল্ নির্বিচারে সমস্ত শিল্পের জাতীয়করণ সমর্থন অবশ্য করেননি। তবে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের (Public sector) অংশটি যথেষ্ট সম্প্রসারিত হওয়া চাই—যাতে করে ব্যক্তি মালিকানাধীনে পরিচালিত শিল্পগুলি নীতির ও আচরণের শৃঙ্খলা সব সময় মেনে চলতে পারে: "Must be large enough to set the tone for the rest leaving private industry to operate within a frame. Work of public enterprise rather than the other way around"

[G. D. H. Cole]

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীরা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের সামাজিকীকরণের পক্ষে। যদি

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-প্রশাসনে ও পরিচালনায় সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং শ্রমিকের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত না করা হয় তাহলে সে-ব্যবস্থা 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদেরই' নামান্তর হবে। এ ব্যাপারে যুগোশ্লাভিয়ায় এক নূতন পরীক্ষা চলেছে। মার্কসবাদীরা এবং চৈনিক কমিউনিস্ট পার্টির উগ্র 'বাম'—অংশ যুগোশ্লাভিয়ায় এই গণতান্ত্রিক পরীক্ষাকে 'শোধনবাদী' বলে নিন্দা করে আসছিল।

চিন্তাবিদ অধ্যাপক কোল্ গণতন্ত্রীদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে গেছেন: রাষ্ট্রীয়-করণই সামাজিকীকরণের একমাত্র পথ নয়। তিনি সমবায় এবং পৌর সংস্থার মাধ্যমে সামাজিকীকরণের (municipalization of services) ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে গেছেন। শিল্পোন্নয়ন শিল্প-বিন্যাস সংক্রান্ত নীতির রূপায়ণে "workers' self management" নীতিকে প্রয়োগ করে ধাপে ধাপে 'পাবলিক সেক্টর'কে—'ওয়ার্কার্স সেক্টরে' রূপান্তরিত করে শ্রমিক শ্রেণীর ওপর দায়িত্ব দিতে হবে। এতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দায়িত্বশীল আন্দোলনে রূপান্তরিত হবে—নিছক পাইয়ে দেবার রাজনীতি থেকে সরে এসে।

রাষ্ট্রীয়করণের যুক্তি উনবিংশ শতাব্দীতে ছিল মূলত নীতিগত (ethical)। নৈতিক মূল্যবোধের তাগিদই মানুষকে এই কর্মসূচীর দিকে মানবতাবাদী ও বুদ্ধিজীবিদের আকৃষ্ট করেছিল। দুঃসহ পুঁজিবাদী শোষণ মানুষকে অসহিষ্ণু করে তুলেছিল। এযুগে রাষ্ট্রীয়করণের যৌক্তিকতাকে শুধু ন্যায়-নীতির ওপর দাঁড় করাতে চেষ্টা করলেই হবে না। দক্ষতার ও অধিক উৎপাদনশীলতার ওপর, ভোগ্য পণ্য ও শিল্প-পণ্যের উৎকর্ষতা ও জনকল্যাণের ওপর রাষ্ট্রীয়করণের প্রস্তাবকে দাঁড় করাতে হবে। সমাজবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে শুধু ন্যায় নীতি ভিত্তিক উন্নত ব্যবস্থা বলে প্রচার ও প্রমাণ করলেই চলবে না—এ ব্যবস্থা যে সেই সঙ্গে আরও দক্ষ ও সৃজনশীল—রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে কম অপচয়, বেশী লাভ হবে—এটাও প্রমাণ করতে হবে। আর এর জন্যই চাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গণ-তন্ত্রীকরণ। সিডনী ওয়েব বলেছিলেন আসলে সমাজতন্ত্র হল গণতান্ত্রিক আদর্শের অর্থনৈতিক দিক—"economic side of the democratic ideal."

দেখা যায় রাষ্ট্রীয়করণ হলে অর্থনৈতিক ক্ষমতা পুঁজির মালিকদের হাত থেকে হস্তান্তরিত হয়ে এক-একটি শক্তিশালী পরিচালক বোর্ড (Board of Management)-এর হাতেই আসে। এখন এই হস্তান্তর হলেই কোন প্রাকৃতিক নিয়মে অথবা কোন বৈজ্ঞানিক সূত্র অনুযায়ী ক্ষমতাটা শ্রমিক বা

জনগণের হাতে এসে পড়ে না। দেখা গেছে এইসব 'বোর্ড' বা সংস্থা প্রভৃত ক্ষমতার অধিকারী এবং তাদের কৃত কর্ম বা সিদ্ধান্তগুলির জন্যে শ্রমিক শ্রেণী বা দেশের আম-জনতার কাছে 'জবাবদিহি' করতে বাধ্য নয় এবং কোন কৈফিয়ৎও দেয় না (less accountable)। দেশের অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ এবং শ্রমজীবীরা নূতন পরিচালকমণ্ডলীকে ক্ষুদে ডিক্টেটর বলেই মনে করেন। অভিযোগ ওঠে আমলাতান্ত্রিকতার। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব শুধুমাত্র মন্ত্রী বা মন্ত্রিসভার নীতি-সম্পর্কিত নির্দেশাবলী, পরিষদীয় বিতর্ক (Parliamentary debate) এবং পরিষদীয় উচ্চ পর্যায়ের কমিটির অনুসন্ধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

রাষ্ট্রায়ত্ত-শিল্পে লোকসানের অঙ্ক দেখে সাধারণ মানুষ আঁৎকিয়ে উঠছেন। এ ব্যাপারে শ্রমিক-কর্মচারী, বিশেষত প্রযুক্তিবিদ্ সমাজ বিজ্ঞানী ও রাজনীতি বিদদের সজাগ থাকতে হবে। দক্ষতার উৎস কিন্তু শাস্ত্রীয় মন্ত্রপাঠ সঠিক পদ্ধতিতে উচ্চারিত হওয়ার মধ্যে নিহিত নেই। রাজনীতির মতো—অর্থনীতিতেও কোন 'ডগমা' বা গোঁড়ামির স্থান নেই। তিনটি বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ থাকতে হবে: (১) প্রত্যাশিত বা আকাঙ্ক্ষিত সুফল জনগণ পাচ্ছেন কিনা, (২) অপ্রত্যাশিত অসুবিধা বা কুফল দেখা দিচ্ছে কিনা। এর জন্য দরকার চাই গ্রহীষ্ণু মন এবং বাস্তববাদী চিন্তা (economic pragmatism), (৩) স্বয়ং-শাসিত সংস্থা কর্তৃক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসংস্থাগুলির আয়-ব্যয় হিসাব পরীক্ষার (Audit) কড়া ব্যবস্থা।

শ্রমিক কর্মচারীরা যখন কোন বিশেষ শিল্পের জাতীয়করণ দাবী করেন তখন বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নকেও জনগণ ও সরকারের কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে—যে সুফল পাওয়া যাবে জাতীয়করণের ফলে, অপচয়, দুর্নীতি উৎপাটিত হবে। অপ্রত্যাশিত কুফল ও অসুবিধা দেখা দিলে, উৎপাদন ব্যাহত হলে, উৎকর্ষতা বা দক্ষতা ক্ষুণ্ণ হলে 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' বলে সরকারের অথবা আমলাদের ওপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে দায়িত্ব এড়াবার গতানুগতিক নেতিবাচক মনোভাবও পরিহার করতে হবে। একটা সহজ সত্য পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতে হবে: মালিকানা ব্যবস্থার সঙ্গে দক্ষতার কার্যকারণ সম্পর্ক কিছু নেই।

বেপরোয়া জাতীয়করণের নীতি দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেবে। ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলির পরিচালনায় যে প্রভৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়েছে—তা থেকে ভারতের রাজনীতিবিদদের শিক্ষার অনেক কিছু রয়েছে। এই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর পুনর্বিন্যাস দরকার।

অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশগুলিতে সেখানে যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যক্রম রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনীতির—কি কৃষির ক্ষেত্রে কি শিল্পের ক্ষেত্রে—সম্পূর্ণ সামরিকীকরণ হয়েছে (militarization of agriculture and industry)। শৃঙ্খলাতত্ত্বের নামে শ্রমিকশ্রেণীর গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পূর্ণভাবে হরণ করা হয়েছে। সমাজবাদী মূল্যবোধের জায়গা দখল করেছে উৎপাদন বৃদ্ধি-তত্ত্ব, বন্ধ্যা শৃঙ্খলা-তত্ত্ব, উৎপাদনে পুঁজিবাদী দুনিয়াকে পিছনে-ফেলে-লাফ-দিয়ে-এগিয়ে যাবার ঘুমপাড়ানি গান। সামরিকীকরণের নীতি গোটা দেশে একনায়কতন্ত্রের জোয়াল চাপিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

গণতন্ত্রে বিশ্বাসী যাঁরা তাঁরা সেই রাজনীতির ফাঁদে পা দেবেন কেন? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই শাসক দলকে সাহস ও নিষ্ঠার সঙ্গে আয়-বণ্টন (Income distribution) সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সিদ্ধান্ত নিতে হবে মোট উৎপাদনের (out-put) মধ্যে কতটা 'কনজাম্‌শন' বা জনগণের ভোগে নিয়োজিত হবে, কতটা জাতীয় লগ্নীতে (investment), কতটা সামাজিক খাতে আর কতটাই বা রপ্তানির খাতে, প্রতিরক্ষা খাতে। আর এটা নিশ্চয়ই সম্ভব। অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান পুঁথিগত শাস্ত্রজ্ঞানের চাইতেও বেশী উপযোগী। আর মনীষী এ্যারিস্টটলের বাণীটাই কি কম সত্য? ভোজনে যাঁরা আমন্ত্রিত হয়ে আসেন—পাচকদের চাইতে সেই অতিথিরাই ভোজনের যোগ্য সমঝদার —"the guest will judge better of a feast than the cook." [Aristotle]। জনগণের অভিজ্ঞতায় বিচারের আসল মাপকাঠি—কোন অনড় থিওরী নয়। গণতন্ত্রীদের থিওরীর গোঁড়ামিকে সর্বতোভাবে এড়িয়ে এগুতে হবে প্র্যাগম্যাটিজম্‌-এর ভিত্তিতে।

ইংলণ্ডের 'ফেবিয়ান সোস্যালিস্ট' মহল থেকে 'Competitive public enterprise'-এর প্রস্তাব উঠেছিল—অর্থাৎ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের ক্ষেত্রেও একটা প্রতিযোগিতার পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। এতে দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ মিলবে। এই প্রতিযোগিতার সুফল জনগণই পেতে পারেন। আমাদের দেশে এই 'কমপিটিটিভ পাবলিক এণ্টারপ্রাইজ'-এর কর্মসূচী রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতি-বিদরা রূপ দেবার চেষ্টা করতে পারেন। বার্নার্ড শ'র একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে:

"Since competition among producer admittedly secures to

the public the most satisfactory products, the State should compete with all its might in every department of production" [From : The Future Of Socialism. By C. A. R. Crosland : 327]

এ দেশেও সাবেক একটা তর্ক উঠেছে : ভারী শিল্পের সম্প্রসারণ না করে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটীর শিল্পের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। ভারতবর্ষকেও একটি আধুনিক শিল্পোন্নত রাষ্ট্ররূপে গড়ে উঠতে হবে। ভারী শিল্পকে অবহেলা করা হবে চরম আত্মঘাতী নীতি। মনে রাখতে হবে বর্তমান বিশ্বের দুটো অতিকায় রাষ্ট্র রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাইবে না ভারতবর্ষ আধুনিক শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হোক। ভারতবর্ষকে কাঁচামাল সরবরাহের ঘাঁটিরূপে তারা দেখতে চায়। এই ব্যাপারে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের সজাগ থাকা চাই। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা টেক্‌নলজী বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে দেশের উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রভৃতির জন্য ভারী শিল্পের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে এবং তার পরিকল্পনা ব্যবস্থায় গণতন্ত্রীকরণ অপরিহার্য। অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে আধুনিক বৃহৎ ভারী শিল্পে (capital intensive) কর্মসংস্থানের সুযোগ কমই। এদেশে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে বৃহৎ শিল্পে একটি লোকের কর্মসংস্থানের জন্য ২·৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হয়। প্রতিটি কর্মচারী শ্রমিকের জন্য যে পরিমাণ 'ফিক্‌সড এ্যাসেট' প্রয়োজন সেটা ক্ষুদ্র শিল্পে সেইরূপ একজন শ্রমিক-কর্মচারীর জন্য নির্দিষ্ট সংস্থান বা 'এ্যাসেটের' প্রায় আট গুণ। অথচ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই বিপুল বিনিয়োগ সত্ত্বেও ক্ষুদ্র শিল্পের একজন শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতার (প্রোডাক্‌টিভিটি) মাত্র দ্বিগুণ। সুতরাং যে দেশে এই ভয়াবহ বেকারী ও দারিদ্র্য সে-দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করতে কৃষি উৎপাদন ও ক্ষুদ্র কুটীর শিল্পের, গ্রাম-ভিত্তিক অর্থনৈতিক উদ্যোগের প্রাধান্য থাকবেই। তাই বলে বৃহৎ ভারী শিল্প, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের গুরুত্ব বা ভূমিকা হ্রাস হবে না। ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও প্রতিরক্ষা মজবুত করার জন্যেই প্রয়োজন ভারী শিল্পের ভিত্তি ও বুনিয়াদ দৃঢ় করা, কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত ভারী শিল্পের ওপর চাই কড়া তদারকি এবং বিশেষজ্ঞের পর্যবেক্ষণ ও অডিট ব্যবস্থা।

(২) গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে মার্কসবাদীদের আর একটি পার্থক্য :

ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-মানুষেব মর্যাদা সমাজবাদী বাষ্ট্রে অলঙ্ঘনীয়। রাষ্ট্রীয় স্বার্থ অথবা কল্পিত বর্ধিত উৎপাদন-তত্ত্বের যূপ-কাষ্ঠে শ্রমিক-নাগরিককে বলি দেওয়া চলবে না।

অনেকে অবশ্য মনে কবেন গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বাধ্য-বাধকতার (compulsion) স্থান নেই। কমিউনিস্টরাই বলপ্রয়োগের নীতিতে বিশ্বাসী। প্রচাবেব দ্বাবা, শিক্ষাব দ্বাবা পবিবর্তনীযতাব নীতিতে (persuation) তাঁবা বিশ্বাসী নন। আবাব কোন প্রকাব বাধ্য-বাধকতা থাকলেই সমাজতন্ত্র বা গণতন্ত্র অশুদ্ধ হয়ে যাবে মনে কবা ভুল। যে-কোন বাজনৈতিক থিওরী আসলে মানব প্রকৃতির মূল্যাযনেব ওপবই প্রতিষ্ঠিত। মানব প্রকৃতিব প্রকৃত গঠনেব, তাব বিশ্লেষণের ওপবই থিওবীব যথার্থতা নির্ভব কবে। মানুষেব প্রকৃতিব মধ্যে এমন প্রবৃত্তি আছে যা সমষ্টি-স্বার্থে শাসিত ও বাধ্যতামূলকভাবে আইন দ্বাবা নিযন্ত্রিত হওয়া দবকাব। যদি আবেদন প্রচাব ও শিক্ষাব দ্বাবা সুষ্ঠু নিযন্ত্রণ অসম্ভব হয় তাহলে সমাজ ধবে আইনেব বাধ্যতামূলক প্রযোগ আবশ্যক হযে পড়বে। তবে বাধ্য-বাধকতাব অর্থ—গণ-নিপীড়ন বা আইন-বিধি-বহির্ভূত শাস্তিদান (extra legal punishment বা 'লিকুইডেশন' নয—যা ফ্যাসিস্ট কমিউনিস্ট বা সামবিক জুন্টা-শাসিত বাষ্ট্রে হযে থাকে। যেমন ধবা যাক, অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদাযিকতা, ধর্মীয কুসংস্কাব ইত্যাদি। যদি কেউ এসব ব্যাপাবে আইনেব প্রাধান্য মানতে না চান, পবন্তু আচবণেব দ্বাবা প্রশ্রয দেন বা উসকানি দেন তাহলে বাষ্ট্র কি গণতন্ত্রেব দোহাই দিযে হাত গুটিযে বসে থাকবে? এক শ্রেণীব লোভী খাদ্যে ভেজাল দেবে, অতি মুনাফাবাজী চোবাকাববাবী মজুতদাবী কবে দেশেব সর্বনাশ সাধন কবতে যাবা প্রবৃত্ত হবে, যাবা বিশৃঙ্খলা অবাজকতা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকবে বাষ্ট্র তাদেব নাতজামাই-এব আদবে আপ্যাযন কববে? অশ্লীল সিনেমা, থিযেটাব, পত্র পত্রিকা নোংবা সাহিত্য—'শিল্পে স্বাধীনতা', 'স্বাধীন সাহিত্য' ইত্যাদি কথিত আদর্শেব নামে যদি চলতে থাকে কি কোন বলিষ্ঠ সবকাব মেনে নিতে পাবেন? এভাবে 'স্বাধীনতাব' নামে গোটা দেশেব যুব মনকে বিনষ্ট কবা হচ্ছে, পঙ্গু কবা হচ্ছে। এই কুৎসিত ষড়যন্ত্রেব মূলোৎপাটন কবতে হবে দেশকে নবজাতকেব বাসযোগ্য কবাব জন্য।

স্বাধীনতাব অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা নয। অধিকাব-বোধ কর্তব্য-বোধেব দ্বাবা

পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। স্বাধীনতার মাহাত্ম্য ও গাম্ভীর্য নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। যা সত্য সুন্দর মঙ্গলময় তা অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় না। দার্শনিক প্লেটো গ্রীসের ডেমোক্রাটদের অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার দাবীকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছিলেন। অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা নূতন অত্যাচার ও দাসত্বের পথ তৈরী করে দেয়। ইতিহাস একথার সাক্ষী। উচ্ছৃঙ্খলতা অরাজকতার জন্ম দিয়ে থাকে। এই অরাজকতা স্তব্ধ করার দাবীতে সমাজে শৃঙ্খলার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্য সুযোগ-সন্ধানী দল নতুন স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ খোঁজে।

বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী হোয়াইটহেডের মন্তব্যটি স্মর্তব্য :

"Unrestricted liberty means complete absence of any compulsory co-ordination. Human society in the absence of any compulsion is trusting to the happy co-ordination of individual emotion, purposes and affections and actions. Civilisation can only exist among a population which in the mass does exhibit this fortunate neutral adaptation. Unfortunately, a minority of adverse instance, if unchecked, is sufficient to upset the social structure. A few men in the whole cast of their character and most men in some of their actions are anti-social in respect to the particular type of any society possible in their time. There can be no evasion of the plain fact that compulsion is necessary and that compulsion is the restriction of liberty." [A. N. Whitehead, Adventures Of Idea, P. 71]

শৃঙ্খলা ব্যতিরেকে স্বাধীনতা অবা[illegible] পার্থি[illegible]। [illegible] শৃঙ্খলা ও অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার নিয়ন্ত্রণ প্রকৃত[illegible] নাগরিকদের [illegible]। আর এই সর্তগুলি আদালতের বিচার ও পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ (Judicial review of executive actions) হওয়া চাই। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ও একদেশদর্শী একনায়কতন্ত্র-ধর্মী মার্কসীয় সমাজবাদের সঙ্গে মৌলিক পার্থক্যের আস্বাদ পাওয়া যাবে দেশের বিচারালয়ের স্বাধীন নিরপেক্ষ ভূমিকা এবং সরকারী বিধি-নিষেধ—প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রের পুলিশ-ক্ষমতার ওপর মূল্যবোধ

সচেতন সজাগ আইনসভার, বিচারালয়ের নিরপেক্ষ নির্ভীক পর্যবেক্ষণ গণ-মতের অস্তিত্ব ও গণ-সমালোচনার স্বীকৃতির মধ্যে। প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা ও আইনের শাসনের প্রাধান্যের গুরুত্ব এইখানেই। কোন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে আদালতকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয় না মার্কসীয় তত্ত্বগত কারণেও।

ভারতের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের (গ) উপধারায় বলা হয়েছে:

"39 (c) · That the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment".

দেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির পরিণতির দিকে তাকালে দেখা যায় দেশের ওপরতলার আমলারা, প্রশাসক, রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রনেতারা গত ২৫ বছর ধরে নিজেদের প্রচারিত তত্ত্বের ঘোষণাকে বিদ্রূপ করে এসেছেন। অর্থনৈতিক ক্ষমতা কিভাবে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে কিছু ধনকুবেরদের ও তাদের পরিবারের হাতে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে সরকারী প্রতিবেদনগুলিতে। 'মনোপলি কমিশনের' কাছে যে সব গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব পেশ হয়েছিল তাতেই বোঝা গেছে গোটা ভারতের অর্থনীতি কাদের মুঠোর মধ্যে। ১৪টি ব্যাঙ্কিং কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত হল। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের লগ্নীর বা ঋণদানের সুযোগ এ পর্যন্ত কারা পেল? সেই মুষ্টিমেয় বৃহৎ পুঁজির মালিক গোষ্ঠী। যেন মনে হবে সমগ্র রাষ্ট্রীয় প্রশাসন একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ রক্ষারই কাজ করে চলেছে।

যে দেশে শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্য-সীমার নীচে বাস করছে—সে দেশে বড় বড় স্বয়ংবস্ত্রের কল-কারখানায় উৎপন্ন হচ্ছে দামী দামী অতি মিহি সুতার সৌখীন কাপড়—জামার কাপড় ইত্যাদি। দেশের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষের জন্য প্রয়োজন সস্তা দরের মোটা টেঁকসই পরিধানযোগ্য অল্প দামের নিত্যব্যবহার্য কাপড়-শাড়ী ইত্যাদি। ভারতের 'ন্যাশন্যাল কাউনসিল অফ অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক রিসার্চ'-এর একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে সস্তা নিয়ন্ত্রিত দরের উৎপন্ন মোটা মিলের কাপড়ের শতকরা ১৫ ভাগ মত গ্রামের লোকদের ভাগে জোটে। ২৭ ভাগ ব্যবহার করে বড় বড় সহরের মানুষ। যে অসচ্ছল শ্রেণীর মানুষদের জন্য এই মোটা কাপড় দেশের সুতিকলগুলিতে উৎপন্ন হচ্ছে তাও জোটে না গরীবদের জন্য। এ কি জনকল্যাণ-ধর্মী রাষ্ট্রের লক্ষণ?

দেশের পরিকল্পনা রচনা করছেন সিভিলিয়ান, হারভার্ড, অক্সফোর্ড, মস্কোর বিশেষজ্ঞরা। ৭০ ভাগ লোককে উপবাসে-অনাহারে অবহেলায়-অন্ধকারে রেখে বাকী ৩০ ভাগের শুধুমাত্র একটি সংঘটিত অংশের জন্য দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা রূপায়িত হয়ে চলেছে। নীচের তলার মানুষদের দু'চোখ দিয়ে অঝোরে কান্না ঝড়ছে। তারা পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। দেশের ধনবৈষম্য এবং আয়-বণ্টনের ক্ষেত্রে যে প্রচণ্ড বিকৃতি (d'stortion of income pattern) উৎপাদন নীতিতে তার প্রভাব এসে পড়ছে। রাষ্ট্রনায়কদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে দেশের ৭০ ভাগ গরীবদের জন্য মোটা অল্প দামের পরিধানযোগ্য কাপড় উৎপাদনে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেবার, এই কার্যসূচীকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য সারা দেশে হস্ত-চালিত—বিদ্যুৎ-চালিত তাঁত ও কুটীর শিল্পের ভূমিকা সর্বাধিক। অথচ এই শিল্পগুলিই এদেশে মার খাচ্ছে। দেশে দামী কাপড় কেনার লোক ক্রমশই কমে আসবে। শিল্পপতিরা এক সময় দাম বাড়িয়ে অতি মুনাফা লুটলেন, সরকারের কাছে থেকে ভরতুকি পেলেন। বর্ধিত দাম দিতে গিয়ে ক্রেতা-সাধারণ ক্রয়-ক্ষমতা হারালেন। তখন এই শিল্পপতিরা 'মন্দার' ধুয়ো তুলে বসেন। এখন প্রশ্ন মূল্যনীতি নির্ধারণের সময়—'investment decisions' 'production decisions'গুলো নেবার সময় ভারত সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়ে আসছেন কেন? দেশের অর্থনীতিবিদ বিশেষজ্ঞ বড় বড় ট্রেড ইউনিয়নগুলির মতামত অগ্রাহ্য হয় কি করে? দেশের বড় বড় ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতিবাচক ভূমিকা দেখে হতাশ হতে হয়।

সরকারই বলে দেবেন কাপড়ের কলের মালিকদের গরীব দেশের গরীবদের উপযোগী বস্ত্র উৎপাদনের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। এই উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দিতেই হবে। তবেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের আস্বাদ গরীব শ্রেণীর মানুষ পেতে পারে। লর্ড কীন্‌সের থিওরী সত্যরূপে প্রতি মুহূর্তে হাজির হয় আমাদের কাছে। দেশে মোট চাহিদার ঘাটতি দেখা দিলে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেবেই। সাধারণ মানুষের যাদের শতকরা ৭০ ভাগই দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছেন—তাদের ক্রয়-ক্ষমতা (purchasing power) না থাকলে দেশে ভোগ্য পণ্যের চাহিদা থাকবে কি করবে? তাই এই বিপুল-সংখ্যক মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা বাড়ানর প্রশ্নটি অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের একটি মূল প্রশ্ন। দেশে হাজার হাজার গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। গ্রামের মেয়ে-পুরুষদের

প্রতিদিন দূর-দূরান্ত গ্রাম থেকে কঠোর পরিশ্রম করে পানীয় জল সংগ্রহ করে আনতে হয় আজও (গান্ধী-শতবার্ষিকী ঘটা করে উদযাপিত হয়ে গেল!)। হাজার হাজার গ্রামে পানীয় জলের কলগুলি দীর্ঘ দিন ধরে অকেজো হয়ে পড়ে আছে (derelict tubewells)।

এদেশে কোন্ শিল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে—রেফ্রিজারেটার নির্মাণ অথবা ঘরের হাওয়া শীতলীকরণের যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা—না ব্যাপক-ভাবে টিউবওয়েল বা কৃষি-সরঞ্জাম তৈরীর কারখানা? গ্রামে গ্রামে পর্যাপ্ত সংখ্যায় পানীয় জলের কল বসাবার মত টিউবওয়েলের সরবরাহ নেই—অথচ 'এয়ার কুলার'—রেফ্রিজারেটার তৈরীর জন্য কারখানা বসাবার অর্থের অভাব হয় না। অবস্থাপন্নদের—ধনীদের চাহিদা মেটাবার প্রয়োজনীয়তাকে আমাদের পরিকল্পনা-বিশারদরা, প্রশাসকরা, শিল্পপতিরা বেশী গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। এদেশে মে [illegible] 'হঠাবার' কথা যতই বলা হোক না কেন রাষ্ট্র ও প্রশাসন-যন্ত্র বিত্তবানদের স্বার্থেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বড় বড় শহরে বড়লোকদের জন্য আকাশ-ছোঁয়া বিলাস-বহুল বাড়ী উঠছে। সরকারী বা বেসরকারী সংস্থাগুলি দেশের বিত্তবানদের বাসস্থানের সমস্যা নিয়ে বেশী উদ্বিগ্ন। এই সব বাড়ীর জন্য সিমেন্টের কোন অভাব নেই। অথচ দেশের নিম্ন-মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত গরীব শ্রেণীর মানুষদের জন্য বস্তীবাসীর জন্য ভারত সরকার অথবা রাজ্য সরকারগুলি নিয়েছেন কোন ব্যাপক গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা? তখন সিমেণ্ট লোহার অভাবের দোহাই পাড়া হবে। গ্রামের গৃহহীনদের জন্য মাথা গোঁজার ব্যাপক কোন ব্যবস্থা রাজ্য সরকারগুলি করেছেন?

দেশের কোটি কোটি মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির দাবীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটিয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র বলে নিজেদের প্রচারের ঢাক পিটিয়ে জাহির করা দুঃসহ আত্ম-প্রতারণা ছাড়া আর কি? ভোট-সর্বস্ব রাজ-নীতিতে 'গরীবি হঠানোর' স্লোগান ভোটার ধরার ফিকির বলেই সাধারণ মানুষের বুকে বাজে। সমাজতন্ত্রের কথা এত বলা হয়েছে, প্রগতিশীলতার ভেরী এত বাজানো হয়েছে তবু কেন দেশের রাষ্ট্রনায়করা প্রশাসকরা দেশের উৎপাদন-বণ্টন ও পুঁজিবিনিয়োগ সংক্রান্ত মৌল সিদ্ধান্তগুলি নেবার ব্যাপারে এত হৃদয়হীনতা এত উপেক্ষা উদাসীনতার পরিচয় দিয়ে চলেছেন? ভারতে অর্থনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হবে দেশের দরিদ্র ৮০ ভাগ মানুষের

প্রতিদিনের চাহিদা পূরণের জন্য কর্মকাণ্ডের আয়োজন করা। পঙ্গু মনুষ্যত্বকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দলমত নির্বিশেষে আপোষহীন সংগ্রামে সামিল হতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ আহ্বান জানিয়ে গেছেন :

"যেখানে মানুষ অন্নাভাবে কাঁদছে সেখানে তার অন্নের সংস্থান করো ; যেখানে রোগ-যাতনায় মানুষ কষ্ট করছে সেখানে তার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াও, যেখানে অশিক্ষা আর কুশিক্ষায় মানুষের অন্তর দুয়ার বন্ধ সেখানে তোমার জ্ঞানের শিক্ষা নিয়ে উপস্থিত হও, যেখানে নারী ম্লান বিষণ্ণ মুখে অনাদরে অবজ্ঞায় শুকিয়ে যাচ্ছে, পদাহত নারীত্বের করুণ আর্তনাদ আকাশ বিদীর্ণ করছে সেখানে তার পাশে দাঁড়িয়ে বল, আমি তোমার সন্তান তুমি অসহায় কিসে !"

[স্বামী বিবেকানন্দ]

যে-দেশে মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশী মানুষ অশিক্ষিত এবং অক্ষর পরিচয়টুকুও যাদের হয়নি সেদেশে জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করার কাজ কি অগ্রাধিকার পাবে ? কর্মহীনদের কর্মসংস্থান, আশ্রয়হীনদের আশ্রয় দানের—না গ্রামে গ্রামে উচ্চমানের প্রাথমিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন, গ্রামীণ পাকা সড়ক নির্মাণের কর্মসূচী অগ্রাধিকার পাবে ?

ভারতবর্ষে গত ক' বছর ধরে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এক অরাজকতা চলেছে। অবিরাম তেলা মাথাগুলোতে তেল দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে আর শুকনো খসখসে মাথাগুলো শুষ্কই থেকে যাচ্ছে। এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ ও ট্রেড ইউনিয়ন এই আত্মঘাতী রাজনীতিতে মদত দিয়ে চলেছেন। লক্ষ লক্ষ ম্লান মুখগুলো অব্যক্ত জীবন-যন্ত্রণায় কাতর, ভাষাহারা। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদছে। অর্থনৈতিক গণতন্ত্র রূপায়ণে উদ্যোগী যাঁরা হবেন তাদের সর্বাগ্রে সামাজিক বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য স্থির করে নিতে হবে, উন্নয়নের কোন্ কোন্ কর্মসূচী অগ্রাধিকার পাবে (ordering of priorities)। পরিকল্পনা রচনার ভিত্তি হবে সেটাই। নতুবা 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের' আদর্শ রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর, অজ্ঞ অশিক্ষিত ভোটদাতাদের সম্মোহন করে রাখার ঘুম-পাড়ানি ছেলে-ভোলান গান ছাড়া আর কিছুই নয় এ সংশয় জাগবে মানুষের মনে।

দেশের অগ্রগতি হচ্ছে 'প্রতিক্রিয়াশীল' শক্তসমূহের প্রতিরোধ ঠেলে দেশ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার লক্ষ্যাভিমুখে এগুচ্ছে, অহর্নিশি এই বিরামহীন প্রচার

হচ্ছে। কতযুগ আগে বন্দেমাতরম মন্ত্রের উদ্‌গাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রগতি-বাদীদের প্রগতি কীর্তনের মুখোশ খুলে দিতে গিয়ে কলম ধরেছিলেন। ব্রিটিশ শাসকদের এবং তাদের তল্পীবাহীদের বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গ হেনে তিনি লিখেছিলেন :

"আজিকালি বড় গোল শুনা যায় যে, আমাদের দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এতকাল আমাদের দেশ উৎসন্নে যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরেজের শাসন কৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি।...দেশের বড় মঙ্গল তোমরা একবার মঙ্গলের জন্য জয়ধ্বনি কর।

এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল? হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে খালি মাথায় খালি পায়ে একহাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থি-চর্মবিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণের জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দম পান করিতেছে, ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে। কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাগ পাতরে রাঙা রাঙা বড় বড় ভাত লুন লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয় ভূমে, গোহালের এক পাশে শয়ন করিবে—উহাদের মশা লাগে না। তাহারা পরদিন প্রাতে আবার সেই একহাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে, যাইবার সময় হয় জমিদার নয় মহাজন পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয়ত চষিবার সময় জমিদার ভূমিখানি কাড়িয়া লইবেন। তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস, সপরিবারে উপবাস। বল দেখি চশমা-নাকে বাবু? ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদের কি মঙ্গল সাধিয়াছ? আর তুমি ইংরেজ বাহাদুর...তুমি বল দেখি তোমা হইতে এই হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তের কি উপকার হইয়াছে? আমি বলি অনুমাত্র না, কণামাত্র না। তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না। দেশের মঙ্গল—কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি। কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে

দেশের কয়জন থাকে। হিসাব করিলে তাহারাই দেশ। দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী।...সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।" [বঙ্কিমচন্দ্র : বিবিধ প্রবন্ধ : বঙ্গদেশের কৃষক ; বঙ্কিম রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৮-২৮৯ : সাহিত্য সংসদ]

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের এই রচনা প্রকাশিত হবার পর দেশে অনেক পরিবর্তন এসেছে, জমিদারী প্রথা বিলোপ করা হয়েছে, মধ্যস্বত্ত অধিকার বিলুপ্ত হয়েছে আইনজারী করে, দেশে সমবায় আইন মাধ্যমে কৃষক সমাজের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা হয়েছে, মহাজনী শোষণ থেকে গরীব কৃষককে বাঁচাবার জন্য আইনও হয়েছে—দেশে বড় বড় পাঁচশালা পরিকল্পনা কার্যকরী হয়েছে সকল রাজনৈতিক দল সমাজতন্ত্রের মন্ত্র ঘন ঘন উচ্চারণ করে দেশবাসীকে সঞ্জীবিত করেছেন, কৃষিতে দেশে নাকি 'বিপ্লব' সাধিত হয়েছে, দেশে খাদ্যোৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সবই সত্যি কিন্তু প্রকৃত 'হাসিম শেখ রামা কৈবর্তের' কি উন্নতি হয়েছে? কৃষি-নির্ভর গ্রামে-গাঁথা এই দেশে এই শ্রেণীর মানুষই তো বেশী। গণতন্ত্রের লক্ষ্যই তো সর্বাধিক সংখ্যক লোকের সর্বাধিক কল্যাণ ও উন্নতি সাধন। সেই বিচারে এই অবহেলিত এই বিপুল জনসমাজের উন্নতি কি হয়েছে? তাদের কি সত্যিই মঙ্গল হয়েছে? গ্রামীণ জীবনে কি রূপান্তর সাধিত হয়েছে? সরকারী সকল আইন ও পরিকল্পনার সুযোগ সুবিধা বড়লোকরাই, গ্রামের বড় কৃষকরাই একচেটিয়া করে নিয়েছে। সমবায় সমিতিগুলি, কৃষিঋণ দান সমিতিগুলি গ্রামের বড় বড় হাঙড়-ভাঙড়দের দ্বারা কুক্ষিগত। গরীবরা সেখান থেকে প্রায় নির্বাসিত। এই করুণ নির্মম সত্যটি অকরুণভাবে পরিস্ফুট আজ। কৃষক সমাজকে কৃষি-নির্ভর কৃষি-শ্রমিক ক্ষেত-মজুরদের উপবাসী রেখে দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও জয়যাত্রার জয়ঢাক যাঁরা বাজাতে চান বাজান তাতে তাঁদের স্বার্থ জড়িত আছে। যাঁরা এই জয়ধ্বনিতে গলা মেলাবেন না তাঁরা কেন 'প্রতিক্রিয়াশীল' 'দক্ষিণপন্থী' 'বামপন্থী হঠকারী' বা 'সিয়ার' (CIA) চর' বলে নিন্দিত হবেন? 'সমাজতন্ত্র' 'গণতন্ত্রের'ই অর্থনৈতিক দিক। সর্বাধিক সংখ্যক দেশবাসীকে অনাদরে রেখে 'অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের' বড়াই করা নিজেদের বিবেকের সঙ্গে প্রতারণা করারই সমতুল্য।

দেশের অগ্রগতির বিচারের কষ্টিপাথর হল সাধারণ মানুষের সুখ সমৃদ্ধি।

ক্ষুধার্ত মানুষ কি তত্ত্বকথায় ভুলতে পারে? জীবন তত্ত্বের চেয়ে অনেক বড়। Goethe বলেছিলেন 'theory is grey, life is evergreen'। ঊষর তত্ত্বের অভ্রান্ততা প্রমাণের জন্য মানুষের জীবন যুগ যুগ ধরে বান্ধী রাখা যায় না। মানুষের জন্যই তত্ত্ব। রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক গণতন্ত্র তো মানুষের জীবনে সবুজের সাধনাকে সার্থক করার জন্যই। দেশে বড় বড় ইস্পাত কারখানা হচ্ছে, ব্যাঙ্ক বীমা রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েছে, দেশের কয়লা খনিগুলির পরিচালন ভার পুঁজিপতিদের হাত থেকে রাষ্ট্রের হাতে এসেছে বড বড প্রকল্প উদ্যোগ রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। বড় বড বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে আকাশ-ছোঁয়া বাডীর উপর বাড়ী উঠেছে, বৈদেশিক বাণিজ্যের অঙ্ক স্ফীত হচ্ছে বুভুক্ষুদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিযে দেশের খাদ্যশস্য, মাছ তরিতরকারি ফল সব কিছু রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা জাতীয় ভাণ্ডারে জমেছে। আমার বিক্রয়কর বাবদ সরকারের খাজাঞ্চীখানায় মোটা অঙ্কের রাজস্ব জমা পড়ছে বছর বছর। এ সবই সত্য; কিন্তু দেশের 'হাসিম শেখ রামা কৈবর্তের' জীবনের কোন হেরফের হয়েছে তাতে? চির-দুঃখীর চোখের জল-ফেলা কি একদিনের জন্যও বন্ধ হয়েছে? ক্ষুধার্তের জন্য কি এত প্রগতির ফলে দু'বেলা প্রতিদিন অন্ন জুটছে? যারা দিনে একবেলা ভরপেট আহার জুটলে নিজেদের ঈশ্বরের ধন্য জীব বলে মনে করে তাদের কি দেশের এই শ্রীবৃদ্ধির ফলে দুঃখ ঘুচেছে?

দেশের বিচারালয়ের কাছে একজন সাধারণ নাগরিক এবং দেশের সর্ব-শক্তিমান প্রধানমন্ত্রী আইনের চোখে ও ব্যবহারে সমান একথা সার্থকভাবে প্রমাণের নজির সৃষ্টি করেছেন ভারতেরই একটি হাইকোর্টের বিচারপতি তাঁর স্বাধীন নির্ভীক বিচারের তুলাদণ্ডে। সে এক নিঃশব্দ রক্তপাতহীন বিপ্লব সমতুল্য কাণ্ড। কিন্তু দেশের বড বড় হাসপাতালে আমীর এবং ফকির কি সমান বিচার পান? রুগ্ন আর্ত মানুষের দল বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর কোলে প্রতিদিন ঢলে পড়ছে, দেশে বড বড হাসপাতাল হলেই বা তাদের কি এসে যায়? তারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই হারিয়ে গেল। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজ পুরোহিতরা তাদের জন্য কি করেছেন? দেশের একজন নেতা বা নেত্রীর অপরিহার্যতার তত্ত্ব দিবা-রাত্রি প্রচারের মধ্যেই কি সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষার—অর্থ নৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জীয়ন কাঠি লুকানো আছে? একজন নেতা কিছুসময়ের জন্যও

সর্বোচ্চ ক্ষমতা থেকে ন্যায়ের ও রাজনীতির আদর্শের পতাকা উড্ডীন রাখতে সরে দাঁড়ালে দেশে 'শ্রীবৃদ্ধি' ও 'কল্যাণের' জয়যাত্রা 'স্তব্ধ' হয়ে যাবে? ভারতের 'হাসিম শেখ রামা কৈবর্তের' দল কি সেই রায় দেয়?

যে দেশে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে এবং কুখাদ্য খেয়ে মারা যায় সেদেশের বহির্বাণিজ্য মন্ত্রক 'প্রগতিশীলতার' উর্দি চড়িয়ে সগর্বে ঘোষণা করছে ফলাও করে ভারতবর্ষ ১৯৫১-৫৫ সালে ৩০ হাজার টন উচ্চমানের চাউল বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা মুনাফা লুটেছে। দেশের খাদ্যশস্য ভোগ্যপণ্য শাক-সব্জী পর্যন্ত নির্বিচারে বিদেশে চালান যাচ্ছে। দেশের মানুষকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির নরক-যন্ত্রণা কুণ্ডে বিক্ষিপ্ত রেখে। এ কি সমাজতন্ত্র? পুঁজিপতিরা, একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা গোটা সমাজকে বন্ধক রেখে নিজেদের লাভের থলে ভর্তিতে সদা ব্যস্ত বলেই তো সেই বদর্য গৃধ্নু সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন দাবীতেই সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধের জয়গান। আবার অর্থনৈতিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থারও কি লক্ষ্য তাহলে রাষ্ট্রীয় লাভ ও লোভের থলি ভর্তি করা? সমাজতন্ত্রেও কি মানুষ তথা শ্রমিক বর্ধিত উৎপাদনের, বর্ধিত রপ্তানির বেদীমূলে বলি হবে? পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মত তাহলে কি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও দেশের আম-জনতা চোখবাঁধা কলুর বলদ হয়ে অবিরত শোষণ ও পেষণ-ঘানির চারপাশে পাক খেয়েই মরবে? বিশাল বিশাল আকাশ-ছোঁয়া প্রাসাদোপম বাড়ী উঠছে তাদেরই চোখের সামনে যাঁরা বছরের পর বছর ফুটপাথে রাস্তার ধারে খোলা আকাশের নীচে গরীবের ভগবানে বিচারের আশায় কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেল।

'অর্থনৈতিক গণতন্ত্র' মানুষে-মানুষে দুস্তর ব্যবধান দূর করতে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে একটা সর্বোচ্চ আয় এবং সর্বনিম্ন আয়ের কাঠামো বেঁধে দিয়ে নিজেকে সুনিশ্চিত করে। জাতীয় অর্থনীতিতে একটা ন্যাশন্যাল 'সিলিং' (Income ceiling) এবং একটা ন্যাশন্যাল 'ফ্লোর' (Floor) থাকা চাই যার নীচে একজন নাগরিকের আয় নামতে দেওয়া হবে না। সর্বোচ্চ আয়ের সীমাও এইভাবে বেঁধে দিতে হবে। আর এই ঊর্ধ্বসীমা ও নিম্নসীমার ব্যবধানটুকু সহনীয় সীমার (tolerable limits) মধ্যে থাকা চাই। দেশের প্রগতিবাদীরা যাঁরা দেশের ব্যাপক শ্রীবৃদ্ধি ও মঙ্গল সাধনের প্রমাণে সদা-ব্যস্ত তাঁদের জানা দরকার দেশের শেঠ বড় আমলা 'চশমা-আঁটা বাবুদের' সঙ্গে

'হাসিম শেখ রামা কৈবর্তদের' অকল্পনীয় অশোভন ব্যবধান ঘোচাবার আশু ব্যবস্থা না হলে সমাজে সংঘর্ষের দাবানল সৃষ্টি হবেই একদিন। ক্ষমতা মদমত্তদের ক্ষমতার পূর্ণ মদ্যভাণ্ড চূর্ণ করে ইতিহাসের আবর্জনাকুণ্ডে নিক্ষেপ করবে তারাই যারা সমতা ও ন্যায়বিচারের আশীর্বাদ থেকে চির নির্বাসিত থেকেছে। শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্বের লেবেল এঁটে শক্তিমত্ততার নিশান উড়িয়ে যে-গৃধ্নু, হৃদয়হীন দয়া মায়া সহানুভূতি-রিক্ত বণিক-সভ্যতা দেশের প্রশাসনকে অবলম্বন করে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে উদ্যত তার পালিশ-করা জীর্ণতাকে চিনিয়ে দেবার জন্য সংগ্রামের দুন্দুভি বাজাতে হবে। সুভাষচন্দ্রের ভাষায়:

"এ কথাটা ভুলো না যে, দাসত্বের চাইতে বড় অভিশাপ আর নেই। ভুলে যেও না যে, অবিচার আর দুর্নীতির সঙ্গে আপোস করবার চাইতে বড় অপরাধ আর নেই। মনে রেখো সেই শাশ্বত নীতি: জীবনকে পরিপূর্ণ করে পেতে হলে জীবনের বিনিময়েই তা পেতে হবে। আর মনে রেখো সর্বোচ্চ ক্ষয় ও ক্ষতি [illegible] অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে অবিরাম।"
[শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, প্রেসিডেন্সী জেল থেকে লেখা চিঠি: ২৬.১১.৪০]

বেদান্ত কেশরী স্বামী বিবেকানন্দ এই অবহেলিত পদানত অপমানিত কোটি কোটি ভারতবাসীর মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন এই দরিদ্র [illegible] মানুষের মত মাথা তুলে দাঁড়াক। স্বামীজী জানতেন তারা এক [illegible] তারা। দ্বিধাহীন ভাষায় স্বামীজী স্বার্থপর ক্ষুদ্রচেতা ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের সম্বন্ধে বলেছিলেন:

"তোমরা শূন্যে বিলীন হও। আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে। জেলে মালো মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্যে হতে। ...বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র বছর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে।"

৮

নেতা নির্বাচন ও রাজনৈতিক উত্তরাধিকার সূত্র: দলীয় গণতন্ত্রের ভূমিকা

ভিন্নমত, প্রতিকূল মত সহ্য করার মধ্যেই রয়েছে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এবং গণতান্ত্রিক বিকাশের চাবিকাঠি। আর এই ভিন্ন বা বিরোধী মত প্রকাশের অধিকারের গ্যারান্টি রাজনৈতিক দলের শাসক গোষ্ঠীর বা নেতার আচার-আচরণের মধ্যে নিহিত থাকতে পারে না। এর গ্যারান্টি দেশের সংবিধানে (Constitution), দলের সংবিধানে থাকা চাই। দেশের নেতা—তিনি যত মহানই হোন না কেন—যত মহৎ ও আকর্ষণীয় গুণাবলীর সমাবেশই হোক না কেন তাঁর চরিত্রে, যত ত্যাগী যত নিঃস্বার্থপরই হোন না কেন তিনি—দেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্রের গ্যারান্টি সেই ব্যক্তি-নেতা নন। দেশের নাগরিকদের রাজনৈতিক দলের কর্মীদের তাই ভিন্ন-মত প্রকাশ ও প্রচার—শাসক দলের বা গোষ্ঠীর প্রতিকূল মত নির্ভয়ে ব্যক্ত করার মৌল অধিকারটিকে, সংবিধানিক রক্ষা-কবচকে রক্ষা করতে হয়। নেতার ব্যক্তিমাধুর্য, সততা-নিষ্ঠা তার চরিত্রে অনন্য-সাধারণ গুণের সমাবেশ দেশ ও দলের গৌরব—জাতির তথা নাগরিক দলের কর্মীদের প্রেরণার উৎস, নিঃসন্দেহে। কিন্তু তার কোন স্থায়িত্ব নেই, সেই অসাধারণ নেতা মারাত্মক ভুল করলে তার প্রতিকারের কোন উপায় থাকে না। সেজন্য যে-দল রাজনৈতিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং ক্ষমতাসীন সেই দলের গঠনতন্ত্রে ও আচরণের ওপর একটা দেশে গণতন্ত্রের পরিবেশ বহুলাংশে নির্ভর করে।

এর অর্থ এটা কখনই নয় যে, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ভূমিকা নেই। বিরোধী দলগুলি বা দল-বিশেষের আচরণে ও আদর্শের মধ্যে যখন বৈপরীত্য দেখা দেবে,—যখন আদর্শ ও আচরণ দুই-ই গণতন্ত্রের সংহার করবে মনে হবে—তখন দেশের জনসাধারণের কাছে নির্বাচনে সেই দলের গ্রহণযোগ্যতা ও রাজনৈতিক অর্থ নৈতিক গণতন্ত্রকে রক্ষা করার ব্যাপারে নির্ভরশীলতার যাচাই হবে। যে-পরিমাণে তার আচরণ অগণতান্ত্রিক হবে সেই পরিমাণেই তার গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পাবে জনসাধারণের কাছে। রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Sigmund Neumann ব্যাখ্যা করে বলেছেন:

"To become a 'party' to something always means identification with one group and differentiation from another. Every party in its very essence signifies partnership in a particular organisation and separation from other by a specific program.

Such an empirical description, to be sure, indicates that the very definition of party pre-supposes a democratic climate and hence makes it a misnomer in every dictatorship. A one-party system is a contradiction in itself. [Modern Political Parties. Neumann ; Chicago Press, 1956 ; P. 395.]

রাজনৈতিক গণতন্ত্র পার্টি-প্রথার ওপরই প্রতিষ্ঠিত। রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য হল বিশেষ স্বার্থ ভাবধারার 'পার্টনারশিপ',—বিশেষ কর্মসূচী অন্যদল থেকে তাকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করে রেখে দেয়। একদিকে তাই যেমন বিশেষ স্বার্থ আদর্শের সঙ্গে একাত্মতা—অন্যদিকে অন্য-চিন্তা, স্বার্থ ও কর্মসূচী থেকে পৃথক হয়ে থাকার যুগপৎ চেষ্টাই একটি রাজনৈতিক দলকে দল রূপে চিহ্নিত করে রাখে। দলের এই সংজ্ঞা থেকে বোঝা যাবে দেশ ও দলের মধ্যে গণতান্ত্রিক আবহাওয়া না থাকলে দল-ব্যবস্থা টিকতে পারে না। এক-পার্টি-শাসনব্যবস্থা স্ব-বিরোধী বস্তু, কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতই।

একনায়কতন্ত্রী ব্যবস্থায় 'পার্টি' বলে যা চালান হয় তাকে 'পার্টি' প্রকৃত অর্থে বলা চলে না। পার্টি ব্যবস্থার অন্যতম প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সর্তই হল একাধিক পার্টির অস্তিত্ব। তাই কমিউনিস্ট দেশগুলিতে যেখানে রাজনৈতিক বা কোন প্রকার বিরোধিতার বা ভিন্নমত প্রচারের অধিকার নেই, ভিন্ন দলের অস্তিত্বের অবকাশ নেই, কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে রাজনৈতিক দল বলে বর্ণনা করলে থিওরীর গোজামিল হবে। 'দল' বলে যেটাকে চালান হয় আসলে সেটা প্রশাসন ব্যবস্থার একটা অঙ্গ—কমিউনিস্ট পরিভাষায় 'কনভেয়ার বেল্ট'—বা 'ট্রান্স্মিশন বেল্ট'। ওপরতলার নেতারা কমিউনিজম-এর বা আদর্শের রূপ-রূপায়ণ সম্বন্ধে যা সময়-সময় ভাবেন বা করেন সামরিক বাহিনী ও সবব্যাপী গুপ্ত পুলিশ ব্যবস্থার সহায়তায় সেইটাকেই দলের ভাবনা ও কর্মসূচী বলে প্রচার করার মাধ্যম হল 'কমিউনিস্ট দল'। দলের নিজস্ব কোনই ভূমিকা নেই।

'জনগণ' (People) এবং 'প্রশাসন' (Establishment) একই বস্তুর দুটো দিক তো নয়। দুটো ভিন্ন বস্তু। 'শাসক' (ruler) 'শাসিত' (ruled) যে অর্থে ভিন্ন, 'জনগণ' ও 'সরকার' সেই অর্থেই ভিন্ন। জনগণ ও প্রশাসনের মধ্যে যোগাযোগ-সেতু—ভাবের সেতু রাজনৈতিক দল। একাধিক দলের অস্তিত্ব তাই অপরিহার্য। এইখানেই দলের ভূমিকা মতপ্রচারের স্বাধীনতা সংবাদ পরিবেশন ও প্রচারের স্বাধীনতা, দলবদ্ধ হবার স্বাধীনতা, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে দেশের অভ্যন্তরে অবাধ যাতায়াতের অবাধ স্বাধীনতা, রাষ্ট্রের কৃপা অনুগ্রহ-নির্ভর না হয়ে নিজের জীবিকা নির্বাহের স্বাধীন বৃত্তি ও ব্যবসায়ের মৌল-অধিকারগুলির রাজনৈতিক গুরুত্ব এত অপরিসীম।

প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত দেখা দেবেই। এটা থিওরীর কথা, বাস্তব ঘটনাও। দেশের প্রধানমন্ত্রী বা কোন কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কোন বিশেষ দলের হলেই বা বিশেষ ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হলেই দেশের জনগণের সমস্যাগুলি কোন যাদুমন্ত্র বলে সমাধান হয়ে যায় না—যেতে পারে না। স্বয়ং স্তালিনও জীবনের সায়াহ্নে এসে তাঁর শেষ রচনায় বলেছিলেন 'Economic laws are absolute and unalterable' 'অর্থনৈতিক নিয়মগুলি প্রাকৃতিক বিষয়ের মতই—যে নিয়মে ঝড় বৃষ্টি শীত গ্রীষ্ম হয়—অমোঘ অপরিবর্তনীয়' (স্তালিন)। যখন স্বার্থের সংঘাত দুয়ের মধ্যে দেখা দেবে তখন তার প্রতিকার কী? বন্দী ক্যাম্প বা শিবিরের দাসত্ব, বাধ্যতামূলক শ্রম? কারাদণ্ড? মৃত্যুদণ্ড—গুপ্ত পুলিশের ভয়াল বিভীষিকা? না মিসা (MISA) আইনের ন্যায় পাশুপত অস্ত্রের যথেচ্ছ অপপ্রয়োগ?

সোভিয়েট রাশিয়ায় স্তালিনের নৃশংস গণ-দমন নিপীড়ন নীতি, ব্যাপক হত্যা, পুলিশী সন্ত্রাস ও রাজনৈতিক জিঘাংসাবৃত্তির বীভৎসতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য রুশ কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সচেতন কর্মী বা সর্বহারাশ্রেণীর পরিত্রাতারা এগিয়ে আসেননি। স্তালিনের গণ-নিপীড়ন ও হত্যার বিস্তারিত কাহিনী কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম অধিবেশনের এক গোপন সম্মেলনে ফাঁস হয়ে যায়। ক্রুশ্চভ তখন দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং দলেরও ফার্স্ট সেক্রেটারী ছিলেন। বিগত ত্রিশ বছর ধরে এই সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। রাজনৈতিক দল হিসাবে রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (CPSU) কি এই রক্ত ঝরাবার কাহিনী কিছুই জানত না? না, জেনেও স্তালিন বেরিয়ার মুখের দিকে চেয়ে অস্তিত্ব

বাঁচাবার তাগিদে নীরবতার ষড়যন্ত্রের শরিক হয়েছিল ? নি স্তালিনীকরণ (De-Stalinization) প্রমাণ করে দিল কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে 'প্রশাসন' (Government) এবং 'জনগণের' (Public) মধ্যে 'শাসক' ও 'শাসিতের' মধ্যে রক্তাক্ত স্বার্থ-সংঘাত বিদ্যমান থাকতে পারে এবং থাকবেই। সংঘাতের কারণ যতদিন থাকবে সংঘাতও ততদিন থাকবে। তাই দেশের ও জাতির সঙ্কটতম কালে রাজনৈতিক দল হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টি রুশ-প্রশাসন-রথের অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত হাতুড়ি-কাস্তে-তারকা চিহ্নিত 'স্টেপনী হুইল' বই অন্য কিছু ছিল না। রাজনৈতিক দলের কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় তো দেয়নি। আবার স্তালিনের অপকীর্তির হাত থেকে আংশিকভাবে দেশ ও দলকে রক্ষা করতে ক্রুশ্চভ যে ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে দেশে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পরিবেশ তৈরী করতে এগিয়ে এসে স্মরণীয় হলেন সেই কারণেই দেশের প্রশাসনিক ও দলীয় কায়েমী স্বার্থ তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করল। জনপ্রিয়তার সুউচ্চ শিখরে যিনি উঠেছিলেন জলের দাগের মত রুশ ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁর নামকীর্তি মুছে গেল।

রাজনৈতিক দল সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যম, সমাজ-ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের, গণতন্ত্রীকরণ ও মুক্তির গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। [David E Apter : The Politics of Modernization : Chapter 6 ; P. 179] এর জন্য যেমন দরকার (১) রাজনৈতিক মত-বিনিময় ও প্রচারের অবাধ সুযোগ, প্রতিকূল ভাবধারার অস্তিত্ব, তেমনি প্রয়োজন (২) রাজনৈতিক নেতৃত্ব রদবদলের শান্তিপূর্ণ সুনিশ্চিত গণতান্ত্রিক প্রথা। একজন রাজনৈতিক নেতা মুখ্য প্রশাসক পদত্যাগ করলে বা তাঁর মৃত্যু ঘটলে তার স্থলাভিষিক্ত কে বা কারা হবেন এবং কিভাবে হবেন ? গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে নেতা পরিবর্তনের সুযোগ আছে। Apter-এর ভাষায় :

"The democracy practised by a multi-party government is one of the few systems in which succession in public office is a regular and healthy feature of political life. Without bitter purges and internecine warfare between oligarchs (as occurred, for example, after death of both Lenin and Stalin in the Soviet Union) or conflicts ov r leadership (as in

countries as diverse as Turkey, Vietnam, South Korea, and the Dominican Republic). Stable multi-party democracy has solved the problem of peaceful succession in public office".

[The Politics of Modernization : P. 189]

বহু-দলীয় স্থায়ী গণতান্ত্রিক প্রশাসনে নেতৃত্ব পরিবর্তন, রাজনৈতিক-প্রশাসনিক পদে কে গেলেন কে আসবেন এই জটিল সমস্যার সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব। যেখানে এই ধরনের গণতন্ত্র নেই সেখানে রক্তাক্ত আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের সূচনা হয়েছে—পার্জ হয়েছে। এর মধ্যে চিন্তা কার্যসূচী বা আদর্শের ধারাবাহিকতাও রক্ষিত হতে পারে না। লেনিনের লোকান্তরের পর কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন সেই প্রশ্নের সমাধানের কোন গণতান্ত্রিক রীতি ছিল না। লেনিন তাঁর শেষ রাজনৈতিক 'উইল'-এ স্তালিনের আচরণে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে দলের নেতা না করার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিলেন। লেনিন জীবন-সায়াহ্নে স্তালিন-মূল্যায়ন করেছিলেন এইভাবে :

"Comrade Stalin, having become General Secretary, has concentrated immeasurable power in his hands, and I am not sure that he always knows how to use that power with sufficient caution". রোগশয্যায় তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন স্তালিন সম্বন্ধে :

"Stalin is too coarse and this fault though tolerable in dealings among us Communists, becomes unbearable in a General Secretary. Therefore I propose to the comrades to find some way of *removing* Stalin from his position and appointing somebody else who differs in all respects from Comrade Stalin in one characteristic namely, someone more *tolerant,* more *loyal,* more *polite* and *considerate* to his comrades, *less capricious* etc." (Last Testament : Lenin) [Life And Death of Lenin : Robert Payne : P. 553, 561]

"কমরেড স্তালিন দলের সাধারণ সম্পাদক হবার পর অপরিসীম ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করেছেন। আমি কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না

তিনি সবসময় সেই অপ্রমত্ত ক্ষমতা যথাযথ সংযমের সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারবেন কিনা।"......আবার .....

"স্তালিন অত্যন্ত মেঠো-রুক্ষ। তাঁর চরিত্রের এই ত্রুটি দলের মধ্যে দলের অন্যান্য কমিউনিস্টদের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহনীয় হলেও দলের সাধারণ সম্পাদকরূপে এই দোষ অসহনীয়। তাই কমরেডদের কর্তব্য স্তালিনকে তাঁর এই পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর জায়গায় এমন একজন কমরেডকে বসান হোক—যিনি সকল ব্যাপারে চরিত্রে-আচরণে স্তালিন থেকে স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন। পার্টির সাধারণ সম্পাদকরূপে স্তালিনের জায়গায় যিনি আসবেন তিনি হবেন আরও সহনশীল সহিষ্ণু, আরও অনুগত, আরও নম্র-বিনয়ী, বিবেচক, অনুভবী, তাঁর সহকর্মী দলের কমরেডদের প্রতি তাঁকে হতে হবে কম খামখেয়ালী।" [লেনিন]

এ কথাগুলি লেনিনের তাঁরই মন্ত্রশিষ্য বলে প্রচারিত স্তালিনের সম্বন্ধে। এহেন নেতা দেশের ও দলের সর্বাধিনায়ক—একমেবম্ অদ্বিতীয়ম্—হয়ে নিপীড়ন অত্যাচারের রথ ছুটিয়েছিলেন একটানা প্রায় ত্রিশ বছর ধরে। কেউ তাঁকে সরাতে পারেনি। সে কথা তাঁর জীবদ্দশায় কেউ মুখেও আনতে পারেনি।

জীবনের শেষ ক'টা মাস আংশিক পক্ষাঘাত-ক্লিষ্ট হয়ে রোগশয্যায় শুয়ে লেনিন দেশে এবং দলের মধ্যে আগামী দিনের সম্ভাব্য পরিণতির কথা ভেবে শিউরে উঠেছিলেন। তাই স্তালিন ঐ পদে থাকুন এ তিনি চাননি। রোগ-শয্যায় তিনি যখন খবর পান স্তালিনের অনুগত Ordjonikidze—জর্জিয়া-প্রজাতন্ত্রে সোভিয়েট সেনাবাহিনী নিয়ে সেই প্রজাতন্ত্রের মানুষের ওপর নির্মম নিপীড়ন চালিয়েছে, বহু রক্ত ঝরিয়েছে, শত শত মানুষকে হত্যা করা হয়েছে—তখন তিনি ক্রোধে-ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। লেনিন তাঁর সহধর্মিণী ক্রুপস্কায়া ও অন্যান্যদের কাছ থেকে জানতে পারেন যে, জর্জিয়ায় যা ঘটেছে সেটি একটি 'রক্তস্নান' ছাড়া কিছু নয়। তিনি ৩০শে ডিসেম্বর (১৯২৩) স্তালিন Ordjonikidze, Dzerzhinsky-র তীব্র নিন্দা করেন; তাদের এবং সমস্ত আমলাদের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন তারা "typical Russian bureaucrats, rascals and lovers of violence". জর্জিয়া অভিযান স্তালিনের নির্দেশেই হয়েছিল। জোরপূর্বক জর্জিয়াকে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। [Life & Death Of Lenin : Robert Payne : P. 557]

তাঁর শেষ রাজনৈতিক দলিলে লেনিন পার্টি-একনায়কতন্ত্রকে বিলুপ্ত করার জন্য (১) একটি পরিকল্পনার ইঙ্গিত দেন, (২) দলের বিভিন্ন নেতাদের সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মূল্যায়নও করে যান। তিনি স্পষ্টই স্তালিনের চাইতে ট্রট্স্কী, বুখারীনকে বেশী পছন্দ করতেন। তিনি জিনোভিয়েভ-ক্যামেনেভকে 'ক্ষমা' করে যান (অথচ স্তালিন এঁদের দু'জনকেই হত্যা করেন তাঁর জল্লাদদের দিয়ে বিচারের প্রহসন করে)। যে-লেনিন সকল একনায়কত্ববাদী নেতার মত সর্বময় ক্ষমতার সর্বাধিক কেন্দ্রীকরণের সমর্থক ছিলেন, শেষ জীবনে হতাশার মুখে এসে আবিষ্কার করলেন কামউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি শুধুমাত্র কিছু বাছাই-করা বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী-ভুক্ত ব্যক্তি ও পুলিশ দিয়ে ঠাসা। এই কমিটিতে কোন শ্রমিক কর্মচারীর স্থান নেই। তাই এই ধরনের কেন্দ্রীয় কমিটি না রেখে যদি তাকে আরও উদার-ভিত্তিক করে তার মধ্যে ৫০ থেকে ১০০ জন শ্রমিক শ্রেণীর মানুষকে প্রতিনিধিরূপে রাখা যায় তাতে ক্ষতি কি ?

"The Central Committee, the driving force of the State, consisted of a small hand-picked group of intellectuals and policemen ; there were no workers in it. What would happen if the Central Committee was broadened to include fifty or even a hundred working class members ? It was a suggestion he (Lenin) would never have tolerated when he held power in his hands, but as he saw it there was no other safeguard for the continuing existence of the State." [Life & Death of Lenin : Payne : P. 55..]

এই প্রস্তাব লেনিন যখন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তখন তিনি করেননি এবং সে সময় এই রকম প্রস্তাব করলে তাঁর কাছে কেউ রেহাই পেত না, নিঃসন্দেহে। ক্ষমতা থাকার সময় এক আচরণ, ক্ষমতা চলে যাবার মুখে অন্য সুর। একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় এইটাই হয়ে থাকে। নেতৃত্বের রদ-বদলের মধ্যে রাজনৈতিক উত্তরাধিকার-প্রশ্নের মীমাংসার কোন সুনির্দিষ্ট নীতি-প্রথা-কনভেনশন নেই। ডিকটেটরী হুকুমতে এটা বিরাট জটিল সমস্যা—যার সমাধান প্রাসাদ চক্রান্ত ; অন্যথায় সমাধান রক্তাক্ত হতে বাধ্য।

যে-লেনিনের মরদেহ মৃত্যুর পর আজও লেনিন স্মৃতি-সৌধে সযত্নে রক্ষিত

সেই মহামতি লেনিনের 'শেষ ইচ্ছার' প্রতি মর্যাদা পরবর্তী কোন রুশ নেতা দেখাননি কেন? স্তালিনের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। ম্যালেনকভ-ক্রুশ্চভ, ব্রেজনভ সবাই স্তালিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন কেন? দলের মধ্যে, দেশের মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার, গণতন্ত্রের পরিবেশ রক্ষার কোন সাংবিধানিক কাঠামো (Institutional safeguard) নেই বলেই, মুখ্যত। দলের গণতন্ত্রীকরণে লেনিন যে-পার্টি সংবিধানের সংশোধন প্রস্তাব করেছিলেন সে ব্যাপারে দলের নেতারা, দেশের শাসকরা নীরবতার ষড়যন্ত্র পালন করলেন কেন? বিকল্প ক্ষমতার দ্বারাই, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারাই ক্ষমতার প্রভাব হ্রাস করা যায়। কিন্তু কোন একনায়কতন্ত্রী ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে বা বিভাজনে বিশ্বাসী নন। কেননা তার অর্থই নিজেদের অস্তিত্বের সমাপ্তি-পরোয়ানায় দস্তখত করা। লেনিন বলেছিলেন :

"Such a reform would lay the foundation for a greater stability of our party, and would help it in its struggle under the condition of encirclement by hostile States ...... "

লেনিনের বিরাট সংগ্রামী ঐতিহ্য ও বিপ্লবী ভাবমূর্তিকে দল ব্যবহার করেছে—কাজে লাগিয়েছে বিশেষ গোষ্ঠীকে ক্ষমতাসীন রাখতে—কিন্তু তাঁর আদর্শ নীতি জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে। লেনিন দলের নেতৃত্ব কি হওয়া উচিত, তাঁর প্রকৃত উত্তরাধিকারী কে বা কারা হবেন, তাঁর ইংগিতও রেখে যান। ট্রট্স্কীর ভূয়সী প্রশংসা করেও কিন্তু তিনি তাঁর ওপরে স্থান দিয়ে যান বুখারীন ও পিয়াটাকভকে। ট্রট্স্কী সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন :

"On the other hand comrade Trotsky is distinguished not only by his *exceptional abilities* personally, to be sure, he is perhaps *the most able man* on the present CC—but also by his excessive self-assurance and excessive enthusiasm for the purely administrative aspect of his work.

These two qualities of the two more eminent leaders of the present CC might, quite innocently lead to a split and if our party does not take steps to prevent it a split might arise unexpectedly." [Lenin]

ট্রট্স্কী স্তালিন এই দুই বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যের বিপরীত-ধর্মী চরিত্র দলকে পরিণামে একটি ভাঙনের মুখে অপ্রত্যাশিতভাবে ঠেলে দেবে। ট্রট্স্কী অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন এবং বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটিতে সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি নিঃসন্দেহে। কিন্তু ট্রট্স্কী ব্যক্তিস্ববাদী—নীতি থিওরীর চাইতেও কোন সমস্যার প্রশাসনিক দিকটাই তাঁর কাছে বেশী গুরুত্ব পেয়ে থাকে। সর্বোচ্চ ব্যুরোক্র্যাটের যে ত্রুটি তা ট্রট্স্কীর ছিল। তার মধ্যে আত্মম্ভরিতার ভাবও ছিল। [লেনিন]

লেনিন সম্ভবতঃ দলের ভাঙন এড়াবার জন্য বুখারীন পিয়াটকভের কথাটা বলেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল এদের সামনে আনা হোক নেতৃত্বে। এঁদের সম্বন্ধে লেনিন বলেছিলেন

"those outstanding and loyal workers, who might if they supplemented their knowledge and corrected their one-sidedness be of even greater service to the party " [Lenin]

লেনিন যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলার অনুকূলে তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করে যান 'শেষ দলিলে'। স্তালিনের জহ্লাদরা একে একে এদের সকলকে খতম করে স্তালিনের একনায়কতন্ত্রকে নিরঙ্কুশ করেছিল।

রোগশয্যায় লেনিন যখন আগামী দিনগুলির কথা, স্তালিনের জিঘাংসাবৃত্তি হিংসা সন্ত্রাসবাদী কুটিল রাজনীতির কথা ভেবে শংকিত তখন উচ্চাভিলাষী স্তালিনের ভাবনা কত তাড়াতাড়ি লেনিনের দেহাবসান ঘটে সেইদিকে। লেনিনকে হত্যার গোপন ষড়যন্ত্রও তিনি করে চলেছিলেন। অনেকে মনে করেন স্তালিন লেনিনের খাদ্যে বিষ প্রয়োগ করে লেনিনের মৃত্যু ত্বরান্বিত করেছিলেন। তখন আবার লেনিন-পত্নী ক্রপ্স্কায়া হৃদরোগে আক্রান্ত। লেনিন হৃদরোগে আক্রান্ত হন ১৬ই ডিসেম্বর। স্তালিনের রুক্ষ আচরণ তাঁকে এতই ব্যথিত করেছিল যে, তিনি ক্রপ্স্কায়াকে ডেকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি লেখেন স্তালিনকে উদ্দেশ্য করে। এই চিঠিতে ক্রপ্স্কায়ার নাম ছিল। এই চিঠি পাবার পরই স্তালিন অত্যন্ত অশোভন ভাষায় টেলিফোনে ক্রপ্স্কায়াকে আক্রমণ করেন। পরে যাতে এই চিঠি ফাঁস না হয়ে পড়ে সেই উদ্দেশ্যে স্তালিন এমন জঘন্য হুমকীও দিতে দ্বিধা করেননি যে, তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করবেন, বাড়াবাড়ি করলে, ক্রপ্স্কায়া আসলে লেনিনের পত্নীই

নয়। ব্ল্যাক-মেইল-এর সম্রাট ছিলেন স্তালিন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক দলেরও কিছু কিছু নেতা ব্ল্যাক-মেইল-এর রাজনীতি রপ্ত করেছেন। ক্রুপ্‌স্কায়া অপমানে বেদনায় মূহ্যমান। স্বামীকেও কিছু জানাতে পারছেন না, কেননা উত্তেজনায় তাঁর অবস্থার তাতে অবনতি ঘটতে পারত। তিনি ক্যামেনেভকে এক পত্র দেন এ বিষয়ে তাঁর সাহায্য চেয়ে।

"Lev Borisvich !

Because, I took down a short message by dictation from Vladimir Ilych by permission of doctors, Stalin permitted himself yesterday an unusually coarse outburst directed at me. This is not my first day in the party. During all these thirty years no comrade has ever addressed me with such coarse words.

The business of the party and of Ilyich are not less dear to me than to Stalin. I have to have the greatest self control. I am turning to you and to Grigory [Zinoviev] as being much closer comrades of V. I. and I am begging you to protect me from rude interference in my private life and from these invectives and threats. I have no doubt what will be the unanimous decision of the Control Commission with which Stalin sees fit to threaten me. However, I have neither the strength nor the time to waste on this stupid quarrel. I am a human being and my nerves are strained to the utmost." [N. Krupskaya]

ক্রুপ্‌স্কায়াকে স্তালিন অপমানসূচক ভাষায় বলেন 'দলের ব্যাপারে মাথা গলাতে গেলে ফল খারাপ হবে। লেনিনের কান ভাঙচি করছেন রাষ্ট্রীয় বিষয় নিয়ে। দলের ব্যাপারে লেনিনকে তথ্য সরবরাহ করে তাঁকে আপনি প্রভাবান্বিত করছেন। সাবধান!' ক্রুপস্কায়ার দুঃখ ৩০ বছর ধরে পার্টিতে কাজ করছেন, ছায়ার মত লেনিনের পাশে পাশে আছেন। কেউ অতীতে কখনও তাঁকে এত কড়া বা অশোভন কথা বলতে সাহস পায়নি। আমি

নিজেকে সংযত করেছি এত অপমানের পরও। আপনারা—আপনি ও জিনোভিয়েভ—লেনিনের খুব কাছের লোক। আপনাদের সাহায্য ভিক্ষা করছি আমার ব্যক্তিগত জীবনের ওপর উদ্ধত আঘাতের হাত থেকে রক্ষার জন্ত।...

ক্যামেনেভ বা জিনোভিয়েভ কিন্তু দলের 'শক্ত লোক' বলে পরিচিত ছিলেন না। ক্যামেনেভ ক্রপস্কায়ার চিঠি পেয়ে স্তালিনকে সেই চিঠি দেখান কৈফিয়ৎ চেয়ে। তখন অনেকে জানতেন স্তালিন জিনোভিয়েভ ক্যামেনেভ এই তিনজন চক্রান্ত করে লেনিনের মৃত্যুর পর ক্ষমতা দখল করবেন। স্তালিনও এদের সেই ক্ষমতার প্রলোভনও দেখিয়েছিলেন। ক্রপস্কায়ার প্রতি স্তালিনের অশোভন আচরণ লেনিন জানতে পেরে এত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি নিজেই তাঁর সেক্রেটারী ভলোডিচেভাকে তাঁর শয়নকক্ষে ডেকে তাঁর নিজের জবানীতে স্তালিনকে একটি ছোট্ট চিঠি লেখেন। তার অনুলিপি ক্যামেনেভ জিনোভিয়েভকেও পাঠান। চিঠিটি ছিল এইরূপ:

"Dear Comrade Stalin,

You permitted yourself a rude summons of my wife to the telephone and you went on to reprimand her rudely. Despite the fact that she told you she agreed to forget what was said nevertheless Zinoviev and Kamanev heard about it from her. I have no intention of forgetting so easily something which has been done against me and I do not have to stress that I consider anything done against my wife as done against me. I am therefore asking you to weigh carefully whether you agree to retract your words and apologize or *whether you prefer the severence of relation between* us. Sincerely Lenin".

"আমার স্ত্রীর প্রতি এই অশোভন আচরণকে আমি আমার বিরুদ্ধে প্রদর্শিত আচরণ বলেই মনে করব নিঃসন্দেহে। আপনি ভেবে দেখবেন আপনি আপনার ঐ সব অশালীন কটূক্তি প্রত্যাহার করে নিয়ে ক্ষমা চাইতে প্রস্তুত কিনা। এর বিকল্প আমাদের পরস্পরের সকল সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন বলে ধরে নেওয়া।"

লেনিন কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে যাদেরই সঙ্গে মতপার্থক্য হয়েছে

সেইসব স্বনামী দামী সংগ্রামী মর্যাদাসম্পন্ন বহু সাথীদের বিরুদ্ধে চরমতম কটূক্তি করতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু এহেন লেনিন, যিনি জীবনে লক্ষ্যসাধনের জন্য প্রয়োজনীয়তার (*expediency*) কাছে নীতি মূল্যবোধ বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেননি এবং রাজনৈতিক কৌশলকেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন, জীবন-সায়াহ্নে রোগশয্যায় তাঁর পরম বিশ্বস্ত জীবনসঙ্গিনীর প্রতি বন্ধু-স্তালিনের অশোভন আচরণ ও মন্তব্যে এতই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন যে, মন্ত্র-শিষ্য বলে প্রচারিত ও পরিচিত স্তালিনকে জীবনের মত পরিত্যাগ করার সঙ্কল্প ব্যক্ত করতে দ্বিধা করেননি।

লেনিনের এই চিঠির উত্তর স্তালিন সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু পাঠাননি। তাঁর অনুগত একজন লেনিনের চিকিৎসক লেনিনের স্বাস্থ্য ও রোগ পরিস্থিতি সম্বন্ধে গোপনে রিপোর্ট করেছিলেন। তিনি স্তালিনকে বুঝিয়েছিলেন উত্তর দেবার আগেই লেনিন মারা যাবেন। তাই তড়িঘড়ি ক্ষমা ভিক্ষা করে একটা চিঠি দিয়ে নিজের বিরুদ্ধে একটা সরকারী দলিল তৈরী না করাই বাঞ্ছনীয়। এই দলিল পরে স্তালিনের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হতে পারে। এই ডাক্তারকে নিয়োগ করেছিলেন স্বয়ং স্তালিন। লেনিনের জীবদ্দশাতেই স্তালিন এইভাবে চলেছিলেন। তাঁর অবর্তমানে কত নিষ্ঠুর ও ক্রূর হয়ে উঠেছিলেন সেটা তো সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। ১৮ দিন পর ক্ষমা চেয়ে তিনি উত্তর পাঠালেন। ক্রুপ্‌স্কায়া সেটা জেনেও ছিলেন। এর পর লেনিনের অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হতে থাকে। স্তালিনকে যে তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী করতে চাননি তার আরও একটা বড় প্রমাণ তিনি জর্জিয়া প্রজাতন্ত্রের মানুষদের ওপর যে রক্তাক্ত স্তালিনী নিপীড়ন চলেছিল তার বিরুদ্ধে রোগশয্যা থেকে জর্জিয়াবাসীদের পক্ষ নিয়ে লড়াই চালাবার জন্য দায়িত্ব দিয়ে ছিলেন ট্রট্স্কীকে। ক্যামেনেভকে সে চিঠির অনুলিপি পাঠিয়েছিলেন। ৬ই মার্চ (১৯২৩) সেই চিঠি লেখা হয় ভলোডিচেভাকে দিয়ে। ট্রট্স্কী-ক্যামেনেভকে লেখা চিঠিটি এইরূপ :

'Esteemed Comrades !

I am heart and soul behind you in this matter Ordjonidze's brutalities and the connivance of Stalin and Dzerzhinsky have outraged me. On your behalf I am now preparing notes and a speech. With esteem : Lenin."

"প্রদ্ধেয় বন্ধুগণ,

জর্জিয়ার প্রশ্নে আমার মন-প্রাণ সম্পূর্ণ আপনাদের সঙ্গেই আছে। স্তালিনের যোগসাজসে জর্জিয়াকে যেভাবে অত্যাচার-নিপীড়নের লীলাক্ষেত্র করা হয়েছে তাতে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। আপনাদের হয়ে আসন্ন সম্মেলনে রিপোর্ট ও ভাষণ তৈরী করছি। লেনিন।"

[কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেই স্বর্গরাজ্য কায়েম হয় না লেনিনের এই চিঠিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কমিউনিস্ট রাজত্বেও অত্যাচার-নিপীড়ন শোষণ চলে। তার প্রতিকার পার্টি সংবিধানে নেই দেশের সংবিধানে নেই। তার প্রতিকার কখনও ব্যক্তি-লেনিন (প্রতিষ্ঠান নয়) কখনও ব্যক্তি-ক্রুশ্চভ ক্ষমতাবলে যখন প্রধানমন্ত্রী। কখনও ইমরে নেগী, কখনও ডুবচেক, কখনও মিলোভান জিলাস। কোন Inst tutional safeguard নেই। দলের নেতা ও কর্মীর বিবেক ও সাহস-ই একমাত্র ভরসা। এই জর্জিয়ার রক্তাক্ত উৎপীড়ন ও হত্যালীলার বিরুদ্ধে রোগশয্যা থেকে লেনিন কলম ধরেছিলেন প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন। দলের বিপ্লবী শ্রেণী-সচেতন সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত অন্য নেতারা কর্মীরা কেন প্রতিবাদে গর্জন করে ওঠেননি? কমিউনিস্ট দর্শনের মধ্যে, লেনিনবাদের মধ্যে অত্যাচাবিত মানুষের—কমিউনিজমেব নামে যারা অত্যাচার করে—তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার আছে কি? নেই। ইতিহাস তার জলন্ত সাক্ষ্য।]

এই দেড় লাইনের চিঠিটিই তাঁব শেষ চিঠি। যে তিনজন কমরেডকে লেনিন নিজে ওপবে উঠিয়েছিলেন, ক্ষমতার সিংহাসনে বসিয়েছিলেন, মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়েও এই সংগ্রামী বিশ্ব-বরেণ্য নেতা তাঁদেরই বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু এর মধ্যেও ছিল চবম গোপনীয়তা। ভয় ছিল স্তালিন যেন না কিছু জানতে পেরে যান। লেনিন যেন দুঃখ-বেদনায় নিজেকেই স্তালিনের অপকীর্তির জন্য দায়ী করতে চেয়েছিলেন। ত্যাগী বিপ্লবী মহৎ চরিত্রের এটিও একটি বিশিষ্ট দিক, চরিত্রের সৌরভ। আজকের রাজনীতি সুভাষ লেনিন গান্ধী মাও হো চি মিন চরিত্রের সৌরভ সম্বন্ধে রাজনৈতিক কর্মী ও নেতারা অবহিত হতে চান না। যিনি বিপ্লবী হবেন তিনি সর্বাগ্রে হবেন অকপট-সত্যবাদী ও নির্ভীক।

মৃত্যু যখন শিয়রে তখনও তিনি জর্জিয়াবাসীর ক্রন্দন ভোলেননি।

পার্টি সম্মেলনে (দ্বাদশ) কে হবেন সেই যোগ্যব্যক্তি যিনি স্তালিনের বিরুদ্ধে লড়তে পারবেন? লেনিন ট্রট্স্কীকেই নির্বাচিত করেছিলেন মনে মনে। তাঁর ব্যক্তিগত সচিব Fotieva ও পিপ্‌ল্‌স্ কমিসারের সঙ্গে Marea Gliasser-কে ৭ই মার্চ পরের দিনই ডেকে জর্জিয়া সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য, অত্যাচার নিপীড়নের গোপন রিপোর্ট—যা লেনিন নিজে অন্য কমরেড দিয়ে সংগ্রহ করেছিলেন—যাবতীয় সংশ্লিষ্ট চিঠিপত্র সবকিছু ট্রট্‌স্কীর হাতে পৌছে দেবার জন্য বলেন। ট্রট্‌স্কীর সাহায্য পাবার জন্য তিনি মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সচিব Fotieva উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন সেইসময়: "Vladimir Ilyich is preparing a bomb for Stalin at the Congress." ভ্লাডিমির ইলিচ্ আসন্ন পার্টি কংগ্রেসে স্তালিনের বিরুদ্ধে একটি বোমা ফাটাবার ব্যবস্থা করছেন।

ট্রট্স্কী লেনিনের দূতের কাছ থেকে সব শুনে জানতে চাইলেন ক্যামেনেভ, এইসব ব্যাপার নিয়ে ক্যামেনেভের সঙ্গে আলোচনা করতে লেনিনের মত আছে কিনা। কেননা লেনিনের অনুপস্থিতিতে ক্যামেনেভ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি-রূপে কাজ চালাচ্ছিলেন। তখন ক্যামেনেভ রাশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ বলে পরিচিত। এ ব্যাপারে ফোতিয়েভার কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না, কেননা লেনিন তাঁকে দলিলপত্রগুলি ট্রট্‌স্কীর হাতে পৌছে দিতে বলেছিলেন মাত্র। অন্য কেউ এ ব্যাপার নিয়ে কিছু করবে না এটাই লেনিনের অভিলাষ ছিল। ফোতিয়েভা তখনই লেনিনের বাসগৃহে ফিরে আসেন তাঁর মতামত জানতে চেয়ে। লেনিন তাঁকে জানালেন যে, সমগ্র ব্যাপারটা ট্রট্স্কীর ওপর ন্যস্ত হোক এই তাঁর ইচ্ছা। লেনিনের ভয় ছিল (তাঁর ভাষায়): "Kamenev will immediately show everything to Stalin and then Stalin will make a rotten compromise and deceive every one."

"ক্যামেনেভ জানতে পারলেই ব্যাপারটা স্তালিনকে জানিয়ে দেবেন এবং চতুর স্তালিন একটা ঘৃণ্য আপোষ-রফা করে ফেলবে সবাইকে ধোঁকা দিয়ে প্রবঞ্চিত করবেন।" ট্রট্স্কী সব শুনলেন। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করলেন। স্তালিন ডারজেন্‌স্কী (Dzerzhinsky) ও Ordjonikidze-র বিরুদ্ধে সেই সময় কোন ব্যবস্থা নিতে চাননি ট্রট্স্কী, স্তালিনকে দলের নেতৃত্ব থেকে সরাতেও চাননি। ফোতিয়েভা ট্রট্স্কীর মনোভাব বর্ণনা করতে গিয়ে

বলেছিলেন ট্রট্স্কী চেয়েছিলেন ওপরতলার নেতাদের মধ্যে একটা 'ভদ্রলোকের চুক্তি' 'an honest co-operation among higher spheres of the party.' যে চুক্তির বলে তাঁরা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বিভিন্ন স্তরে কাজ করতে পারবেন। ট্রট্স্কীর মনের কথা জেনে ফোয়েতিভা হতাশ হয়ে ফিরে এসে লেনিনকে সব জানালেন। ফোয়েতিভা যখন পরে আবার ট্রট্স্কীকে জানালেন যে, এই চিঠির অনুলিপিটি ক্যামেনেভের জন্যও চিহ্নিত রেখেছিলেন লেনিন—তখন ট্রট্স্কী বিস্ময় প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করেন, 'তাহলে কি ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন?' তিনি ট্রট্স্কীকে লেনিনের স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতির কথাও জানালেন।

"His condition is getting worse every hour. You must not believe the reassuring statement of the doctors. He can speak now only with difficulty.···Georgian question worries him terribly. He is afraid he will collapse before he can undertake anything. When he handed me this note he said: 'Before it is too late.···I am obliged to come out openly before the proper time!"

এত কথা শুনেও ট্রট্স্কী তাঁকে বললেন: 'তাহলে কি আমি ক্যামেনেভের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে পারি?' ফোতিয়েভা উত্তর দিলেন: 'অবশ্যই।' ট্রট্স্কী বললেন: 'তাহলে ক্যামেনেভকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলুন।' ট্রট্স্কীও সে সময় অসুস্থ ছিলেন। চিকিৎসকরা তাঁকে পূর্ণ বিশ্রাম নিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রায় একঘণ্টা পরে ক্যামেনেভ এলেন। আসার আগে ক্রুপ্স্কায়ার সঙ্গে কথা বলে এসেছিলেন। ক্রুপ্স্কায়া স্তালিনকে রাজনৈতিক দিক থেকে চূর্ণ করার লেনিনের সঙ্কল্পের কথা ক্যামেনেভকে জানান। ক্যামেনেভ তখন ছুটলেন স্তালিনের কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনাসূচক লেনিনের চিঠির উত্তর আনার জন্য। স্তালিন যখন সেই উত্তর পাঠালেন তখন লেনিনের জীবন-দীপ নিভু-নিভু। ৯ই মার্চ লেনিনের তৃতীয়বারের মত হৃদ্‌রোগের আক্রমণ হয়। এর ফলে তিনি তাঁর বাক্-শক্তিও হারালেন। রোগশয্যায় ক্ষমতামত্ত স্তালিনের সঙ্গে এই স্নায়ু-যুদ্ধই তাঁর মৃত্যু ত্বরান্বিত করল।

পার্টির ত্রয়োদশ সম্মেলনে স্তালিন প্রমাণ করেছিলেন তিনি দলের ও দেশের

সর্বেসর্বা। তাঁর ওপর কেউ নন। এই সম্মেলনে ট্রট্স্কী-লেনিন উপস্থিত ছিলেন না। ট্রট্স্কী তখনও অসুস্থ। ট্রট্স্কী স্তালিনের বিরুদ্ধে উপযুক্ত সময়ে লড়াইএ অবতীর্ণ হতে চাননি। লেনিনের পূর্ণ সমর্থন তাঁর পেছনে আছে জেনেও তিনি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। স্তালিনের চক্রান্তের বিরুদ্ধে উপযুক্ত মুহূর্তে বিদ্রোহ না করার খেসারত তাঁকে জীবন দিয়ে দিতে হয়েছিল। স্তালিন কিন্তু সুযোগ ছাড়েননি। যখনই সুযোগ পেয়েছেন ট্রট্স্কীর ওপর আঘাতের পর আঘাত হেনেছেন। স্তালিনের মতে ট্রট্স্কী রাজনীতিতে ছটি বড় রকমের ভুল করেছিলেন—তার যে-কোন একটির জন্যও তাঁকে নাকি ফাঁসিতে ঝোলান যেত। অপরাধগুলি কি ধরনের?

(১) তিনি ছিলেন সবজান্তা, (২) তিনি কেন্দ্রীয় কমিটি শৃঙ্খলা মানতেন না, (৩) তিনি পুনঃপুনঃ ছাত্রদের বক্তব্য এবং (৪) দেশের বুদ্ধি-জীবীদের বক্তব্যকে উঁচুতে স্থান দেবার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছিলেন। বুদ্ধি-জীবীদের দলের বিরুদ্ধে লেলিয়ে ছিলেন, (৫) পার্টিকে চালাতে যে পার্টি প্রশাসন যন্ত্র (apparatus) দরকার তার বিরোধিতা করে সামগ্রিকভাবে তিনি দলকে উঁচুতে স্থান দিতে চেয়েছিলেন। স্তালিনের ধারণা 'এ্যাপারেটাস' ছাড়া দল দাঁড়ায় না। তাই 'এ্যাপারেটাসের' বিরোধিতা করে তিনি সমস্ত দলেরই বিরোধিতা করেছিলেন, (৬) ট্রট্স্কী নিজেকে অতি-মানব (Super-man) ভাবতেন। পার্টি, কেন্দ্রীয় কমিটি সব কিছুর ওপর তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে নাকি চেয়েছিলেন। দলের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে বাঁচিয়ে রাখার নামে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কর্তৃত্ব ও শৃঙ্খলার লাগাম আলগা করতে সাহায্য করেছিলেন। এতে দলের প্রতি কর্মীদের আস্থা নষ্ট হতে যাচ্ছিল স্তালিনের বিচারে এই ত্রুটিগুলিকে নিছক 'ভুল' (error) বলা ঠিক হবে না। এগুলো উচ্চ-পর্যায়ের 'রাষ্ট্রদ্রোহিতার' সমতুল্য।

সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির দশম অধিবেশনে স্বয়ং লেনিন প্রস্তাব করেছিলেন যে, কেন্দ্রীয় কমিটির যে কোন সদস্যকে দল থেকে বহিষ্কার করা যাবে যদি খুব দায়িত্বশীল নেতাদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন সাধারণ সম্মেলনে এই নির্দেশের পেছনে থাকে। এই 'ডিক্রী'-টিকে গোপন ডিক্রী বলেই ওপরতলার নেতারা জানতেন। এই প্রস্তাব দশম অধিবেশনে গৃহীত হলেও একে এতদিন কার্যকরী করা হয়নি। সেদিন ট্রট্স্কীর অনুপস্থিতিতে লেনিনের অস্ত্র দিয়েই

তাঁর মন্ত্রশিষ্য স্তালিন রাজনৈতিক বিরোধীদের খতম করার পূর্ণ অধিকার করায়ত্ত করলেন। পৃথিবীর 'আদর্শ গণতন্ত্র'রূপে প্রচারিত 'কমিউনিস্ট গণতন্ত্র' নিরঙ্কুশ নিষ্ঠুর একনায়কতন্ত্রের উর্বর জন্মভূমি হয়ে দাঁড়াল।

কেন স্তালিনকে নেতৃত্ব থেকে সরান গেল না? কেনই বা লেনিন ব্যর্থ হলেন? নেতৃত্ব পরিবর্তন 'পলিটিক্যাল সাক্সেশন' কেন শান্তিপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক হতে পারল না 'সর্বহারার গণতন্ত্রে'? কেন মহামতি লেনিন স্তালিনের আদর্শ ও নীতি-বিরোধী কার্যকলাপ জেনেও সরাসরি দেশের সাধারণ নাগরিক, বিপ্লবী, সেনাবাহিনী, পুলিশ, দলের সক্রিয় সচেতন কর্মীদের কাছে আবেদন জানাতে পারলেন না স্তালিনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য। কেনই বা তিনি গোপনীয়তার সঙ্গে শুধুমাত্র ট্রট্স্কী ক্যামেনেভের সঙ্গে যুক্তি করে লড়াই চালাতে উদ্যোগী হলেন? একটা প্রাসাদ চক্রান্তকে চূর্ণ করতে জনগণের সাহায্য না চেয়ে আর একটা গোষ্ঠীতন্ত্রের সাহায্য নেবার নৈতিকতা কি ছিল? একটা অশুভ চক্রান্তকে আর একটা চক্রান্ত দিয়ে পর্যুদস্ত করা যায় না।

চক্রান্তকে ভেঙে চুরমার করতে পারে গণশক্তি এবং আদর্শের, নৈতিক মূল্যবোধের জোয়ার। কেননা, শেষ বিচারে, আদর্শের অভিযানকে রুখবার শক্তি রাইফেলের নেই। যে-আদর্শবাদ যে-জলন্ত 'আইডিয়ালিজম' লেনিন ঢেলে দিয়েছিলেন দেশ ও জাতি গড়ার জন্য,—জীবনের অপরাহ্ণে যখন তিনি দেখলেন তাঁর অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে উচ্চাভিলাষী স্তালিন সযত্নে-লালিত মূল্যবোধগুলিকে ভেঙে খানচুর করতে উদ্যত তখন সেই আদর্শবাদ দিয়ে দল ও দেশকে পুনরুজ্জীবিত করতে কেন অগ্রণী হলেন না? কৌশল-তত্ত্বের প্রবক্তা শেষ মুহূর্তেও কৌশল দিয়েই চক্রান্তকে ব্যর্থ করতে গিয়েও হেরে গেলেন। তিনি ও ট্রট্স্কী যে অস্ত্র তৈরী করেছিলেন স্তালিন প্রচণ্ড দক্ষতার সঙ্গে তা ব্যবহার করে বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করলেন, গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করলেন।

রাজনৈতিক গণতন্ত্রের এইখানে রয়েছে শাশ্বত আবেদন। ইংলণ্ডে চার্চিলের পর কে তাঁর দলের উত্তরাধিকারী হবেন—সেটা দলীয় গণতন্ত্রের নিয়মে নির্ধারিত হয়ে থাকে। কাউকে ওপর থেকে চাপান হয় না। রাজনৈতিক 'উইল' করে স্থির করে দিতে হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি কে হবেন তা সে দেশের 'রিপাবলিক্যান দল' ও 'গণতান্ত্রিক দলের' অধিবেশনে ঠিক হয়। তার জন্য চলে প্রত্যক্ষ অবিরাম প্রচার সভা-সমাবেশ তর্ক-বিতর্ক দুই দলের

মধ্যেই। তার পর হয় সিদ্ধান্ত। কিন্তু ভারতবর্ষ এ ব্যাপারে কোন সুস্থ প্রথা বা রাজনৈতিক ট্রাডিশন গড়ে তুলতে পারেনি আজও। চেষ্টাও হয়নি। ১৯৩৯ সালের ত্রিপুরী কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আমরা প্রমাণ পেয়েছি তার। এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনাও করেছি অন্যত্র।

দলের নির্বাচনেও কংগ্রেস উত্তর-ত্রিপুরীর অগণতান্ত্রিক রীতি অনুসরণ করে এসেছে দুঃখজনকভাবে। ফলে দলের মধ্যে গণতন্ত্রের শিকড় গভীরে অনুপ্রবেশ করতে পারছে না। প্রবীণদের যা দেখছেন দলের মধ্যে নবীনরাও তাই অনুকরণ করতে অভ্যস্ত হচ্ছেন মাত্র। দলের মধ্যে অগণতান্ত্রিক শক্তিকে রুখতে গণতন্ত্রের সংকোচন—দাওয়াই নয়। প্রয়োজন গতিশীল আরও বলিষ্ঠ গণতান্ত্রিক আচরণ।) ডেমোক্রাসীকে সংকুচিত করে উন্নততর ডেমোক্রাসী প্রতিষ্ঠা করা যায়নি—কি রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্রে—কি দলীয় প্রশাসনে। এদেশে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন হয়ে গেল। এতবড গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক নির্বাচন। কিন্তু হয়েছে কোথাও কোন বিতর্ক আলোচনা, সম্ভাব্য প্রার্থী কে হবেন তা নিয়ে? হঠাৎ সিদ্ধান্তটা খবরের কাগজে প্রকাশ হল আর কংগ্রেস দলের বিধানসভা লোকসভার সদস্যের কাজ হল নির্ধারিত ভোটের দিন ভোট বাক্সে চিহ্নিত ভোট-পত্রটি নিক্ষেপ করা। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রমাণ করার প্রতিযোগিতায় সবাই মেতে ওঠেন।

যে-আসন একদিন ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ, ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, ডক্টর জাকির হোসেন অলঙ্কৃত করেছেন সেই আসনের যোগ্য গুণী ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হবে এটাই স্বাভাবিক। তার জন্য আলোচনা হওয়া চাই। এদেশে তা হয়নি। এ কাজ কিন্তু কখনই গণতন্ত্রের সহায়ক নয়। প্রধানমন্ত্রী দেশের খুব উচ্চ পদাধিকারী, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা কখনই এই সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের উৎস হতে পারে না। ইংলণ্ডে, ফরাসী দেশে, পশ্চিম, জার্মানীতে, আমেরিকা, ইতালী, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপানে এ রীতি নেই। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা দেশের প্রধানমন্ত্রীকে খুশী করে নিজেদের ক্ষমতা ও পদ অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিদে বলছেন 'ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আমাদের সুপ্রীম কোর্ট'। সকল দ্বন্দ্বের মীমাংসা সূত্র হিসাবে তিনি যা বলবেন বা প্রস্তাব দেবেন তাই আমাদের কাছে গ্রহণ যোগ্য হবে। [আনন্দবাজার পত্রিকা : ৬ই মে, ১৯৭৫]. তাহলে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দলের শেষ ও চূড়ান্ত আদালত দেশের জনগণ নয়,

দলের সর্বভারতীয় সমিতি A.I.C.C. নয়, দলের সভাপতিও নন ; কর্মীর বিবেক হয় দেশের প্রধানমন্ত্রী। এই সব কথাবার্তার মধ্যে গণতান্ত্রিক ভাবধারার বাষ্পমাত্রও কি খুঁজে পাওয়া যাবে ? এই ধরনের স্থূল স্তাবকতা ও নেতা-পূজার মানসিকতা দুঃসহ। অথচ এই অসুস্থ মানসিকতা, এই তোষামোদের মনোভাব ধীরে ধীরে সর্বস্তরে দলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে।

একই ধরনের নেতা-ভজনা, স্থূল স্তাবকতার প্রকাশ ঘটল দিল্লী কেন্দ্রীয় কংগ্রেস পরিষদীয় দলের বিশেষভাবে আহূত সভায় 'প্রধানমন্ত্রীর অপরিহার্যতা' ঘোষণার মধ্যে দিয়ে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীজগমোহন লাল সিংহের রায়বেরিলী নির্বাচন বাতিল সম্পর্কিত রায়কে পাশ কাটিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতাসীন রাখার দাবীতে সোচ্চার হয়েছিলেন পরিষদ সদস্যরা। ব্যতিক্রম শ্রীচন্দ্রশেখর, মোহন ধাড়িয়া, কৃষ্ণকান্ত এবং রামধন। সভাশেষে দলের সভাপতি—সভারও সভাপতি শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়া ঘোষণা করলেন 'ভারতই ইন্দিরা গান্ধী—ইন্দিরা গান্ধীই ভারত' "India is Indira—Indira is India" ; (Statesman, আনন্দবাজার পত্রিকা : ১৯শে জুন ১৯৭৫)। আর একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীচ্যবন ঘোষণা করলেন সেই সভায় : "What happens to her happens to India. What happens to India—happens to her" 'জাতি' ও 'দল'কে সমগোত্রীয় করা হল।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরুজীকে গান্ধীজীই তাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেছিলেন। সেখানেও কোন গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত হয় নি। নেতৃত্ব ওপর থেকে গোটা দেশ ও কংগ্রেস দলের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতি সাধারণ ঘরের গরীব ঘরের মানুষ শান্ত সরল নিরহঙ্কারী দরদী লালবাহাদুর শাস্ত্রীজীর অল্পকালের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হওয়াটা একটা রীতির ব্যতিক্রম। তাঁর অনাড়ম্বর জীবন, গ্রাম্য জীবনের সরলতা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম তাঁকে জাতির অতি কাছের মানুষ করেছিল। যে ক'দিন তিনি রাষ্ট্রের হাল ধরেছিলেন সে ক'দিনে তাঁর দৃঢ়তা ও যোগ্যতার পরিচয়ও দিয়েছিলেন। বিদেশে তাঁর রহস্যজনক আকস্মিক মৃত্যু গোটা জাতিকে শোকে মুহ্যমান করেছিল। জাতি সত্যি যেন নিজের লোককে হারাবার ব্যথা অনুভব করেছিল সেদিন। তাঁর মৃত্যুর পর যে নেতৃত্বের নির্বাচন হয়েছিল সেখানেও গণতন্ত্রের স্পর্শও ছিল না। সিদ্ধান্ত নেবার মালিক ছিলেন

কংগ্রেসের 'সিণ্ডিকেট' বলে পরিচিত গোষ্ঠী। পরবর্তীকালে, ১৯৬৯ সালে, 'সিণ্ডিকেট' ভাঙল বটে কিন্তু দল গণতান্ত্রিক প্রথায় নেতা নির্বাচনের শাশ্বত রীতিতে ফিরে গেল না। একই ধারা চলে আসছে ত্রিপুরী (১৯৩৯) অধিবেশনের পর থেকে। কোন ব্যতিক্রম নেই।

পণ্ডিতজী যতদিন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি বর্ণাঢ্য শক্ত কোন ব্যক্তিকে দলের সভাপতিরূপে দেখতে চাননি। স্বাধীনতা-উত্তরকালে আচার্য কৃপালনী ও নেহরুজীর ব্যক্তিত্বের সংঘাত সর্বজনবিদিত। নেহরুজী কৃপালনীর মত দৃঢ়চেতা গুণী-জ্ঞানী নীতিপরায়ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কংগ্রেস সভাপতিকে সহজ মনে গ্রহণ করেননি। কৃপালনীজীও কংগ্রেস সভাপতিরূপে দাবী করেছিলেন : দেশে দলের সরকার হবে, সরকারের দল হবে না। কংগ্রেস দল সরকারের নীতি কার্যক্রম নির্ধারণ করবে—কেন্দ্রীয় সরকার বা তার প্রধানমন্ত্রী উপ-প্রধানমন্ত্রী দলের নীতি কার্যসূচী ঠিক করবেন না। দল দেখবে দেশের দলীয় সরকার জনগণের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ঠিক ঠিক পালন করছে কিনা। প্রধানমন্ত্রী দলের নেতা। দল কিন্তু নেতার নয়। নেতার কাছ থেকে দল কৈফিয়ৎ তলব করবে প্রতিশ্রুতি ও আচরণের ব্যবধান সম্পর্কে। এইটাই তো পার্টি-গণতন্ত্রের অন্যতম মূল কথা। কিন্তু নেহরুজী এতে সন্তুষ্ট হননি। পরিশেষে কৃপালনীজীকে পদত্যাগ করে চলে আসতে হয়। পরবর্তীকালে শঙ্কররাও দেও (নেহরুজীর সমর্থনপুষ্ট প্রার্থী) ও পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনের মধ্যে কংগ্রেস সভাপতি পদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নির্বাচনে জয়ী হয়েও পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনজী তাঁর কার্যকারিতা দেখাতে পারেননি কেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

কমিউনিস্ট ব্যবস্থায় রাজনৈতিক উত্তরাধিকার সমস্যা একটি অতি জটিল সমস্যা এবং এর কোন শান্তিপূর্ণ নিরুপদ্রব সহনীয় সমাধান আজও আবিষ্কৃত হয়নি, আর তা হওয়া সম্ভবও নয়। একই সমস্যা চীন দেশেও বিদ্যমান। চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙ-এর পর কে তাঁর জায়গা নেবেন সে নিয়ে গত কয়েক-বছর ধরে জটিল তর্ক সেদেশের ওপরমহলে চলেছে। মাও সে-তুঙ-ই স্থির করবেন কে সেই স্থান দখল করবেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বা জনগণের এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার কোনই ক্ষমতা নেই। রুশ প্রভাবান্বিত কমিউনিস্ট দেশগুলিতে মস্কোর পছন্দসই অনুগত ব্যক্তিই নেতৃত্বে স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকেন।

স্বভাবতই জিজ্ঞাসু রাজনীতির ছাত্রদের মনে প্রশ্ন জাগবে ভারতে বৃহত্তম

গণতান্ত্রিক কংগ্রেস দলের মধ্যেও যখন গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি অনুযায়ী কাজ হচ্ছে না তখন জনগণ এই প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে আদৌ 'গণতান্ত্রিক' ব্যবস্থা এবং কমিউনিস্ট ব্যবস্থার চাইতে গুণগতভাবে উন্নততর ব্যবস্থা বলে মনে করবেন কেন? এখানেও দলের ভিতরে কর্মীদের মনে ভয় আতঙ্ক বিদ্যমান। কোন কাজ অন্যায় অগণতান্ত্রিক জেনেও নেতা-কর্মীরা মুখ খুলতে চান না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সময় যে মানসিকতা ছিল আজও সেই মানসিকতা। সেই নেতা-পূজার নামে রাজনৈতিক নাটুকেপনা, রাজনৈতিক তোষামোদবৃত্তি ও চাটুকারবৃত্তি। রাশিয়া বা চীন দেশেও যেমন ওপরতলার নেতাদের মনে ভয়, এদেশেও তাই।

যেমন ধরা যাক ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন প্রসঙ্গ। তাঁর মন্ত্রিত্ব-কাল একটানা ব্যর্থতার ইতিহাস। প্রতিরক্ষা ব্যাপারে যে প্রচণ্ড ব্যর্থতার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন তাতে যেকোন প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ১৯৬২ সালের সীমান্ত সংঘর্ষ ও ভারতের প্রচণ্ড সামরিক বিপর্যয়ের মত ঘটনা ঘটলে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হত। কিন্তু এদেশে তার ব্যতিক্রম হয়েছিল। এত ব্যর্থতার পরও, ভারতের আত্মমর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও, ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে সরাতে চাননি। দলের মধ্যে ওপরতলায় নেতাদের মধ্যে বিক্ষোভ যথেষ্ট থাকলেও কেউ কৃষ্ণ মেনন সম্বন্ধে কিছু বলতে সাহস পাননি। অবশ্য জনমত এতই তাঁর বিরুদ্ধে গিয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। জাতির স্বার্থ জাতির মর্যাদা আত্মরক্ষাজনিত স্বার্থের ওপরে প্রাধান্য পেয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নেহরুজীর কৃষ্ণ-প্রীতি।

নেহরু মন্ত্রিসভায় যিনি প্রভাবের দিক থেকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন সেই বর্ণাঢ্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদও মন্ত্রী থাকা কালে যে বই লিখলেন (India Wins Freedom) তাও—তাঁরই নির্দেশে আত্মপ্রকাশ করল তাঁর মৃত্যুর পর। সেই পুস্তকে নেহরু সর্দার প্যাটেল সম্বন্ধে কিছু কঠোর মন্তব্য ছিল। জীবদ্দশায় এই পুস্তক প্রকাশিত হলে লেখককে দেশবাসী বেশী শ্রদ্ধা করতেন সৎ সাহস দেখাবার জন্য। কিন্তু কেন তা পারলেন না এতকালের কংগ্রেসের বরেণ্য নেতা হয়েও? কার ভয়—কিসের ভয়? মন্ত্রিত্ব হারাবার ভয়? তাঁর পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডটি

তাঁর মৃত্যুর বহুদিন পর প্রকাশিত হবার নির্দেশ ছিল। সেই অপ্রকাশিত খণ্ডটি কেনই বা আজও প্রকাশিত হল না? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যদি এই ভয় থাকে ওপরতলার নেতাদের মনে, একনায়কতন্ত্রী কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে সেই ভয় আরও কত বেশী তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না।

লেনিনের রোগশয্যায় ভয় ছিল যদি স্তালিন তাঁর পরিকল্পনা জেনে ফেলেন? যদি তাঁর কৌশল ব্যর্থ হয়ে যায়? যদি ক্যামেনেভ-জিনোভিয়েভ-এর সঙ্গে স্তালিন গোপনে আপোষ করে ফেলেন? সর্বত্র কৌশল, গোপনীয়তার আশ্রয়। কিন্তু গোপনীয়তার হিম-শীতল অন্ধকারে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের বীজ অঙ্কুরিত হয় না। প্রকাশমানতার আলোতেই গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র মুকুলিত হতে পারে, প্রস্ফুটিত শতদল আলোর পরশেই পাপড়ি মেলে থাকে।

নেতা মাও সে-তুঙ কেও তাঁর পাশের নেতারা সহকর্মীরা এমনিতর ভয় করে থাকেন। সব সিদ্ধান্তের—ন্যায়-অন্যায়-শুভ-অশুভ—উৎস মাও-এর ইচ্ছা অভিলাষ। দলও নয়, জনগণও নয়। মাও যতদিন জীবিত আছেন—ততদিন তাঁরই গোষ্ঠীভুক্তরা তাঁর পরও ক্ষমতায় থাকবেন। মাও-নীতির সমালোচনা সেদেশে হতে পারে না। হবেও না। যেমন হয়নি রাশিয়ায় যতদিন স্তালিনবাদীরা স্তালিনের মৃত্যুর পরও ক্ষমতায় ছিলেন।

রোগশয্যা থেকে কৌশলে গোপনীয়তার সঙ্গে স্তালিনের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে লড়াই পরিচালনা করতে গিয়ে লেনিন বার বার ভেবেছেন তিনি যদি সুস্থ হয়ে না ওঠেন তাহলে কি এই সংগ্রাম সফল হবে? আবার তাঁর মন্ত্রশিষ্য স্তালিন যখন নিজে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার জন্য চক্রান্তের পর চক্রান্ত করে চলেছিলেন তিনিও আশঙ্কা করেছিলেন যদি চিকিৎসকদের ধারণা ব্যর্থ করে দিয়ে লেনিন সত্যি সত্যি সুস্থ হয়ে ওঠেন!

ভারতে দলের নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রীতি অনুসৃত হচ্ছে না। তার বড় কারণ দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আদর্শসচেতনতার অভাব। কারণ, দলীয় নেতৃত্ব আদর্শ রূপায়ণের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি স্মরণাতীত কাল থেকে দলের হেঁসেল ঘরের অতি গোপনীয় ঘরোয়া সমস্যা বলে গণ্য করা—প্রকাশ্য গণ-বিতর্ক ও গণ-আলোচনার আলোর মধ্যে আনতে না দেবার সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থপরতা ও গোষ্ঠীতন্ত্রের প্রাধান্য, 'শৃঙ্খলা' নামক দানবের ভ্রূকুটির মুখোশকে ভয় করে দলের সদস্যদের পিছু হটে আসা।

এর মধ্যেও আশার আলোর ঝিলিক যে না দেখা যায় তা নয়। গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল দেশের নাগরিকদের—যাঁরা কোন দলের সভ্য নন—এই অজুহাতে এই মৌল প্রশ্ন গুলি সম্বন্ধে উদাসীনতা—নেতা নেতৃত্ব নির্বাচন সংক্রান্ত গণতান্ত্রিক ট্রাডিশন গড়ে তুলতে সাহায্য করে না। সাধারণ নাগরিক ও জনগণের আগ্রহের চাপ দলের অভ্যন্তরে অনুপেক্ষনীয়। পথচারীদের ন্যায় তাঁদের উদাসীনতা ও নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ গণতান্ত্রিক দলের ভিতরের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় লড়াইকে দুর্বলই করে দেয়।

শ্রীমতী গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রীপদে আসীন না থাকলে ভারত রসাতলে যাবে—তাই তো এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে মাথা পেতে মেনে নেওয়া যায় না! ভারতবর্ষ কখনই রস তলে যাবে না। আদর্শভ্রষ্টদের দ্বারা কুক্ষিগত, ভারতের শাসক দলের 'প্রগতিশীল' 'লবির' ভরাডুবি ঘটবে। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে বিশ্বের দরবারে তো বটেই, সারা ভারতে আইনের শাসন-তত্ত্বের অলঙ্ঘনীয়তা ও গণতন্ত্রের মহিমা প্রমাণিত হত, গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতি শাসক দলের আনুগত্যের প্রমাণ মিলত, প্রমাণ হত আবার কমিউনিস্ট দুনিয়া ও গণতান্ত্রিক ভারতের মধ্যেকার গুণগত আদর্শগত পার্থক্য স্বাতন্ত্র্য; প্রমাণ হত শাসক দল ও দলের নেত্রী কখনই আদর্শ, সংবিধান ন্যায় নীতি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, দেশ ও জাতির স্বার্থ—মর্যাদার উর্ধ্বে নন। সব কিছুর উর্ধ্বে দেশ ও জাতি, জাতির মৃত্যুহীন আদর্শ। দলের ও দলের নেত্রীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠত নিঃসন্দেহে। প্রমাণ করার প্রয়োজন ছিল 'বৃহত্তম গণতন্ত্রে' প্রধানমন্ত্রীর 'পদের' মর্যাদা ও মহিমা ব্যক্তি-প্রধানমন্ত্রীর অনেক উর্ধ্বে।

শোনা যায় প্রধানমন্ত্রী নাকি পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর পরামর্শদাতারা অন্য পরামর্শ দিলেন। তাঁরা যে প্রধানমন্ত্রীকে তাঁদের সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠী ও ব্যক্তি-স্বার্থে প্রয়োজন ও খুশীমত ব্যবহার করে এসেছেন এতদিন—সেই অবস্থা চলুক এটাই তাঁরা চান। দেশ জাহান্নমে যায় যাক। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে কে অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রীরূপে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন এ নিয়ে উঠেছিল তর্ক-বিতর্ক। প্রধানমন্ত্রী যদি নিজেই তাঁর 'উত্তরাধিকারী' নির্বাচিত করতেন [যেমন গান্ধীজী করেছিলেন, লেনিন চেয়েছিলেন, মাও সে-তুঙ চেয়েছেন—তাঁদের অবর্তমানে কে বা কারা 'উত্তরাধিকারী' হবেন] তাহলে পদত্যাগের অসুবিধা কি ছিল? কিন্তু নেতা নির্বাচন 'কেন'

বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্বাধীনভাবে করতে পারবে না? কেন পরিষদীয় দল নূতন নেতা নির্বাচন করতে পারবে না? কংগ্রেস দল—কি অবিভক্ত, কি বিভক্ত—এই গণতান্ত্রিক প্রথা গড়ে তোলেনি। প্রতিটি সঙ্কটে নেতা-পূজার উৎকট মানসিকতা গণতান্ত্রিক ট্রাডিশন সৃষ্টি করতে বাধা দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় পরিষদীয় দল নেতা নির্বাচনের প্রশ্নে অনিবার্যভাবে ভাঙনের সম্মুখীন হবে জেনেই প্রধানমন্ত্রীর অপরিহার্যতা ঘোষণা করা হল প্রস্তাবাকারে। যেহেতু (কমিউনিস্ট-শাসিত রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট দলের যুক্তিও অনুরূপ) কংগ্রেস দল মানেই দেশ ও জাতি,—তাই দলের বিপর্যয়ের অর্থ জাতির বিপর্যয়! নূতন নেতা নির্বাচনের জন্য গণতান্ত্রিক পথে পা বাড়াতে কংগ্রেস পরিষদীয় দল সাহস পেল না। একটা জিনিস কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করার আছে। যে-কেন্দ্রীয় পরিষদীয় দল বিশেষ নেতার অপরিহার্যতা ঘোষণা করল এবং দলের নেতারা নেতার প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য প্রমাণের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিলেন তাঁরা নেত্রীর প্রতি এতই যখন অনুগত (একজন প্রভাবশালী নেতা নির্দ্বিধায় ঘোষণা করে বসলেন তিনি ১৯৬৬ সালে কংগ্রেসে পুনরায় যোগদান করেছিলেন 'প্রধানমন্ত্রীর সেবায়' নিযুক্ত থাকতে—'to serve her') তখন তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁরই পছন্দমত উত্তরাধিকারী মনোনীত করার অধিকার মেনে নেননি কেন? সুতরাং এই ভক্তি ও আনুগত্য প্রদর্শনের যে অভিনয় হচ্ছে সেটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

গণতন্ত্রের মুখোশ পরিধান করে গণতন্ত্র রক্ষার যে অভিনয় চলেছে তাতে গণতন্ত্র রক্ষা পাবে না—স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পথই রচিত হবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নূতন নেতা নির্বাচন সম্ভব নয় বলেই অপরিহার্যতা-তত্ত্ব পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর আপীলের ও স্থগিতাদেশের নিরপেক্ষ নির্ভীক বিচারের উপযোগী পরিবেশ বিঘ্নিত করা হচ্ছে। ফলে আইনের শাসন-তত্ত্বের—দেশের সকল মানুষই আইনের চোখে সমান—এই সাংবিধানিক অঙ্গীকারের অবমাননাই ঘটবে।

১০

গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলন

পরিষদীয় গণতন্ত্রের বিকল্প কোন-ন-কোন প্রকারের নিয়ন্ত্রণহীন এক-নায়কতন্ত্র। কিন্তু পরিষদীয় গণতন্ত্রের মাহাত্ম্য যতই প্রচার করা হোক না কেন পরিষদীয় গণতন্ত্রের সুস্পষ্ট অবক্ষয় ঘটেছে কয়েকটি বিশেষ কারণে। প্রথমটি হল পরিষদের বাইরে—একটি মূল বোধ সচেতন সজাগ জনমতের অস্তিত্ব; আর দ্বিতীয়টি হল আধুনিক পার্টি-ব্যবস্থা ও তার সীমাহীন প্রভাব। প্রকৃত কর্তৃত্ব পরিষদ বা পার্লামেণ্টের কক্ষের বাইরে—জনমত সৃষ্টিকারী সংস্থাগুলির কাছে চলে যাচ্ছে। গণতন্ত্র তো আর পার্টি-বিহীন গণতন্ত্র নয় এ-যুগে; দেশের শাসন চালায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। পরিষদ বা পার্লামেণ্টের নীতি কার্যক্রম নির্ধারণ করে দল। সুতরাং পার্লামেণ্ট—বিধানমণ্ডলী এগুলি দলের নির্দেশ-আজ্ঞা-ইচ্ছা পালনের প্রতিষ্ঠানিক হাতিয়ার মাত্র। দল যেমনটি নির্দেশ দেবে পরিষদীয় দল ঠিক ঠিক ভাবে সেটি পালন করবে।

সংবাদপত্র গণমত তৈরীর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। স্বাধীন সংবাদপত্রের বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জনমত প্রভাব বিস্তার করে অনিবার্যভাবে গণতান্ত্রিক দলের সভ্যদের ওপর। কমিউনিস্ট দেশগুলিতে স্বাধীন সংবাদপত্র বলে কিছু নেই—তত্ত্বগতভাবে থাকতেও পারে না। জনগণের মত নির্ভর করে পার্টি-পরিচালিত সংবাদপত্র—প্রচারপত্রের ওপর। অবশ্য ভিন্নমতাবলম্বীরা, যেমন রাশিয়ায়, গোপনভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে সমালোচনা-মুখর প্রচারপত্র—সংবাদ, সাহিত্য-বিজ্ঞান-ইতিহাস-বিষয়ক তত্ত্ব প্রচার করে থাকেন এবং ধরা পড়লেই কঠোর শাস্তি পেয়ে থাকেন।

পার্টির নির্দেশ ও সজাগ জনমতের পাহারায় সংসদ সদস্যদের বলিষ্ঠ-নির্ভীক স্বাধীন ভূমিকা উত্তরোত্তর নিষ্প্রভ হয়ে পড়ছে। শাসক দলের কোন আইন বা সিদ্ধান্ত যত অযৌক্তিক ও অন্যায়ই হোক না কেন—দলের 'হুইপ' দিয়ে দলের সকল সদস্যকে তা মানতে ও তার সমর্থনে ভোট দিতে বাধ্য করা হবে। বিবেকের বিরুদ্ধেও কাজ করতে হবে, দলের নির্দেশ মেনে চলতেই হবে।

দলের সঙ্গে জনস্বার্থের সংঘাত থাকলেও 'দলই ঠিক বলছে' এই অন্ধ বিচারে জনস্বার্থের ওপর, মানবিক অধিকার ও মনুষ্যত্ববোধের ওপর দলীয় ফারমান বেশী প্রাধান্য পেয়ে যায়। এ অবস্থা কি চলতেই থাকবে আর একটি সাধারণ নির্বাচন না আসা পর্যন্ত? পার্লামেন্ট বিধানসভাগুলিতে জোরালো যুক্তিপূর্ণ ভাষণ বাগ্মিতার কোন কার্যকারিতাও আর নেই এযুগে। দর্শক বা প্রেস গ্যালারীর আকর্ষণ হতে পারে—প্রশংসা কুড়োতে পারে—কিন্তু বিভিন্ন দলের সদস্যরা তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেও ভোট দেবেন শেষ পর্যন্ত দলের নির্দেশমতই। তাহলে দেখা যাচ্ছে ক্ষমতা পার্লামেন্ট বা বিধানসভা থেকে হস্তান্তরিত হচ্ছে (১) জনমতের দরবারে ও (২) দলের কার্যকরী সমিতির কাছে। [Transfer of power from Parliament to the Party in power and the people.]

আধুনিক রাষ্ট্রে নির্বাচন একটি অতি ব্যয়-বহুল জটিল ব্যাপার। সাধারণ নাগরিকের পক্ষে এই নির্বাচনী ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব। দলের টিকিট পাবার জন্য তাই এত হুড়োহুড়ি। দলই যখন অর্থ থেকে আরম্ভ করে নির্বাচনের সমস্ত দায়-দায়িত্ব বহন করে—তখন নির্বাচিত সদস্যরা সব সময় দলের মুখ চেয়ে কাজ করতে বাধ্য থাকেন। জনগণের স্বার্থ, দেশের স্বার্থ, ন্যায় নীতি বিবেক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনের কর্তব্য—এগুলি গৌণ হয়ে পড়বে ক্রমে ক্রমে। ফলে দলের সাধারণ সদস্য এবং সমস্যা-জর্জরিত গরীব দেশের সাধারণ নাগরিকদের পরিষদ-সংসদ-বিধানমণ্ডলী সম্বন্ধে আগ্রহ, ঔৎসুক্য দিন দিনই কমে আসছে এবং সংসদীয় রাজনীতির কার্যকারিতায় তাদের উৎসাহহীন হয়ে পড়তে দেখা যাবে। আবার বিজ্ঞাপিত দিনে ভোটের ভেঁপু বেজে উঠলেই চারিধারে সাজ-সাজ রব উঠবে—রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত হবে, নাগরিকরা রাজনৈতিক প্রচারে বিমোহিত হয়ে ভোট বাক্সে ছাপ-মেরে ভোটপত্র নিক্ষেপ করে কোন না কোন বিশেষ দলকে জয়ী করিয়ে বিজয়ীর গৌরব অনুভব করবেন। নির্বাচনে আঞ্চলিকতা, জাত-পাত-ভাষা-সম্প্রদায় অপপ্রচার টাকার খেলা প্রাধান্য পাবে—অথচ বিজয় মিছিলে গগনভেদী আওয়াজ উঠবে 'এবার ভোটে জিতল কারা?' 'জনগণ আবার কারা?'

ভোটে রায়টাই শেষ কথা নয়—কারচুপি আরও বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে এযুগে। রিগিং-এর কুৎসিত চেহারাটা লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু 'রিগিং' শুধু

ভয় দেখিয়ে জোর-জুলুম করে ভোট-বাক্সে ভোটের কাগজ ঢুকিয়ে দেওয়া, পোলিং অফিসারদের ভীত-সন্ত্রস্ত রেখে কাজ হাসিল করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। জাল ব্যালট পেপার তৈরী করে, ভয় দেখিয়ে হিংস্র পদ্ধতিতে যেমন এ কাজ হয়—আবার গণতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ অহিংস পথেও চমৎকারভাবে একাজ হয়ে থাকে। ভোটপর্ব সুরু হবার আগে থেকেই ভোট কেন্দ্রে দীর্ঘ লাইন সংগঠিত করে অন্যপক্ষের সমর্থক ভোটারদের স্বাধীনভাবে সময় সুবিধামত ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোট দিতে বাধা সৃষ্টি করা, কোন বিশেষ দলের ক্রীড়নক হয়ে সমর্থক সরকারী কর্মচারী অফিসারদের ভোট গ্রহণের সময় প্রত্যক্ষ নয় পৃষ্ঠপোষকতা, কোন ভোট কেন্দ্রে বিরুদ্ধ দলের বা প্রার্থীর সমর্থক ভোটার বেশী হলে ইচ্ছকৃতভাবে কালহরণ করে যাতে কম ভোটার ভোট দিতে পারেন সেটা সুনিশ্চিত করা। আরও কত নির্লজ্জ আচরণ নিরপেক্ষ প্রশাসনের মুখোশ পরে লক্ষণীয় হয়ে পড়ে।

জুলুমবাজী পিস্তলবাজীকে একদিন না একদিন রোখা যাবেই—সংগঠিত গণশক্তি দিয়ে, আইন প্রশাসনিক তৎপরতার দ্বারা। কিন্তু গণতান্ত্রিক অহিংস পদ্ধতির আড়ালে যে-কারচুপি হয়ে থাকে ব্যাপকভাবে তার কি প্রতিকার? এদেশে গণতন্ত্রের নামে প্রকৃত 'ইলেকশন' ততটা হয় না আদৌ, যতটা হয় 'ইলেকশনীয়ারিং'। সুতরাং যখন বলছি পার্লামেণ্ট বা পরিষদ কক্ষ থেকে জনগণের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটেছে তখন সন্দেহ জাগে—এই ক্ষমতা হস্তান্তর কতটা প্রকৃত? নির্বাচন যদি সত্যি সত্যিই 'স্বাধীন' 'নিরপেক্ষ' 'বাধামুক্ত' না হয় তাহলে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও—তা কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতই অলীক হবে। দল-নিরপেক্ষ অসংখ্য জনগণ প্রতিকারহীন অন্যায়ের, প্রতারণার শিকার হয়ে পড়ছেন।

ক্ষমতা যখন প্রকারান্তরে জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলির হাতে ফিরে আসছে তখন পরিষদীয় গণতন্ত্রের সার্থকতা নির্ভর করবে (১) রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি সংস্কৃতি-সচেতন সদা-জাগ্রত জনমত সৃষ্টির ওপর এবং (২) রাজনৈতিক দলগুলির গণতন্ত্রীকরণের ওপর। পার্লামেণ্ট বিধানসভায় আনীত আইনের ক্ষমতা নিয়ে ব্যাপক গণ-বিতর্ক যেমন সভা-সমিতিতে স্বাধীনভাবে হওয়া দরকার, তেমনি বাধা-মুক্ত স্বাধীন বিতর্ক হওয়া দরকার দলের মধ্যে। 'ডেমোক্র্যাটিক্ সেণ্ট্রালিজম'-এর 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণের' মুখোশ পরে দলের

কার্যকরী সমিতি হাইকম্যাণ্ড বা পলিট ব্যুরো একনায়কতন্ত্র ও যথেচ্ছাচার চালিয়ে যাবে। পার্লামেন্ট, সংসদ হবে সেই 'হাইকম্যাণ্ড' 'কেন্দ্রীয় কমিটি' 'পলিট ব্যুরোর' ইচ্ছা খেয়াল-খুশী, অভিলাষ চরিতার্থতার 'রেজিস্টারিং মেশিন' মাত্র।

সংসদ-বিধানসভাগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ আইন, সিদ্ধান্ত মাত্র কয়েক ঘণ্টার বিতর্কের পর পাশ হয়ে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতামত মূল্যহীন, 'মেজরিটি রুল'-এর নীতির কাছে সব তর্কই ভোঁতা হয়ে যায়। 'মাইনরিটির' মতামত কোন মর্যাদা পায় না। 'কনসেনসাস' গড়ে তোলার কোন আগ্রহই পরিলক্ষিত হয় না। বর্তমান রাজ্য-প্রশাসন অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। বিশেষজ্ঞদের বিজ্ঞানীদের দক্ষ টেকনোক্রাট ব্যুরোক্রাটদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনুপেক্ষণীয় এযুগে। সংসদের কাজ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ অপরিহার্য। বিভিন্ন উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির হাতে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব সংসদ-বিধানসভাগুলিতে বণ্টন করে দিতে হচ্ছে। এ যুগের পরিষদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভা এতই শক্তিশালী প্রভাবশালী যে, শাসক দলের ক্ষমতা প্রকৃত অর্থে মন্ত্রিসভার ক্ষমতা। আর মন্ত্রিসভার ক্ষমতা, শেষ হিসাবে, একটি গোষ্ঠীর (caucus) সর্বময় ক্ষমতা।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ট্রাডিশন গড়ে না উঠে প্রকারান্তরে র‍্যামজে ম্যুয়ের-এর ভাষায় 'ক্যাবিনেট একনায়কতন্ত্র' গড়ে উঠছে। ইংলণ্ডের তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই র‍্যামজে ম্যুয়ের এই মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন আরও এই মন্ত্রীমণ্ডলীর একনায়কতন্ত্র ধীরে ধীরে পার্লামেন্টের প্রভাব মর্যাদা নষ্ট করেছে "...that Parliament exists mainly for the purpose ineffectually of criticising all but omnipotent Cabinet and transfer the main discussion of political issues from Parliament to the platform and the Press" [Ramsay Muir] রাজনৈতিক বিতর্ক এখন পার্লামেন্ট কক্ষ ছেড়ে সংবাদপত্র ও সভা-সমিতিতেই হয়ে থাকে। পরিষদীয় গণতন্ত্রের এই গতি ঘটনাচক্রে যেন অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

শুধু তাই নয়, প্রচণ্ড ক্ষমতা নিয়ে আমলাতন্ত্রের (Bureaucracy) উদ্ভব হয়েছে—নিষ্ঠুর জবরদস্ত হৃদয়হীন আমলাতন্ত্র। বিকেন্দ্রিত আইনের রূপ ধরে

'একজিকিউটিভ' হয়ে উঠেছে অপ্রমত্ত ক্ষমতার অধিকারী। এই আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানবিক অধিকার রক্ষার তাগিদে, আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুরক্ষিত করতে প্রয়োজন বিরামহীন সংগ্রাম; গণমত-তৈরীর কারখানাগুলিকে 'ক্লোজার' 'লক-আউটের' হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। 'সিভিল সার্ভিসে' দেশের প্রতিভাবান আদর্শনিষ্ঠ সেরা ব্যক্তিরা যেন আকৃষ্ট হয়ে দেশসেবার সুযোগ পান। তাঁদের হাতেই তো প্রকৃত ক্ষমতা। 'ক্যাবিনেট একনায়কতন্ত্রের' আড়ালে আসলে ব্যুরোক্রাটদেরই হাতে অপরিসীম ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে। ভারতেও তাই হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে 'বুরোক্র্যাসী' চরম হৃদয়হীন রূপ নিয়েছে। নাগরিকরা সেখানে প্রতিকারহীন। আমলাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সুযোগ নেই। 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে' সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে পার্টি-আমলা (Party Bureaucrats) ও সামরিক বাহিনীর আমলাদের মহামিলন ঘটায় বিপন্ন নাগরিকদের অবস্থাটা আরও দুঃসহ হয়ে ওঠে। চীন রাশিয়া ও প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশের এ এক গুরুতর সমস্যা।

পরিষদীয় গণতন্ত্রকে সচল ও জনকল্যাণের হাতিয়ার করতে আমলাদের নীতি নির্ধারণ ও গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি আদালত-গ্রাহ্য করার প্রয়োজন আছে। আমলা যদি মনে করেন তাঁদের 'অর্ডার', 'রেগুলেশন', প্রস্তাবিত 'রুলস্'—সিদ্ধান্ত 'চূড়ান্ত' (fi al)—কোন ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিক তাকে চ্যালেঞ্জ করতে পাবেন না—আদালতের আশ্রয় নিতে পাবেন না—তাহলে 'একজিকিউটিভ' দুর্বিনীত হবে এবং 'ক্যাবিনেট ডিক্টেটরশিপ'-এর আশঙ্কা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে। নাগরিকদের মনে চরম ঔদাসীন্য ও হতাশা জাগবে। হতাশা বেশীদিন পুঞ্জীভূত থাকলে সংঘর্ষের পরিবেশ সৃষ্টি করবেই। আইনের অনুশাসন সুনিশ্চিত করতে পারলে এই হতাশা অনেক দূরীভূত হবে—সমাজের কল্যাণ হবে তাতে। উপদেষ্টা পর্ষদ (Advisory bodies), গণ-কমিটি গঠিত হলে আমলাতন্ত্রের বিচ্যুতিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামের গণতান্ত্রিক হাতিয়ার তৈরী হবে। আমলাদের সিদ্ধান্তগুলিকে উপদেষ্টা পর্ষদের মতামত ও পরামর্শ দ্বারা এবং বিচার বিভাগীয় পর্যবেক্ষণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন গণতন্ত্রের স্বার্থেই।

পরিষদীয় গণতন্ত্রের এইসব পরিণতির দিক চিন্তা করলে জয়প্রকাশজীর আন্দোলনের তাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যাবে। যেহেতু ক্ষমতা

সংসদ থেকে জনসাধারণ এবং রাজনৈতিক দলগুলিতে হস্তান্তরিত হচ্ছে সেইহেতু জনগণ উপযুক্ত পরিস্থিতিতে দাবী করতে পারেন, ন্যায়সঙ্গতভাবেই, নির্বাচিত সদস্যদের ফিরিয়ে আনার (right of recall)। এতে পার্লামেণ্ট, বিধানসভা নূতন মর্যাদা ফিরে পাবে—প্রতিনিধিরা সর্ব অবস্থাতেই দেশের স্বার্থ, জনগণের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে চলতে বাধ্য হবেন। জনমতকে উপেক্ষা করে দলীয় শক্তির উন্মত্ততার জোরে সংসদে আচরণ করার স্পর্ধা দেখাতে সাহস পাবেন না। পার্লামেণ্ট বিধানসভা হবে প্রকৃত গণমতের দর্পণ—জনকল্যাণের শ্রেষ্ঠ নিয়মতান্ত্রিক বলিষ্ঠতম হাতিয়ার। বিহারের 'সংঘর্ষ সমিতির' গণ-আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতির দিকে ভারত চেয়ে আছে। জনগণের ক্ষমতাকে বাস্তবতার মর্যাদা দেবার জন্যই জয়প্রকাশজীর এই ঐতিহাসিক অহিংস আন্দোলন।

রাজনীতির সঙ্গে ন্যায় নীতিকে যুক্ত করা চাই। সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশজী সেইদিকে জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বিহারের আন্দোলন একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই আন্দোলনের চাপে যদি বিধানসভা বাতিল হয় তাহলে তার ঢেউ অন্যান্য রাজ্যেও গিয়ে আছড়ে পড়বে। ভারতে নূতন রাজনৈতিক নেতৃত্ব জন্ম নেবেই। জনপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধিরা যদি নিজেদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালনে ব্যর্থ হন এবং নিজেদের ব্যক্তিগত ও দলীয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থ বজায় রাখতে গিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করেন এবং জনগণের মতামতের প্রতি চরম অবজ্ঞা দেখান তাহলে দেশের নাগরিকরা শাসনতান্ত্রিক রাজনীতির বাধ্যবাধকতা মেনে চলবেন এটা আশা করা ভুল হবে। শাসকশ্রেণী যদি সভ্য শাসনের শাশ্বত নীতিগুলি পদদলিত করে চলেন এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিবোধকারীদের বিরুদ্ধে হিংসার রথ ছুটিয়ে দেন তাহলে নাগরিকদের—তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের—ফিরিয়ে আনার দাবী নূতন নৈতিকতা ও শক্তি অর্জন করবেই। তাদের পদত্যাগ করতে বাধ্য করার অধিকার, কংগ্রেস ও সি. পি. আই. দলের শত বিরোধিতা সত্ত্বেও, জনগণের সার্বভৌমত্বের মূল তত্ত্বের সঙ্গে হবে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

বিহারের ঐতিহাসিক আন্দোলনকে কংগ্রেস ও তার দোসর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি 'সি. আই. এ.' পরিচালিত ও 'ফ্যাসিস্ট-সুলভ' বলে বিরামহীন অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। চরিত্র-হনন এযুগের রাজনীতির বড় হাতিয়ার।

জনসাধারণের মুখে আইনসভা ভেঙে দেবার দাবীর কথা শুনে তাঁরা আতঙ্কে অস্থির হচ্ছেন। তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার ১৯৫৯ সালে কেরলের কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে বিধানসভা বাতিল করে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবীতে যে প্রচণ্ড গণ-আন্দোলন হয়েছিল সেই রাজ্যে তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেদিন কংগ্রেস সভানেত্রীরূপে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

গান্ধীজীর মৃত্যুর পর এই প্রথম জনগণের মনে ধারণা জন্মালো যে, যেখানে সকল রাজনৈতিক দল নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে ছাত্র-সমাজ ও সাধারণ নাগরিকরা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে রক্ষার জন্য এগিয়ে এলে, যোগ্য নেতৃত্বে আদর্শের অবক্ষয় কোনরকমে না ঘটিয়ে অহিংস পথে চালিত হলে আন্দোলন যে কি দুর্বার হতে পারে বিহার তা প্রমাণ করে দিল। গুজরাটেও ছাত্র আন্দোলন সফল হল মন্ত্রিসভা ভেঙে দেবার দাবীতে। যাঁরা নেতৃত্ব দিলেন গুজরাটের আন্দোলনের তাঁরাও সকল রাজনৈতিক দলের প্রভাবমুক্ত। জয়প্রকাশজীর আন্দোলন সম্বন্ধে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন (১৯৭৪, ১লা নভেম্বর):

"রাস্তার জনতার দাবীর কাছে তিনি কিছুতেই নতি স্বীকার করবেন না। আমি জনসাধারণের সরকার নির্বাচিত করা অথবা তাকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার অধিকার আত্মসাৎ করব না।"

বিহারের এই শান্তিপূর্ণ গণ-আন্দোলন জনসাধারণকে তাদের প্রতিনিধিত্ব-মূলক সরকার নির্বাচিত করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা মোটেই বলা যায় না, বরং সেই অধিকারকে কার্যকরী করার একটা শর্ত বলে গণ্য করা যেতে পারে। ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থক এবং তাঁর দলের মিত্র সি. পি. আই. এই অহিংস গণ আন্দোলনকে ফ্যাসিস্ট ও সি আই. এ. পরিচালিত বলে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে এসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের সেই মৌল অধিকারকে অস্বীকারই করেছিলেন। আগেই বলেছি ১৯৫৯ সালের কেরলের কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভার বিলোপ সাধনের দাবীতে যে বিরাট গণ-আন্দোলন হয়েছিল তার পুরোভাগে সেদিন কংগ্রেস সভানেত্রীরূপে শ্রীমতী গান্ধী ছিলেন। তখন কেন 'রাস্তার আন্দোলনকে' এত মর্যাদা দিয়েছিলেন?

১৯৫৯ সালের কেরালা মন্ত্রিসভা গঠনের পর আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞ কমিশনের ভারতীয় শাখা কেরলে প্রথম কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভার আমলে আইনের

শাসন কিরূপ নিয়েছিল তা নিয়ে অনুসন্ধান করার জন্ত যে কমিটি গঠন করেছিলেন তাতে ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এন. এইচ. ভগবতী, আইনজ্ঞ এম. কে. নাম্বিয়ার প্রমুখ। এই কমিটিও প্রসঙ্গত মন্তব্য করেছিলেন আইন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা-ভিত্তিক কোন মন্ত্রিসভার পূর্ণকাল অবধি কাজ চালিয়ে যাবার অপ্রতিরোধ্য অধিকার থাকতে পারে না। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন-নির্ভর মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে জনসাধারণের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন গড়ে তুলে মন্ত্রিসভা, বিধানসভার বিলোপ দাবী করার অধিকার শাসনতন্ত্র ও গণতন্ত্রসম্মত। জয়প্রকাশজী গণতন্ত্রকে নূতন মহিমা ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন মাত্র। তাঁর প্রেরণায় সারা দেশজুড়ে এই আন্দোলন চলেছে অথচ কোথাও কোন হিংসার বহিঃপ্রকাশ নেই। গান্ধীজীও এত বড় অহিংস আন্দোলন পরিচালনা করতে পারেননি। দেশের পার্লামেন্ট বা আইনসভাগুলি যদি সংবিধানসম্মত জনসাধারণের ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ না করেন এবং দেশের অপশাসন উৎপীড়ন নিছক দলবাজী চলতেই থাকে সংখ্যাধিক্যের দাবীতে, যদি পার্লামেন্ট আইনসভাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের রবার স্ট্যাম্পরূপে ব্যবহার করা হয়, নিরপেক্ষ প্রশাসন ও আইনের শাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখান হয় তাহলে জনগণ আর একটি সাধারণ নির্বাচন না আসা পর্যন্ত নীরবে সেই অন্যায় অপশাসনের বোঝা বইতে মোটেই বাধ্য নন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার।

এটা লক্ষ্য করা গেছে সংসদীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্র-শাসন বা পরিচালনার ক্ষেত্রে নাগরিক তথা জনসাধারণের সাধারণ নির্বাচনের দিনে ভোট দেওয়া ছাড়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন ভূমিকাই নেই। জয়প্রকাশজীর আন্দোলন গণতন্ত্র ও জনগণকে তথা নাগরিকদের একটা বিশেষ মর্যাদা দান করেছে নিঃসন্দেহে। নির্বাচনের পর নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনগণের 'মনিব' হয়ে যান এবং জনগণ তাঁদের সেই নয়া রাজকুলের 'দাস' হয়ে পড়েন। শাসকশ্রেণী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর ভুলে যান সময় সময় যে, জনগণই তাঁদের 'প্রভু' এবং তাঁরা জনগণের ও দেশের 'ভৃত্য' মাত্র।

দেশে দেশে রাজনৈতিক দল-প্রথার উদ্ভবের পর দেখা যায় সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন আসলে বিশেষ দলের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীরই শাসন। নির্বাচিত সদস্যরা কি বিধানসভায় কি লোকসভায় দলের কাছেই দায়বদ্ধ, জনগণের কাছে নন।

দলই প্রধান হয়ে ওঠে—জনসাধারণ গৌণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এই কি প্রকৃত গণতন্ত্র? নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দলের হুকুম মেনে চলেন—জনগণের মতামতকে অগ্রাহ্য করেন। সকল দল সম্বন্ধেই এটা প্রযোজ্য। একপার্টি শাসন-ব্যবস্থায় পরিস্থিতিটা কত দুঃসহ হয়ে ওঠে সেটা সহজেই অনুমেয়। এ অবস্থা বিবেচনা করেই চিন্তানায়ক মানবেন্দ্রনাথ রায় 'দলহীন গণতন্ত্রের' কথা বলেছিলেন এবং সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশজীও সেই আদর্শের কথা বলেছেন। অবশ্য এই 'দলহীন গণতন্ত্রের' আদর্শ একটা দূরপাল্লার মানবিক দৃষ্টিতে দেখা সুন্দর স্বপ্ন বা আদর্শ। তাঁর সঙ্গে নূতন এই গণ-আন্দোলনের সম্পর্ক আপাত-দৃষ্টিতে নেই। যারা জয়প্রকাশজীর 'দলহীন গণতন্ত্রের' সঙ্গে বিভিন্ন দলগুলিকে একত্রিত করে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বানকে সামঞ্জস্যহীন বলে সমালোচনা করছেন তারা ভ্রান্ত। মার্কসের রাষ্ট্র অবলুপ্তি-তত্ত্বও ('State will wither away') এমনি একটি দূরপাল্লার দৃষ্টিতে দেখা একটা মহৎ স্বপ্ন।

রাজনৈতিক দলগুলি যেখানে এইভাবে জনগণের ঘাড়ে চেপে বসছে সেখানে জয়প্রকাশজীর মানবিক অধিকারগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করার দাবীতে নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন জনগণের কাছে তাদের অপহৃত ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে সাহায্য করবে নিঃসন্দেহে। এই আন্দোলনের নৈতিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে এখনও সময় লাগবে। যদি গণতন্ত্রই আমাদের মূল লক্ষ্য হয় তাহলে জন-সাধারণকে তাদের ভূমিকায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

জয়প্রকাশজীর আন্দোলনের আশু রাজনৈতিক দিক যেমন আছে, নৈতিক দিকও রয়েছে এবং দ্বিতীয়টিই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোদয় নেতা তাঁর 'সার্বিক বিপ্লব' তত্ত্বটিকে খুব পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেননি। এই অস্পষ্টতা অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে ভবিষ্যতে। দ্বিতীয়ত, শ্রেণীহীন সমাজের কথা তিনিও বলছেন। সেই সমাজ কিভাবে কোন্ পথে আসবে সেটাও পরিষ্কার করে বলেননি। শ্রেণীহীন সমাজ 'দলহীন গণতন্ত্রের' সহায়ক হবে একথাটা বুঝতে অসুবিধা হয় না সত্যি। কিন্তু পৃথিবীর এযুগের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে বিজ্ঞাপিত রাষ্ট্রগুলিতে বিশেষ করে রাশিয়ায় অর্ধশতাব্দীর সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরও সেদেশে দুর্মদ-একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সোভিয়েত একনায়কতন্ত্র অতি নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ কলেবর ধারণ করেছে। 'যে কোন প্রতিরোধ বিদ্রোহের চ্যালেঞ্জ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তাছাড়া নূতন ধরনের

শ্রেণী-বিভাগে বিভক্ত সেই আধুনিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিচ্যুতিগুলি যাতে কোনমতেই তার পুনরাবৃত্তি এদেশে না ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

দেশের শিক্ষা পদ্ধতি, রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক চেতনার স্তর এমন হওয়া দরকার যাতে এদেশে স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়। দলের বাইরে—দলের সঙ্গে যুক্ত নন—এরকম জনসংখ্যা এদেশে যে কি বিপুল এবং তাদের প্রভাব যে কত প্রচণ্ড ও সুদূরপ্রসারী হতে পারে জয়প্রকাশজীর নেতৃত্বের আকর্ষণীয়তা ও সাফল্যই তার প্রমাণ। এই বরেণ্য নেতা দীর্ঘ ২০ বছর সকল দলীয় রাজনীতির বাইরে ছিলেন—কোনরকম ক্ষমতার সঙ্গে কখনই যুক্ত ছিলেন না—কোন পদের মোহ তাঁকে নীতি ও মূল্যবোধের নিরলস অনুধ্যান থেকে টেনে আনতে পারেনি। অথচ কোন রাজনৈতিক নেতা বা দল যা পারেননি—তিনি তা পেরেছেন। ভারতের গণতন্ত্রের সাফল্যের ভবিষ্যৎ ভারতের জন-চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই। এই গণশক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে।

অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়-শিক্ষা-চিকিৎসা-রুজির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতেই হবে। সেই সঙ্গে চলবে নৈতিক জাগরণ ও খাঁটি মানুষ তৈরীর প্রচেষ্টা। ন্যায়নিষ্ঠ জীবন যাপনের জন্য সর্বোদয় নেতা জনসাধারণের এত কাছের মানুষ। রাজনীতিকে ন্যায়-নীতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধবার জন্য গান্ধীজী-শ্রীঅরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথ-তিলক-নেতাজী সুভাষচন্দ্র যে স্বপ্ন দেখেছিলেন জয়প্রকাশজীকে অবলম্বন করে সেই স্বপ্ন-শতদল প্রস্ফুটিত হোক।

১১

এক-পার্টি শাসন-ব্যবস্থা ও গণতন্ত্র

ভারতের লোকসভার অধ্যক্ষ জি. এস. ধীলন সংবাদপত্রের প্রথম পাতার খবর হলেন। শিলং-এ রোটারী ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: "একদলীয় শাসন ও একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক শৃঙ্খলা স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব-ইউরোপীয় দেশগুলির মতো সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহেও এই ব্যবস্থাই কায়েম রয়েছে। তিনি বলেছেন ২৫ বছরের পরিস্থিতি বিবেচনা করে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বহু-দলীয় শাসন-পদ্ধতির জন্যই ভারতের রাজনৈতিক জীবন স্থিতিশীল হতে পারেনি। তবে এখন জনসাধারণ বুঝতে পেরেছেন অনেক কারণেই বহুদলীয় শাসন-পদ্ধতি দেশের পক্ষে শুভ নয়। তিনি ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমি এবং ভাবগত ও অন্যান্য নানা প্রকার ভিন্ন-মুখীনতা স্মরণ করিয়ে দেন এবং বলেন তাঁর মতে তাঁরা যে-ব্রিটিশ সংসদীয় পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন জনসাধারণের অবস্থার সঙ্গে তা ঠিক খাপ খায়নি।

ভারতের সংসদ ও বিধানসভাসমূহের তিক্ত দৃশ্যাবলীর উল্লেখ করে শ্রীধীলন বলেন যে, অতি সাধারণ ধরনের লোকেদের যখন বিশেষজ্ঞদের মতো কথা বলতে দেখা যায় তখন সত্যিই দুঃখ হয়। গণতন্ত্রের পক্ষে এই অবস্থা বিপজ্জনক।"

লোকসভার অধ্যক্ষের এই বক্তৃতা যুগপৎ বিস্ময় ও উদ্বেগ সৃষ্টি করবে রাজনৈতিক মহলে। অবশ্য ধীলন সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই খবরকে 'বিকৃত' বলে জানিয়েছেন। তবু বিতর্ক চলেছে। শ্রীজ্যোতির্ময় বসু ও কয়েকজন বিশিষ্ট সংসদ সদস্য সংবাদপত্রে প্রচারিত ধীলনের বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করেছেন। লোকসভায় এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে যথেষ্ট। যখন সর্বত্র গণতন্ত্র রক্ষার জন্য চীৎকার ও পাল্টা চীৎকার চলেছে—আন্দোলন ও পাল্টা আন্দোলন চলেছে এবং প্রধানমন্ত্রী থেকে সকল রাজনীতিবিদরাই—ডান-বাম-মধ্য-মার্গী—সবাই যখন সাংবিধানিক এবং রাজনৈতিক গণতন্ত্রের আদর্শকে শেষ পর্যন্ত আঁকড়িয়ে

ধরে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল উন্নতির (orderly progress) কথা বলছেন ঠিক সেই সময় এ রকম একটা বিতর্ক ওঠা নানা দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। বিতর্কমূলক বিবৃতিটি যাঁর নামে প্রচারিত তিনি বিতর্কের বাইরে থাকলেও—এদেশে অনেক রাজনীতিবিদের মনের কথা এটি। এদেশে সংসদ সদস্যদের 'প্রগতিশীল' কেউ কেউ 'সীমিত একনায়কত্বে'-র কথা প্রকাশ্যেই বলেছেন। তাঁরা আবার নিজেদের সরকারী দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের খুব ঘনিষ্ঠ বলেও দাবী করে থাকেন।

শ্রীধীলন লোকসভায় এই বিতর্কের উত্তরে বলেছেন তিনি এদেশে এক-পার্টি শাসন প্রবর্তনের প্রস্তাব করেননি শিলং-এর রোটারী ক্লাবের সভায়। তিনি বলেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সোভিয়েট ধাঁচের এক-পার্টি শাসনব্যবস্থা চালু করেছে। পূর্ব ইউরোপ আফ্রিকার কয়েকটি দেশে এই ব্যবস্থা চালু আছে। এই ব্যবস্থার একটা সুফল—সেই সব দেশ বিশেষজ্ঞদের প্রশাসন-ব্যবস্থা মান্য করে এবং পরিষদীয় কমিটিগুলি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত হওয়ার ফলে বিভিন্ন জটিল সমস্যার সম্যক পরীক্ষা ও বিচার সম্ভব।

বহু-দলীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেসব কথা বলা হচ্ছে তার একটু বিশ্লেষণ দরকার। বহু-দলীয় রাজনীতির জন্যই কি ভারতের 'রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা' ক্ষুণ্ণ হয়েছে? ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ভারতের—কি কেন্দ্র কি রাজ্যগুলিতে—একই দলের শাসন চালু ছিল। জাতীয় কংগ্রেস দলই ক্ষমতায় ছিল। দেশের পঞ্চবার্ষিকী যোজনাগুলি প্রণয়নের ও রূপায়ণের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির ওপর। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর প্রভাব ও প্রতাপ ছিল অপরিসীম। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত দেশের স্থিতিশীলতা অর্জনে কেন্দ্রীয় সরকার কতটা সফল হয়েছিলেন? ১৯৫২ সালের চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষে ভারতের সেনাবাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে বিশ্বের কাছে আত্মমর্যাদা হারাল কার অপদার্থতার জন্য? এর জন্য দায়ী বহু-দলীয় প্রথা? সেদিনের প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রতিরক্ষা বিষয়ক কোন্ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ শুনেছিলেন? বিশেষজ্ঞদের তো উপেক্ষাই তিনি করেছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর জীবদ্দশায় লোকসভায় শক্তি-সম্পন্ন বিরোধী দল বলতে যা বোঝায় তা ছিল না। কিছু কিছু শক্তিশালী বিরোধী

নেতা ছিলেন, যেমন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, আচার্য কৃপালনী, রাম মনোহর লোহিয়া, সুরেন্দ্রনাথ দ্বিবেদী, শ্রীনাথ পাই, অধ্যাপক হেম বরুয়া, এ. কে. গোপালন, এস. এ. ডাঙ্গে, অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী, হরিবিষ্ণু কামাথ, প্রকাশবীর শাস্ত্রী, অটল বিহারী বাজপেয়ী, কংগ্রেস দলের পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র প্রমুখ। ডক্টর মুখার্জী ও লোহিয়া বিরোধী দলের দুর্বল নীতির, প্রধানমন্ত্রীর অনুগ্রহ ভিক্ষা প্রবৃত্তির তীব্র সমালোচক ছিলেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর, ডক্টর লোহিয়া যখন নির্বাচিত হয়ে আসেন তার বহু পূর্বেই শেখ আবদুল্লার কাশ্মীর কারাগারে বন্দীদশা কালে মৃত্যু হয়।

লোকসভা-রাজ্যসভায় বিভিন্ন বিধানসভাগুলিতে কংগ্রেস দলের পাশব সংখ্যাগরিষ্ঠতাতেও এই দল খুশী নন; এমনিতেই সংখ্যাধিক্যের স্টীম রোলারের চাপে বিরোধীরা তো পিষ্ট। তারা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে আঘাত হানল কিভাবে? রচনাত্মক রাজনৈতিক চিন্তাধারার জোয়ার আনার কোন চেষ্টা গত ২৫ বছরে হয়েছে কি? বিরোধীরা সমালোচনা করলেও অপরাধ? তাহলে গণতন্ত্রের উপাসকরা কি চান পরিষদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলগুলিও শাসক দলের কৃপাজীবী ক্লাবের ভূমিকা নিক?

শাসক দলের কিছু কিছু প্রথম সারির নেতা লোকসভায় বিরোধী দলগুলিকে টিট্‌কারি দিয়ে বিদ্রূপ করে বলে থাকেন বিরোধীদের সংখ্যা এতই কম যে, তাদের 'দুরবীণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে হয়'। তবু যত দোষ নন্দ ঘোষের। ভারতে ২৫ বছর ধরে যে পরিষদীয় গণতন্ত্রের পরীক্ষা চলেছে তাতে এক-পার্টি শাসনের বাকি আছে কি? শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকলে গণতন্ত্রের মূল্য কি আছে? ভারতের সংসদ ও বিধানসভাগুলির তিক্ত দৃশ্যাবলী অধ্যক্ষ ধীলনকে ব্যথিত করেছে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টেও অনুরূপ তিক্ত ঘটনা বহু ঘটেছে। তাহলে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে —'মার্শাল' নিয়োগের ব্যবস্থা আছে কেন? ট্রেজারী বেঞ্চের দিকে চেয়ে রুলিং দেওয়াটা বুঝি দুঃখজনক নয়?

'রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার' কথা বলে আসল সমস্যাকে শ্রীধীলন ঢাকবার চেষ্টা করেছেন। গত ২৫ বছরে গরীবরা কেন উত্তরোত্তর আরও গরীব হয়ে পড়ল? কেন পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হল? বহু-দলীয় ব্যবস্থার জন্য? একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। ধীলনের এই বক্তব্যের পর তিনি 'নিরপেক্ষ'

একথা বলার অবকাশ থাকবে কিনা সন্দেহ হয়। সংসদে ও বিধানসভাগুলিতে অতি সাধারণ প্রতিনিধিদের বিশেষজ্ঞদের মত যখন কথা বলতে শোনা যায় তখন গণতন্ত্রের কার্যকারিতায় শ্রীধীলনের মনে সংশয় জাগে। কিন্তু লোকসভায় নির্বাচিত বিশ্ব-বিশ্রুত বিজ্ঞানী পরলোকগত ডক্টর মেঘনাথ সাহা তো শাসক শ্রেণীর কাছে সেই মর্যাদা পাননি। তাঁকেও তো তাঁর নির্ভীক মতামতের জন্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী—'মেঠো বক্তার বক্তৃতা' বলে ('layman') ব্যঙ্গ করেছিলেন। এদেশে বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তিদের দেশের প্রশাসন যোগ্য প্রাপ্য মর্যাদা তো দেয়নি। আমলারাই দেশ চালিয়ে এসেছেন। ডঃ হরগোবিন্দ খোরানার ন্যায় বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী এদেশে কি ব্যবহার পেয়ে দুঃখে-ক্ষোভে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে গেলেন তাও আর আজ অজানা নেই। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হবার পরই তাঁকে এদেশে আনার জন্য টানাটানি শুরু হল। দেশের বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী পণ্ডিতরা যে যোগ্য মর্যাদা পাননি, তাঁদের মতামতের যে মূল্য তা দেওয়া হয়নি এদেশে এতকাল ধরে, তাও কি বহু-দলীয় গণতন্ত্রের জন্য? দেশের এই সীমাহীন দারিদ্র্য, ভূমি-সংস্কারের অভাব, কৃষির অবিশ্বাস্য পশ্চাৎপদতা—তাও কি 'বহু-দলীয় গণতন্ত্রের' জন্য?

মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে এত বক্তৃতা, এত তীব্র সমালোচনা—এত সমাজতন্ত্রের কচকচি হওয়া সত্ত্বেও দেশের মোট কৃষি-ঋণের শতকরা দশ ভাগের বেশী 'সমবায় সমিতি'গুলি থেকে চাষীর কাছে আসে না। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা দেশে না এলে 'রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা' আসতে পারে? অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রশ্নটিকে উপেক্ষা করে তথাকথিত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য এক-পার্টি শাসন চালু করার অর্থ দেশে বিশেষ শ্রেণী ও গোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রাধান্য চাপিয়ে রাখার নামে একনায়কতন্ত্র চাপিয়ে দেওয়া। সব চেয়ে দুঃখজনক লোকসভার অধ্যক্ষের মুখ দিয়ে এই ধরনের বক্তব্য প্রচার হওয়াটা। তিনিও কি অত্যন্ত মেঠোভাবে অত্যন্ত জটিল তত্ত্বকে বিনা বিশ্লেষণে কোনরকম তথ্য না পেশ করেই তাঁর প্রস্তাবটি প্রচার করলেন না? তিনি কি 'বিশেষজ্ঞদের' মত কথা বলেছেন? যে 'অতি সাধারণ' সদস্যদের 'পরম বিজ্ঞের' ন্যায় কথাবার্তা বলা তাঁকে অধ্যক্ষরূপে 'পীড়া' দিয়ে থাকে—তাঁর এই মেঠো বক্তৃতার সারমর্মও দেশের বুদ্ধিজীবীদের পীড়া দেবে নিঃসন্দেহে। ধীলন বলেছেন লোকসভায়:

"...He made no such remarks advocating a one-party system of Government in India. Mr. Dhillon said at Rotary Club he had inter alia pointed out that various countries had accepted the one-party system as in the Soviet Union; one good thing was the emphasis on specialization and the system of entrusting measures to Committees for full examination..." [Statesman, November 13, '74]

তিনি চীন দেশের নাম করলেন না কেন বোঝা গেল না—কেননা সে দেশেও তো এক-পার্টি শাসনব্যবস্থা চালু রয়েছে। সে দেশের জনসংখ্যা ভারতের চেয়ে অনেক বেশী। সে দেশ গত ২৫ বছরে প্রভূত উন্নতি করেছে। প্রবল পরাক্রান্ত রুশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রূকুটির কাছে আত্মসমর্পন করেনি। স্তালিন হিটলার নিজ নিজ দেশের অবিশ্বাস্য বৈষয়িক উন্নতির কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। সে সব দেশে আইন-শৃঙ্খলা অক্ষুন্ন ছিল। জার্মানীতেও অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে অভাবনীয় বৈষয়িক উন্নতি সাধিত হয়েছিল—এক-পার্টি নাৎসী শাসনব্যবস্থায়। কুয়োমিন্‌টাঙ দল শাসিত ফরমোজা দ্বীপের এক-নায়কতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা কি বৈষয়িক উন্নয়নের কৃতিত্ব দাবী করতে পারে না? সমস্যার অতি-সরলীকরণ (over simplification) একটা বড় অবৈজ্ঞানিক বিচ্যুতি, একটা মারাত্মক ব্যাধিও। অধ্যক্ষ ধীলন একটি জটিল অর্থনৈতিক সমস্যাকে একপেশে দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে অতি-সরলীকরণের মারাত্মক ভুলটিই করে ফেলেছেন। ব্রিটিশ, ফরাসী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'বহু-দলীয় গণতন্ত্রে' নির্বাচন-ভিত্তিক সংসদগুলিতে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে গঠিত কমিটি দ্বারা বিভিন্ন সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণের ব্যবস্থা আছে।

এক-পার্টি শাসনের অনুরাগীরা কি জানেন না সোভিয়েট রাশিয়ায় বিজ্ঞানীরা বিশেষজ্ঞরা যদি সরকারের দাস্যবৃত্তি না করেন তাহলে নাগরিক হিসাবে তাঁদের কি পরিণতি হয়? রাশিয়ার বিখ্যাত অর্থনৈতিক পরিকল্পক সোভিয়েট রাশিয়ায় সর্বোচ্চ যোজনা পর্ষদের সভাপতি ভজনেসন্‌স্কীকে স্তালিন কিভাবে হত্যা করেছিলেন পরিকল্পনা বিশারদ হিসাবে তাঁর সুচিন্তিত মতামতের জন্য? দৃষ্টান্ত একটার পর একটা দেওয়া যায়। কমিউনিস্ট দেশগুলিতেও পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণের দাবী ক্রমশই সোচ্চার হচ্ছে।

বিজ্ঞানী বা বিশেষজ্ঞরা যতক্ষণ পার্টি ব্যুরোক্র্যাটদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবেন ততক্ষণই এক-পার্টি ব্যবস্থায় তাঁদের কদর। বিজ্ঞানকে মুখ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের কাজে তাল দিয়ে যেতে হবে।

বিজ্ঞানের এই রাজনীতিকরণ (politicalisation of science) বিজ্ঞানের অবমাননাই ঘটিয়ে থাকে। রাশিয়ায় ও কমিউনিস্ট দুনিয়ায় স্টালিন-যুগে 'Lysenko Biology'-কে কেন্দ্র করে যে-বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল এবং বিজ্ঞানের অবমাননা ঘটেছিল সেটা রাজনীতির অন্দরমহলের ছাত্ররা জানেন। পুঁজিবাদী দেশে, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, বিজ্ঞানীদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সাধনের কাজে যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে এবং হয়ে থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানকে পুঁজিবাদী দেশে 'রাষ্ট্রীয় মতবাদের' অন্যতম বাহন করা হয়নি। ব্রেজনেভকে লেখা বিশ্ব-বিখ্যাত রুশ পদার্থবিজ্ঞানী শাখারভের চিঠির কথা কি ধীলন জানেন না? এক-পার্টি শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুশ বিজ্ঞানীর মন্তব্য তিনি পড়ে দেখতে পারেন।

অধ্যক্ষ শ্রীধীলন যখন বলেছেন এক-পার্টি শাসনব্যবস্থা এ দেশে প্রবর্তনের পক্ষে তিনি বলেননি—আমি সেটা ধরেই নেব সত্য বলে। তবে প্রশ্ন থেকেই যায়। দেশে যখন 'গণতন্ত্র রক্ষার' জন্য এত গলাবাজি হচ্ছে আর সেই গণতন্ত্রকে সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ নাকি 'ধ্বংস' করতে উদ্যত বলে প্রতিনিয়ত একটি বিশেষ শিবির থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চিৎকার করা হচ্ছে, (অধ্যক্ষ ধীলনও সেই ঐকতানে কণ্ঠ মিলিয়েছেন) তাঁর দুর্নীতি-মূল্যবৃদ্ধি-দারিদ্র্য-অনাচারের প্রতিকার সাধন, নির্বাচনী আইনের আমূল সংস্কার ও বিধানসভা বাতিলের জন্য দীর্ঘমেয়াদী জন-আন্দোলনকে যখন 'ফ্যাসিবাদের সহায়ক' বলা হচ্ছে—তখন ধীলন হঠাৎ রোটারী ক্লাবে রাশিয়ার এক-পার্টি শাসনব্যবস্থার কথা শোনাতে গেলেন কেন?

গণতন্ত্র কেন এদেশে দানা বাঁধছে না, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশের দ্রুত অর্থ-নৈতিক উন্নয়ন সাধনে বাধা কি, কিভাবে সেই সব বাধা দূর করা যায়, গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হলে শাসক দল ও বিরোধী দলগুলির কি আচরণ হওয়া উচিত, দেশের এই সীমাহীন দারিদ্র্য বেকারী দূর করতে ২৫ বছরের একটানা চরম ব্যর্থতা, গণতন্ত্র রক্ষায় বিধানসভার অধ্যক্ষদের কি ভূমিকা হওয়া উচিত, দল ভাঙা-ভাঙির রাজনীতি রোধ করার জন্য সক্রিয় কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত,

নির্বাচনে যোগ্যতা-সম্পন্ন জ্ঞানী-গুণী বিশেষজ্ঞরা কিভাবে নির্বাচিত হয়ে আসতে পারেন, রাজ্যপালদের সংবিধানে সত্যিকারের কি ভূমিকা হওয়া উচিত গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্য, ১৯৬৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালরা প্রকৃত 'সাংবিধানিক রাজ্যপালের' ভূমিকা নিয়েছিলেন কিনা ইত্যাদি বহু বিষয়ে তো আলোচনা, মত প্রকাশের সুযোগ ছিল। সব ছেড়ে হঠাৎ এক-পার্টি শাসনের সুফলের প্রশ্নটা অগ্রাধিকার পেল কি করে অধ্যক্ষ মহাশয়ের মনে?

কোন দেশে যখন শাসক শ্রেণী অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে ব্যর্থ হন, প্রশাসন যখন পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে, দেশের নেতৃত্ব যখন হোঁচট খেতে খেতে একটা সঙ্কট থেকে আর একটা সঙ্কটের মধ্যে গিয়ে পড়ে, শাসক শ্রেণী যখন নীতিহীন সুবিধাবাদী স্বেচ্ছাচারী রাজনীতির অনিবার্য ফলশ্রুতিস্বরূপ দারুণ আত্ম-সংঘাতে লিপ্ত হয়, দারিদ্র্য বেকারী দুর্নীতি প্রশাসনিক ব্যর্থতা বিশৃঙ্খলতা যখন শাসক শ্রেণীর মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে তখনই কাল্পনিক অথবা কোন প্রকৃত বহিঃশত্রুকে বড় করে দেখান হয় নিজেদের সংহতির সহায়ক হিসাবে এবং আরও ক্ষমতা করায়ত্ত করার অগণতান্ত্রিক প্রবণতা প্রকট হয়ে ওঠে। দেশে দেশে কোন তন্ত্র-মন্ত্রের দোহাই না পেরে—অপরিসীম ক্ষমতা অন্যায়ভাবে কুক্ষিগত করেছেন কেউ, কেউ বা ব্যাপারটিকে সহনীয় ও ভব্যভাবে উপস্থিত করার জন্য মতবাদের দোহাই পেরেছেন।

আমাদের দেশে পরিষদীয় বা আধা-পরিষদীয় গণতন্ত্র সফলতার গৌরব অর্জন করেনি ঠিকই। তার কারণও অনেক। দেশের সর্বোচ্চ আইনসভা লোকসভাকে পাশ কাটিয়ে ভারত সরকার গুরুত্বপূর্ণ বহু সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন একটার পর একটা। দেশের বৃহৎ সংবাদপত্র গোষ্ঠী শাসক শ্রেণীর তল্পিবাহকের ভূমিকা নিয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। সরকারের ভ্রূকুটির কাছে সংবাদপত্রের মালিক শ্রেণী নতজানু হয়েছে বার বার। সাহসের সঙ্গে সত্য কথা বলতে, 'কোদাল কে কোদাল বলতে' তাঁরা পারেননি।

মার্কসবাদী দলগুলি প্রকাশ্যেই পরিষদীয় গণতন্ত্রকে, নির্বাচনকে নিছক 'বুর্জোয়া শ্রেণীর বুজরুকি' বলে ব্যঙ্গ করতে দ্বিধা করেনি। অথচ নিষ্ঠা সততার পরিচয় দিয়ে পরিষদীয় গণতন্ত্রকে পরিহারও করেনি। এ্যাসিড-বাল্ব-বিপ্লব থেকে ব্যালট-বিপ্লবে বিশ্বাসী হয়ে উঠতেও তো দ্বিধা হয়নি? নির্বাচনে অংশ-

গ্রহণ করে পরিষদীয়-রাজনীতির-খেলা চতুরতার সঙ্গে খেলাকে 'লেনিনবাদী কৌশল' বলেই তাঁরা মনে করেছেন। ক্যাডারদেরও শিখিয়েছেন সেটা বিশ্বাস করতে। সাংবিধানিক গণতন্ত্রে তাঁদের কোন শ্রদ্ধা নেই একথা অসতর্ক মুহূর্তে তাঁদের নেতারা বলেও ফেলেছেন বহুবার। লেনিন পার্লামেণ্টকে 'শুয়োরের খোঁয়ার' (Parliament is a piggery) ব'লছিলেন। সেই পার্লামেণ্টের খোঁয়ারে ঢুকবার জন্যে কেনই বা এত ছটফটানি তাহলে? সরাসরি ক্ষমতা দখলের জন্য বিপ্লবের পথে পা বাড়াতে বিপ্লবী মার্কসবাদী দলগুলি কেন পারেনি?

একটি বামপন্থী শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দল পরিষদীয় দলের রাজনীতির মধ্যে দিয়ে তার 'বিপ্লবী' চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে কি পারে না? বিপ্লবী দল হিসাবে বিপ্লবের পথেও পা বাড়াব না—আবার নির্বাচনে অংশ নিয়ে পরিষদে নির্বাচিত দল হিসাবে আন্তরিকতার সঙ্গে বলিষ্ঠ কল্যাণধর্মী আইন প্রণয়ন করে দেশের মৌল সমস্যার সমাধানেও আগ্রহী হব না। এই 'না ঘরকা না ঘাটকা' বন্ধ্যা নীতি ভারতের মার্কসবাদী বামপন্থীরা অনুসরণ করে আসছেন ১৯৫১ সাল থেকে। এই টানা-পোড়েনের মধ্যে পড়ে মার্কসবাদী শিবিরের অনুগামীরা সঙ্কটের সম্মুখীন হলেন। বিপ্লবের পথে পা বাড়াবার কথা বললে দলের পরিষদীয় শাখা—যেটা আসলে সমগ্র পার্টিকে নিয়ন্ত্রত করে থাকে—তাকে 'বোকামী'—'এ্যাডভেনচারিজম্' বলে নিরুৎসাহিত করবে, আবার দলের নেতৃত্বের 'বিপ্লবী চেহারা' তুলে ধরার জন্য 'শোধনবাদের' বিরুদ্ধে একটানা নিন্দা করা হবে। এতে তথাকথিত বাম শিবির না বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন না বিপ্লবী ত্যাগী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন না সৃষ্টি করেছেন গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব।

আবার জাতীয়তাবাদী দলগুলি বিপ্লবের নামে আঁৎকে উঠে থাকেন। বিপ্লবকে তারা রাষ্ট্র-বিরোধীতার সমতুল্য মনে করে থাকেন। 'অসমাপ্ত' 'জাতীয় বিপ্লবকে' সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁরা ভুলে গেছেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী বিপ্লববাদীদের ঐতিহ্য—নেতাজী-ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়ে রইলেন এঁরা। ফলে বিপ্লবীয়ানার একচেটিয়া অধিকার বাম দলগুলির হাতে স্বেচ্ছায় তুলে দিয়েছেন। বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাসী মানুষ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য চেয়ে থেকেছেন শুধুমাত্র মার্কসবাদী দলগুলির দিকে। তাঁরা গণতন্ত্রকে

নিছক নির্বাচন ও ভোট-সর্বস্ব বলে ধরে নিয়েছেন। ভোটে সংসদ বা বিধানসভাগুলিতে নির্বাচিত হয়ে যেতে পারলেই, তাঁদের বক্তৃতা বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রচারিত হলেই তাঁরা মনে করেছেন 'গণতন্ত্র' কায়েম হয়েছে। 'রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে' 'অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের' মধ্যে মেলাবার জন্য যে সর্বাত্মক নিরলস প্রয়াস ও সংগ্রাম একান্ত প্রয়োজন তা এই জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দলগুলি ভেবে দেখেনি। এই চরম রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার জন্য জনমানসে এই সব দল জনগণের 'পরিত্রাতারূপে' শিকড় গাড়তে পারছে না। সাধারণ মানুষ দল-ব্যবস্থার প্রতি যেন আস্থা হারিয়ে ফেলছে। বিহারের সাম্প্রতিক ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ত দীর্ঘমেয়াদী গণ-আন্দোলনের মধ্যে সেই মানসিকতা যেন প্রকাশ পাচ্ছে। দলীয় নেতৃত্ববিহীন এত ব্যাপক এবং দীর্ঘস্থায়ী গণ-আন্দোলন ভারতবর্ষে অতীতে আর হয়নি। যে-জাতীয় বিপ্লবের পুরোধা ছিল জাতীয় কংগ্রেস, ১৯৪৭ সালে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আপোষে খণ্ডিত দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পর সেই দল বিপ্লবের দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকল—বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্যের বিশ্বাসঘাতকতা করল।

অধ্যক্ষ ধীলন তাঁর নামে যে সংবাদ বিবরণী প্রচারিত হয়েছে তা অসত্য বলতে গিয়ে বলেছেন :

"I think I have a right to speak as I feel at my house or at my club".

"বাড়িতে বা ক্লাবঘরে বসে স্বাধীনভাবে কথা বলার বা স্বাধীনভাবে চিন্তার অধিকার নিশ্চয় আমার আছে" কিন্তু তিনি ভেবে দেখলেন না এক-পার্টি শাসিত রাষ্ট্রে কোন নাগরিকের 'স্বাধীনভাবে' 'ইচ্ছামত' ঘরে বা ক্লাবে কথা বলার ও চিন্তা করার অধিকার থাকে না। আর স্বাধীনভাবে ক্লাবঘরে বা নিজের বাড়িতে বসে কথা বললে চিন্তা করলেও কিছু আসে যায় না—যদি না তা প্রকাশ হয়ে পড়ে অন্য লোকের কথাবার্তায় এবং পত্র-পত্রিকা মাধ্যমে। রাশিয়া বা চীন অথবা আফ্রিকার যে দেশগুলির সপ্রশংস উল্লেখ শ্রীধীলন করেছেন সেই দেশগুলির নাগরিক হিসাবে স্বাধীনভাবে তিনি বলতে পারতেন 'দেশে বহু-দলীয় শাসনব্যবস্থা চালু করা দরকার?' কখনই নয়। আর রোটারী ক্লাবকে তাঁর 'নিজের ক্লাব' মনে করার কি কারণ ঘটল? 'স্বাধীন চিন্তা' নিছক সিগারেটের

ধোঁয়া ছাড়া নয়। যিনি 'স্বাধীনভাবে' চিন্তা করার অধিকার দাবী করেন তিনি তাঁর চিন্তার পক্ষে যুক্তি-তথ্য পেশ করেন। তাঁর চিন্তার পক্ষে মতামত সংগঠিত করেন। ধীলনজী যখন কয়েকটি দেশের এক-পার্টি শাসনব্যবস্থায় সুফলের কথা বললেন তখন তাঁর পক্ষে যে যুক্তিগুলি তাঁর মনকে আকৃষ্ট করেছে সেগুলি 'বিশেষজ্ঞের' মত কেন দেশবাসীর কাছে সাহসের সঙ্গে পেশ করলেন না? কিসের ভয়ে? অধ্যক্ষের আসন হারাবার ভয়! প্রতিষ্ঠিত সুযোগ-সুবিধা হারাবার আশঙ্কা? দেশে বহু-দলীয় গণতন্ত্র থাকবে, না এক-পার্টি শাসন প্রবর্তিত হবে—এই বিষয়ে প্রাণবন্ত রাজনৈতিক বিতর্কের প্রয়োজনীয়তা আছে। আর গণতন্ত্রেই সেটা সম্ভব। ধীলন প্রশ্নটা তুলে আলোচনাটা চাপা দেবার চেষ্টা করলেন কেন? এটা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী স্বাধীনচেতা স্পষ্টবক্তা সংসদ অধ্যক্ষের মত আচরণ হল কি?

একথা সত্যি রাজনৈতিক অস্থিরতা গণতন্ত্রের সহায়ক হয় না। তাই বহু-দলীয় অরাজকতা (multi-party chaos) গণতন্ত্রের ক্ষতিসাধন করে। কেননা মূলত এই অরাজকতা দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ব্যাহত করে থাকে। কিন্তু রাজনীতিতে বহু-দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে অরাজকতা যুক্ত নয়। এক-পার্টি শাসনব্যবস্থাতেও অরাজকতা আসতে পারে। তাই দুটোর মধ্যে কোন কার্যকারণ (cause and effect) সম্পর্ক নেই। ভারতের মত একটি বিশাল দেশে ১০।১২টি পার্টির অবস্থান গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্রের সহায়ক না হলেও বহু-দলীয় অরাজকতা আনেনি। দল ভাঙাভাঙির রাজনীতি এদেশের অন্যতম অভিশাপ। এই দল ভাঙাভাঙি বন্ধ হলে রাজ্যে রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর হবে। রাজ্যপালদের ভূমিকাও অস্থিরতা সৃষ্টিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। কার ইঙ্গিতে বা অঙ্গুলি-হেলনে রাজ্যপালরা ১৯৬৭ থেকে এ পর্যন্ত অনুরূপ পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করেছেন? তার পেছনে কি যুক্তি ছিল?

যে কারণে এক রাজ্যে বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হচ্ছে রাজ্যপালের পরামর্শে, ঠিক সেই কারণে আর একটি রাজ্যে বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার পরামর্শ না দিয়ে অপর এক গোষ্ঠীকে মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। অমনি সুরু হয় দল ভাঙাভাঙির খেলা।

বিহার রাজ্যে গফুর মন্ত্রিসভা এবং বিধানসভাকে জিইয়ে রাখার পেছনে

জিদ থাকতে পারে, কিন্তু যুক্তি কি আছে? জনগণের বৃহত্তম অংশ যে গফুর মন্ত্রিসভার পেছনে নেই তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বিধানসভা চালু থেকেও, সাংবিধানিক তথাকথিত মন্ত্রিসভা থেকেও গত কয়েক মাসে সে রাজ্যে ১৭০টি অর্ডিন্যান্স জারী হয়েছে। বিধানসভাকে জনমতকে পাশ কাটিয়েই তো গফুর মন্ত্রিসভা রাজ্য শাসন করছেন। এটা কোন্ ধরনের গণতন্ত্র? নতুন করে জনতার রায় যাচাই করতে অসুবিধা কোথায়? কংগ্রেস মন্ত্রিসভা এখানে পদত্যাগ করে নির্বাচন দাবী করলে দলের মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেত দেশবাসীর চোখে। দেশবাসী গফুরের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সাহসিকতার তারিফ করতেন। শেষ পর্যন্ত গফুরকে সরে দাঁড়াতে হল বহু জল ঘোলা করে। কিন্তু তাও দলীয় আভ্যন্তরীণ কোন্দলের পরিণতি স্বরূপ, কোন গণতান্ত্রিক নজির হিসাবে নয়। গফুরের জায়গায় কেন্দ্রের মনোমত একজনকে যখন পাওয়া গেল তখন কংগ্রেস কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গফুরকে সরে আসতে পরামর্শ দিলেন।

ভারতে সত্যি সত্যি সর্বভারতীয় দল আজ কটি? (১) জাতীয় কংগ্রেস (২) সংগঠন কংগ্রেস (৩) ভারতীয় লোকদল (৪) মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টি (৫) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (৬) জনসংঘ (৭) সোস্যালিস্ট পার্টি।

এর মধ্যে জাতীয় কংগ্রেস ছাড়া সারা ভারতে সকল রাজ্যে নির্বাচনে দাঁড়াবার মত শক্তি ও অর্থ অন্য কোন্ দলের আছে? মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গ কেরালা ছাড়া অন্য কোথায় শক্তিশালী? কিছু জায়গায় তাদের সমর্থন ছড়িয়ে আছে সত্যি কিন্তু চাপ সৃষ্টি করার মত শক্তি কোথায় সেই সব জায়গায়? সি. পি আই.-এর কি সেই শক্তি আছে? জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থন ছাড়া কি এই দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাতে পারে? একই অবস্থা সোস্যালিস্ট পার্টি ও জনসংঘের। সোস্যালিস্টরা ভারতের সকল রাজ্যেই ছড়িয়ে আছেন। একদিন ছিল যখন সারা ভারতে শক্তিতে তাদের স্থান ছিল কংগ্রেস দলের পরই। জনসংঘ একটি সুশৃঙ্খল ক্যাডার-ভিত্তিক সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী দল। এক-একটি রাজ্যে আবার অনেক ছোট ছোট দলও আছে। নির্বাচনে বহু-দলীয় যুক্তফ্রণ্ট হতে পারে আসন ভাগা-ভাগির ভিত্তিতে, আদর্শের ভিত্তিতে নয়—অতীতে বিভিন্ন রাজ্যে যেমন হয়েছে।

এই ধরনের যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা ও বিপদ প্রমাণিত হয়ে গেছে। এই ধরনের সুবিধাবাদী, ভোটে-জিতবার-তাগিদে গঠিত নেতিবাচক ফ্রন্ট প্রগতি, উন্নতি ও স্থিতিশীলতার সহায়ক হয় না। কিন্তু দলগুলির অস্তিত্ব কখনই গণতন্ত্রের পথে বিপজ্জনক নয়, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ও পরিপন্থী নয়। ছোট ছোট দল বাঁচিয়ে রাখার কোনই যৌক্তিকতা নেই, কেননা সে-রাজনীতির কার্যকারিতা যাচাই করার উপায় নেই। তবে নির্বাচনে দাঁড়াতেই হবে এমন তো কোন কথা নেই। একটা পার্টি ভোট পরিহার করে তার আদর্শ ও কর্মসূচী প্রচার করতে পারে। সে ক্ষেত্রে তার অস্তিত্ব বহু-দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার সহায়ক হয়েও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ কখনই হয়ে দাঁড়ায় না। ইংলণ্ডের 'ফেবিয়ান সোসাইটির' মত আদর্শ প্রচারের দল নিশ্চয়ই থাকা উচিত দেশে দেশে। সবাই পার্লামেণ্ট বিধানসভার সভ্য হতে চান না। বেশীর ভাগ মানুষই দেশের সার্থক নাগরিক হয়ে পূর্ণ মর্যাদা নিরাপত্তা নিজ নিজ মত নিয়ে বাঁচতে চান। ভোটবাদী দলের রাজনীতির আকর্ষণ তাঁদের কাছে নেই ততটা।

এদেশে ছোট ছোট দল গুটিয়ে বৃহৎ দলে সম্মিলিত হবার চেষ্টা চলেছে। সেই সঙ্গে ভাঙাগড়ার খেলাও চলেছে। কয়েকটি অকমিউনিস্ট দলের মিলনে উদ্ভূত ভারতীয় লোকদল একটি সাহসী পদক্ষেপ স্থিতিশীল রাজনীতির ও অর্থনীতির স্বার্থেই। তবে নিছক কর্মসূচী-ভিত্তিক দল বেশীদূর এগুতে পারে না, যদি না তার নীচে আদর্শ নীতির ভিত্তি থাকে। সোস্যালিস্ট পার্টিও বহুবার বহুভাবে বিভক্ত হয়ে শেষে আবার গোঁড়ামি ত্যাগ করে মিলিত হয়েছে। এটিও একটি সুস্থ নজীর নিঃসন্দেহে। গণতন্ত্রের সহায়ক এই ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়াসগুলি। একটি শক্তিশালী সর্বভারতীয় গণতান্ত্রিক দলই কেন্দ্রীয় সরকারের হাল শক্তহাতে ধরতে পারে এবং সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীকে দৃঢ়তার সঙ্গে রূপায়িত করতে পারে। জয়প্রকাশজীর স্বপ্ন রূপ নিতে চলেছে।

দেশের মার্কসবাদী শক্তি বহু দলে আজও বিভক্ত। খোদ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে নূতন করে মত-পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমবাংলাতেই দলের ৩,৪০০ কর্মীকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। একথা এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই দলের বরখাস্ত সদস্য শ্রীপীযূষ দাশগুপ্ত স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন:

"আজ আর তাঁরা নিঃসঙ্গ নন। পার্টির রাজ্য-নেতৃত্ব গত এক বছরে শুধু কলকাতায় অন্ততঃ একহাজার পার্টি সদস্যকে চুপিসারে বাদ দিয়েছেন। সারা রাজ্যে নাম-কাটা সদস্যের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন হাজার। তাছাড়া আরও প্রায় এক হাজার পার্টি সদস্য নিজেরাই সরে যেতে বাধ্য হয়েছেন।·

রাজ্য নেতৃত্ব আজ কায়েমী স্বার্থে আবদ্ধ। তাই তাঁরা পার্টি কর্মসূচীর অপব্যাখ্যা এবং অপপ্রয়োগ করেছেন। এই বিচ্যুতির যাঁরাই প্রতিবাদ করেছিলেন হয় তাঁদের কারো নাম সদস্য তালিকা থেকে কেটে দেওয়া হয়, কারো কারো সামনে সরে যাওয়া ছাড়া পথ ছিল না।

·· ·· দেখা যাচ্ছে পার্টির মধ্যে থেকে নীতির লড়াই চালাবার সুযোগ প্রায় নেই। বাইরে থেকে তাঁরা সে লড়াই চালানর জন্য 'ভারতের লেনিনকেন্দ্র' গড়েছেন। এই কেন্দ্র চীন বা রাশিয়ায় কারো গোঁড়া সমর্থক নয়।··· "
[যুগান্তর পত্রিকা, ৮ই নভেম্বর, ১৯৫৪, পৃষ্ঠা ১]

শ্রীদাশগুপ্ত মার্কসবাদীদের অনৈক্যকে ভারতের গণমুক্তি আন্দোলনের দুর্বলতা ও দেশের দুর্দশার জন্য দায়ী করেছেন। এই ধরনের অভিযোগ অন্যান্য মার্কসবাদী দলগুলিও করে আসছে। 'সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেণ্টার' (SUCI) মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দলের সমালোচনা প্রায়ই করে থাকেন তাদের 'বিভেদ-পন্থী' নীতি এবং মার্কসীয় বা বামপন্থী দৃষ্টি-ভঙ্গীর অভাবের জন্য। কিন্তু কেন এ দেশের সকল মার্কসবাদীরা এক হতে পারছেন না? একই আদর্শে বিশ্বাসী হয়েও তাঁরা একই পতাকার নীচে ঐক্যবদ্ধ হতে পারছেন না। আবার একই দলের মধ্যেও মতপার্থক্য থাকা সত্বেও তা প্রকাশ করার কোন সুযোগ কোন মার্কসবাদী দলেই নেই। অথচ কোন মার্কসবাদী দলে কোন 'গ্রুপ' 'ফ্যাকশন' 'গোষ্ঠী' 'উপদল' থাকতে দেওয়া হয় না।

যেমন ধরা যাক এস. ইউ. সি.র কথা। এই দল নিঃসন্দেহে একটি ক্যাডার-ভিত্তিক সুশৃঙ্খল মার্কসবাদী দল। বাম-জোটের ভিতরে থেকে বৃহত্তম মার্কসবাদী দল সি. পি. এম. সম্বন্ধে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে নিজ দলের দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য সাহসের সঙ্গে তুলে ধরে থাকে এই দল। সেটা সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু যে যুক্তিতে এই দল 'বামজোটের' মধ্যে নিজের ভিন্ন মত স্বাধীনভাবে প্রকাশের অধিকারে প্রতিবাদ করে, লড়াই করে, ঠিক সেইভাবে একই যুক্তিতে নিজের দলের সভ্যদেরও সেই 'স্বাধীনতা' মেনে নেওয়া উচিত। মার্কসবাদী

দলগুলিতে যাঁরা 'শাসক' সেই রাজন্যবর্গের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কথা বলতেই হবে দলে টিকে থাকতে হলে। নচেৎ heresy-র অপরাধে শাস্তি নিতে হবে। পীযূষবাবুদের মত দীর্ঘদিনের মার্কসবাদীদের কপালে তাই জুটল। 'Consciously understood convictions' অনুযায়ী কাজ করার, কথা বলার সুযোগ নেই। নীতির লড়াই চালাবার সুযোগ নেই। ধীলন ও তাঁর অনুগামীরা—যাঁদের হয়ে তিনি কথা বলেছিলেন শিলং-এর রোটারী ক্লাবের ভাষণে—এদেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় একজন ব্যক্তির এই তিক্ত হৃদয়-বিদারক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কি বলবেন? এক-পার্টি শাসনব্যবস্থার পরিণতি তো এই।

সংবিধানে একটি দলকে স্বীকৃতি দেবার অর্থ শাসক দলকেই এই স্বীকৃতি দেওয়া। একচেটিয়া রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধিকারী হবে কেবলমাত্র সেই দলই। রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের যে দেশগুলির কথা ধীলন বলেছেন সেই সব দেশে কমিউনিস্ট পার্টিই (মস্কো অনুগত) এই রাজনৈতিক 'মনোপলির' ছাড়পত্র পেয়েছে। আফ্রিকা পশ্চিম এশিয়ার কয়েকটি রাষ্ট্রে এই অধিকার পেয়েছে এক-একটি অকমিউনিস্ট দল সামরিক বাহিনীর সহায়তায়।

মার্কসবাদীরা যতদিন সারা ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করতে না পারবেন ততদিন তাঁরা গণতন্ত্রের তত্ত্ব-কথা উচ্চারণ করবেন। কেননা এ পরিস্থিতিতে এই এক-পার্টি শাসনব্যবস্থার কথা কমিউনিস্ট পরিভাষায় সাজিয়ে গুছিয়ে বললে পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণ তাঁদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। নিজেদের থিওরীর জাঁতাকলে নিজেরাই পিষ্ট হবেন। তাছাড়া ভোটযুদ্ধ সামনে। জনগণ যে কোন এক-পার্টি শাসনকে একনায়কতন্ত্রের ছাড়পত্র বলেই মেনে নেবেন। সেখানে জনগণও তাঁদের বর্জন করবেন সে ভয়ও রয়েছে। হিটলারও এক-পার্টি শাসন কায়েম করেছিলেন গণতান্ত্রিক 'হ্বাইমার সংবিধানের' মধ্যে দিয়ে। বৃদ্ধ প্রেসিডেন্ট হিনডেনবুর্গকে ধোঁকা দিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে রেখে দিয়ে প্রতারণার দ্বারা হিটলার জার্মানীর 'চ্যানসেলার' হয়েছিলেন ইতিহাসের ছাত্ররা জানেন।

একপার্টি-শাসিত কমিউনিস্ট দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি সামরিক বাহিনীর সাহায্যে ভয় সন্ত্রাসের পরিবেশ রেখে পুলিশের সাহায্যে নিজেদের জবরদস্তি শাসন চালিয়ে থাকে। কিন্তু সামরিক বাহিনীর নেতাদের সঙ্গে

বেসামরিক পার্টি নেতাদের মত-পার্থক্য দেখা দিতে পারে। কমিউনিস্ট পার্টিকে সামারক বাহিনীর ওপর নির্ভর করতে হয় সব চেয়ে বেশী। সেজন্ত আবার ভয়ও নেতৃত্বকে ছায়ার মত অনুসরণ করে। চীন দেশে কিছুকাল থেকে দুই পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সুরু হয়েছে। চীনা কমিউনিস্ট দলের সরকারী মুখপত্র 'People's Daily' পত্রিকায় চীনের সামরিক বাহিনীকে নিঃসর্তে পার্টির নেতৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্ত মারাত্মক হুঁশিয়ারী শোনান হয়েছে। বলা হয়েছে :

"We absolutely must not permit the Army to become instrument in the hands of careerists.

In a warning of unprecedented severity the 'People's Daily' to-day called on the Chinese Army to submit unconditionally to the authority of the Party". [Statesman ; November 14, 1974]

'People's Daily' পত্রিকায় পুনরায় 'ঐক্যের' আহ্বান জানান হয়েছে। 'ঐক্য' কাদের ? সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব এবং পার্টি 'শ্রেণী সচেতন' মার্কসবাদী মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টি-নেতৃত্বের ঐক্য। এর দ্বারা কি সন্দেহাতীত ভাবে দুই ভিন্ন স্বার্থের গাঁটছড়া বাঁধার কথাটা কি প্রমাণিত হল না (Interlocking of interests of civil and military authority) ?

ধীলন-পন্থীরা এই দিকটা মনে রাখলে ভাল করবেন। এক-পার্টি শাসন-ব্যবস্থার দিকে পা বাড়াতে গেলে এই ধরনের গাঁটছড়া এদেশের নেতাদেরও বাঁধতে হবে। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার নামে দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সামরিকীকরণ (militarization) সম্পূর্ণ হবে তখন। দেশের জনসাধারণকে পোশ মানিয়ে রাখার জন্ত শুধু পুলিশ গোয়েন্দা বাহিনী দিয়ে হবে না, সেনাবাহিনী জনগণের বিভিন্ন চটকদারী স্লোগান, শোষণহীন শ্রেণীহীন সমাজের ঘুম-পাড়ানি বটিকা সেবন করে নেশাচ্ছন্ন হয়ে শাসক শ্রেণীর প্রতি অনুগত আছে কিনা তদারকির জন্ত অতন্দ্র প্রহরী হয়ে থাকবে। হীন কদর্য বশ্যতার মূল্য দিয়ে তথাকথিত শৃঙ্খলা ও সুশৃঙ্খল প্রগতি সুনিশ্চিত করতে হয়।

কমিউনিস্ট চীন দেশে যে নূতন দ্বন্দ্বের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সেটা কিন্তু

কমিউনিস্ট রাজনীতিতে আকস্মিকও নয়—নূতন তো নয়ই। রাশিয়ায় স্তালিন-যুগে স্তালিনের নির্দেশে সে দেশের বিখ্যাত লাল ফৌজের (Red Army) সেরা সেরা সেনানীদের বিপ্লবোত্তর কালের গৃহযুদ্ধে বীর বিজয়ী সেনাপতি ও সেনা-বাহিনীর অফিসারদের বিরুদ্ধে ১৯৩৭ সালের ১১ই জুন রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে কোতল করা হয়েছিল। হঠাৎ একদিন সে দেশের নাগরিকরা জানলেন এই সব কাল্পনিক অভিযোগের কথা। যেদিন বিচারের জন্য তাঁদের হাজির করা হয়েছিল তার পরদিনই মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হল—গুলি করে হত্যা করা হল। যাঁরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন : মার্শাল টুখাচেভস্কী (ডেপুটি পিপ্‌লস্ কমিশর অব ডিফেন্স), কম্যাণ্ডার ইয়াকির—কিয়েভ সামরিক জেলার অধিনায়ক, কম্যাণ্ডার উবোরেভিচ্, বাইলো রাশিয়ান সামরিক জেলার অধিনায়ক, কোর কম্যাণ্ডার ইডেম্যান, বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থার অধিকর্তা, কম্যাণ্ডার কর্ক—সামরিক এ্যাকাডেমীর প্রধান, কোর কম্যাণ্ডার পুটনা, কোর কম্যাণ্ডার ফেল্‌ডম্যান, লাল ফৌজ প্রশাসনের অধিকর্তা, কোর কম্যাণ্ডার প্রাইমাকভ, লেনিনগ্রাদ সামরিক জেলার ডেপুটি কম্যাণ্ডার, ইয়ান গ্যামারনিক, 'লাল ফৌজের' রাজনৈতিক প্রশাসনের প্রধান (ইনি ১লা জুন আত্মহত্যা করেন)। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল :

"The above named persons were accused of breach of military duty and oath of allegiance, treason to their country, treason against the peoples of the U. S. S. R. and treason against the workers' and peasants' Red Army"

অভিযোগের মর্ম : সামরিক কর্তব্য লঙ্ঘন, আনুগত্যের শপথভঙ্গ। দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, শ্রমিক-কৃষকদের লাল ফৌজের প্রতি বেইমানী। [লাল ফৌজ গড়ে তুলতে এঁদের অবদান ছিল অসামান্য।] [Great Terror : By Robert Conquest. P. 201 3]

লাল ফৌজ যখন গঠিত হয় তখন যে সব কমিউনিস্টরা সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়েছিলেন তাঁরা রাজনীতি চর্চা করতে পারতেন। ১৯২৮ সাল থেকে স্তালিনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পরই সামরিক বাহিনীর অফিসার ও সৈন্যদের রাজনীতিতে মাথা ঘামান নিষিদ্ধ হয়। ভয় ছিল পার্টি নেতাদের যে, সেনা বাহিনী একদিন ঘাড়ে চেপে বসতে পারে। এই সম্বন্ধে আইজ্যাক ডয়েটশারের

মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই প্রখ্যাত লেখক এবং মার্কসবাদী দর্শনের একজন বিশ্ব-স্বীকৃত পণ্ডিত লিখেছেন :

"The leaders of the Bolshevik Party had always had the precedents of the French Revolution in their minds and had given much thought to the idea that in Russia, too, a Bonaparte might one day 'climb to power on the back of the Revolution'. Both Stalin and Trotsky, for their bitter disagreements agreed on this, ard each (from his own angle) kept an anxious eye on the danger of the 'potential Bonaparte'. Stalin himself eventually donned the Generalissimo's uniform and acted as a half-phoney Bonaparte in order to keep out any authentic candidate to the role. He sent three most popular Marshalls of the pre-war period, Tukhachevsky, Bluecher and Yegorov to the their death. Then he relegated to obscurity the victorious Marshalls of the second world war and exiled Zhukov whose name became a legend among the Russian people…"

[Russia, China And The West 1953-1966 : P. 34, By Deutscher.]

রুশ-বিপ্লবের নেতাদের ভয় ছিল ফরাসী-বিপ্লবের পরবর্তী কালের মত বোনাপার্টের মত একজন বিপ্লবের কাঁধে চেপে ক্ষমতা দখল করে দেশের ঘাড়ে চড়ে বসতে পারে। স্তালিন ট্রট্স্কীর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মত-পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দুজনেই এই আশঙ্কা সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন। তবে দুজনের আপত্তি করার কারণ ভিন্ন ছিল। সম্ভাব্য 'বোনাপার্ট' সম্বন্ধে দুজনেরই সজাগ দৃষ্টি ছিল। অবশ্য পরে স্তালিন নিজেই 'সেনানায়কের' কোর্তা নিজের গায়ে চড়িয়ে নিয়ে নকল বোনাপার্টের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন—যাতে অন্য কোন সত্যিকারের 'বোনাপার্ট' এই আসনের দাবীদার হতে না পারেন। বিপ্লবোত্তর কালের তিনজন সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সেনাপতিকে তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিজয়ী সেনাপতিদের বিস্মৃতির অন্ধকারে নির্বাসিত

করেছিলেন স্তালিন। মার্শাল জুকভ্—যাঁর নাম লোকের মুখে মুখে উচ্চারিত হত—তাঁকে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জের কারণ মনে করে স্তালিন ওডেসাতে নির্বাসিত করেন।" [আইজ্যাক ডয়েটশার]

১৯৩৭ সালে সামরিক অফিসারদের 'পার্জ' সুরু হবার আগে দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে সামরিক বাহিনীর বিশারদরা স্থান পেতেন। ভরোশিলভ্ বুদেনী (Budenny) সব সময় স্তালিনকে সমর্থন করতেন। তাঁরা বলশেভিক নেতা বুখারীনের, যাঁকে লেনিন এক সময় তাঁর 'উত্তরাধিকারী' করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এবং যাঁকে তিনি 'darling of the Party' বলতেন—গ্রেপ্তারকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু অন্য অফিসাররা তা করেননি। 'লাল ফৌজ' ও নৌ-বহরের বিভিন্ন স্তরে ব্যাপক পার্জ সুরু হয়েছিল সে সময়। স্তালিনের ভয় ছিল 'সম্ভাব্য কোন বোনাপার্টের'। রুশ সেনাবাহিনীতে প্রথমে কমিউনিস্ট সদস্যরা যোগ দিয়েছিলেন। স্বভাবতই দলের আদর্শ সেনাবাহিনীতে প্রচারিত হত। স্তালিন এই ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন না। ক্রন্দস্তাদ্ নৌ-বিদ্রোহ তাঁর মত অনেক বলশেভিক নেতার চোখ খুলে দিয়েছিল।

প্রথম যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যৌথ-দায়িত্ব নীতি (Principle of shared responsibility)। সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক এবং পলিটিক্যাল কমিশার এক জোটে কাজ করতেন। স্তালিন ১৯৩৪ সালে এই ব্যবস্থা রদ করলেন। কম্যাণ্ডারকেই পূর্ণ দায়িত্ব দিলেন এবং পলিটিক্যাল কমিশারকে শুধু উপদেষ্টার ভূমিকায় রাখা হল। সামরিক নেতাদের সঙ্গে রাজনীতিবিদদের মেলামেশা তাঁর ভাল লাগছিল না। রাজনীতি বিশারদরা সামরিক নেতাদের সহযোগিতায় গণ্ডগোল বাধাতে পারেন আশঙ্কা ছিল। লাল ফৌজ গড়ার মূলে কিন্তু ছিল রাজনৈতিক আদর্শ। ক্রমে ক্রমে সেই রাজনীতি-সচেতনতা থেকে তাকে মুক্ত করার চেষ্টা চলতে থাকে, লাল ফৌজকে অন্যান্য অকমিউনিস্ট ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মত পুরোপুরি পেশাদারী সেনাবাহিনীতে রূপান্তরিত করা হল। চীন দেশেও তাই হয়েছে।

চীনের গণমুক্তি ফৌজকে (PLA) এখন রাজনীতি-মুক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। একদিন প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিন পিয়াও কি প্রচণ্ড প্রভাবই না বিস্তার করেছিলেন সমগ্র সেনাবাহিনীর ওপর। মাও সে-তুঙ-এর আশীর্বাদ সব সময়ই এঁর ওপর ছিল। হঠাৎ লিন পিয়াও 'প্রতিক্রিয়াশীল' 'ভাগ্যান্বেষী'

'সুবিধাবাদী' হয়ে গেলেন! তাঁকে হত্যা করা হল। তাই চীন দেশেও সামরিক বাহিনীর ওপর থেকে লিন পিয়াও, লিউ শাও চি-পন্থীদের প্রভাব দূর করার উত্তম চলছে। সমাজতান্ত্রিক এক-পার্টি রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ক্ষমতার আসনে থাকতে প্রয়োজন ষড়যন্ত্র, ব্ল্যাকমেইল, সন্ত্রাস ও বিভীষিকা-সৃষ্টি। 'উন্নতি' হবে 'প্রভূত উন্নতি' হবে—রাষ্ট্র শক্তিশালী, পরাক্রান্ত হবে, বিদেশীরা সমীহ করবে সে-দেশকে। রেডিও—সিনেমা—টেলিভিশনে দিবারাত্রি জাতির অগ্রগতি জয়যাত্রার মহাকাব্য শোনা যাবে।

স্তালিনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় সেনাপতিদের রাজনৈতিক প্রভাব মর্যাদা প্রভৃত বৃদ্ধি পেয়েছে। 'আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পুলিশের' মর্যাদা 'বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসের' পর ভেঙে চুরমার হয়েছে। তাদের বিশেষ স্তালিনী যুগের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। এই শূন্য স্থান পূর্ণ করেছে সে-দেশের সামরিক বাহিনী। দেশে হঠাৎ বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশী। আর বন্দুকের নলই যে ক্ষমতার উৎস! শাসককুলের হাতেই শোভা পাবে উদ্যত বন্দুক, আর নিরস্ত্র জনগণের বক্ষদেশ তো বন্দুক-তত্ত্বের কার্যকারিতা প্রমাণের চাঁদমারি। জনগণের হাতে উদ্যত বন্দুক তুলে দিয়ে পৃথিবীর কোন দেশেই, কমিউনিস্ট দেশে তো নয়ই (কেননা সেখানে তো সীমান্ত চোরা-চালান নেই যে, আগ্নেয়াস্ত্র গোপনে চোরাপথে আমদানি হয়ে দেশের 'জঙ্গী'দের হাতে আসবে। আর পুলিশও তো 'বুর্জোয়া' পুলিশ নয়!) শাসকশ্রেণী 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস' এ তত্ত্ব প্রমাণ করার দুঃসাহস বা সৎসাহস দেখাননি।

সংসদ অধ্যক্ষ ধীলন বলেছেন, তাঁর বক্তৃতার যে-ভাষ্য কাগজে বার হয়েছে সেটা ঠিক নয়। তবে তিনি এক-পার্টি শাসনব্যবস্থার কার্যকারিতার প্রশংসার উল্লেখ করতে গিয়ে রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির কথা বলেছেন। এক-পার্টি শাসনব্যবস্থাকে ভারতের কোন গণতান্ত্রিক দল কখনই মেনে নিয়ে গণতন্ত্রের মৃত্যু পরোয়ানায় সই দেবে না। তাই ঐ ব্যবস্থাকে চাপিয়ে দিতে হয় 'ডিকটেটরশিপ' কায়েম করে বন্দুকের নলের জোরেই। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রহরী হিসাবে নিজেই তাকে গলা টিপে হত্যা করার মতলব অহিংস পদ্ধতিতে বাতলিয়ে দিতে তাঁর বাধল না। এক-পার্টি শাসন চালু করতে গেলে অন্যান্য সকল দলকে তাদের সদস্য সমর্থকদের স্তালিনী কায়দায় নির্মূল

(liquidate) করতে হয়। দেশের বিচারালয়গুলিকে দলের তল্পীবাহক হিসাবে কাজ করতে হবে—দলেরই নির্দেশে। দেশে যত হিংসা সন্ত্রাস বাড়বে—রক্ত ঝরবে—দেশের সরকারী অফিস-আদালতে অহিংস মন্ত্রের নিরলস সাধক মহাত্মা গান্ধীর আরও বড় বড় ছবি শোভা পাবে, গান্ধীঘাটে গান্ধীজীর স্মৃতি-সৌধের ওপর ততই বেশী করে কপট শ্রদ্ধার পুষ্প-স্তবক স্তূপীকৃত হবে। দেশের সকল সংবাদপত্র পত্র-পত্রিকা মুদ্রণ-শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হয় এক-পার্টি শাসনব্যবস্থাকে বাঁচাতে। দেশে 'স্বাধীন' সংবাদপত্র বলে কিছুই থাকবে না।

এই তো সেদিন একজন খ্যাতিমান সাংবাদিক, যাঁর লেখনী পশ্চিমবাংলার কমিউনিস্ট শিবিরকে গত দুই দশক ধরে শক্তিশালী করে এসেছে—সেই বিশিষ্ট 'বামপন্থী' সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকার সরকারী অধিগ্রহণের পর (Take-over of the press by the State Government) তাঁর সম্পাদকরূপে মর্যাদা ও অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে এই অভিযোগে উক্ত পত্রিকার সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে এক বিবৃতিতে বলেছেন :

"West Bengal Government had proved once for all that the acquisition of a Newspaper by government would lead to the death of a free press.

I wanted to experiment if the freedom of the press could be maintained inspite of a government take-over and its financial support but unfortunately that hope has been shattered by the government itself." [Statesman, November 18, 1974]

"পশ্চিমবঙ্গ সরকার চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করলেন কোন সংবাদপত্রের সরকারী অধিগ্রহণ সেই পত্রিকার স্বাধীন সাংবাদিকতারই মৃত্যু ঘটায়। আমি পরীক্ষা করে দেখছিলাম—সংবাদপত্রকে সরকারী সাহায্য দান এবং পত্রিকার সরকারী অধিগ্রহণ বা মালিকানা অর্জন সত্ত্বেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় কিনা। আমার সেই আশা সরকারই ভেঙে চুরমার করে দিলেন।"

বিবৃতির মধ্যে আরও অভিযোগ আছে। যেমন, সম্পাদকের লেখা প্রেসে ছাপতে যাবার আগে—প্রশাসকের বিচারে তা ছাপার যোগ্য বলে বিবেচিত

হওয়া চাই। কোন সংবাদপত্রের মালিকানা সরকার হাতে নিলে যে সেই পত্রিকার 'স্বাধীনতা' স্বাতন্ত্র্য নিজস্ব ঐতিহ্য বলে যে কিছু থাকে না—একথা ইতিহাসে স্বতঃসিদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে বহুকাল আগে। এই স্বীকৃত সত্যকে নতুন করে যাচাই করে দেখবার জন্য বিবেকানন্দবাবুর মত একজন বিপুল অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ 'বামপন্থী' সাংবাদিকের ক্ষমতা-মত্ত দল-দেবতার ঝুলন্ত অহিংস খড়্গের তলায় বসে 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকার সম্পাদনার কাজ নেবার প্রচণ্ড ঝুঁকি ছিল নিঃসন্দেহে। সরকার টাকা দিয়ে কাগজের দায়িত্বভার নিলেন—তার স্তাবকদের দিয়ে এত প্রশংসা-কীর্তন করালেন—সরকারের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী অগ্নিবর্ষী সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখার অবাধ সুযোগ করে দেবার জন্য ?

সরকার সানাইবাদককে বায়না দিয়ে সুসজ্জিত নহবতখানায় আমন্ত্রণ জানিয়ে আনবেন—'বোধনের' দিনে 'বিজয়ার' বিষণ্ণ ব্যর্থ সুর বাজাবার জন্য! দেশের অগণিত মুক্তি-সূর্যের অভিবাদন জানাতে ব্যাণ্ড-বাদ্যের 'জিও জিও যুগ যুগ জিও' ঐকতান যখন আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে তখন কি নহবতের সানাই-এ 'বিসর্জনের' সুর সমাদৃত হয় শাসক শ্রেণীর কাছে? সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় কি জানতেন না এক-পার্টি শাসিত দেশ-গুলিতে আদৌ 'ফ্রী-প্রেস' 'স্বাধীন সংবাদপত্র' বলে কোন বস্তু থাকতে পারে না? 'ফ্রীডম', 'স্বাধীনতা', 'গণতন্ত্র'—ও তো বুর্জোয়া-গান্ধী শব্দ, বস্তাপচা ঊনবিংশ শতকের বস্তু! রাশিয়া, চীন বা কোন এক-পার্টি শাসিত রাষ্ট্রে কি, যে 'ফ্রী প্রেসের' কথা বিবেকানন্দবাবু বলেছেন, তা আছে, না থাকতে পারে আদৌ? সংবাদপত্র পার্টি বুলেটিন বা ইস্তাহার ছাড়া আর কি? প্রেস সরকারের 'হিজ-মাস্টারস্ ভয়েস্' মাত্র। সরকারের পছন্দমত রেকর্ড বাজিয়ে শোনাবার গ্রামোফোন যন্ত্র মাত্র।

ব্রিটিশ পরিষদীয় গণতন্ত্রে 'স্পীকার' পদের পেছনে যে ঐতিহ্য গড়ে তোলা হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে আমরা এদেশে সেই বলিষ্ঠ ও সুন্দর নজীরটি গ্রহণ করিনি। ফলে আমাদের দেশের অধ্যক্ষরা 'ট্রেজারী বেঞ্চের' দিকে চেয়ে থাকেন অনুগ্রহ-প্রার্থীরূপে। আইনসভা কক্ষে 'ডান' দিকের বেঞ্চের দিকে অন্তত আড়-চোখে না চেয়ে রুলিং দিতে সাহস পান না। ধীলনজী তার ব্যতিক্রম নন। আর তিনি অধ্যক্ষ হয়ে দলীয় রাজনীতিবিদের মত সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ

নারায়ণ ও তাঁর আন্দোলনকে যেভাবে নিন্দা করেছেন তাতে তাঁর নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে গভীর সংশয় জাগা স্বাভাবিক। ধীলনের এই আচম্‌কা বিবৃতির স্বরের সঙ্গে কংগ্রেস দলের আর একজন 'প্রগতিশীল' সংসদ সদস্যের এদেশে 'সীমিত একনায়কতন্ত্রের'—প্রবর্তনের প্রস্তাবের অদ্ভুত মিলও আছে।

বাতাসে খড় ছুঁড়ে দিয়ে বাতাসের গতি কোন্‌ দিকে তা নির্ণয়ের মত এই ধরনের প্রস্তাবগুলি জনসাধারণের কাছে অত্যন্ত নিষ্পাপ প্রস্তাবরূপে অতি নিরীহভাবে উত্থাপন করা হচ্ছে রাজনৈতিক হাওয়া-নির্দেশক যন্ত্ররূপে। এ থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয় গণতান্ত্রিক জীবন-দর্শনের প্রতি চরম অবিশ্বাস, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবক্ষয়।

১১

দল-নেতা-নেতৃত্ব ঃ মুখোশ বনাম মুখশ্রী

সুভাষচন্দ্রের হরিপুরা-ভাষণ তৎকালীন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অনেক সদস্যেরই বিরক্তির কারণ হয়েছিল। তাই ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র যাতে দ্বিতীয়বারের জন্য কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হতে না পারেন তার জন্য প্রস্তুতি চলেছিল গান্ধীজীর আশীর্বাদ নিয়েই। হরিপুরা অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের স্মরণীয় সভাপতির ভাষণটিতে কংগ্রেস দলকে একটি নূতন মোড় নিয়ে সঠিক পথে চলার পথ-নির্দেশ ছিল। সে পথ-নির্দেশ দল মেনে চলেনি। এরূপ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্যে ছিল রামগড় আপোষ-বিরোধী সম্মেলনের ভাষণ (১৯৪০)। [Anti-compromise Conference]

সুভাষচন্দ্রকে দেশের আসন্ন পরিস্থিতির গাম্ভীর্য ও গুরুত্ব বিবেচনা করে—কংগ্রেস দলের বিভিন্ন প্রদেশের অগণিত প্রতিনিধি দ্বিতীয়বারের জন্য সভাপতির পদে বরণ করতে চাইলেন। বহু অনুরোধ তাঁর কাছে আসতে থাকে এবং শেষে তিনি প্রতিনিধিদের (Delegates) ইচ্ছা অনুযায়ী দ্বিতীয়বারের মত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে রাজী হয়ে এক বিবৃতি দিলেন (জানুয়ারী ২১, ১৯৩৯)। তিনি বললেন অন্যান্য দেশের মত 'রাষ্ট্রপতির' নির্বাচন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ও সমস্যার ভিত্তিতে হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে নির্বাচন বাঞ্ছনীয়। কোন প্রতিনিধিই তাঁকে দ্বিতীয়বারের জন্য নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবার জন্য অনুরোধও করেন নি। কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রী ব্লকও তাঁকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য। তিনি জানালেন সংখ্যাধিক্যের ভোটেই স্থির হোক কংগ্রেস তাঁকে সভাপতিরূপে পেতে চায় কিনা। এটাই গণতন্ত্রের কথা। কিন্তু দলের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব কিছুতেই রাজী নন সুভাষচন্দ্র আবার সভাপতি হোন। আবার গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী নির্বাচনের রায়ও মানতে চান না। চাপ সৃষ্টি করে তাঁকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করার গোষ্ঠী-রাজনীতির আশ্রয় দক্ষিণপন্থী নেতারা নিলেন। গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতি কোন শ্রদ্ধা সেদিন দেখান হল না। বক্কে

রাখা দরকার এখানে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার দলের সভাপতির পদে বৃত হোন। এই মহান দেশনায়কের প্রতি বিশ্বকবির কি গভীর স্নেহ ফল্গু-ধারার মত সদা-প্রবাহিত ছিল সে সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন পরবর্তী কালে একজন দক্ষ লেখক। [রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র : নেপাল মজুমদার]

যাঁরা বিরোধীর ভূমিকায় নামলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন : সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, জয়রামদাস দৌলতরাম, ভুলাভাই দেশাই, জে. বি. কৃপালনী, যমনালাল বাজাজ, শঙ্কররাও দেও। সবাই ছিলেন সেদিনের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। মৌলানা আজাদকে সভাপতিরূপে দাঁড় করাবার জন্য দক্ষিণপন্থী নেতারা চেষ্টা করলেন। তাঁর নামও প্রস্তাবিত হল। কিন্তু অবস্থা বুঝে মৌলানা আজাদ নির্বাচন থেকে তাঁর নাম প্রত্যাহার করে নিলেন। তখন এই নেতারা গান্ধীজীর পরামর্শে পট্টভি সীতারামাইয়াকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরূপে দাঁড় করালেন। গান্ধীজী নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে, প্রথম থেকেই তিনি সুভাষচন্দ্রকে পুনর্নির্বাচিত করার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং সুভাষচন্দ্রের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন।

"Since I was instrumental in inducing Dr. Pattabhi not to withdraw his name as a candidate when Maulana Saheb withdrew, the defeat is more mine than his." Gandhiji.

[গান্ধীজীর বিবৃতি—বরদৌলি, জানুয়ারী ৩১, ১৯৩৯]

নেতারা যৌথ বিবৃতি দিয়ে কংগ্রেস ডেলিগেটদের ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়াকে নির্বাচিত করার জন্য আহ্বান জানালেন। তাঁরা আরও ঐ বিবৃতি মাধ্যমে জানালেন—কংগ্রেস সভাপতির পদটি হল দলের 'চেয়ারম্যানের' সমতুল্য (কমিউনিস্ট চীনে 'চেয়ারম্যানের' ক্ষমতা ও মর্যাদা অসামান্য। প্রকৃতপক্ষে তিনিই একমেবম্ অদ্বিতীয়ম্)। সাংবিধানিক রাজতন্ত্র রাজার মতই শিখণ্ডী মাত্র। তাই 'সভাপতি' নির্বাচনের সঙ্গে নীতি-কর্মসূচী-আদর্শ এই সব প্রশ্ন উত্থাপন করা নাকি অর্থহীন।

এই প্রথম দলের মধ্যে বিশেষ প্রার্থীর পক্ষে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা প্রকাশ্যেই বিবৃতি দিয়ে তদ্বির ও প্রচারে নেমে গেলেন। এটাও গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি বিরুদ্ধ। তাছাড়া ওয়ার্কিং কমিটি কোন পর্যায়েই কোন আলোচনা

বৈঠক না করেই সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে জোট বেঁধে পক্ষ নিয়ে নিলেন। সুভাষচন্দ্র এই আচরণের প্রতিবাদ জানালেন প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে (জানুয়ারী ২৫, ১৯৩৯)। যখন ওয়ার্কিং কমিটির দুজন সদস্য – সুভাষচন্দ্র ও ডাঃ সীতারামাইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলেন তখন কেন একটা পরাক্রান্ত গোষ্ঠী এভাবে গান্ধীজীর সমর্থন নিয়ে একটা পক্ষ অবলম্বন করে ডেলিগেটদের অশোভন ও অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট হবেন সে সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন :

"I ask if this is fair either when the Working Committee never discussed this question. In the statement we are told for the first time that the decision to advocate Dr. Pattabhi's election was taken with much deliberation. Neither I, nor some of my colleagues on the Working Committee had any knowledge or idea of either the deliberation or the decision " [Subhas Chandra Bose]

তাছাড়া স্বাক্ষরকারী নেতারা ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরূপে বিবৃতি না দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে বিবৃতি দিতে পারতেন। তাও তাঁরা করেননি। ভোট স্বাধীনভাবে হওয়া দরকার—কোন নৈতিক চাপ দেওয়া কখনই উচিত নয়—ডেলিগেটদের ওপর তিনি দাবী করলেন্ "...there should be freedom of voting without any moral coercion. But does not a statement of this sort tentamount to moral coercion."

সুভাষচন্দ্র জানতে চাইলেন : প্রতিনিধিদের ভোটে সভাপতি নির্বাচিত হবেন, না ওয়ার্কিং কমিটির দ্বারা মনোনীত হবেন? বাইরে একটি দল স্বাধীন বাধামুক্ত নির্বাচনের কথা দিবারাত্র বলবে, আর দলীয় আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের ক্ষেত্রে নেতা মনোনয়ন করে দলের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে—এ কি নীতি? গণতান্ত্রিক দল হিসাবে আজকের কংগ্রেস দলকে এই প্রশ্নগুলি ভেবে দেখা দরকার। অতীতের ইতিহাস থেকে অনেক কিছু নেবার রয়েছে। সুভাষচন্দ্র সেদিন বলেছিলেন :

"New conventions should now grow up around the Congress President and his election. The position of the President is no longer analogous to that of the Chairman of

a meeting. The President is like the Prime Minister or the President of The United States of America who nominates his own Cabinet. It is altogether wrong to liken the Congress President to a Constitutional Monarch ··"

"নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতির পদটি একটি সভার সভাপতির সমতুল্য মোটেই নয়। সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের রাজার মতও নয়। এ পদের মর্যাদা প্রধানমন্ত্রী অথবা আমেরিকার রাষ্ট্রপতির সমতুল্য। কংগ্রেস সভাপতিই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত করেন, যেমন প্রধানমন্ত্রী বা মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করেন।" (সুভাষচন্দ্র)

দেশে তখন দক্ষিণপন্থী নেতাদের আপোষমুখী মনোভাবের কথা অজানা ছিল না। সুতরাং সুভাষচন্দ্র যখন নীতি ও কর্মসূচীর গুরুত্বের ওপর জোর দিচ্ছিলেন তখন তার তাৎপর্য বুঝে নিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। ত্রিপুরী সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ সরকারকে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে ছয় মাসের চরম পত্র দেবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। যদি ছয় মাসের মধ্যে 'পূর্ণ স্বাধীনতা' ভারতবর্ষকে দেওয়া না হয় তাহলে আপোষহীন সংগ্রাম সুরু হবে। তাই এই সময়কার কংগ্রেস সংগঠনের নেতৃত্বে থাকা চাই এমন ব্যক্তিদের ও নেতাদের যাঁদের সংগ্রাম-মুখীনতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকবে না।

সুভাষচন্দ্রের ভাষায় :

"In my opinion, therefore, we should submit our National demand to the British Government in the form of an ultimatum and give a certain time-limit within which a reply is to be expected···"

সুভাষচন্দ্রেব প্রার্থীপদের বিরোধিতা করতে গিয়ে জহরলাল নেহরু যে-ভূমিকা নিয়েছিলেন সেটা আরও দুঃখজনক এবং অযৌক্তিক, বিশেষ করে একশ্রেণীর রাজনীতিবিদ নেহরুকে 'প্রগতিশীল' ও 'বামপন্থী' বলে চিহ্নিত করে আসছিলেন। এই কারণেই তাঁর সেদিনের ও পরবর্তীকালের আচরণ অত্যন্ত ক্ষোভের ও দুঃখজনক।

পণ্ডিত নেহরু সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা করতে গিয়ে 'কংগ্রেস সভাপতি' পদের গুরুত্বকে লঘু করার চেষ্টা করলেন। কংগ্রেসী রাজনীতিতে বিশেষ করে

স্বাধীনতা-উত্তরকালে নেহরুজী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে কংগ্রেস সভাপতিরূপে এমন ব্যক্তিদের চেয়েছিলেন যাঁরা ব্যক্তিত্বে-গুণে-মর্যাদায় কংগ্রেসের প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের ঐতিহ্যের আদৌ বাহক হতে পারেননি, একথা অকপটে বলা চলে। দলীয় গণতন্ত্রকে খর্ব করার এবং দলের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীকে (eaucus) কংগ্রেস সভাপতিকে নিজেদের সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থের হাতিয়াররূপে ব্যবহার করার রাজনীতির উৎসও এইখানে বহুলাংশে। জহরলালজী বললেন :

"Important as the Presidential election is, it is a *secondary* matter. What is far more important is the policy and programme of the Congress."…[Statement dated January 26, 1939 from Almora]

তাঁর বিশেষ বক্তব্য ছিল : নীতি ও কর্মসূচী নির্ধারণ করবে কংগ্রেস দল ওয়ার্কিং কমিটি অথবা নিখিল ভারত কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি। দলের সর্বোচ্চ পদে কে নির্বাচিত হলেন তার ওপর কিছু নির্ভর করে না। এই সভাপতি পদের নির্বাচনে কোন নীতি বা কার্যসূচীর প্রশ্ন জড়িত নেই। তিনি সরাসরিই বললেন সুভাষচন্দ্রের এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা উচিত নয়।……"I was equally clear that Subhas Babu should not stand." [Nehru] শুধু তাই নয়, জহরলালজী মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে সভাপতিরূপে নির্বাচন করার প্রকাশ্যে প্রস্তাব দিলেন।

"·· the obvious person for Presidentship this year was Maulana Abul Kalam Azad. Every line of reasoning led me to this conclusion. He was peculiarly fitted to deal with some of our problems. He had that delicate insight and sensitiveness which understood and appreciated the view points other than his own . May I add that my admiration for his keen intelligence and rare insight has grown from year to year during the past twenty years that I have been privileged to know him." [Nehru]

সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয়বার প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যৌক্তিকতার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে এইসব কথার অবতারণার কি অর্থ ছিল? নেহরুজী মুখে

সব সময় বামপন্থী প্রগতি-পন্থী কথা বলতেন। কিন্তু কংগ্রেসের রাজনীতিতে যখনই দক্ষিণ-বামের সংঘাত এসেছে তিনি সমস্ত শক্তি দিয়ে দক্ষিণপন্থীদেরই সাহায্য করে এসেছেন। মৌলানা আজাদই কেন তাঁর মতে সবচেয়ে যোগ্য বিবেচিত হলেন? সুভাষচন্দ্র তো নিজে থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাননি। হরিপুরায় ঐতিহাসিক ভাষণে যে বলিষ্ঠ চিন্তা, আপোষবিহীন সংগ্রামমুখীনতা, রাজনৈতিক উদারতা, সহনশীলতা, বামপন্থী চিন্তার প্রতি অনুরাগ, জাতীয় সামগ্রিক স্বার্থের মুল্যায়ন, সর্বোপরি গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে অধিকাংশ ডেলিগেট তাঁকে আন্তরিকভাবেই পুনরায় সভাপতিরূপে পেতে চেয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের অপরাধ তিনি গণতান্ত্রিক দলে গণতান্ত্রিক রীতি ও নীতি অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাকে মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চেয়ে। এই প্রসঙ্গে মৌলানা আজাদের প্রশস্তি গাইবার কোন সুযোগই ছিল না। আর বিভিন্ন মতকে মানিয়ে নিয়ে চলা? এ ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র হরিপুরা ভাষণে যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন—অতীতে কি পরবর্তীকালে—কোন কংগ্রেস সভাপতিই সেই আন্তরিকতার পরিচয় দেননি। মৌলানা আজাদ ছিলেন 'ওল্ড গার্ড', দক্ষিণপন্থী শিবিরের একজন অন্যতম নেতা। কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ ক্রমবর্ধমান বামশক্তিকে মানিয়ে নিয়ে কাজ করার মত মানসিক গঠনই তাঁর ছিল না। আর অন্তর্দৃষ্টি? সুভাষচন্দ্রই তো ১৯৩৯ সালে ঘোষণা করেছিলেন ছয় মাসের মধ্যে ইউরোপে বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন। ইংরেজ কোণঠাসা হবেই। 'ইংলণ্ডের দুর্দিন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সুদিন'। তাই 'পূর্ণ স্বাধীনতার' দাবী জানিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে 'ছয় মাসের চরমপত্র' দেওয়া হোক। ঠিক ছয় মাসের মাথায় ইউরোপে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। দক্ষিণপন্থী আপোষমুখী নেতৃত্ব সুভাষচন্দ্রের কথায় কর্ণপাত করেননি।

অন্তর্দৃষ্টি? সুভাষচন্দ্রই সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন কুটিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভারতবর্ষকে দু-টুকরো করে দ্বিখণ্ডিত করে সরে পড়ার ফন্দি আঁটবে এবং এইভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে পঙ্গু করে দিতে চেষ্টা করবে যদি দেশ আপোষ-রফার মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা পেতে আগ্রহী হয়। ইতিহাস কি চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করে দেয়নি সুভাষচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী? ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আজাদ হিন্দ্ সরকার প্রতিষ্ঠা ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ

গঠন করে সশস্ত্র অভিযান সংগঠন পরিচালনা এবং জনসাধারণ মুক্তি-সংগ্রামের নেতৃত্ব তিনি দিয়েছিলেন, অগণিত মুক্তিফৌজের সৈনিকরা দেশের জন্য উজাড় করে বুকের তপ্ত রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন বলেই ১৯৪৭ সালে ক্ষমতালোভী দক্ষিণপন্থী নেতারা দিল্লীর মসনদে বসতে পেরেছিলেন।

ত্রিপুরীর তিক্ত ক্লেদাক্ত ঘটনাবলীর পর সুভাষচন্দ্র তাঁর এক ব্যক্তিগত চিঠিতে দুঃখ করে লিখেছিলেন দেশের ও জাতির এই সঙ্কট মুহূর্তে একক কোন ব্যক্তি বা নেতাই পণ্ডিত নেহরুর চাইতে তাঁর এবং দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের আদর্শের প্রতি বেশী ক্ষতিসাধন করেননি।

"Nobody has done more harm to me personally and to our cause in this crisis than Pandit Nehru. If he had been with me we would have a majority. Even his neutrality would have given us a majority. But he was with the old guards at Tripuri. His open propaganda against me has done me more harm than the activities of the 12 stalwarts. What a pity !" [Cross Roads—P. 113. Compiled by Netaji Research Bureau, Calcutta : ASIA Publishing House]

নেহরুজী সুভাষচন্দ্রের পক্ষে থাকলে বামশক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ হত। তিনি যদি নিরপেক্ষও থাকতেন তাহলে সুভাষচন্দ্রের সমর্থকরা সেদিন জয়ী হতেন। কিন্তু তিনি সরাসরি রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থী নেতাদের পক্ষে প্রচার চালিয়েছিলেন। এক ডজন প্রবীণ দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতা সম্মিলিতভাবে যা পারেননি নেহরুজী একা তাঁদের হয়ে তাই করতে পেরেছিলেন। সত্যিই অদৃষ্টের পরিহাস !

এখানে লক্ষণীয় :—

(ক) ত্রিপুরী অধিবেশনের সভাপতিপদের প্রার্থীরূপে দাঁড়াবার ইচ্ছে সুভাষচন্দ্রের ছিল না প্রথমদিকে। আচার্য নরেন দেবের নাম তিনি প্রস্তাব করেছিলেন প্রার্থী হবার জন্য। অতএব ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রশ্ন ওঠেই না তাঁর সম্বন্ধে।

(খ) নির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরীতে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অসুস্থতার জন্য সভা পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। অতএব তাঁর মনোনীত কাউকে করতে হবে সভাপতির কাজটা। তিনি তখন মনোনীত

করলেন আজাদকে বামপন্থী কাউকে না করে। গণতন্ত্রের মর্যাদা বাড়াবার জন্য তিনি নিজের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে যে-সভায় তার পরিচালনার ভার ন্যস্ত করলেন বিরুদ্ধ-পক্ষের নেতার ওপর।

(গ) জহরলালজী যদিও বললেন সভাপতির ব্যক্তিত্বটা খুব বড় প্রশ্ন নয় নির্বাচন ব্যাপারে, কার্যতঃ তিনি আজাদের ব্যক্তিত্ব বর্ণনা করতে লাগলেন নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবেই। এ থেকে বোঝা যায় সুভাষচন্দ্র কত বেশী গণতান্ত্রিক উদারপন্থী ছিলেন জহরলালের চেয়ে।

যেকথা হচ্ছিল। মৌলানা আজাদকে এই নেতারা বহু পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি নামতে রাজী হলেন না। তখন ডাঃ পট্টভি সীতারামাইয়া দক্ষিণপন্থী শিবিরের প্রার্থী হলেন। ওয়ার্কিং কমিটির দক্ষিণপন্থী নেতাদের পক্ষে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্য শ্রীশরৎচন্দ্র বসুকে ২৪শে জানুয়ারী এক টেলিগ্রামে জানালেন:

"Feel Subhas Babu's statement Presidential Election. Needs counter statement from members Working Committe who feel re-election this year unnecessary. Brief statement ready. It says Re-election only exceptional circumstances. No such present for electing Subhas Babu. It rebuts Subhas Babu's contention about Federation etc. Says Programmes and Policies fixed not by President but by Congress or Working Committee, Counter statement commends Dr. Pattabhi for election and approach Subhas Babu not divide Congressmen on Presidential Election."

"অকল্পনীয় অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই কংগ্রেস সভাপতিপদে দ্বিতীয়বারের মত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা চলে। বর্তমান পরিস্থিতি তা নয়। সুভাষবাবুর তাই দাঁড়িয়ে কংগ্রেসীদের মধ্যে বিভেদ ডেকে আনা অনুচিত হবে। আমরা ওয়ার্কিং কমিটির তরফ থেকে বিবৃতি দিয়ে ডাঃ পট্টভিকে সভাপতিরূপে নির্বাচিত করার আহ্বান জানাচ্ছি। সভাপতি কিছুই নন। দলই নীতি কর্মসূচী নির্ধারণ করে।"

এই টেলিগ্রামের জবাবী বার্তায় শ্রীশরৎচন্দ্র বসু জানালেন:

"In my view setting up Dr. Pattabhi after Maulana's

withdrawal undesirable. Coming year more critical and exceptional from every view point than 1937. Strongly feel no member of Working Committee should take sides in contest between collegues. Your proposed statement would accentuate dissensions between right and left wings which should be avoided. Dr. Pattabhai will not inspire country's confidence in coming fight Please do not divide Congress."

"মৌলানার নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেবার পর ডাঃ পট্টভিকে প্রার্থীরূপে দাঁড় করান বাঞ্ছনীয় নয়। সামনের দিনগুলি খুবই সঙ্কটপূর্ণ ও অভাবনীয় সম্ভাবনাময়। এ পরিস্থিতিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীদের কোন পক্ষ নেওয়া অত্যন্ত অনুচিত হবে। এর ফলে দলের মধ্যে ডান ও বামের সংঘাত আরও তীব্রতর হবে। ডঃ পট্টভি আসন্ন সংগ্রামে দেশের এই সঙ্কটে জাতির মনে আস্থার সঞ্চার করতে পারবেন না। আপনারা দলকে দ্বিধা-বিভক্ত করবেন না।" [শরৎচন্দ্র বসু]

এখন প্রশ্ন : বেশ ভাল কথা, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করবেন না, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁরা চান মৌলানা আজাদকে। কিন্তু মৌলানা আজাদ তো প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ালেন। তখন ওয়ার্কিং কমিটি ডাঃ পট্টভিকে দাঁড় করাতে মনস্থ করলেন। গণতান্ত্রিক দলে এই সিদ্ধান্তগুলি তো গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ীই নিতে হবে। ওয়ার্কিং কমিটি কি কখনও সভা ডেকে আলোচ্য বিষয় (Agenda) নির্ধারণ করে, নোটিশ দিয়ে, বৈঠক ডেকে সংখ্যাধিক্যের ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ? না। সুভাষচন্দ্র সেদিন এই প্রশ্নও তুলেছিলেন। এক বিবৃতিতে তিনি বললেন :

"In an election contest between two members of the Working Committee one could not expect the other members to take sides in an organised manner ; because that would obviously not be fair. Sarder Patel and other leaders have issued the statement as members of the Working Committee and not as individual Congressmen. *I ask* if this is fair either *when the Working Committee never discussed this question.* In

the statement we are told for the first time that the *decision to advocate Dr. Pattabhi's election was taken with much deliberation.* Neither I nor some of my colleagues on the Working Committee had any knowledge or idea of either the deliberation or the decision." [Statement of Subhas Ch. Bose, Dated January 25, 1939]

এই নির্বাচনে ওয়ার্কিং কমিটি বেশ কিছু-সংখ্যক সদস্য ডাঃ সীতারামাইয়ার পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রচারে নেমে গেলেন। এই ধরনের নির্বাচনে যেখানে একই ওয়ার্কিং কমিটির দুই সদস্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সভাপতিপদের জন্য সেখানে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের কোন প্রার্থীর পক্ষেই প্রচারে নামা উচিত নয়, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরূপে তো নয়ই। কিন্তু ডাঃ সীতারামাইয়ার পক্ষে সর্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে যে সদস্যরা প্রচারে নামলেন তাঁরা ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যরূপেই করেছেন, ব্যক্তিগতভাবে একজন কংগ্রেসী হিসাবে নয়। এটা কি নীতিপরায়ণতার পরিচায়ক? তাছাড়া বলা হল 'অনেক বিবেচনার' পর-ডাঃ পট্টভিকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কবে কখন কোথায় এই বিচার-বিবেচনা করা হল? কোন আলোচনাই তো ওয়ার্কিং কমিটিতে হয়নি। সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর পক্ষের বন্ধু-সদস্যরা তো কোন খবরই রাখেন না কবে এই সভা বা বৈঠক হল? সিদ্ধান্তের কথাও তো তাঁরা জানেনই না।

সমগ্র কংগ্রেসের ব্যাপারটাই যেন ওপরতলার গান্ধীজী অনুগৃহীত (গান্ধী-পন্থী বলা ভুল হবে কেননা কজনই বা গান্ধীজীর মতাদর্শ মানতেন ?) কতিপয় নেতার ঘরোয়া ব্যাপার। তাঁরা গোপনে সলাপরামর্শ করে যা করে দেবেন গোটা দলকে চোখ-কান মুখ বুজে তা অনুসরণ করতে হবে সুশৃঙ্খল সৈনিকের মত। 'গণতন্ত্র' কথাটা নেহাৎ মুখের কথা। আচরণে গণতন্ত্রের লেশমাত্রও ছিল না।

দক্ষিণপন্থী গান্ধী শিবিরের নেতারাই ঠিক করবেন কে দলের সভাপতি হবেন, দলের প্রতিনিধিরা নন, দলের সক্রিয় সাধারণ সদস্যরাও নন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গান্ধীজীর তিরোধানের পর—এখনও কংগ্রেসে দলীয় গণতন্ত্র পূর্ববৎ নিষ্পেষিত। এখন প্রধানমন্ত্রীই স্থির করে থাকেন তাঁর দলের দলপতি কে হবেন। প্রধানমন্ত্রীরা চান পছন্দমত সুবিধাজনক ব্যক্তি—'কনভিনিয়েণ্ট' পারসন্। দল জনগণ—সরকার পরিচালনা করবেও না।

ত্রিপুরী বিতর্ক পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান যাঁদের সেদিন কুক্ষিগত ছিল তাঁরাই মালিক হতে চেয়েছিলেন গোটা সংগঠনের। গণতান্ত্রিক দলের নির্বাচিত ডেলিগেটদের অধিকার হরণ করার রাজনীতিই সেদিন দলের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র এই রাজনীতির বিরুদ্ধতা করতে দ্বিধা করেননি। দলের নির্বাচিত ডেলিগেটরাই স্থির করবেন কাকে তাঁরা সভাপতিরূপে পেতে চান, ওপরতলার নেতারা নন। ত্রিপুরী সম্মেলনের সভাপতি পদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুনিশ্চিত করে সুভাষচন্দ্র একটি বলিষ্ঠ গণতান্ত্রিক নজির সৃষ্টি করেছিলেন। সেদিন গান্ধী-শিবিরের দক্ষিণপন্থী নেতা ও 'প্রগতিশীল সমাজতন্ত্রী' নেতা নেহরুজীর আবেদন পরামর্শ ও বিবৃতিবাজী ও চরিত্রহননের রাজনীতির ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে উত্তরসূরীদের জন্য তিনি তৈরী করে গেলেন নূতন ট্রাডিসন গড়ে তোলার প্রয়াসের ভিত্তি।

আজ যখন বহুকাল পরে ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাই তখন অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় মন আনত হয় এই বহু-নির্যাতিত নিঃসঙ্গ যোদ্ধৃ-শ্রেষ্ঠ মহাবিপ্লবী সংগ্রামী মহানায়কের চির-ভাস্বর কীর্তির প্রতি। এ যুগের কংগ্রেসীদের বেশী করে শোনান প্রয়োজন ইতিহাসের ফেলে-আসা দিনগুলির কথা। কোন ভ্রূকুটির কাছেই তিনি মাথা নীচু করেননি। গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীর কাছে সেইটাই সবচেয়ে বড় আদর্শ। যা কিছু অন্যায় নীতি-বিগর্হিত যা কিছু মিথ্যা যা-কিছু অবিচার উৎপীড়নের সহায়ক তারই বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে, ইস্পাত-কঠিন দুর্দমনীয় সঙ্কল্প নিয়ে লড়াই করতে হবে—মূল্যের কথা ভাবলে চলবে না। আজকের দিনে কংগ্রেসের কর্মী ও নেতারা যখন আদর্শের কথা ভুলে গিয়ে 'এক্স্‌পিডিয়েন্সীর' স্রোতে, নীতিহীন সুবিধাবাদের স্রোতে গা ভাসিয়ে চলতে অভ্যস্ত তখন প্রয়োজন ইতিহাসের রোমন্থন। যাঁরা সত্যি সত্যিই দেশকে গণতন্ত্রের মৌল ভিত্তির ওপর, সমতা-ভিত্তিক উদারনৈতিক ন্যায়পরায়ণ সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চান তাঁদের প্রয়োজন অতীতের গবেষণা।

আত্মজিজ্ঞাসার সময় কি আজও আসেনি? গান্ধীজী বলতেন সঙ্কটের সময় 'Turn the search-light inward'—'নিজের অন্তর্দেশে সার্চলাইটের আলো ফেলে আত্মানুসন্ধান কর।' আমরা অহর্নিশি গরীবি হঠানোর কথা সমাজবাদের কথা গণতন্ত্রের কথা বলছি। কিন্তু ভেবে দেখেছি কি দলের নেতাদের আচরণ ও কথার মধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি এবং কার্যকলাপের

মধ্যে ব্যবধান দিন দিন কত বিপুল থেকে বিপুলতর হচ্ছে। কংগ্রেস সংগঠন আজ কতিপয় নেতার সংগঠন। সংগঠনের নেতা তাঁরা নন। সংগঠন তাঁদের চালনা করে না। সংগঠন নেতা ও মন্ত্রীদের সেবাদাস মাত্র, হুকুম-পালনের হাতিয়ার। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলগুলি সম্বন্ধে একই কথা আরও জোরের সঙ্গে বলা চলে। মার্কসের আদর্শের যে স্তালিনবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয়েছে এবং দীর্ঘদিনের ব্যবহারিক আচরণের দ্বারা যেভাবে সেই ব্যাখ্যাকে কার্যকরী করা হয়েছে তাতে সেই ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী ভারতের যে-কোন মার্কসবাদী দল যখন গণতান্ত্রিক ট্র্যাডিশনকে নস্যাৎ করতে উদ্যত হয় তখন সে-আচরণের একটা অজুহাত খুঁজে পাওয়া যায় তাদের থিওরীর মধ্যে। কিন্তু কোন জাতীয় গণতান্ত্রিক দল যখন গণতন্ত্রের কথা অহরহ বলে প্রতিদিনের কাজেব মধ্যে সেই গণতান্ত্রিক রীতি আচরণ পদ্ধতি কৌশল, সর্বোপরি সেই মৌল আদর্শের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায়, তখন সেই আচরণের পরিণাম সম্বন্ধে যদি দলেব আদর্শনিষ্ঠ কর্মীবা, সাধারণ সদস্যরা, গণতান্ত্রিক আদর্শে শ্রদ্ধাশীল জনসাধারণ যদি সজাগ না হন তাহলে বিপদ অনিবার্য। কংগ্রেসের অতীতের ইতিহাসের কয়েকটি ঘটনা আলোচনা করছি এটা দেখাতে দীর্ঘদিনের ইতিহাসে একটানা অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে আদর্শের প্রজ্জলন্ত মশাল তুলে ধরেছেন এক-একজন নেতা। আবার সেই সব নেতাব অবর্তমানে মশালেব আলো নিভে গেছে।

কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী তথা গান্ধীজীর শিবির-ভুক্ত নেতারা নির্বাচনকে এড়াতে চেয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করেছিলেন। তাঁরা একবার বললেন একই ব্যক্তির একাধিকবার কংগ্রেস সভাপতি হবার রীতি নেই। কেবলমাত্র 'অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই' এই রীতির ব্যতিক্রম ঘটে থাকে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র জানতে চাইলেন কবে এই তথাকথিত অলঙ্ঘনীয় রীতি অনুসরণেব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়? সুভাষচন্দ্র বললেন:

"It is news to me that there is a rule that the same person should not be re-elected President except under exceptional circumstances. If one traces the history cf the Congress one will find that in several cases same person has been elected more than once. I am also surprised that

Presidential elections have hitherto been unanimous. I remember to have voted for one candidate in preference to another on several occasions." [Cross Roads, P. 91 : Subhas Chandra Bose]

গণতান্ত্রিক দলে ভোটাভুটি কেন হবে না? স্বাধীনভাবে বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী আদর্শ অনুযায়ী কেন দলের সভ্যরা ভোট দিয়ে দলের নেতা নির্বাচন করতে পারবেন না? প্রতিদ্বন্দ্বিতা দুর্বলতার লক্ষণ নয় বরং দলীয় স্বাস্থ্যেরই সুলক্ষণ। নির্বাচন এড়িয়ে সর্বসম্মতিক্রমে দলপতি নির্বাচনের দ্বারা দেশবাসী তথা দুনিয়ার সম্মুখে দলের আভ্যন্তরীণ ঐক্যকে জাহির করার পেছনে দলের যে-দুর্বলতা চাপা দেবার চেষ্টা অনেক সময় হয় সেটা বুঝতে কিন্তু অসুবিধা হয় না। কংগ্রেসে অতীতে একই ব্যক্তি একাধিকবার সভাপতি হয়ে এসেছেন। তবে সুভাষচন্দ্রের বেলায় এত আপত্তি কেন? তাঁর আপোষহীন সংগ্রামী আদর্শ ও চরিত্রকে গান্ধী-গোষ্ঠীভুক্ত নেতারা ভয় পেতেন। নেহরু গান্ধী গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না। তিনি যে ছিলেন 'প্রগতিশীল' 'র‍্যাডিক্যাল', 'লেফ্‌টিস্ট'! ওয়ার্কিং কমিটিতে গান্ধীজীর সঙ্গে নেহরুজীর বিতর্ক হয়েছে, আবার আসল সময় দেখা গেছে সেই নেহরুজী গান্ধীজীর মতেই মত দিয়ে এসেছেন। সে-যুগে গান্ধীজী ও নেহরুর ঝগড়াকে 'বাপ-বেটার ঝগড়া' বলে মশকরা করতেন অনেকে। জনৈক ব্রিটিশ সাংবাদিক বলেছিলেন—"Pandit Motilal's son talks left but acts right."

কংগ্রেস (নব) দলের সভাপতি একালে নির্বাচিত হয়ে থাকেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিনা বিতর্কে। ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মা সভাপতি হলেন। কিন্তু তার আগে দলের মধ্যে উপরতলা থেকে নীচের তলায় কোথাও কোন আলোচনা হল না। কে বা কারা ভিতরে ভিতরে ঠিক করলেন শর্মা সভাপতি হবেন। দলের ডেলিগেটরা সোল্লাসে তাঁকে নির্বাচিত করে দলের 'ঐক্য' এবং নেতার 'ইমেজ' জাহির করলেন। আবার মন্ত্রী দেবকান্ত বড়ুয়াকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে কংগ্রেসের সভাপতি করা হল—আর প্রাক্তন সভাপতি শর্মাজী হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এ সিদ্ধান্ত কার? দলের? না, তা তো নয়। ওয়ার্কিং কমিটির? না। এ. আই. সি. সি-র? তাও নয়। সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রীর। অতএব সেটাই তো দলের সিদ্ধান্ত! তাই ত্রিপুরী

অধিবেশনের কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন-বিতর্কটা একালের কংগ্রেসীদের ভাল করে অনুধাবন করা দরকার। পাঠকদের বুঝে নিতে অসুবিধা হবে না: সুভাষচন্দ্র প্রকৃত গণতন্ত্রী ছিলেন—না গান্ধীজীর শিবিরভুক্ত নেতারা, নেহরু সমেত, আদৌ গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন? গণতন্ত্র আসলে ওঁদের মনের রঙ ছিল না। স্তালিনও তো খুব বেশী 'গণতন্ত্রের' কথা বলতেন। ১৯৩৬ সালের 'স্তালিন সংবিধানকে' তিনি ও তাঁর অনুগামীরা 'সবচেয়ে গণতান্ত্রিক সংবিধান' বলতেন।

গণতান্ত্রিক দলের নেতৃত্ব-নির্বাচন ব্যবস্থা একটা বড় আভ্যন্তরীণ দলীয় গণতন্ত্রের পরীক্ষাও বটে। দলের মধ্যে এই গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পক্ষে এক সুস্থ ট্র্যাডিশন গড়ে তোলা দরকার। দলের মধ্যে সব সময় যে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী চিন্তা বা মত থাকে—সেই সব মত পুষ্পিত হতে পারে না, তার সৌরভ ছড়াতে পারে না সভ্য-সাধারণের মধ্যে যদি অবাধ স্বাধীন নির্বাচন সুনিশ্চিত করার মত সাংবিধানিক রক্ষাকবচ এবং ব্যবহারগত ট্র্যাডিশনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা না যায়। কোন মার্কসিস্ট দলের নেতৃত্ব-নির্বাচন সেভাবে হয়ই না। তাই দেখা যাবে 'পলিট ব্যুরো' বা কেন্দ্রীয় কমিটিগুলিতে যে-সব নেতারা রয়েছেন—বছরের পর বছর তাঁরাই নেতৃত্ব কামড়িয়ে পড়ে আছেন। তাঁরা সচরাচর কোন চ্যালেঞ্জ-এর সম্মুখীন হন না। ছোট ছোট কয়েকটি মার্কসীয় আদর্শে গড়ে-ওঠা দলের সাধারণ সম্পাদক ১৫।২০ বছর ধরে একই পদে রয়ে গেছেন। 'গণতন্ত্র' দলের মধ্যে নেই বলেই এটা সম্ভব। সমালোচকরা দলের ভিতরে বা বাইরে মুখ খুললে হয় 'শোধনবাদী' অথবা 'প্রতিক্রিয়াশীল' শক্তির ক্রীড়নক অথবা 'সি. আই. এ.-র চর' বলে নিন্দিত ও চিহ্নিত হবেন। আবার গণতান্ত্রিক দলে যেভাবে ঘন ঘন নেতৃত্বের পরিবর্তন হয়—বিনা নির্বাচনে সেটাও অশুভ ও অযৌক্তিক। এই জন্যই নেতৃত্ব-নির্বাচনের প্রসঙ্গটিকে সুভাষচন্দ্র 'নীতি ও কর্মসূচী' ঘোষণা ও রূপায়ণের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। একথা নেহরুজী, সর্দার প্যাটেল, ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এঁরা কেউই মানতে চাননি। অথচ তাঁরা বলেছিলেন সভাপতি নির্বাচন দলের ওয়ার্কিং কমিটি, এ. আই. সি. সি.-ই করে থাকে। ভাল কথা। শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়ার নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারটি স্থির করলেন কি এ. আই. সি. সি., না ওয়ার্কিং কমিটি, না স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী? শর্মাজীর পদত্যাগ ও মন্ত্রিত্ব বরণই বা কার নির্দেশে হল? দলের

নির্দেশে? তা তো নয়। এইভাবেই কি গণতান্ত্রিক ট্র্যাডিশন গড়ে ওঠে কোন দলের মধ্যে ও বাইরে? কর্মীরা ওপরতলায় যা দেখছেন—তাই শিখে নিজ নিজ ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করছেন। কথায় বলে 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখাও'—Example is better than precept. কিন্তু দলের ওপরতলার আচরণ কি সত্যিই গণতন্ত্র রক্ষার সহায়ক?

সত্যি কথাটা ক্ষতিকারক ও অসুবিধাজনক হলেও কি খোলাখুলি হাটের মাঝে বলা, শেষ বিচারে, বেশী কাম্য নয়? নেতারা আসবেন যাবেন। ভারতবর্ষ থাকবে—তার কোটি কোটি সন্তান-সন্ততিদের বুকে নিয়ে পাহাড়-নদ-নদী তার ঐতিহ্য সভ্যতা সংস্কৃতি, তার অনন্ত-আত্মিক শক্তি নিয়ে। নেতাদের চেয়ে, দলের চেয়েও, দেশ অনেক বড়—একথাটা গণতন্ত্রীদের ভুল গেলে চলবে না। সত্যি কথাটা সজোরে বললে নেতাদের অসুবিধা হবে—সেটা মুখরোচকও হবে না। না-ই বা হল? দেশ গড়ার কাজে—জাতি গড়ার কাজে সেটা হবে মূল্যবান উপাদান। সত্যি কথা বলব না ভোটের লোভে? এই ভোট-ভোট খেলা নিত্যকাল নিত্যদিন চলতে দিলে দেশের সার্বিক সর্বনাশ কেউ রুখতে পারবে না শেষ পর্যন্ত।

স্বাধীন দলীয় নির্বাচন সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বললেন:

"If Presidential election is to be an election worth the name, there should be *freedom of voting* without any moral coercion, but does not a statement of this sort (meaning the signed statement of the Working Committee members dated January 24, 1939) tantamount to moral coercion? If the President is to be elected by the delegates and not be nominated by influential members of the Working Committee, will Sardar Patel and others withdraw their whip and leave it to the delegates *to vote as they like*? If the delegates are given the freedom to vote as they like there would not be the slightest doubt as to the issue of the election contest. Otherwise, why not end the elective system and have the President nominated by the Working Committee?" [S. C. Bose]

সুভাষচন্দ্র স্পষ্টই বলেছিলেন :

"...new conventions should grow up around the Congress President and his election." [Subhas Ch. Bose]

'কংগ্রেস সভাপতি এবং তাঁর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশে নতুন আচরণ নতুন কনভেনশন বা প্রথা গড়ে তোলা দরকার।' সুভাষচন্দ্রের এই আহ্বানে কংগ্রেস কোনদিনই সাড়া না দিয়ে কংগ্রেস সংগঠনকেই দুর্বল করেছে, তার 'সভাপতিত্ব' পদটিকে নিছক শিখণ্ডি—নৈবিদ্যের মোণ্ডার ন্যায় আলঙ্কারিক করেই রেখেছে। পরিণাম কিন্তু ভাল হয়নি, অবশ্য গোষ্ঠী-স্বার্থ সিদ্ধি হয়েছে তাতে। সুভাষচন্দ্র যে 'স্বাধীন ভোটাভুটির' ওপর জোর দিয়েছিলেন তাও নেতাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি।

সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছিল একটা অশোভন কুটিল চক্রান্ত। এটা বুঝতে একটুও অসুবিধা হয়নি যখন আমরা ডাঃ সীতারামাইয়ার স্বাক্ষরিত ২৫শে জানুয়ারীর (১৯৩৯) বিবৃতিতে দেখি তিনি নির্দ্বিধায় বলছেন কেন তিনি সুভাষের অনুকূলে তাঁর নাম প্রত্যাহার করবেন না।

"One thing remains to be explained. Why should I not withdraw in favour of Mr. Subhas Chandra Bose? *I can not, because I must not resist the will of valued colleagues.*"

[Dr. P. Sitaramaya.]

"আমি আমার নাম প্রত্যাহার করতে পারি না—কেননা আমি কখনই আমার বিশিষ্ট সহযোগীদের ইচ্ছার বিরোধিতা করতে পারি না।" তিনি তাহলে ছিলেন নিছক শিখণ্ডি! মৌলানা আজাদকেও চেষ্টা করেছিলেন নেহরুজী শিখণ্ডি করার। অবস্থা বুঝে তিনি সরে দাঁড়ান। শেষ পর্যন্ত ডাঃ পট্টভিকেই শিখণ্ডি করা হল। বিরোধিতা করার জন্যই যেন বিরোধিতা।

কি নেহরুজী কি অন্যান্য গান্ধী-পন্থী নেতারা বার বার বোঝাতে চেয়েছিলেন 'অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই' কেবল একাধিকবার একই ব্যক্তি সভাপতির পদে দাঁড়াতে পারেন। কিন্তু ১৯৩৯ সাল কি সত্যিই বিশ্ব-রাজনীতির খুব গুরুত্বপূর্ণ বছর ছিল না? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী-শক্তি কামানের তোপের খাদ্য করার চক্রান্ত করল। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী

শক্তিগুলি জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা ছিল সবচেয়ে বেশী আপোষ-হীন মুক্তি-সংগ্রাম পরিচালনার জন্য। সুভাষচন্দ্রের ভাষায় :

"With the progressive sharpening of anti-imperialist struggle in India there have emerged new ideas and ideologies and programmes." [Subhas Ch. Bose]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ডাঃ সীতারামাইয়া তাঁর "History of Congress" পুস্তকের সংশোধিত সংস্করণে স্বীকার করেছেন যে, সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয়বার প্রার্থী হওয়ার মধ্যে কোনো অন্যায় ছিল না, বরং দক্ষিণপন্থী নেতাদের বাধা দানের মধ্যেই ছিল অন্যায়।

ত্রিপুরী অধিবেশনে কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ডেলিগেটদের কাছে প্রশ্ন ছিল আপোষহীন লড়াই, না হয় আত্মসমর্পণ। ডেলিগেটরা সুভাষচন্দ্রকেই দ্বিতীয়বারের মত সভাপতি নির্বাচন করলেন। এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ড গান্ধীজীকে দূরে রেখেই সুভাষ-বিরোধী অগণতান্ত্রিক লড়াইটা চালিয়ে আসছিলেন। কিন্তু সুভাষের বিজয় সংবাদে গান্ধীজী যে বিবৃতি দিলেন তাতে দেশবাসী শুধু স্তম্ভিত ও মর্মাহতই হননি—তাঁরা বুঝলেন এই সঙ্ঘবদ্ধ সুভাষ-বিরোধিতার পিছনে গান্ধীজীর আশীর্বাদ সব সময়ই ছিল। গান্ধীজী বললেন 'পট্টভির পরাজয় আমারই পরাজয়' ('The defeat is more mine than his')। গান্ধীজী পরিষ্কার বুঝলেন নির্বাচিত ডেলিগেটরা অধিকাংশই গান্ধীজীর নীতি ও কার্যসূচী অনুমোদন করেন না। তাঁরা সুভাষের নীতি ও কর্মপন্থাকেই বেছে নিতে চান। গান্ধীজী তাঁর বহু উল্লিখিত ও সমালোচিত বিবৃতির উপসংহারে বললেন যে, কথাটা সেটা মর্মান্তিক নিষ্ঠুরতার সমতুল্য। 'After all Subhas Babu is not an enemy of his country'. 'আর যাই হোক সুভাষবাবু তো আর তাঁর দেশের শত্রু নন!' তাই তাঁকে সভাপতিরূপে মেনে নিতে আমাদের বাধা কোথায়? দেশের এত বড় মহান সর্বত্যাগী দেশপ্রেমিক বীর মুক্তি-সংগ্রামীকে বলা হল 'তিনি তো আর দেশের শত্রু নন'! এর সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন ত্রিপুরী সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রের সহযোগী, কংগ্রেস ডেলিগেট—তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইন সংসদের সদস্য পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র। তিনি তাঁর স্মরণীয় ত্রিপুরী অধিবেশনের ভাষণে 'National Demand'—প্রস্তাবের সমর্থনে এই উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন সেদিন।

মহাত্মা গান্ধী সেদিন তাঁর অনুগামীদের কংগ্রেস সংগঠন থেকে বের হয়ে আসার পরামর্শ দিলেন। তাঁর পরামর্শ: "Those who being Congress-minded remain outside the Congress by design represent it most"—অর্থাৎ 'যাঁরা খাঁটি কংগ্রেসী—কংগ্রেসের বাইরে থেকেই প্রকৃত কংগ্রেসীর পরিচয় দেবেন।' এই পরামর্শ দিয়ে তিনি সেদিন কংগ্রেস দলের মধ্যে অচলাবস্থা সৃষ্টি করতে চাইলেন। তাঁর পরামর্শ মত ওয়ার্কিং কমিটির ১২ জন সদস্য সভ্য-পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। নির্বাচনের আগে বিরামহীন চেষ্টা করেও সুভাষচন্দ্রকে রুখতে না পেরে—শেষে পদত্যাগ করে অসহযোগিতা করে তাঁকে 'শিক্ষা' দেবার চেষ্টা করলেন দক্ষিণ-পন্থী নেতারা।

এদিকে গান্ধীজীর বহু-সমালোচিত উপরোক্ত বিবৃতির পর উদার নির্ভীক সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন:

"It will always be my aim and object to try and win his (Gandhiji's) confidence for the simple reason that it will be a tragic step for me, if I succeed in winning the confidence of other people but fail to win the confidence of India's greatest man." [Subhas Ch. Bo e]

"আমার লক্ষ্য হবে গান্ধীজীর আস্থা অর্জন করা। এটা খুবই বেদনাদায়ক ব্যাপার হবে যদি আমি দেশে অন্যান্য সকল শ্রেণীর মানুষের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েও—ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের—অর্থাৎ গান্ধীজীর আস্থা অর্জন করতে না পারি।" মনে রাখবেন—এই বিবৃতি, যে-বিবৃতিতে গান্ধীজী সুভাষকে দেশের শত্রু নন বলে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন—তারই জবাবী বিবৃতি। সুভাষচন্দ্রের অন্তর যে কত উদার ছিল এই বিবৃতিই তার অন্যতম সাক্ষ্য।

এই আলোচনা আরও কিছুটা করব। ঘটনাগুলো তুলে ধরছি—মন্তব্য অবশ্য আমার নিজের।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ১২ জন সদস্যের পদত্যাগের উল্লেখ আগে করেছি। তখন সুভাষচন্দ্র খুব অসুস্থ। স্বাস্থ্য ভগ্নপ্রায়—তার ওপর এই টানা-পোড়েন। কংগ্রেসের 'অহিংসবাদী' নেতারা এই অসুস্থতাকে 'রাজনৈতিক অসুখ' বলে ব্যঙ্গ করতেও দ্বিধা করেননি। কর্তব্যপরায়ণ

সৈনিকের মত তিনি পদত্যাগপত্রগুলি গ্রহণ করলেন। তিনি ও তাঁর বড় ভাই শরৎচন্দ্র বসু ছাড়া ওয়ার্কিং কমিটিতে আর কেউই রইলেন না। পদত্যাগ-পত্রগুলি গ্রহণ করায় নেতারা ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। দলের অচলাবস্থা দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টা তিনি করলেন, কিন্তু অবস্থা চলে গিয়েছিল তাঁর আয়ত্তের বাইরে। একের পর একটা আঘাত হানা হতে থাকল 'ওল্ড গার্ড' শিবির থেকে।

এর পর যা ঘটল তা কংগ্রেস দলের ইতিহাসে কলঙ্কজনক অধ্যায় বলেই গণ্য হবে। নানা চিঠিতে এই সব নেতাদের শিবির থেকে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হুমকী বর্ষিত হচ্ছিল 'হয় আপনি সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিন নতুবা অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন হোন'। তখন সুভাষচন্দ্র কঠিন নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত। তার ওপর একের পর এক এই অহিংস আঘাত। এদিকে ত্রিপুরীতে ডেলিগেটদের কাছে এবং জনতার কাছে ফিস্‌ফিস্‌ করে বিরামহীন প্রচার চালান হল 'সুভাষবাবু আদৌ অসুস্থ নন—অসুস্থতার ভান করে লুকিয়ে আছেন'। সুভাষচন্দ্র স্থির করলেন অসুস্থ শরীরেই এ্যাম্বুলেন্স-এ সম্মেলন প্রাঙ্গণে আসবেন। তখন তাঁর জ্বরের তাপ ১০৩ ডিগ্রী। রাত্রির অন্ধকারে চলল কুৎসিত সুভাষ-বিরোধী সংকীর্ণ অপপ্রচার। এসব কোন কিছুই গান্ধীজী বা নেহরুজীর অজানা ছিল না। নেহরু এই সময় অবস্থা দেখে সুভাষচন্দ্রকে জব্বলপুর হাসপাতালে পাঠাবার প্রস্তাব করেছিলেন। ক্ষত সৃষ্টি করে মলম দিতে এগিয়ে এলেন। একজন সংগ্রামী সহকর্মীর প্রতি দরদের অভাব তো দেখান যায় না! ভবিষ্যতের ইতিহাস-লেখক—লেখক-বুদ্ধিজীবীরা বলবেন, আর যাই হোক নেহরুজী 'প্রগতিশীল'—তিনি সর্দার প্যাটেল, শঙ্কর রাও, ভুলাভাই দেশাই, আজাদের মত 'সংকীর্ণতাবাদী' 'sectarian' ছিলেন না—তিনি লিবার‍্যালিজিম-এর নাইটিংগেল! যুদ্ধক্ষেত্রে প্রীতি-মমতার প্রদীপ জ্বালিয়ে আহত সৈনিকদের শুশ্রূষার জন্য কাতর! সুভাষচন্দ্র বললেন: "I have not come here to go to hospital in Jubbalpore. I would much rather die here than be removed else where before the session was over." "জব্বলপুর হাসপাতালে ভর্তি হবার জন্য আমি এখানে আসিনি। আমি বরং এখানেই মৃত্যু বরণ করব তবু অধিবেশন সমাপ্ত হবার আগে হাসপাতালে যাব না।"

সুভাষ-বিরোধিতার রাজনীতিতে যে নোংরামির আশ্রয় সেদিনের অহিংস-বাদী নেতারা ও তাঁদের অনুগামীরা নিয়েছিলেন তার তুলনা মিলবে না।

এই সমস্ত বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের এক মর্মস্পর্শী রচনা বিখ্যাত 'মডার্ণ রিভ্যু' পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যায় 'My Strange Illness' শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছিল। ত্রিপুরী অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির বিশিষ্ট চিকিৎসক—ভারত-বিখ্যাত চিকিৎসক স্যার নীলরতন সরকারের সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বুলেটিনও অহিংসবাদী নেতাদের মনে দাগ কাটেনি। তাঁরা আগে প্রচার চালিয়েছিলেন এ অসুখ ভুয়ো, সাজানো ব্যাপার। ব্যাপারটা এতদূর গড়ায় এবং মধ্য প্রদেশের যে সব চিকিৎসক সুভাষচন্দ্রের চিকিৎসা করছিলেন তাঁরাও এঁদের আচরণে বিস্মিত ও মর্মাহত হন। ব্যাপার কিন্তু এখানেই থামেনি। ডাক্তারদেরও এঁরা অবিশ্বাস করতে থাকায় শেষে একটা 'মেডিক্যাল বোর্ড' বসান হল অভ্যর্থনা সমিতির উদ্যোগে। এই বোর্ডে ছিলেন—Inspector General of Civil Hospitals C. P. and Berar এবং Civil Surgeon, Jubalpore. তাঁরা পরীক্ষা করে যৌথ বিবৃতি দেবার পর হাওয়া ঘুরতে লাগল। গণতন্ত্রের নামে কংগ্রেসে এ জিনিসও হয়েছে। কিন্তু এই বিশিষ্ট চিকিৎসকরা প্রকাশ্য অধিবেশনে তাঁর উপস্থিতি নিষিদ্ধ করেছিলেন স্বাস্থ্যের অবস্থার বিচারে।

এদিকে সারা ভারতের মানুষের উদ্বেগ-কাতর মন পড়ে ছিল এই নিঃসঙ্গ নেতার প্রতি। অগণিত চিঠি টেলিগ্রাম কংগ্রেসের অনুরাগীদের কাছ থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রোগশয্যায় তাঁর কাছে প্রতিদিন আসছিল। তিনি বুঝলেন নেতারা চক্রান্ত করলেও দেশবাসী ও কংগ্রেসকর্মীরা তাঁর পক্ষেই। দারুণ রোগে যন্ত্রণাকাতর রাষ্ট্রপতি জামাদোবা হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে ভেবেছেন: এই কি রাজনীতির চেহারা? এর জন্যই কি সবকিছু ছেড়ে মানুষ রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করে? দেশের রাজনৈতিক মহলের সর্বোচ্চ স্তরে যদি এই নীচতা নিষ্ঠুরতা পঙ্কিলতা থাকে—তাহলে তলাকার মানুষ কি বিশ্বাসে রাজনীতি আঁকড়িয়ে থাকবে?

"As I tossed in my bed at Jamadoba by day and by night, I began to ask myself again and again what would become of

our public life when there was so much of filthiness and vindictiveness even in the highest circles. My thoughts naturally turned towards what was my first love in life—the eternal call of the Himalayas. If such was the consummation of our politics why did I stray from what Sri Aurobindo Ghose would describe as 'the life divine'.. I spent days and nights of moral doubt and uncertainty. At times the call of the Himalayas became insistent. I prayed for light in my dark mind."

মনে আমার গভীর সংশয় এসেছে রাজনীতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। বাল্য-জীবনের হিমালয়ের আহ্বান আবার রোগশয্যায় ব্যথাক্লিষ্ট মনকে বার বার হাতছানি দিয়েছে। নীচতা—ক্ষুদ্রতার জ্বালা থেকে মন মুক্তির জন্য ছুটেছিল হিমালয়ের পানে 'দিব্য জীবনের' আদর্শের দিকে। মনের সংশয়ের সঙ্গে রাত্রি-দিন অহর্নিশি যুঝেছি। সংশয়ের দোলায় মন যখন দোদুল্যমান তখন ধীরে ধীরে আমি আবার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছি, মনের ভারসাম্য ফিরে পেয়েছি। মানুষের প্রতি দেশবাসীর প্রতি অভিমানে আঘাতে যে-বিশ্বাস হারাতে বসেছিলাম রোগশয্যায়—সে বিশ্বাস হঠাৎ ফিরে এলো। তখন মনে পড়ল :

"After all Tripuri was not real India. There was another India revealed by these letters, prescriptions medicine amulets, flowers etc. What grievance could I have against that India which was perhaps the real India ? Then again it struck me that at Tripuri there were two worlds. The pettiness and vindictiueness that I had experienced referred only to a part of Tripuri, what about the other part ? What grievance could I have against that part ? Further, inspite of what I had experienced at Tripuri, how could I lose my fundamental faith in man ? To distrust man is to distrust divinity in him—to distrust one's very existence. So

gradually all my doubts were dispelled till I once again recovered my normal robust optimism."

"আর যাই হোক একথা ঠিক, ত্রিপুরী-ই আসল ভারতবর্ষ নয়। আর একটি পৃথক ভারতবর্ষের ছবি আমার মানস নেত্রে ভেসে উঠল—যে ভারতবর্ষের কথা রোগশয্যায় অগণিত চিঠি শুভেচ্ছাবাণী—তারবার্তা—রোগ-চিকিৎসার নানাবিধ পরামর্শ প্রভৃতির মধ্যে ধরা দিয়েছিল সেদিন। সেই ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে আমার তো কোন আক্ষেপ—নালিশ—অভিমান নেই—থাকতে পারে না। এটা একটা পৃথক জগৎ—আর এইটাই তো আসল ভারতবর্ষ। ত্রিপুরীতে যে নীচতা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা উচ্চ মহলে দেখেছি—সেইটাই তো দেশের আসল চিত্র বা সবটা নয়। ত্রিপুরীর মর্মন্তুদ ঘটনাবলী আমাকে যত আঘাতই দিয়ে থাকুক না কেন মানুষের প্রতি আমার আস্থা দেউলিয়া হতে দিতে পারি না। মানুষকে অবিশ্বাস করার অর্থ—মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব আছে তার প্রতি বিশ্বাস হারানো। আর সেটা সম্ভব তখনই যখন মানুষ নিজের প্রতি আস্থা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলে। এইভাবে আত্ম-জিজ্ঞাসার মধ্যে দিয়েই আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম—মনের সকল সংশয়ের অবসান ঘটল। এক বলিষ্ঠ আশাবাদ আমাকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলল।"

প্রকৃত সত্যাশ্রয়ী আঘাতের মধ্যে দিয়েই সত্যকে নূতন করে উপলব্ধি করেন। তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন—

'সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালবাসিলাম—
যে কখনো করে না বঞ্চনা।' [রবীন্দ্রনাথ]

ত্রিপুরী অধিবেশনে পার্টি গণতন্ত্রের সর্বজনীন নীতিগুলি পুনঃ পুনঃ পদ-দলিত হয়েছে গণতন্ত্রের নামে, ন্যায়নীতি ও অহিংসার নামে। আঘাতের পর আঘাত হেনে সুভাষচন্দ্রকে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু তিনি গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতি অবিচল আস্থা রেখে নিঃসঙ্গ সংগ্রাম চালিয়েছিলেন অন্যায় চক্রান্ত অশোভন হীন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। কংগ্রেসের প্রচারিত আদর্শে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের ফেলে-আসা অতীতের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা নেওয়া কর্তব্য। নেতা-পুজোর মানসিকতা পরিত্যাগ করে যা কিছু অন্যায় যা অসত্য তারই বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান দলের সভ্যদের কর্তব্য।

কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্র সকল কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের সামনে সেই মহান শিক্ষা রেখে গেছেন। নেতা যা-কিছু বলছেন তাই মেনে নেওয়া অন্যায়। এই মানসিকতা একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সহায়ক, ফ্যাসিবাদ অথবা সমগ্রতন্ত্রিক কমিউনিজম্-এর সূতিকা-গৃহ। আজকের কংগ্রেস নেতারা কেউই গান্ধীজী নেহরুজী সর্দারজী (প্যাটেল) বাদশা খাঁ ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ আজাদ-এর চাইতে নিশ্চয়ই বেশী ব্যক্তিত্ব বা প্রতিভা-সম্পন্ন নন। অন্যায়ের কাছে কোন অবস্থাতেই নতি স্বীকার না করে, বিদ্রোহ ঘোষণা করে পার্টি-গণতন্ত্রের ইতিহাসে মহা উজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করে গেছেন। আজকের কংগ্রেসকর্মীরা সেই ঐতিহ্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান কেন হবেন না? ভয়? কিসের ভয়? এ পৃথিবীতে যা কিছু অন্যায় যা কিছু কুৎসিত বীভৎস তাই ভয়ের মুখোশ পরে অন্যদের ভয় দেখায়। যারাই জীবনে এই ভয়ের মুখোশকে প্রকৃত ভয়ের কারণ বলে সমীহ করেছে—ভয় করেছে—জীবনে তারাই পরাস্ত হয়েছে।

তুনিয়ায় যারা মরে কিন্তু প্রাণ দিতে ভয় পায় সম্মানের রাজ-তিলক তাদের ললাটে কোনদিন অঙ্কিত হয় না। ইতিহাস বার বার চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের সেটা দেখিয়ে দিয়েছে। সত্যাশ্রয়ীরা যুগে যুগে অসম্মান সয়ে নির্যাতন দুঃখ-বরণ ও প্রাণ দিয়েই ইতিহাসে বরণীয় হয়েছেন স্মরণীয় হয়েছেন। ইতিহাস রাণা প্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজী, নেতাজী সুভাষচন্দ্রকেই চিরস্মরণীয় করেছে, মানসিংহদের কখনই করেনি। জীবন-যুদ্ধে হয় শিবাজী রাণা প্রতাপ সুভাষ-চন্দ্রের পথ বেছে নিতে হবে, আর না হয় মানসিংহদের পথ বেছে নিতে হয়। রাণা প্রতাপ সুভাষচন্দ্রের পথ যাঁরা অনুসরণ করে থাকেন রাজ-সিংহাসনের বৈভব দাপট আরাম তাঁদের জন্য নয়; তাঁদের স্বাধীনতা লাভের জন্য ঘাসের রুটি খেতে হবে, পর্বত-গহ্বরে, অন্ধকার প্রকোষ্ঠে দিন কাটাতে হবে, কণ্টক-শয্যায় শয়ন করতে হবে, অবিরাম যুদ্ধ করতে হবে অন্যায়ের সাথে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। তাঁদের কপালে জুটবে লাঞ্ছনা নিপীড়ন নিগ্রহ অপমান। মানসিংহদের পথ যাঁরা নেবেন ইজ্জত-সম্মান নীতি-ধর্ম-সত্য সব কিছুর বিনিময়ে প্রতিষ্ঠা-সম্ভোগ-সুখ-বৈভব লাভ করবেন তাঁরা। তাঁদের তথাকথিত প্রতিষ্ঠা বা সম্মান-বৈভব কিন্তু তাঁদের গলদেশের বকলেশের দাগকে জনতার চোখ থেকে আড়াল করতে পারে না। অদৃশ্য শিকল 'প্রভুদের' হাতের মুঠিতেই লুকানো থাকে। সুভাষচন্দ্র ভারত ইতিহাসের পুরাণ-পুরুষ এই মহাসত্য তাঁর উত্তর-সাধকদের

কাছে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। মহাসত্যের সাধকের পরাজয় নেই, মৃত্যু নেই আদর্শ আইডিয়া অবিনশ্বর।

কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডী সুভাষচন্দ্রের মহান ঐতিহ্যকে কংগ্রেস ঐতিহ্যের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে স্বীকার না করার অবিমৃষ্যকারিতা। কংগ্রেসীদের কর্তব্য ছিল এই ঐতিহ্যকে দলের ঐতিহ্য বলে বরণ করে নেওয়া। এতে কংগ্রেস নূতন প্রাণ-চাঞ্চল্যে মুখর হয়ে উঠতে পারত।

ত্রিপুরী অধিবেশনে, যেকথা বলতে বলতে সরে এসেছিলাম, পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, কট্টর দক্ষিণ-পন্থী গান্ধীভক্ত নেতা উত্থাপন করলেন এক প্রস্তাব যা কংগ্রেস ইতিহাসে 'পন্থ প্রস্তাব' ('Pant Resolution') বলেই পরিচিত। এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। আর এতে বলা হল যে, রাষ্ট্রপতি যাঁদের ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য মনোনীত করবেন তাঁদের প্রত্যেকেরই গান্ধীজীর আস্থা-ভাজন হওয়া চাই। এই প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনে পরাজিত সেনাপতিরা কৌশলে সমগ্র দল ও দেশের কাছে সুভাষচন্দ্রকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইলেন। সুভাষচন্দ্র জিতলে কি হবে? তিনি গান্ধীজীকে ছাড়িয়ে যেতে তো পারেন না। নির্বাচনে দল সুভাষচন্দ্রকে নেতারূপে মেনে নিলেও গান্ধীজী ছাড়া তাঁর কোন পৃথক সত্বাই নেই। এও আর এক কুৎসিত চক্রান্ত। এ রাজনীতি কখনই গণ-তন্ত্রের সহায়ক হয় না। এই অগণতান্ত্রিক ট্র্যাডিশনকে ভাঙার চেষ্টাও হচ্ছে না।

পণ্ডিত নেহরু সর্দার প্যাটেল ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা, যাঁরা সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা করে বলেছিলেন কংগ্রেস দলের নীতি কার্যসূচী দলই নির্ধারণ করবে অথবা এ. আই. সি. সি. বা ওয়ার্কিং কমিটি তারাই এই নূতন ক্রুর কৌশলের জনক। কোথায় গেল ওয়ার্কিং কমিটির সার্বভৌমত্ব? কোথায় গেল এ. আই. সি. সি.-র প্রাধান্য? সব কিছুই ঠিক করবেন গান্ধীজী। আর গান্ধীজী বলতেন 'আমি দলের চার আনার সভ্যও নই' ('I am not even a four anna member of the Congress')। কোথায় রইল তাহলে গণতন্ত্রের আদর্শ? কি ওয়ার্কিং কমিটি, কি এ. আই. সি. সি. সবই ক্রীড়নক মাত্র; একজন সর্বোচ্চ নেতার হাতের খেলার-পুতুল, শিখণ্ডি মাত্র।

এ পরিস্থিতি সুভাষচন্দ্র মানেন নি। এই প্রস্তাবের অর্থ হল গান্ধীবাদীদের ভোটে পরাজিত হয়েও কৌশলে নেতা-পুজোর মানসিকতাকে চাঙ্গা করা। পরাজিত গান্ধীপন্থীরা আপোষপন্থী দক্ষিণ-পন্থীদের দিয়েই ওয়ার্কিং কমিটি-

গঠনের বায়নাক্কা তুললেন। সুভাষচন্দ্র বার বার গান্ধীজীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন সহযোগিতার জন্ত। তিনি 'কম্পোজিট ক্যাবিনেট' (Composite Cabinet) করতে চেয়েছিলেন সর্বমতাবলম্বীদের নিয়ে। দক্ষিণপন্থীরা চাইলেন 'হোমোজিনিয়াস ক্যাবিনেট' (Homogeneous Cabinet)—একই মতাবলম্বীদের নিয়ে গঠিত ওয়ার্কিং কমিটি। অনুগত সৈনিকের মত 'পন্থ প্রস্তাব' মেনে নিয়েই তিনি পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন। তিনি বলেছিলেন তাঁর সেই গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতিতে:

"Moreover, my own conviction is that in view of the critical times that are ahead of us in India and abroad, we should have a composite cabinet commanding the confidence of the largest number of congressmen possible reflecting the composition of the general body of the Congress." [Statement made on April 29, 1939 before A. I. C. C. meeting at Calcutta]

তিনিই তো কংগ্রেসকে গোষ্ঠীতন্ত্রের হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। অন্ত কেউ নন। বিভিন্ন মতাবলম্বী কংগ্রেসীদের সঙ্গে নিয়েই তিনি মুক্তি-সংগ্রামকে ব্যাপক রূপ দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। দক্ষিণপন্থীরা তাতে রাজী হননি। অহিংসার পূজারীরা কেন এত অসহিষ্ণু হলেন সেদিন ভিন্ন মতাবলম্বীদের সম্বন্ধে? সেই একই ট্র্যাডিশন তো আজও বিদ্যমান। ভিন্ন মতাবলম্বীদের সর্বক্ষেত্র থেকে বিতাড়নের রাজনীতিই আজকের 'দলীয় গণতন্ত্রের' মূল কথা। সেদিন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের গান্ধীজীর আস্থাবান হওয়া আবশ্যিক করা হয়েছিল। 'গান্ধীজীকে দলের সর্বোচ্চ ও শেষ আদালত' বলে দেওয়া হয়েছিল সদস্যদের কাছে। [এ-যুগে শ্রীমতী গান্ধীকে দলের সুপ্রীম কোর্ট বলে থাকেন প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতারা। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬.৪.৫৫] দেশ স্বাধীন হবার পর প্রধানমন্ত্রী নেহরুজীর পছন্দমত ব্যক্তিদেরই ওয়ার্কিং কমিটিতে স্থান হত। আর আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর মনোমত ব্যক্তিরাই ওয়ার্কিং কমিটিতে স্থান পেয়ে থাকেন। এঁদের পেছনে থাকা চাই 'প্রগতিশীলতার' সার্টিফিকেট। দলে সমালোচনার মুখ বন্ধ। এ মানসিকতা কখনই গণতন্ত্রের সহায়ক হতে পারে না। এ দৃষ্টিভঙ্গী

একদিন প্রকৃত গণতন্ত্রের মহা দায় হয়েই দাঁড়াবে। কি কেন্দ্রে, কি প্রদেশে প্রদেশে, একই রাজনীতির ধারা চলেছে।

গান্ধীজী নেহরুজী থেকে আজ পর্যন্ত কংগ্রেস-নেতৃত্ব মৌলিক স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল কোন নেতাকে কংগ্রেস নেতারূপে মেনে নেননি। একনায়কতন্ত্রীরা গণতন্ত্রের মুখোশ পরে মঞ্চে অভিনয় করে এসেছেন।

সেদিন সুভাষচন্দ্র নিজের পছন্দমত ব্যক্তিদের নিয়ে, তাঁর মতানুরাগী ব্যক্তিদের নিয়েই তো ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি এবং তার পক্ষে জোরাল যুক্তি দিয়েছিলেন। এরকম কমিটি যদি তিনি গঠন করতেন তখনই 'পন্থ-প্রস্তাব' ভঙ্গ করার অভিযোগ তুলে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হত। যে ফাঁদ সুকৌশলে পাতা হয়েছিল তাতে তিনি পা বাড়ান নি। তিনি বলেছিলেন :

"I may say that such a step would be contrary to the directions in Pantji's resolution which provides *inter alia* that the Working Committee should be formed in accordance with the wishes of Gandhiji and should command his implicit confidence. If I formed such a committee as advised above, I would not be able to report to you that the committee commanded his implicit confidence." [Resignation letter]

সভাপতিরূপে পদ আগলিয়ে রেখে সংগঠনের কাজে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে এই মামুলি অভিযোগ করার সুযোগও তিনি দিলেন না। পণ্ডিত নেহরু যথারীতি পদত্যাগ প্রত্যাহারের আবেদন করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র তাতে কর্ণপাত করেন নি। তিনি বলেছিলেন তাঁর অনুরোধের উত্তরে :

"Serious and critical times are ahead of us. We must pool our resources and pull our whole weight if we are to emerge triumphant out of the external crisis that is fast overtaking us ·· What does it matter if I am not in the Presidential chair ? My services will always be at the disposal of the Congress and of the Country for what they are worth.

I claim to have sufficient patriotism and sufficient sense of discipline to be able to work as an ordinary soldier in this great fight for India's political and economic emancipation."

[S. C. Bose]

"দেশের সম্মুখে দারুণ সঙ্কট। সকল শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করে সংগ্রামে ঝাঁপ দিতে হবে। আমার নিজের আত্মদানের জন্য সদা প্রস্তুত আমি। নাই বা থাকলাম রাষ্ট্রপতির পদ আঁকড়িয়ে। দেশের মুক্তি-সংগ্রামে—কি রাজনৈতিক কি অর্থনৈতিক—সাধারণ সৈনিকের মত সর্বস্ব পণ করে সংগ্রাম করার মত শৃঙ্খলাবোধ ও দেশপ্রেম আমার আছে।" সুভাষচন্দ্র মুখের মত জবাবটা ছুঁড়ে মেরেছিলেন সেদিন। ত্রিপুরী কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতির পদে যখন সুভাষচন্দ্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে রাজী হলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিদের অনুরোধে—তখন পণ্ডিত নেহরুই এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াবার পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন :

"I have had experience of Congress Presidentship during trying times and on several occasions I was on the point of resigning, because, I felt that I could serve our cause and Congress better without office ·····I was equally clear Subhas Babu should not stand. I felt that his and my capacity for effective work would be lessened by holding this office, at this stage. I told Subhas Babu too." [Statement dated January 26, 1939, Almora.]

"আমারও সঙ্কটকালে রাষ্ট্রপতির পদে থাকার অভিজ্ঞতা আছে। আমি সেই সব সময় পদত্যাগ করার কথা ভেবেছি কারণ আমি বিশ্বাস করি পদ আঁকড়িয়ে না থেকে বাইরে থেকেই দলের এবং আদর্শ রূপায়ণের কাজে বেশী কার্যকরী হতে পারা যায়। সুভাষবাবুকেও আমি সেই পরামর্শ দিয়েছিলাম। কি আমি, কি সুভাষবাবু আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রপতির পদ আঁকড়িয়ে থাকলে ভুল হবে—আমাদের উভয়েরই কার্যকারিতা তাতে হ্রাস পাবে।" [নেহরু]

নিজের সম্বন্ধে এই দার্শনিকের মত কথা বলে পরে যখন সেই অপ্রার্থিত নেতা রাষ্ট্রপতির পদ জাতির সঙ্কট মুহূর্তে ছেঁড়া চটির মত ছেড়ে আসতে

চাইলেন—তখন তাঁকে পরামর্শ দেওয়া হল: 'পদত্যাগ করবেন এই সঙ্কট-কালে?' নৈব নৈব চ। গদি আঁকড়ে বসে থাকুন আর আমাদের অহিংস-বাদীদের তূণের বাছা বাছা নির্যাতন-অপমানের শরের আঘাত সহ্য করুন। আপনার বিপ্লবী-চরিত্র হননের অপূর্ব সুযোগ তোলা থাকবে বিরুদ্ধবাদীদের হাতে; নিন্দাবাদ—চরিত্র-হনন যে রাজনীতির জপের মালার রুদ্রাক্ষ। সকল দলেই এই শ্রেণীর মানুষ আছেন। যিনি সর্বত্যাগী বিদ্রোহী সন্ন্যাসী—পদের মোহ তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারে না।

তিনি আচরণ দিয়ে প্রমাণ করে দিলেন যে, পরাধীন দেশের জননেতার সর্বোচ্চ সম্মানের সুউচ্চ আসন শিখর থেকে আদর্শের আহ্বানে আত্মসম্মানের তাগিদে ও বিবেকের আহ্বানে নেমে এসে পদাতিক সৈনিকদের পাশে দাঁড়ানই আদর্শবাদীর ধর্ম। আদর্শ ন্যায়-নীতি-সত্যকে পদদলিত হতে দেখেও যিনি নীরব থাকেন দলীয় 'এস্‌ট্যাব্‌লিশমেণ্ট'-এর অচলায়তনকে রক্ষা করার জন্য তিনিই নীতি-ত্যাগী বলে চিহ্নিত হবেন ইতিহাসে ও জীবনে। কবে কোন্ নিছক-সমালোচক নিন্দুক 'ডিফেকশন' বলে চিত্রিত করবে সেই মিথ্যা নিন্দাভয়ে সত্যাশ্রয়ী কি নীরব দর্শকের ভূমিকা নিতে পারেন?

জোর করে তিনি সেদিন তাঁর মতবাদ ও কর্মসূচী সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে দলের ওপর চাপিয়ে দেননি। যখন দলকে সংগ্রামের পথে নিয়ে আসতে পারলেন না তখন অনন্যোপায় হয়ে তিনি কংগ্রেসের দলের মধ্যে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' উপদল গঠন করলেন, যেমন গয়া কংগ্রেসের পর অনুরূপ পরিস্থিতিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ 'স্বরাজ্য দল' কংগ্রেসের অভ্যন্তরে গঠন করেছিলেন। তিনি নিজেই বলেছিলেন: "···· either the Congress as a whole must undergo radical reorganization or a new party would have to be formed within the Congress."

যাঁরা প্রচার করে থাকেন জাতীয় কংগ্রেসকে 'প্রগতিপন্থী' জনকল্যাণের বাহক দলরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা ১৯৬৯ সাল থেকে—দলের নেতৃত্ব পরিবর্তনের লড়াই থেকেই সুরু হয়েছে তাঁরা আদৌ সত্য কথা বলেন না। উপরের বিবৃতির অংশটি থেকেই বোঝা যাবে সুভাষচন্দ্র পুনঃপুনঃ কংগ্রেস দলকে radicalize করার আহ্বান জানিয়েছেন—চেষ্টা করে এসেছেন। ১৯৩৮ সাল থেকেই তিনি সংগঠনের রূপান্তর ঘটাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী-

শোষণ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে স্থানীয় ভিত্তিতে, প্রদেশ ভিত্তিতে সংগ্রাম সুরু করার আহ্বানও তিনি জানালেন নূতন এই বাম উপদল (ফরোয়ার্ড ব্লক) গঠন করে। আপোষপন্থী কংগ্রেসের ওপরতলার নেতাদের সম্বন্ধে তাঁর হুঁশিয়ারী তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টিরই পরিচয় বহন করে। ঠিক তিনি যখন আপোষহীন স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্ম ব্রিটিশ সরকারকে 'চরম পত্র' দেবার কথা বলেছিলেন সেই সময় গান্ধীজী দিল্লীর বড়লাট প্রাসাদে বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছিলেন (১৫ই মার্চ, ১৯৩৯)। গান্ধীজী এই সময় এক সমালোচনার উত্তরে বলেছিলেন: "আপোষ সত্যাগ্রহীর পক্ষে অপরিহার্য কর্মসূচী।"

কিন্তু যে আপোষহীন সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরী ভাষণে, পরবর্তী বিভিন্ন বক্তৃতায় এবং রামগড় অপোষবিরোধী সম্মেলনে, সে-ডাকে দক্ষিণ-পন্থী নেতারা সাড়া দিলেন না। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে গান্ধীজীই 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ('Do or die') সঙ্কল্প নিয়ে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপ দেবার আহ্বান জানালেন, নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। ভারতবর্ষ তখন কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিচালনার এবং যুদ্ধের যাবতীয় রসদ সরবরাহের বৃহত্তম ঘাঁটিরূপে পূর্ণোদ্যমে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-যন্ত্রকে চালু রেখেছে। বিপুল সুসজ্জিত ব্রিটিশ সেনাবাহিনী যে-কোন আন্দোলনের মোকাবিলা করার জন্য দেশের সর্বত্র মোতায়েন ছিল। অথচ ১৯৪০ সালেও খোদ ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন শহর রক্ষার ন্যূনতম সামরিক প্রস্তুতিটুকুও ছিল না। শূন্য মদের বোতল হাতে নিতে হয় তাই সই, ফ্যাসিস্ট বাহিনীর সঙ্গে মাঠে-পাহাড়ে কলে-কারখানায় অলিতে-গলিতে লড়াই চালিয়ে যাবার জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন।

স্বাধীনতা-যুদ্ধ পরিচালনার জন্য পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে কোন্ সময় অধিক উপযোগী ছিল? ১৯৩৯, না ১৯৪২? গভীর ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি কার ছিল? গান্ধীজীর, মৌলানা আজাদের, সর্দার প্যাটেলের, পণ্ডিত নেহরুর, না সুভাষচন্দ্রের? কঠোর বাস্তববাদী নেতার যোগ্য পরিচয় সেদিন কে দিয়েছিলেন? গান্ধীপন্থীরা, না সুভাষচন্দ্র? ১৯৩৯ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রাক্কালে সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা করে—মৌলানা আজাদকে প্রার্থী করার পক্ষে বিবৃতি দিয়ে গিতে নেহরুজী বলেছিলেন 'কেন মৌলানা আজাদকে সমর্থন

করা দরকার' কারণ, তিনি "an elder statesman of the Congress" তাঁর নাকি ছিল "delicate insight and sensitiveness". তাঁর আরও ছিল "keen intelligence and *rare* insight". পণ্ডিত নেহরু বলেছিলেন এইসব কারণে, 'মৌলানা সাহেবের এই গভীর অনন্যসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির জন্যই তাঁর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা দিন দিন বেড়ে গেছে।

কিন্তু বেদনাহত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা বার বার জাগে : ভারতের আধুনিক কালের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র ছাড়া অন্য কোন্ নেতা এই 'rare insight'-এর পরিচয় দিয়েছিলেন ? পণ্ডিতজী উদারতার পরিচয় দিয়ে তো কখনই পরবর্তীকালে 'স্টেটস্‌ম্যানশিপে'র এই ঐতিহাসিক অসাধারণ দূরদৃষ্টির সপ্রশংস উল্লেখ করেন নি ? তাঁর এই দূরদর্শিতা ও অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির, সাংগঠনিক প্রতিভার পুরস্কাররূপে বদান্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে জুটল 'শাহ্‌নওয়াজ খান কমিশন' (তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী মারা গেছেন এই মিথ্যা কাহিনী প্রমাণ করার জন্য)। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আরও জুটল 'খোসলা কমিশন'। কমিউনিস্টদের কাছে এই বিশ্ববরেণ্য নেতা চিহ্নিত হয়েছিলেন 'দেশদ্রোহী' 'বিভীষণ' 'কুইস্‌লিং' 'পঞ্চম বাহিনী' রূপে। (অবশ্য ২৮ বছর লেগেছিল, তাঁদেরই প্রথম সারির এক নেতার আবিষ্কার করতে যে, নেতাজী-মূল্যায়নে তাঁরা সম্পূর্ণ ভুলই করেছিলেন। ইতিহাস নূতন করে লিখতে গিয়ে এই 'স্বীকারোক্তি' ইতিহাস রচয়িতার কাজে লাগবে নিঃসন্দেহে; কিন্তু ঐতিহাসিক ক্ষতির খেসারত হয় না তাতে।)

যাঁরা দেশের মুক্তি সংগ্রামে জীবন-সর্বস্ব পণ করলেন, যে-নেতা দেশের মুক্তির জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ করার জন্য মুক্তিযুদ্ধের মহাকাব্য সৃষ্টি করলেন তাঁরা 'দেশদ্রোহী' 'কুইসলিং' 'ফ্যাসিস্ত' 'পঞ্চমবাহিনী', না—যাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে গোটা দেশকে সাম্রাজ্যবাদীদের কামানের তোপের খাদ্য করার কুৎসিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকে মুক্তিযুদ্ধের সর্বনাশ সাধনে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন, নেতাজীর মুক্তি-যুদ্ধ ও ঐতিহাসিক আগস্ট বিপ্লবের বিরোধিতা করেছিলেন ? ঐতিহাসিক কৃতঘ্নতা ও বেইমানিকে নিছক নিষ্পাপ 'ভুল' বলে স্বীকারোক্তি করলে পাপস্খালন হয় না। সেদিন যাঁরা নেতাজী-বিরোধিতায় ও আগস্ট বিপ্লব বিরোধিতায় মাতোয়ারা হয়ে ব্রিটিশ-প্রভুদের

আনন্দবর্ধন করে 'প্রিয়' হয়েছিলেন—যাঁরা দেশকে দু টুক্রো করে—'হিন্দুস্থান' 'পাকিস্তান' সৃষ্টির সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে—মুসলিম 'জাতির' 'আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার' বলে—পাকিস্তান সৃষ্টি দ্বারা ভারত দ্বিখণ্ডিকরণের রাজনীতিকে অসত্য মারাত্মক তত্ত্বের পোশাক পরিয়ে সাম্প্রদায়িকতাবাদী শক্তির কাছে প্রিয় হবার মার্কসবাদী কৌশল এঁটেছিলেন—তাঁরা সেদিন নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ বাহিনীকে বিপ্লবী আহ্বান জানালে, নেতাজীর ডাকে সাড়া দিলে, আগস্ট গণ-বিপ্লবকে সমর্থন জানালে—দেশের অভ্যন্তরে শ্রমিক শ্রেণীকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্য উদ্বুদ্ধ করলে—মাগ্গি ভাতা বর্ধিত বেতন ওভার টাইমের প্রলোভনকে পরিহার করে, আগস্ট বিপ্লবে যোগদানের আহ্বান জানালে ভারতের ইতিহাসের মোড় ঘুরত নিঃসন্দেহে। অখণ্ড ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাকে কেউ রুখতে পারত না,—ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হত না—লক্ষ লক্ষ মানুষ বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বলিও হত না—লক্ষাধিক নারী চিরতরে সম্মান-লুণ্ঠিতা হয়ে অপহৃতাও হতেন না—এক কোটিরও বেশী শান্তিপ্রিয় দেশবাসীর গৃহ দাঙ্গার আগুনে ধ্বংস হত না। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীন শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ ভারত নেতাজী-প্রদর্শিত পথে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে নিজের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী সকল চক্রান্তকে স্তব্ধ করতে অগ্রণী হতে পারত। কেন তা হল না? কাদের দোষে? কাদের অপরাধে? সে মূল্যায়ন কি একদিন হবে না? ইতিহাস-লেখক কি বেছে বেছে উপযোগী প্রয়োজনীয় মিথ্যা দিয়েই মন-গড়া তত্ত্ব প্রমাণ করতে চাইবেন?

দেশের জন্য যিনি সর্বস্ব দিলেন সেই মহাবিপ্লবী সর্বত্যাগী নেতা অবসর-প্রাপ্ত সুবিধাভোগী এক প্রাক্তন বিচারপতির বিচারে আজ (১৯৭৪) একজন শুধুমাত্র 'impractical politician' 'বাস্তবতাবোধশূন্য রাজনীতিবিদ'। প্রকৃত 'বাস্তববাদী' বিচারপতি তো মাননীয় শ্রীখোসলা। [খোসলার অন্যায় কুরুচিপূর্ণ অশোভন উক্তিগুলি আর উল্লেখ করব না। ভারতের লোকসভায় সোস্যালিস্ট সদস্য অধ্যাপক সমর গুহ তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার বর্ষণ করেছেন। সুভাষচন্দ্র-বিরোধী চক্রান্ত আজও খুব তৎপর ও সক্রিয়।] 'বাস্তববাদিতার' পরীক্ষায় আগে থেকে পাশ না করলে কি কমিশনের সভাপতি হতে পারতেন? দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিপুল ব্যয়ে ভ্রমণের এতবড় সরকারী সুযোগ, সুনির্দিষ্ট

মোটা বেতন, সংবাদপত্রের ধারাবাহিক পাবলিসিটি ক'জন 'বাস্তববাদীর' ভাগ্যে জোটে ? 'বাস্তববাদীরাই' তো রথও দেখেন আবার সেই সঙ্গে কলাও বেচেন—দুধও খান আবার তামুকও খান। তাঁরা যখন যেমন তখন তেমন।

দুনিয়ায় সকল আদর্শবাদী সকল সত্যাশ্রয়ীই তো 'অবাস্তব' 'পাগল', আর এই অবাস্তব ঘর-ছাড়া পাগলদের দলই যুগে যুগে অন্ধকারের বুকে ঝাঁপ দিয়ে এসেছেন। বাস্তবতাবোধ-বিবর্জিত বলেই ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে মহাত্মাজী 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন। আর 'বাস্তববাদীরা', সেদিনের কংগ্রেসের 'প্রগতিশীলরা' বিপ্লবের লগ্ন-নির্বাচন সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। 'এই মুহূর্তে বিপ্লবের ডাক দিলে গণতান্ত্রিক ব্রিটেন ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী দুনিয়া কংগ্রেস সম্বন্ধে কি ভাববে ?' অরাজকতা ও ফ্যাসিবাদ সম্বন্ধে কংগ্রেসের ও দলের শক্তিশালী 'প্রগতিশীল' বলে চিহ্নিত একটি গোষ্ঠী যখন অহেতুক উদ্বেগ প্রকাশ করছিলেন, ব্রিটেন ও মিত্রপক্ষকে 'বিব্রত' করা হবে বিপ্লবের ডাক দিলে এই ভাবনা ভেবে উদ্‌ভ্রান্ত, তখন গান্ধীজী জনগণের বোধগম্য ভাষায় বলেছিলেন—'দেশে অরাজকতা আসে আসুক, ঈশ্বরের হাতে আমরা নিজেদের সঁপে দেব, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারকে ভারত ছাড়তেই হবে।' সেই বিপ্লবের যুগে আবার 'বাস্তববাদী' কমিউনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতা করে কাজ গুছিয়ে নিলেন। 'বাস্তববাদী রাজনীতি' করে আসছেন বলেই ভারতের কমিউনিস্টরা জন্ম-লগ্ন থেকে প্রতিটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তি-সংগ্রামের বিরোধিতা করেও তারা 'প্রগতিশীল' বামপন্থী বিপ্লবী।

একজন অবসরপ্রাপ্ত সুবিধাবাদী ওপরতলার আমলাকে দিয়ে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে এই রায় দেওয়া অমার্জনীয় ধৃষ্টতা, অসহনীয় অশোভনতা। 'বাস্তববাদী' প্রাক্তন এক বিচারপতিকে দিয়ে 'সব ঠিক হ্যায়'-রায় বাস্তববোধ-পক্ক—রাজনীতির 'স্লট্ মেশিন' থেকেই বেরিয়ে আসে। 'শাহনওয়াজ কমিশন' বসাবার প্রাক্কালে পার্লামেণ্ট সদস্য নেতাজীর সহকর্মী সংগ্রামী নেতা শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথের নানাবিধ প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী নেহরু বলেছিলেন 'নেতাজী জীবিত নেই।' কামাথজী এই উক্তির কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তিনি যদি কমিশন গঠন করে সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্যই আগ্রহীই ছিলেন তবে কেন আগ বাড়িয়ে এইরূপ বিবৃতি দিলেন ? এর দ্বারা কি কমিশনকে প্রেজুডিস্ করা

হল না? কমিশন কি রায় দেবেন সেটা বুঝতে কারুর আর অসুবিধা হয়নি সেদিন।

আবার আগের কথায় ফিরে আসা যাক। 'ফরওয়ার্ড ব্লকের' মাধ্যমে কংগ্রেসের অভ্যন্তবে আপোষ-বিরোধিতার মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য, লড়াইয়ের ক্ষেত্র প্রশস্ততর করার জন্য 'কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি'ও কংগ্রেসের ভিতরে এইভাবে একদিন সংগঠিত হয়েছিল। আজও তো নব কংগ্রেসের বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত নেতা কংগ্রেসের ভিতরে 'প্রগতিশীল' ভূমিকা নিতে কংগ্রেসকে বাধ্য করার জন্য 'নেহরু ফোরাম' অথবা 'সোস্যালিস্ট ফোরাম'-এর সমর্থক! সুভাষচন্দ্র ভুলটা কোথায় করেছিলেন 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠনে উদ্যোগী হয়ে? ফরোয়ার্ড এ্যাকশনের জন্য 'ফরোয়ার্ড ব্লক' তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল মূলত বিপ্লবী। বিভিন্ন প্রদেশে অঞ্চল-ভিত্তিক আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দিচ্ছিল ফরোয়ার্ড ব্লক। এটা কংগ্রেস-নেতৃত্ব ভাল চোখে দেখেন নি। অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি (A. I. C. C) সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের উদ্যোগে একটি নূতন প্রস্তাব গ্রহণ করল। এই প্রস্তাবে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সম্মতি ব্যতিরেকে যে কোন প্রদেশে সকল আইন অমান্য আন্দোলন নিষিদ্ধ হল। কংগ্রেসেব অভ্যন্তরে ভিন্ন-মতাবলম্বীদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে এইভাবে খর্ব করা হল। সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দেবার পর এক-মতাবলম্বী গান্ধীপন্থীদেব দিয়ে যে-ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়েছিল সেই কমিটিই ছিল এই সিদ্ধান্তের প্রকৃত জনক।

'প্যাটেল প্রস্তাব' কংগ্রেসেব ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শৃঙ্খলার নামে গোটা দলকে একটি বিশেষ ছাঁচে ঢালার চেষ্টা চূড়ান্ত রূপ পেল গণতন্ত্রেরই নামে কিন্তু। ভারতের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী প্ল্যাটফর্ম কংগ্রেসকে একটি সংকীর্ণ সংস্থারূপে দাঁড় করাবার ব্যবস্থা পাকা হল সেদিন। ত্রিপুরী সম্মেলনের আগে পর্যন্ত কংগ্রেস সভাপতি ভিন্ন-মতাবলম্বী বাম-ডান মার্গী গোষ্ঠীর নেতাদের দিয়েই যৌথ কমিটি 'Composite Cabinet' তৈরী করে আসছিলেন। এতে সর্বভারতীয় সংগঠনে বিভিন্ন চিন্তাবলম্বী জাতীয়তাবাদী সমাজবাদী গোষ্ঠীগুলি অবাধে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আসছিল। 'প্যাটেল প্রস্তাব' সে সুযোগ কেড়ে নিল। গণতান্ত্রিক বৃহত্তম দলটিকে সমগ্রতান্ত্রিক

ছাঁচে গড়ার চেষ্টা বলেই 'প্যাটেল প্রস্তাব' গণ্য হবে রাজনীতির ছাত্রদের কাছে। কংগ্রেস দলকে একনায়কতন্ত্রে চালাই-এর পথ প্রশস্ত হল।

'Homogeneous Cabinet' গঠনের গান্ধীবাদী নীতিটি ত্রিপুরী অধিবেশনের পর যেমন একটি মৌল সাংগঠনিক নীতিতে পরিণত হল, তেমনি এই অগণতান্ত্রিক নীতিকে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের ফর্মুলার পর্যায় থেকে দলের প্রত্যন্ত স্তর পর্যন্ত প্রয়োগ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হল। দল থেকে ভিন্ন-মতাবলম্বী —অর্থাৎ গান্ধীবাদী যাঁরা নন—তাঁদের বহিষ্কারের পরিবেশ তৈরী হল গণতান্ত্রিক কায়দায়। কেননা 'প্যাটেল প্রস্তাব' দলের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারক কমিটিতে ভোটেই গৃহীত হয়েছিল। এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে সারা ভারতব্যাপী 'প্রতিবাদ দিবস' উদযাপিত হল ৯ই জুলাই, ১৯৩৯। সুভাষচন্দ্র প্রতিবাদ-বিদ্রোহের নেতা ছিলেন। এর পরই তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে ১৮ই জুলাই শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে কেন তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না তার কারণ দেখাবার জন্য নোটিশ দিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করার ব্যক্তিগত অধিকার কেড়ে নেবার ব্যবস্থা চূড়ান্ত হল। এই নোটিশের জবাবে সুভাষচন্দ্র যে বিবৃতি পাঠালেন রাষ্ট্রপতির কাছে সেদিন সেটা শুধু কংগ্রেসের ইতিহাসেই নয়, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঐতিহাসিক দলিলরূপে বিবেচিত হবে। আজকের কংগ্রেসীদের, অন্যান্য সকল দলের সদস্যদের বড় প্রেরণার উৎস হবে সেই ছোট্ট দলিলটি। তিনি প্রসঙ্গত নোটিশের জবাবে বললেন:

"It is my constitutional right to give expression to my opinion regarding any resolution passed bv the A.I.C.C. · If you grant congressmen the right to express their views on resolution passed by the A.I.C.C. you can not draw a line and say that *only favourable opinions will be allowed expression and unfavourable opinions will be banned.* If we have the constitutionl right to express our views are favourable or unfavourable. Your letter seems to suggest that only expression of unfavourable views is to be banned." [S. C. Bose]

"দলের যে কোন প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার মতামত ব্যক্ত করার অধিকার আমার মৌল সাংবিধানিক অধিকার। ··কংগ্রেস সদস্য হিসাবে কংগ্রেসীদের যদি মতামত ব্যক্ত করার অধিকার স্বীকৃত হয় তাহলে নেতারা তখন বিভাজন রেখা টেনে বলতে পারেন না কেবলমাত্র সেই কংগ্রেসীদেরই মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে, যাদের মত ও সমালোচনা দলের নেতৃত্বের মতের পক্ষে যাবে। আর যে-সব সমালোচনা দলের পক্ষে অসুবিধাজনক সেই সব মতামতের কণ্ঠরোধ করা হবে। নোটিশ পড়ে মনে হবে দল চাইছে বিরুদ্ধ মতামত প্রকাশ দলীয় গণতন্ত্রে নিষিদ্ধ।" তিনি আরও বললেন:

"We have so long been fighting the British Government, among other things, for our Civil Liberty. Civil liberty, I take it, includes freedom of speech. According to your point of view we are not to claim freedom of speech when we do not see eye to eye with the majority in the A.I.C.C. or in the congress. It would be a strange situation if we are to have the right of freedom of speech as against the British Government but not as against the Congress or anybody subordinate to it. If we are denied the right to adversely criticise resolutions of the A.I.C.C. which in our view are harmful to the country's cause then it *would amount to denial of a democratic right.* May I ask you in all seriousness if democratic rights are to be exercised only, outside the Congress but not inside it ?" [S. C. Bose]

"আমরা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যে লড়াই করছি তার মধ্যে অন্যতম দাবী 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা'। মত প্রকাশের স্বাধীনতা ব্যক্তিগত স্বাধীনতারই অন্তর্ভুক্ত। আপনার দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী যাঁরা অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সঙ্গে সকল বিষয় একমত হয়ে একই সুরে কথা বলতে অক্ষম তাঁরা মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারী হতে পারেন না। এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি দাঁড়াবে: ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নাগরিক হিসাবে আমাদের মত প্রকাশের পূর্ণ অধিকার স্বীকৃত হবে, অথচ দলের মধ্যে সেই মৌল অধিকার

স্বীকৃত হবে না। অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক গৃহীত কোন প্রস্তাব বা কোন কংগ্রেস সদস্যের বিচারে ক্ষতিকারক বলে মনে হবে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার কেড়ে নেবার অর্থ সদস্যদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা। আমি কি জানতে পারি সত্যি সত্যিই গণতান্ত্রিক অধিকার ব্যবহারের ক্ষেত্র গণতান্ত্রিক দলের ভিতরের ব্যাপার নয় কেবলমাত্র বাইরের ?"

"...You will agree further, I hope, that it is open to a minority to carry on a propaganda with a view to converting the majority to its point of view. Now how can we do this except by appealing to Congressmen through public meeting and through writings in the press ? If you maintain that once a resolution is passed in the A.I.C.C. it is sacrosanct and must hold good for ever then you may have some justification for banning criticism of it. But if you grant us the right to revise or amend or alter or rescind a particular resolution of the A.I C.C. either through that body or through open session of the Congress then I do not see how you can gag criticism, as you have been trying to do." [Subhas Ch. Bose]

"আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন, আশা রাখি, যে দলের অভ্যন্তরে সংখ্যালঘিষ্ঠরা তাদের মতামতের পক্ষে প্রচারকার্য চালাবার অধিকারী সংখ্যাগরিষ্ঠদের তাদের অনুকূলে আনার জন্য। এটা কখনই করা যায় না যদি না প্রকাশ্য জনসভা এবং পত্র-পত্রিকা মাধ্যমে দলের সাধারণ সভ্যদের কাছে আবেদন রাখার অধিকার স্বীকৃত হয়। যদি একথা বলা হয় যে, A.I C.C যে প্রস্তাব গ্রহণ করে সেটা অনড় অপরিবর্তনীয় এবং চূড়ান্ত চিরকালের মত, তাহলে তার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ নিষিদ্ধ করাটা বোধগম্য। কিন্তু দলীয় গঠনতন্ত্রে গৃহীত প্রস্তাবের সংশোধন পরিবর্তনের অধিকার বাতিল করার অধিকার স্বীকৃত। সেটা A.I.C.C. অধিবেশনে অথবা প্রকাশ্য সম্মেলনে করা চলে। তাহলে সমালোচনার কণ্ঠরোধ করার নামান্তর নয় কি এই ধরনের নোটিশ জারী ?"

"I am afraid you are giving an interpretation to the word 'discipline' which I can not accept. I consider myself to be a stern disciplinarian and, I am afraid, that in the name of discipline you are trying to check healthy criticism. *Discipline does not mean denying a person of his constitutional and democratic right.*" [S. C. Bose]

"আমি দুঃখিত 'শৃঙ্খলা'-তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা দিতে চাইছেন আপনি তা মানতে পারছি না। আমি নিজে কঠোর শৃঙ্খলাবাদী হয়েই বলছি শৃঙ্খলার নামে সুস্থ সমালোচনার কণ্ঠ স্তব্ধ করতে চাইছেন আপনারা। শৃঙ্খলার অর্থ একজন সদস্যের সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা কখনই নয়।"

"Lastly, please do not forget that Mahatma Gandhi wrote in 'Young India', if my recollection is correct, *that the minority has the right to rebel.* We have not gone so far as to rebel against the decision of the majority, we have simply taken the liberty of criticising certain resolutions passed by the majority in the teeth of your opposition."

"পরিশেষে বলতে চাই দয়া করে ভুলবেন না মহাত্মা গান্ধী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় একসময় লিখেছিলেন সংখ্যালঘিষ্ঠদের বিদ্রোহ করার অধিকার আছে। আমরা 'প্রতিবাদ দিবস' পালন করে বিদ্রোহ করার পর্যায়ে যাইনি এখনো। যে প্রস্তাব (প্যাটেল প্রস্তাব) অন্যায় বলে মনে করেছি তারই প্রতিবাদ করেছি মাত্র। আর সেই প্রতিবাদ করাটা যদি অন্যায় হয় তাহলে স্বীকার করছি আমি মুখ্য আসামী (then I am the arch criminal)।"

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য 'অসন্তোজনক' বলে বিবেচনা করে ঘোষণা করলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি থাকার যৌক্তিকতা তিনি হারিয়েছেন। গণতন্ত্রের শাশ্বত আদর্শের পতাকা তুলে ধরতে গিয়ে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অজুহাতে বহিষ্কৃত হলেন তিনি। পরে গান্ধীজী স্বীকার করেছিলেন "সুভাষবাবু সম্পর্কিত প্রস্তাবটির খসড়া তিনিই রচনা করেছিলেন"। I must confess that the Subhas Babu—resolution was drafted by me" [Gandhiji]

ভারতের সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে গণতন্ত্রকে রক্ষা করার পবিত্র সংগ্রামে যাঁরা আগ্রহী তাঁদের কাছে এই স্মরণীয় দলিলটির তাৎপর্য অপরিসীম। যেসব যুক্তির অবতারণা সেদিন তিনি করেছিলেন প্রতিবাদ বিদ্রোহের সমর্থনে তা যুগে যুগে স্বাধীনতাকামী গণতন্ত্রীদের অমানিশার অন্ধকারে ধ্রুব-নক্ষত্রের মত চির উজ্জ্বল হয়ে রইবে। মানব-প্রেমিক গণতান্ত্রিক সুভাষের মহৎ স্বপ্নের শতদল প্রস্ফুটিত হয়ে পাঁপড়ি মেলবেই একদিন। শৃঙ্খলার অজুহাতে শাসকশ্রেণী বিভিন্ন দেশে যুগে যুগে ন্যায় ও সত্যের কণ্ঠরোধ করে এসেছে। মানুষের জন্যই, তার সুসমঞ্জস সমৃদ্ধি ও আত্মিক বিকাশের জন্যই, জীবনকে সবদিক দিয়ে ঝলমলিয়ে তোলার জন্যই শৃঙ্খলার প্রয়োজন। শৃঙ্খলার জন্য মানুষ নয়। ন্যায়সঙ্গত মত প্রকাশের, অন্যায় অবিচারকে দূরে সরাবার পথ যেখানে বন্ধ সেখানে বিদ্রোহ মানুষের জন্মগত অধিকার। সুভাষচন্দ্রের বিদ্রোহ ঘোষণায় প্রমাণ মিলল জীবনে অনড় বন্ধ্যা শৃঙ্খলা-তত্ত্বের ওপর সত্য আদর্শ ন্যায়নীতি মনুষ্যত্ববোধ বিবেকবোধের আসন পাতা।

১২

(ক) গণতন্ত্র ও আইনের শাসন

'আইনের শাসন' গণতন্ত্রের ভিত্তি ও অন্যতম সর্ত। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষার জন্য চাই আইনের অনুশাসন। প্রশ্ন উঠতে পারে সব রকম সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থাই তো কোন না কোন রকমের আইনের দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত। তাহলে 'আইনের শাসন' শুধু গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হবে কেন? কমিউনিস্ট দেশগুলিতেও তো নানা ধরনের আইন প্রচলিত আছে এবং জনগণ সেই সব আইন মেনে চলতে বাধ্য। ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রেও তো আইনের কড়া পাহাড়া বলবৎ থাকতে দেখা গেছে। সেইজন্যই 'শাসনের শাসন' এই তত্ত্বের একটা পরিষ্কার বিশ্লেষণ দরকার।

অনেকের ধারণা 'আইনের শাসন' বলতে শুধুমাত্র দেশের বিচার-ব্যবস্থা ও বিচারালয়ের স্বাধীনতা-নিরপেক্ষতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে দেশের বিচারপ্রথা এবং বিচারালয়ের ভূমিকাই মুখ্যত বোঝায়। সেটা কিন্তু আংশিকভাবে মাত্র সত্য। 'আইনের শাসনের' (Rule of Law) বিভিন্ন দিক আছে। দেশের বুদ্ধিজীবী মহলে এবং গণতন্ত্রীদের মধ্যে সেইসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা ও মত-বিনিময় ব্যাপকভাবে দরকার। 'আইনের শাসন' নিয়ে আলোচনা করতে গেলে জানা দরকার—আইনের তিনটি দিক আছে: (১) আইন প্রণয়ন, (২) আইনের ব্যাখ্যা এবং (৩) আইনের প্রয়োগ। আইন প্রণয়ন করেন দেশের আইনসভার সদস্যরা। আইনের ব্যাখ্যা করেন দেশের বিচারালয়। আর আইনের প্রযোগ করেন দেশের প্রশাসন, কর্মচারী, অফিসাররা। এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তি বা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মানুষই আইনের দাস। তাঁদের জন্যও সমভাবে আইনের শাসন মান্য। তাঁরাও আইনের শাসনের উর্ধ্বে নন। আইনের শাসন মানতে দেশের শাসক ও শাসিত সমভাবে বাধ্য।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিনিয়তই নূতন নূতন আইন রচিত হচ্ছে। আইন-প্রণেতাদের সব সময় মনে রাখা দরকার 'আইনের শাসন' ক্ষমতার সংযত ব্যবহারের সহায়ক। দেশের বিশেষ সমস্যার নিয়মতান্ত্রিক সমাধানের জন্য

জটিলতা দূর করার জন্য মানুষের বিশেষ বিশেষ অধিকারকে—সমাজের অধিকারকে সঠিক রূপ দেবার জন্য প্রয়োজনমত আইন প্রণীত হয়ে থাকে। আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য কখনই 'আরও, আরও বেশী ক্ষমতার অধিকারী হওয়া' নয়—বিশেষ সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ পূরণ বা চরিতার্থতার হাতিয়ার আইনসভাগুলি নয়। দেশের আইনসভা যদি বিশেষ বিশেষ সংকীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আইন প্রণয়ন করেন তাহলে সে-আইন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রণীত হচ্ছে না। দলীয় স্বার্থবোধ ও ক্ষমতার পরিধি বিস্তৃত করার জন্যই হচ্ছে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এর দ্বারা 'আইনের শাসন' লঙ্ঘিত হচ্ছে বলা চলে।

একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টিকে পরিষ্কার করা যেতে পারে। কিছুকাল আগে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্ট পার্লামেণ্টে নির্বাচিত সদস্য শ্রীচাওলার নির্বাচন অবৈধ বলে ঘোষণা করেন পরাজিত জনসংঘ দলের প্রার্থী শ্রীকানোয়ারলাল গুপ্তর আবেদনে। এটি কয়েকটি দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ রায় এবং রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে টাকার দাসত্ব থেকে মুক্ত করার পথে খুব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমাদের দেশে নির্বাচনে অর্থব্যয় রাজনৈতিক দুর্নীতির বড় উৎস-মুখ। প্রভূত টাকা ব্যয় করে নির্বাচনী-রায় কেনা-বেচা গণতন্ত্রের কলঙ্ক ছাড়া আর কিছুই নয়। নিবাচনকে টাকার দাপট থেকে মুক্ত করার জন্য দেশের আইন নির্বাচনী ব্যয়ের উর্ধ্ব সীমা বেঁধে দিয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচনী ব্যয়ের সবোচ্চ সীমা ২৫,০০০ টাকা, আর বিধানসভার ক্ষেত্রে এই সীমা ১০,০০০ টাকা।

সুপ্রীম কোর্ট ঘোষণা করলেন এই প্রথম যে, নির্বাচনে প্রার্থী যে অর্থব্যয় করে থাকেন, তাঁর দল বা তাঁর কোন সমর্থক-সংস্থা যে ব্যয় করে থাকেন সেটাকেও প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হবে। এই বিচারে শ্রীচাওলার নিবাচন অবৈধ বলে ঘোষিত হয়। অবশ্য অন্য কারণও ছিল। গোটা দেশের অবাধ ও স্বাধীন নিবাচনের সমর্থকরা এই রায়-এ উৎসাহিত হয়েছিলেন। দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এই গুরুত্বপূর্ণ রায়কে স্বাগত জানালেন। এই ধরনের বিপুল-সংখ্যক নির্বাচনী মোকদ্দমা বিচারাধীন ছিল—এই রায় যখন প্রকাশিত হয়। এই রায়ের ভিত্তিতে আরও অনেক নির্বাচিত সদস্যদের নিবাচন লোকসভা ও বিধানসভাগুলিতে অবৈধ বলে ঘোষিত হবার গভীর আশঙ্কা ছিল। দেশের শাসক দল এই রায়কে সন্তুষ্ট চিত্তে নিতে পারেন নি। লোকসভা

রাতারাতি একটা 'অর্ডিন্যান্স' পাশ করলেন, এই গুরুত্বপূর্ণ রায়কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখালেন। এই রায় শাসক দলের পছন্দ হল না। তাঁরা মানতে রাজী নন প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়ের সঙ্গে তাঁর দল তাঁর জন্য যে খরচ করে থাকে সেটা অন্তর্ভুক্ত হয়। সমস্ত শোভনতার দিকে পিঠ ফিরিয়ে এইভাবে কংগ্রেস শাসক দল প্রকাশ্যে আইন জারী করে ঊর্দ্ধ সীমা বহির্ভূত নির্বাচনী ব্যয়কে সমর্থন করতে এগিয়ে আসবেন ভাবা যায়নি। পার্টি-গণতন্ত্রে দল ও দলের প্রার্থীর মধ্যে চীনের প্রাচীর কি করে তোলা যায় তা বোধগম্য হয় না। যাই হোক, এ থেকে দেশের জন-মানসে ছুটো ধারণা জন্মাতে সাহায্য করা হল কিন্তু।

(১) শাসক দল রাতারাতি এই আইন প্রণয়ন করলেন কেননা তাঁদের ভয় ছিল এই কারণে বহু নির্বাচিত সদস্যদের নির্বাচন অবৈধ বলে ঘোষিত হবার ভয় ছিল। তাতে দলের সংখ্যাধিক্য রাতারাতি কমে যেত এবং দলীয় শাসন বিপন্ন হতে পারত। এই বিপদ থেকে বাঁচবার জন্য এবং দলীয় শাসন অব্যাহত রাখার জন্য এই ধরনের অর্ডিন্যান্স ও আইন পরবর্তীকালে ক্ষিপ্রগতিতে পাশ করিয়ে নেওয়া হল। শাসক দল সুপ্রীম কোর্টের রায় তাই সহজভাবে মেনে নিলেন না। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী সুপ্রীম কোর্টের এই রায়ে আইনের সঠিক ব্যাখ্যার প্রতিফলন হয়নি সে কথাও প্রকাশ্যে বলতে দ্বিধা করেন নি। (২) সাধারণ মানুষের এবং বুদ্ধিজীবীদের মনে হওয়া খুবই সঙ্গত ও স্বাভাবিক যে, শাসক দল বেশী অর্থ ব্যয় না করে নির্বাচনে জয়ী হতে পারবে না বলেই এই ধরনের একটি অগণতান্ত্রিক আইন পার্লামেণ্টে সংখ্যাধিক্যেব জোবে পাশ করিয়ে নিলেন।

সুপ্রীম কোর্টের এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ রায় নাকচ করে দেওয়া হল পাশব সংখ্যাধিক্যের জোরে। কিন্তু তার আগে হযেছে দলের পরিষদীয় শাখার সভায় কোন আলোচনা—আত্ম-সমালোচনা—মত-বিনিময়? হয়েছে শাসক দলের নীতি-নির্ধারক কমিটির বিশেষ সভায় নূতন অর্ডিন্যান্সের আলোচনা? দলের ক্যাডারবা, যাঁরা পথে ঘাটে শহরে গ্রামে দলের সিদ্ধান্ত-গুলিকে সমর্থন করে বেড়ান—তাঁদের মতামত ব্যক্ত করার কোন সুযোগ দেওয়া হয়েছে? অদৃষ্টের পরিহাস—এই ক্যাডারদেরই নির্বাচনের মুখে দেশবাসীকে এই অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তকে 'যুক্তিযুক্ত' 'গণতন্ত্র-সম্মত' বলে গলা ফাটাতে হবে, —বিরোধী দলগুলির বক্তব্যের জবাব দিতে হবে। এ তো 'আইনের শাসন'

হল না। আইনের 'ওপর' শাসন কায়েম করা হল। দেখান হল সংখ্যা-গরিষ্ঠরা যা করে তাই ন্যায়সঙ্গত, সংখ্যাধিক্যের খেয়াল-খুশী-ইচ্ছাই আইনের উৎস। আর তাকেই গুরুগম্ভীর ভাষায় বলা হবে 'কম্যাণ্ড অব দ্য সভার্ণ'।

যদিও এখনও পর্যন্ত নির্বাচনী ব্যয়ের ঊর্ধ্বসীমা বাঁধা আছে তবু এই নূতন আইনের সমর্থকরা খিড়কির দরজা দিয়ে তার চাইতে বেশী অর্থ ব্যয়ের পক্ষে ওকালতি করছেন মাত্র। একটি গরীব দেশের জনগণের দল এত অর্থ পাবে কোথা থেকে? আর ধনীরা ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে এত অর্থ অন্য প্রার্থীরা ব্যয় করবেন কি করে? প্রার্থীর নির্বাচনী তহবিল কাদের দানে স্ফীত হবে? এ সবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। 'সীমিত একনায়কত্বের' পূজারীরাই এইসব প্রশ্নকে চাপা দেবার চেষ্টা করবেন, সমালোচকদের 'প্রতিক্রিয়াশীল' সি. আই. এ.-এর চর বলে গালি-গালাজ দেবেন। 'ক্রিয়াশীল'-দের অতি তৎপরতার গণতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াই কি প্রতিক্রিয়াশীলতার নামান্তর? চোখ-ঝলসানো আড়ম্বর, টাকার দাপটই হবে নির্বাচনী সাফল্যের চাবিকাঠি, তত্ত্ব-আদর্শ-কর্মসূচী সবই ম্লান হয়ে যাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে—এই নির্বাচনী ব্যয়-সংক্রান্ত নতুন আইনটি—আইন-প্রণেতারা ক্ষমতা করায়ত্ত রাখার হাতিয়াররূপেই প্রণয়ন করলেন—ক্ষমতার যথেচ্ছ প্রয়োগ ও অপব্যবহারকে 'নিয়ন্ত্রণ' করার জন্য নয়। তাই গণতন্ত্রের বিচারে এটা 'আইনের শাসন' হল না।

যাঁরা আইন-প্রণেতা তাঁরা আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। গণতন্ত্রের অর্থ এই নয়—সবকিছু শাসক-কুলের সহায়ক হবে। বিশেষ সুযোগ যেমন দলীয় শাসন এনে দেয় অনিবার্যভাবে—তেমনি বিশেষ এবং অতিরিক্ত দায়িত্বও এসে পড়ে শাসক দলের ওপর। সব কিছুই দলের অনুকূলে না হলে গণতন্ত্র হল না এ মনে করা চরম মূঢ়তা। এদেশে যাঁরাই ক্ষমতায় আসেন তাঁরা নিজেদের দলকে দলের কর্মীদের বোঝান না যে, বিরামহীন দেওয়া-নেওয়ার মধ্যেই গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে। ব্যাঙ্ক থেকে সহজ ও সুলভ কিস্তিতে প্রয়োজনের সময় ঋণ না পেয়ে আমরা অভিযোগ করব—সঙ্গত অভিযোগ নিঃসন্দেহে। কিন্তু ঋণ পেলে ঋণ শোধ করার জন্য ব্যাঙ্ক অনুরোধ জানালে বা চাপ দিলে ঋণ-গ্রহীতাকে বোঝাতে হবে যে, ঋণ পরিশোধ না করাটা অন্যায় এবং নীতিহীন কাজ। ঋণ সহজে পাবার জন্য আন্দোলন হবে কিন্তু ঋণ পরিশোধের জন্য কেন রাজনৈতিক দলগুলি তাদের সমর্থক ঋণ-গ্রহীতাদের ওপর চাপ দেবেন না?

ভোটের লোভ—সস্তা বাহাদুরি পাবার নেশা! এ তো একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। এরকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

আইন-প্রণেতারা আইন পাশ করিয়ে নেবার পর যদি দলের সমর্থকরা সরকারের ওপর অবিরত চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন আইনকে দলীয় সংকীর্ণ স্বার্থের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্য, আর সেইভাবে বিশেষ সংকীর্ণ আইনের স্বার্থে আইন রচনার জন্য চাপ দিয়ে আইন পাশ করিয়ে নেন—তাহলেও 'আইনের শাসনের' সমাধি হবে। রাজনৈতিক দলের বিশেষ করে শাসক দলের সংযমী আচরণ তাই সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন। পশ্চিমবাংলায় যুক্তফ্রন্টের শাসনকালে 'আইনের শাসনের' কি হাল হয়েছিল সেটা এ রাজ্যের অধিবাসীরা ভুলে যাননি। আর তার খেসারত দিতে হয়েছে মার্কসবাদী দলগুলিকেও। হিংসা-হত্যা-হঠকারিতা-হতাশা সৃষ্টিকারী রাজনীতির কি ভয়াল পরিণতি হয়েছিল সেকথা গণতন্ত্রীরা বিস্মৃত হতে পারেন আগামীকালে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবার সম্ভাবনার বিনিময়েই। ইতিহাস বড় নির্মম শিক্ষক।

(২) আইনের শাসনকে বলবৎ রাখতে চাই নির্ভীক স্বাধীন বিচারালয় এবং বিচার-ব্যবস্থা। বিচারালয়ও কিন্তু আইনের শাসনের উর্ধ্বে নয়, আইনের শাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মুনসীফ, ম্যাজিস্ট্রেট থেকে হাইকোর্ট-সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের আইন অনুযায়ী নির্ভীকভাবে বিচার করতে হবে ন্যায়পরায়ণতার নিক্তিতে, নিঃস্পৃহ-সংস্কৃত বিবেকের নিরিখে। সুযোগ পেয়েছি—কোন একটা পক্ষকে রগ্‌ড়িয়ে দেবার মন নিয়ে—কোন একটি শক্তিশালী পক্ষের মুখের দিকে চেয়ে যে-বিচার সেটা নিছক প্রহসন। তাই যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নিরপেক্ষ-নির্ভীক বিচার-ব্যবস্থা ও বিচারালয় সুনিশ্চিত করা। এখানে দুটি বিষয়ে সজাগ থাকা দরকার।

প্রথমত, গণতন্ত্রীদের শিবিরের অনেকে আছেন যাঁরা দুনিয়ার 'প্রগতিশীল' 'প্রতিক্রিয়াশীল'দের চিহ্নিত করার লেটার্‌স্ 'পেটেণ্ট' পেয়েছেন দুর্জ্ঞেয় ডায়ালেকটিকের মন্ত্রবলে। গণতন্ত্র এদের মনের রঙ নয়, এটা ওদের একটা সময়োপযোগী 'লেবেল'মাত্র। এই দুনিয়ার তথাকথিত 'পরিত্রাতা' 'প্রগতিশীলরা' আইন-আদালতকে 'প্রগতির পথের অন্তরায়' 'রোড-ব্লক' বলে মনে করেন। তাই আদালতের 'নিরপেক্ষতা' 'স্বাধীনতা' এসব ওদের কাছে উনবিংশ শতাব্দীর বস্তাপচা বুর্জোয়া তত্ত্ব-কথা বলে উপহাসের বস্তু মাত্র। একথা মেনে নেবার

অর্থ—শাসক শ্রেণীর হাতে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার বলে অপ্রমত্ত শাসনের লাগাম তুলে দেওয়া, আইন-প্রণয়ন, তার ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগের সব ক্ষমতাই শাসক শ্রেণীর বা শাসক দলের হাতে তুলে দেওয়া—যেমন হয়ে থাকে একদল-শাসিত কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে।

তাই 'আইনের শাসন' বলবৎ রাখতে হলে এই ধরনের রাজনৈতিক উন্নাসিকতা থেকে—যা রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারের সহায়ক—গণতন্ত্রীদের মুক্ত হতে হবে। দেশের বিচারালয়কে এই দৃষ্টিতে দেখতে শিখলে বা শেখালে বিচারালয়ের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত তো হবেই, বিচারালয়গুলিও হীনমন্যতা ও আত্ম-গ্লানির ব্যাধিতে ভুগে ভুগে সাহস হারিয়ে সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়বে। তার ঐতিহাসিক প্রযোজনীয়তার ভিত্তিই একেবারে টলে যাবে। দেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্রও বিপন্ন হবে। এদেশের মার্কসবাদীরা তথাকথিত বিপ্লবীরা দেশের বিচারালয়কে যেভাবে উপহাস করে এসেছেন তার সঙ্গে ইউরোপের প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের সমাজতন্ত্রী ও মার্কসবাদীদের আচরণের মধ্যে অদ্ভুত মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। ইউরোপের মার্কসবাদীরা ও বাম-সমাজতন্ত্রীরা শ্রেণী-ভিত্তিক সমাজে চালু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে 'বুর্জোয়া শ্রেণীর ডিক্‌টেটরশিপ' বলে এককালে অভিহিত করে এসেছিলেন। এই ভ্রান্ত আত্মঘাতী রাজনীতির প্রচুর খেসারত দিতে হয়েছিল। এই মনোভাব ফ্যাসিবাদকে ইউরোপে কায়েম করতে সাহায্য করেছিল। ফ্যাসিস্ট-নাৎসীরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর মার্কসিস্টরা সেই 'বুর্জোয়া গণতন্ত্রের' মহিমা-কীর্তন শুরু করেছিলেন। 'বুর্জোয়া গণতন্ত্রের' অপূর্ণতার দিকে আঙুল দিয়ে দেখানর অর্থ—তাকে ধ্বংস করার মারাত্মক রাজনীতিতে মাতা নয়, তার অপূর্ণতাকে সামাজিক অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে পরিপূর্ণতা দান করার লক্ষ্যের দিকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাওয়া।

ভারতের মার্কসবাদীরা, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার মার্কসবাদী কমিউনিষ্টরা 'রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে' বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়ে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত কি মারাত্মক আত্মঘাতী রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন তা নিশ্চয় মর্মে মর্মে তাঁরা বুঝছেন। তাঁরা ক্ষমতায় এসে দেশের আদালতগুলিকে 'বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান' বলে জনসমক্ষে হেয় করতে থাকেন, জনগণের কাছে অশ্রদ্ধার বস্তুরূপে চিত্রিত করে আসছিলেন। প্রকাশ্যেই তাঁরা সভা-সমিতিতে বলতেন :

আমরা 'জনতার আদালত' বা 'রাস্তার আদালতের' রায়েই বিশ্বাসী। আদালত সরকারের বিরুদ্ধে রায় দিলে, 'ইন্‌জাঙশন' জারী করলে মার্কসবাদী দলগুলি যুগপৎ নিন্দায় মুখর হয়ে উঠতেন। [যেমন বর্তমানে শাসকদলের কিছু 'প্রগতিশীল' নেতা, মন্ত্রীরা আদালতের 'বিরূপ' রায়ে ক্ষুব্ধ। মিসা (Maintenance of Internal Security Act, 1971) আইন বিনা বিচারে আটক বন্দীকে হাইকোর্ট জামিন দিলে অথবা মুক্তি দিলে 'ক্ষুব্ধ' হয়ে অশোভন মন্তব্য করে থাকেন। ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে. অন্যভাবে—মর্মান্তিকভাবে।]

ক্ষমতার আসনে বসে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে-চোখে মার্কসিস্টরা দেখতেন—ক্ষমতাচ্যুত হয়ে বিরোধী শিবিরে বসে তাঁরা আবিষ্কার করলেন ভারতের 'গণতান্ত্রিক সংবিধান' কংগ্রেসী স্বৈরতন্ত্রের আক্রমণে বিপন্ন। যে-সংবিধান এতদিন 'বুর্জোয়া শ্রেণীর শ্রেণী-স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার' বলে প্রচারিত ও নিন্দিত হয়ে আসছিল—আজ সেই বস্তা-পচা 'বুর্জোয়া' 'মাল'কে 'গণতন্ত্র' বলে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে কেন? এটাও কি কৌশলের একটা দিক, নিছক কূটনীতি? যদি নিছক কৌশল রণনীতি বা কূটনীতিই হয় তাহলে তার পেছনে সংগ্রামের জন্য যে আবেগ সৃষ্টির প্রয়োজন সেটা কি করে সম্ভব হবে? আর যদি এটা অন্তরের কথা হয় তাহলে মার্কসবাদীদের নীতিগতভাবে সর্ব-প্রকার হিংসার বলপ্রয়োগের রাজনীতিকে বর্জন করতে হবে, নিন্দা করতে হবে। সকল দেশে রাজনৈতিক বিরোধিতার অধিকার সর্ব অবস্থাতেই, সর্ব পরিস্থিতিতেই স্বীকার করে নিতে হবে এবং কমিউনিস্ট-ব্যবস্থাতেও রাজনৈতিক বিরোধিতার মৌল অধিকারকে স্বীকার করে নিয়ে প্রয়োজনীয় ঘোষণা করতে হবে। নতুবা বর্তমান শাসক শ্রেণীর অগণতান্ত্রিক আচরণের বিরোধিতার ভূমিকায় জনগণ মার্কসিস্টদের মৌখিক মূল্যে গ্রহণ করতে পারেন না।

অনেক কিছু না পাবার গ্লানিতে জর্জরিত ভারতবাসী—ভারতের সংবিধানকে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি শাণিত শক্তিশালী হাতিয়ার বলেই গণ্য করবেন, অন্তত দেশের বুদ্ধিজীবীরা তো বটেই। আর এই সংবিধানে বিচারালয়ের স্বাধীন নিরপেক্ষ ভূমিকা স্বীকৃত, আইনের শাসন মান্য।

(খ) দ্বিতীয়ত, আইনের শাসন-তত্ত্বের অনুরাগীদের সজাগ থাকতে হবে তাঁদেরও বিরুদ্ধে, যাঁরা আদালতকে দিয়ে দলীয় অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপগুলিকে

সমর্থন করিয়ে নিতে আগ্রহী। তাঁরা বিচারালয়কে সেইভাবেই ঢেলে সাজাতে চান। বিচারপতিদের স্বাধীনতার ওপর আঘাত হানতে চান। এই মনোভাবকেও প্রতিহত করা দরকার গণতন্ত্রকে বাঁচাতে।

বিচারালয় কর্তৃক আইনের শাসন অব্যাহত রাখতে প্রয়োজন—

(১) বিচারপতিদের হাইকোর্ট-সুপ্রীম কোর্ট, 'হায়ার ও সাবরডিনেট জুডিসিয়্যাল সার্ভিসের' সভ্যদের চাকুরির সর্ত যথেষ্ট আকর্ষণীয় হওয়া চাই—যাতে সেরা ব্যক্তিরা বিদগ্ধ আইনজীবী এবং 'জুরিস্টরা' আকৃষ্ট হতে পারেন এবং পদের মর্যাদা যথোপযুক্ত হয়। দেশের সংবিধান ও আইনই তাঁদের মনিব—কোন দল বা শ্রেণী নয়, এই বোধ বিচারকের মজ্জায় মজ্জায় সঞ্চারিত হওয়া চাই। দেশের সর্বনিম্ন আদালতের বিচারপতিরও এই মানসিকতা ও দৃঢ়তা থাকা চাই।

(২) বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে 'সুপারসেশনের' আড়ালে 'সিনিয়ার' বিচারপতিদের টপ্‌কিয়ে একজন 'জুনিয়ার' বিচারপতিকে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগকে কেন্দ্র করে এদেশে প্রচণ্ড বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে। সুপ্রীম কোর্টের ১৩ জন বিচারপতি একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচার করে ১৯৭৩ সালের ২৪শে এপ্রিল তাঁদের খুব গুরুত্বপূর্ণ রায় ঘোষণা করেন (His Holiness Keshvananda VS. State of Kerala. All India Reporter. 1973. S. C, P—1461)। এই রায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতিরা যে সব আইনের ব্যাখ্যা রাখেন তা মোটামুটিভাবে ভারত সরকারের পক্ষেই গিয়েছিল। তবে একটি মৌলিক প্রশ্নে সংখ্যাগরিষ্ঠের ব্যাখ্যায় বলা হয় 'পার্লামেন্টের সংবিধান সংশোধনের অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা নেই' (unfettered right to alter the Constitution)। এই সিদ্ধান্ত মোটামুটিভাবে খুশীমনে দেশবাসী গ্রহণ করে নিয়েছিলেন বলা যেতে পারে। কিন্তু ভারত সরকার খুশী হতে পারেন নি। যেদিন রায় ঘোষিত হল তার পরদিনই ২৫শে এপ্রিল সুপ্রীম কোর্টের ৩ জন দক্ষ অধিক 'সিনিয়ার' বিচারপতিকে ডিঙিয়ে একজন জুনিয়ার বিচারপতিকে ভারতের প্রধান বিচারপতি মনোনীত করে কেন্দ্রীয় সরকার এক ঘোষণা জারী করলেন। বিগত ২৩ বছরের একটানা ইতিহাসে এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি। প্রচলিত দীর্ঘদিনের ট্র্যাডিশনও লঙ্ঘিত হল। এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে কোন সুস্থ নজির নয়। এই ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকলে বিচারালয়ের

স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। আর বিচারালয় যদি স্বাধীন ও নির্ভীক না হয়—জনগণের শ্রদ্ধাও সেই প্রতিষ্ঠান অর্জনে ব্যর্থ হবে।

(৩) এই 'সুপারসেশনকে' কেন্দ্র করে যখন প্রচণ্ড বিতর্কের সূত্রপাত হয় তখন সরকার পক্ষ থেকে বলা হল একজন সরকারী মুখপাত্রের জবানীতে যে, কেন্দ্রীয় সরকার বিচারপতি নিয়োগের সময় সেই বিচারপতির 'সামাজিক দর্শন' ও 'দৃষ্টিভঙ্গী' বিচার করে দেখবেন। সরকার দেখবেন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী 'প্রগতিশীল' না 'প্রতিক্রিয়াশীল' (forward-looking or backward-looking)। সরকার পার্লামেণ্টারী মেজরিটি ও বিচারালয়ের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয় এটা চান না। তাই এই সংঘাতকে এড়িয়ে চলতে গিয়ে এমন ব্যক্তিকে বিচারপতিরূপে বেছে নিতে চান যাঁর মৌল দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর কোন বৈপরীত্য থাকবে না। এই Ideological commitment-এর অর্থ হল 'কমিটেড্ জুডিসিয়ারি'। দেশে যদি 'কমিটেড্ জুডিসিয়ারি' রূপে বিচারালয়কে গড়ে তোলা হয় তাহলে 'আইনের শাসন' বলে কোন বস্তু আর দেশে থাকবে না। বিচারালয় সরকারের অনুগত থাকবে মাত্র। 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদে' ফিরবে। গণতান্ত্রিক অধিকার, নাগরিকদের অধিকার মানবিক অধিকার পদে পদে লাঞ্ছিত হবে। শাসক দলের মুখের দিকে চেয়েই আদালত রায় দেবে সে অবস্থায়।

বিচারপতিদের নিশ্চয়ই একটা 'আনুগত্য' থাকবে 'কমিট্মেণ্ট' থাকবে. সেটা ভারতের সংবিধানের প্রতি আনুগত্য—সংবিধানে-ব্যক্ত মৌল আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার প্রতি চূড়ান্ত আনুগত্য—কোন সরকারী বা বিরোধীদলের প্রতি নয়—সরকারী হুকুমের অথবা কোন দলের 'মতবাদের' প্রতি নয়।

'জাস্টিস' 'লিবার্টি' 'ফ্রীডম' 'ইকোয়ালিটি' 'মনুষ্যত্ব' 'মানবিক অধিকার' মানবিক মূল্যবোধের প্রতি আনুগত্য থাকবে, আনুগত্য থাকবে সার্বভৌম ভারতীর রাষ্ট্র ও ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রতি। সমগ্রতান্ত্রিক কমিউনিস্ট বা ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় স্বাধীন নিরপেক্ষ বিচারালয় বলে কোন সংস্থা বস্তুগতভাবে তো নয়ই 'তত্ত্বের দিক থেকেও' থাকতে পারে না। সেখানে বিচারালয় সর্বব্যাপী প্রশাসনিক যন্ত্রের পুলিশের ন্যায় একটি অঙ্গ মাত্র, অন্য কিছু নয়। দল ও রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যকরী করার হাতিয়ার মাত্র। ঐ ব্যবস্থায় 'জুডিসিয়ারি' সকল অর্থেই 'কমিটেড্'। ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক দলগুলিতে

অনুপ্রবিষ্ট 'প্রগতিশীলতার' তল্পিবাহীয়া ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে এই সব কমিউনিস্ট তত্ত্বগুলিকে নানা প্রগতিগন্ধী শব্দের মোড়কে নির্ভেজাল বস্তু হিসাবে ফেরী করছেন। বিচারালয়ের স্বাধীনতার ওপর যেভাবে এ রাজ্যে মার্কসিস্ট শাসনে আঘাত হানা হয়েছে—স্বাধীন নিরপেক্ষ বিচারালয়ের তত্ত্বকে যেভাবে তাঁরা ব্যঙ্গ করে সাধারণ মানুষের মনে অশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়েছিলেন আজ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে বলীয়ান হয়ে নব কংগ্রেস শাসকদলের একটি সুসংগঠিত অংশ সেই একই অপকৌশল অবলম্বন করেছেন। আবার যেদিন তাঁরা সংখ্যা-লঘিষ্ঠ হয়ে পড়বেন তখন আজকের মার্কসিস্টদের মতই এইসব 'প্রতিক্রিয়াশীল' সংস্থাগুলির প্রাধান্য রক্ষার জন্য আসরে নামতে বাধ্য হবেন।

(৩) বিচারালয়ের স্বাধীনতা ও নির্ভীকভাবে বিচারের অধিকার অক্ষুন্ন রাখতে হলে বিচারকদের স্বাধীন মনোভাব রাখার পরিবেশ অব্যাহত রাখা চাই। বিচার বিভাগে যাঁরা নিযুক্ত হন তাঁদের কাজকে সর্বোচ্চ সেবা বা সার্ভিস গণ্য করা দরকার। মুনসীফ, ডিষ্ট্রিক্ট জাজ ম্যাজিস্ট্রেট জুডিসিয়াল থেকে হাইকোর্ট সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। কাজের সর্ত সুযোগ-সুবিধা ও পদের মর্য্যাদা তাই অনিবার্যভাবে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হওয়া চাই। বিচারকদের বেতন কাঠামোর আশু পরিবর্তন করে এমন আকর্ষণীয় করা দরকার যাতে দেশের সেরা আইনজীবী, জুরিস্ট, ন্যায়-নিষ্ঠাবান কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি বিচার বিভাগের দিকে আকৃষ্ট হন। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিকে দেশের নেতারা অবহেলা করে এসেছেন।

(৪) আমাদের মত গরীব দেশে, যেখানে শতকরা ৭০জন মানুষ দারিদ্র্য-সীমার নীচে বাস করেন সেখানে ন্যায়-বিচার পাবার পথে গরীবদের বিস্তর বাধা। কর্মচ্যুত গরীব কর্মচারী, অনাথা দরিদ্র অসহায় বিধবা নারী—নাবালক—গরীব ভূমিহীন কৃষক—ঠিকা শ্রমিক বর্গাদার আইনজীবীদের—কি দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতে—ফী দিয়ে নিজেদের অধিকার রক্ষার লড়াই করবে কি করে? দরিদ্ররা বিচার পাবে কিভাবে? জন-কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রকে নিম্নতম আদালত থেকে উচ্চতম আদালতে গরীবদের পক্ষ নিয়ে লড়ার জন্য আইনের পরামর্শ ও সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এই সব মোকদ্দমায় আইনজীবীদের ফী নির্দিষ্ট হারে সরকারী কোষাগার থেকে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারকে দক্ষ অভিজ্ঞ আইনজীবীদের 'প্যানেল' গঠন করতে হবে।

তাদের মধ্যে থেকেই এই সব দরিদ্র ব্যক্তিদের পক্ষ নিয়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে গরীবদের মনে আশার সঞ্চার হবে। গণতান্ত্রিক বিচার-ব্যবস্থায় তাঁরা শ্রদ্ধাবান হবেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে দুর্বল শ্রেণীর মানুষকে সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত আইনের আশ্রয় সুনিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা চাই। এটা কোন নিয়ম রক্ষার ব্যাপার নয়, 'আইনের শাসনের' এটি একটি মূল কথা।

(৫) আইনের শাসনের অন্যতম স্তম্ভ হবে স্বাধীন নির্ভীক আইনজীবী শ্রেণী। এই আইনজীবীরা সরকারী বেতনভুক্ কর্মচারী হবেন না অনেকে বলেন আইন-বৃত্তি 'রাষ্ট্রায়ত্ত' করা দরকার। এটা খুব ভ্রান্ত ধারণা। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে সকল বৃত্তির মত আইন-বৃত্তিও রাষ্ট্রায়ত্ত। তত্ত্বগতভাবেও কমিউনিস্ট একনায়কতন্ত্রে কোন 'বৃত্তিকেই' 'স্বাধীন' বলে স্বীকার করা হয় না। তাই আইনজীবীরা সবাই সরকাবী কর্মচারীদের পর্যায়-ভুক্ত। যাঁরা বেতনভুক্ তাঁরাও 'কমিটেড্'। দলের প্রতি, সরকারী শাসন নীতির প্রতি একান্ত অনুগত। সরকারের অবিচারের বিরুদ্ধে আদালতের কাছে অবিচারের বলি—ভুক্তভোগী নাগরিকের পক্ষ নিয়ে সরকারী বেতনভুক্ সিভিলিয়ান নির্ভয়ে নিরপেক্ষভাবে কিভাবে বিচারের দাবী করবেন? কমিউনিস্ট দল বা দলীয় সরকার তত্ত্বগত-ভাবে কোন অন্যায়ই নাকি করতে পারে না—'Communists can do no wrong'. তাহলে কোন নাগরিকের পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে একজন আইনজীবি কিভাবে বলবেন: 'সরকার অন্যায় করেছেন।' আত্মপক্ষ-সমর্থনের অর্থ ই হল দোষ স্বীকার করা, সরকারের কাছে করুণা ভিক্ষা করা। ভারতবর্ষে আইনজীবীরা কি রাশিয়া বা চীন দেশের মত 'কমিটেড্' 'বার' চান? দেশে যদি কমিটেড্ জুডিসিয়ারি, কমিটেড্ আইনজীবি থাকেন তাহলে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিনিয়তই 'একজিকিউটিভের' সরকারী আমলা ও ব্যুরোক্রাসীর স্বেচ্ছাচারের হাড়িকাঠে বলি হবে। সে হবে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি। চিনি-মাখানো প্রগতিশীল বিষের বড়ি গিলবার আগে দেশের বুদ্ধিজীবীরা বিচার করে দেখেন যেন। 'কমিটেড্ জুডিসিয়ারি' এবং 'কমিটেড্ বার'-এর যাঁড়াশির চাপে ন্যায়-বিচার অবলুপ্ত হবে। সেই অবস্থায় 'আইনের শাসন' এক-দলীয় একনায়কতন্ত্রের অবাধ ছাড়পত্র হয়ে দাঁড়াবে।

আগেই বলেছি দেশের বিচারপতিরাও আইনের শাসনে শাসিত হবেন।

আইনের উর্ধ্বে তাঁরা নন। ভয় ও অনুগ্রহ উপেক্ষা করে নিক্তির ওজনে ন্যায় বিচার করতে হবে। আবার তাঁরা বিচার করতে বসে সমকালীন সমাজব্যবস্থা, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিবর্তনশীলতার কথা বিস্মৃত হতে পারেন না। আইনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা দেশবাসীর কাছে আইনকে জীবন্ত করে তুলতে সাহায্য করবেন। 'স্থায়িত্ব' ও 'পরিবর্তনশীলতার' সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করতে হবে। সমাজজীবনের গতিশীলতা এবং সমাজের নব নব প্রত্যাশা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে বিচারপতিদেরও। আইনের ব্যাখ্যা দ্বারা সেই আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিহত করার অর্থ হবে সাংবিধানিক প্রত্যাশার রূপায়ণের পথে বাধা রচনা করা। কিন্তু আইনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শাসক-দলের 'রাজনৈতিক' উদ্দেশ্যের দিকে তাল দিয়ে চললে আদালতই আইনের শাসনকে লঙ্ঘন করবেন। সংবিধানের ঊর্ধ্বে দলীয় শাসন নয়, দলও নয়, দলের নেতাও নন।

উৎক্ষিপ্ত হাওয়াই বাজী বা রকেটের মত আকাশ-ফুঁড়ে একমুখে ছুটে চলাই প্রগতির পরিচয় নয়। গণতন্ত্রে প্রগতি—বাধা ও ভারসাম্য রচনার মধ্যে দিয়েই সুনিশ্চিত হয়। ক্ষিপ্রগতিতে একমুখে ওপরে উঠে-যাওয়া হাওয়াই বাজীর দগ্ধশেষ অবশিষ্টাংশ সপাটে ভূতলে এসেই ছিটকিয়ে পড়ে। বাধা, প্রতিবাদ, সংশয়—জিজ্ঞাসার শাসন ও বেড়াজাল এড়িয়ে যে-এগিয়ে চলা তাকে হালফিলের প্রগতিবাদীরা প্রশংসার সার্টিফিকেট দেন না। সমাজ-বিজ্ঞানীরা তাকে বিজ্ঞান-সম্মত বলে স্বীকার করেন না। প্রগতি কখনই এক-রৈখিক (unilinear) নয়। সংঘাত-বাধার দ্বারা জীবনের অগ্রগতিকে যাচাই করতেই হবে। দু পা কখনও এগুতে হবে, আবার প্রগতির স্বার্থেই দু পা পিছু হট্‌তে হয়। সকল পরিবর্তনই 'প্রগতিশীল' নয়। সকল রক্ষণশীলতাই 'প্রতিক্রিয়াশীল' নয়। পরিবর্তনশীলতাকে রক্ষণশীলতার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবেই। আবার স্থায়িত্ব-পন্থীদের পরিবর্তনের নামে প্রগতির নামে উচ্ছৃঙ্খলতার ঢল্‌কেও রুখতে হয়। উইল এবং এ্যারিয়ল ডুরাণ্টের ভাষায় :

"So the conservative who resists change is as valuable as the radical who proposes it—perhaps as much more valuable as roots are more vital than grafts. It is good that new ideas should be heard for the sake of the few that can be used ;

but it is also good that new ideas should be compelled to go through the mill of objection, opposition and contumely; this is the trial heat which innovations must survive before being allowed to enter the human race. It is good that the old should resist the young and the young should prod the old; out of this tension, as out of the strife of the sexes and the classes comes a creative tensile strength, a stimulated development, a secret and basic unity and movement of the whole.' [The Lessons Of History: By Will and Ariel Durant; P. 36]

সমাজের প্রগতির জন্য পরিবর্তনের প্রবক্তা প্রগতিশীলরা যতটা কাম্য ঠিক ততোধিক কাম্য তাদের বিরোধীরাও। গাছের কাছে তার কাণ্ডের চাইতেও শিকড় যেমন বেশী মূল্যবান—বোধ হয় বিরোধীদের মূল্যও ততটা বেশী। নূতন চিন্তা আদর্শ সমাজকে শোনাতেই হবে, কিন্তু এই সব চিন্তা 'আইডিয়া' সমাজের গ্রহণযোগ্য হবার আগে সমালোচনা ও বিরোধিতার বকযন্ত্রের 'ফিল্‌টার' চুঁইয়ে আসতেই হবে। নূতন 'আইডিয়া' শুধুমাত্র এই বলেই তা মান্য হবে না। এটা স্বাভাবিক প্রবীণরা নবীনদের বাধা দেবেন, নবীনরা প্রবীণদের। পারস্পরিক সংঘাত সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে নূতন উত্তেজনার সূতিকাগৃহে এক নূতন সৃজনশীল শক্তি জন্ম নেবে। এই সংঘাত, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে থেকে সুষ্ঠু বলিষ্ঠ বিকাশ সম্ভব হবে—সমগ্র থেকে যা বিচ্ছিন্ন নয়। আর তার মূলে আছে এক মৌল অদৃশ্য ঐক্য।

আইনের শাসনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলেন আইনের প্রয়োগ-কর্তারা (Executors of Law)। অনেকে বলেন গণতন্ত্রে বিচারালয়ই গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় রক্ষক। কথাটা ঠিক নয়। আইনের মর্যাদার যাচাই ও পরীক্ষা হয় প্রতিদিন তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে। আইনের প্রয়োগ বা enforcement-এর জন্য বিচারালয় তো দায়ী নন। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিজ্ঞতম রায়ের প্রয়োগ কি হবে তা নির্ভর করছে সে দেশের সরকারী অফিসার কর্মচারীদের ন্যায়পরায়ণ আচরণ ও ব্যাখ্যার সঠিক অনুসরণ ও অনুশীলনের ওপর। তাই আইনের বিভিন্ন স্তরের প্রয়োগ-কর্তারা

যদি আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংযম, সততা, প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা, প্রশাসনিক ঔচিত্যবোধ অনুশীলিত ও সংস্কৃত বিবেকের দ্বারা সদা-পরিচালিত না হন তাহলে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার চিৎকার নিছক অরণ্যে রোদনের সমতুল্যই হবে।

আইনের শাসন পরিহাসের মতই শোনাবে যদি দেশে "জরুরীকালীন অবস্থাকে" (Emergency) জিইয়ে রাখা হয়—জন নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে হাজার হাজার নাগরিককে বিনা বিচারে নিবর্তনমূলক আইনে কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়, মৌল স্বাধীনতাগুলি নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত হয়। আইনের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যায় পেট ভরবে না—যেখানে বিনা বিচারে আটক রাখার ব্যবস্থা নির্ভর করছে সর্বশক্তিমান পুলিশের খেয়াল-খুশীর ওপর। গণতন্ত্রের নামে পুলিশরাজ কায়েম হবে। এ অবস্থা চলতে থাকলে দেশের মানুষের মন থেকে গণতান্ত্রিক জীবনদর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা লোপ পাবে। আর সেই অবস্থার সুযোগ নেবে অগণ-তান্ত্রিক শক্তিগুলি—গণতন্ত্র যাদের কাছে 'বুর্জোয়া' মার্কা বলে নিন্দিত অথবা যাঁরা সামরিক বা জুনটা শাসনকে গণতন্ত্রের গ্রহণযোগ্য বিকল্প বলে মনে করেন।

আমাদের দেশে সিভিল সার্ভিসের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আইনের শাসন বলবৎ রাখতে—সেকথা সিভিলিয়ানরা প্রায়ই বিস্মৃত হন। তাঁদের জাল গ্রাম থেকে শহর হয়ে রাজধানী পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁরা সরকারের প্রতি অনুগত সব সময়ই থাকবেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের আরও বড় আনুগত্য দেশের সংবিধানের প্রতি, মৌল আইনগুলির প্রতি, দেশের সামগ্রিক সার্বজনীন স্বার্থের প্রতি। দেশের সিভিলিয়ানদের সরকারী কর্মচারীদের নির্ভয়ে নিরপেক্ষভাবে দেশের ও জাতির স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করতে গিয়ে খেসারত দেবার ভয় থাকে। যাতে সেই ভয় দূর করা যায় তার জন্যও চাই স্বাধীন নির্ভীক বিচার-ব্যবস্থা, উচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা। প্রশাসনকে কখনই দলের সংকীর্ণ স্বার্থে নিযুক্ত হতে দেওয়া যায় না। শাসক শ্রেণী বা দল এই চেষ্টা করতে গেলে তাকে প্রতিহত করতে হবে দেশের আইন প্রয়োগকারী সিভিলিয়ানদের, কর্মচারী, অফিসারদের। এঁদের নিরপেক্ষতা নিষ্ঠা এবং আইনের সংবিধানের প্রতি আনুগত্যর ওপর নির্ভর করে আইনের প্রকৃত শাসন ও মর্যাদা। ১৯৫৭, ৫৯-৬০ সালে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রণ্টীয় শাসনকালে প্রশাসনকে যেভাবে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে গিয়ে পঙ্গু করা হয়েছিল এবং তরে ফলে যে মারাত্মক পরিস্থিতি

সৃষ্টি হয়েছিল সেকথা দেশবাসীর স্মরণ আছে। রাজনৈতিক পালা-বদল ঘটার পরও সেই অশুভ প্রচেষ্টা আজও অব্যাহত আরও উলঙ্গভাবে। আইনের প্রয়োগ-কর্তাদের কর্তব্য উপযুক্ত পরামর্শ দেওয়া দেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতা প্রশাসকদের। দেশের সিভিল সার্ভেন্টদের টেকনোক্রাটদের সব সময় মনে রাখা দরকার—তাঁরা হেঁ-হেঁ-সমিতির সভ্য নন যে, সব সময় ঘাড় হেলিয়েই থাকতে হবে। তাঁদের আদর্শ কখনই যখন-যেমন তখন-তেমন হতে পারে না। যা অন্যায় অসত্য যা দেশের সংবিধান-বিরোধী, সার্বিক জনস্বার্থ বিরোধী, আইন বিরোধী তাকে রোখা সিভিলিয়ান কর্মচারী অফিসারদের নৈতিক কর্তব্য। অধিকার-বোধ সামাজিক দায়িত্ব-বোধ সম্বন্ধে গভীর সচেতনতা যদি জাগান না যায় তহলে আইনের শাসনের অজুহাতে শাসন-সর্বস্ব, হৃদয়হীন ক্ষমতালোলুপ কর্তৃত্ববাদী দলের শাসন চেপে বসে। সেক্ষেত্রে অন্যায় অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার আত্মিক শক্তিই হারিয়ে ফেলবে জাতি। দারিদ্র্য-ক্ষুধা-বেকারী-অশিক্ষা-বৈষম্য হিংসা সন্ত্রাস নৈরাশ্যের বিরুদ্ধে, নীতিবোধ দেশপ্রেম-বর্জিত গৃধ্নু শেঠ বণিকদের, বিবেক-বর্জিত কাণ্ডজ্ঞানহীন রাজনীতি-বিদদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রেরণা দেয় কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক আদর্শ, মূল্যবোধ। শাসক দলের নেতৃত্বের প্রতি নিঃসর্ত, প্রতিবাদহীন প্রশ্নাতীত আনুগত্যের আদর্শরূপে মহিমা কীর্তন নৈতিক অবক্ষয়েরই উপসর্গ মাত্র যা ধীরে ধীরে একনায়কত্বেব পথেই দেশকে ঠেলে দেয়।

(খ) আইনের শাসন ও গণতন্ত্র

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভ স্বাধীন নির্ভীক বিচারালয় ও শাসন-নিয়ন্ত্রণমুক্ত নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা। রাজনীতিতে যাকে বলা হয় ক্ষমতা পৃথকীকরণের তত্ত্ব (Theory of separation of powers) সেটাই হল বিচারব্যবস্থার ভিত্তি-ভূমি। রাষ্ট্রের যথেচ্ছাচারিতার পথে অন্যতম সবচেয়ে বড় বাধা দেশের স্বাধীন নির্ভীক বিচারালয়। দেশের শাসনতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রথা বা কন্‌ভেন্‌শন নাগরিকদের যে-সব স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার অর্পণ করে থাকে তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার বিচারালয়ের ওপর। কোন নাগরিকের মৌল বা কোন অধিকার খর্ব হয়েছে কিনা—রাষ্ট্র তার পুলিশী ও প্রশাসনিক তদারকি ক্ষমতার গণ্ডী (Police power) অতিক্রম করে নাগরিকের অধিকার মানবিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করেছে কিনা অথবা নাগরিক তার আইনের বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন বা রাষ্ট্র-বিরোধী কাজ করছেন কিনা সেটা চূড়ান্তভাবে বিচার করবেন দেশের নিরপেক্ষ বিচারালয়,—সেই রাষ্ট্রের প্রশাসক—কর্মকর্তারা নন। এই তত্ত্বের মূল প্রবক্তা মণ্টেস্ক্যু। তবে এযুগে নানাবিধ প্রশাসনিক জটিলতার জন্য সূক্ষ্ম ক্ষমতার পৃথকীকরণ সম্ভব নয়। তাই এ কালে 'সেপারেশন অব পাওয়ার্স' বলতে বোঝায় 'সেপারেশন অব ফাঙ্‌শানস'। মোটামুটি সকল গণতান্ত্রিক দেশই এই মৌল নীতিকে স্বীকার করে নিয়েছে। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্রের মূলগত বৈশিষ্ট্যের ওপর এই নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু তারতম্য ঘটে থাকে এই যা।

"The legislative power is the power to make laws and to alter them at discrection, the excutive power is the power to see that the laws are duly executed and enforced ; the judicial power is the yower to construe or apply the law or the application of the existing law with modification."

[Cooly : Constitutional Law : P. 48]

ভারতের সংবিধান এই মূল নীতিকে গ্রহণ করেছে নিঃসন্দেহে এবং এই সংবিধানে দেশের হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টকে বিশেষ ভূমিকা ও গুরুত্ব দেওয়া

হয়েছে। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় বুনিয়াদের আকাঙ্ক্ষিত রূপ নিয়ে আলোচনা অনেক হয়েছে এবং হবেও। দেশের নেতারা দেশকে সমাজতান্ত্রিক ছাঁচে গড়তে বদ্ধপরিকর। এই সমাজতন্ত্রকে 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র' বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে (Democratic Socialism)। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো কি রকম হবে তাই নিয়ে কত আলোচনা হয় কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিচারব্যবস্থা কি রকম হবে—বিচারালয়ের ভূমিকা কি হবে সেই অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার আলোচনা সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে।

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বিচারালয়ের যে ক্ষমতা ও ভূমিকা সুচিহ্নিত থাকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কি বিচারালয়ের সেই ক্ষমতা স্বাতন্ত্র্য ও নিরপেক্ষ ভূমিকা থাকবে? গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও প্রভুত্ববাদী একনায়কতন্ত্রী সমাজতন্ত্রের মধ্যে কি কোন পার্থক্যই নেই? সমগ্রতান্ত্রিক সমাজবাদী (Totalitarian Socialism) বলে বিজ্ঞাপিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় বিচারালয়ের যে ভূমিকা ভারতের 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের' রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও বিচারব্যবস্থা বিচার-প্রথা এবং আদালতের ভূমিকা কি একই প্রকার হবে? মস্কো অনুগামীরা গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য বড় বড় ঘোষণা করে থাকেন। তাঁরা কি এদেশে সোভিয়েট-ধাঁচের বিচার-প্রথা প্রবর্তন করতে চান? গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশের আদালত এবং সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অন্যতম রক্ষা-কবচ বলে আজও বন্দিত। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিচারালয়ের কোন স্বাধীন নিরপেক্ষ ভূমিকা নেই। বিচার-বিভাগ শাসন বিভাগেরই (Executive) যেন একটা অংশ। সমস্ত ক্ষমতার উৎস ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টি—যার হাতে কেন্দ্রীভূত আইন প্রণয়নের, সংশোধনের ক্ষমতা, আইনের বাস্তব রূপায়ণ ও প্রয়োগের ক্ষমতা এবং সর্বোপরি আইন ব্যাখ্যারও ক্ষমতা। বিচারকবর্গের বা বিচারালয়ের কোন স্বকীয় ক্ষমতাই তত্ত্বগতভাবে স্বীকার করা হয় না। যেহেতু মস্কো অনুগামী ভারতের কমিউনিস্টরা বড্ড বেশী গণতন্ত্র রক্ষার জন্য ব্যাকুলতা দেখাচ্ছেন—জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রী ও গণতন্ত্রীদের কর্তব্য কমিউনিস্ট বিচার-ব্যবস্থার, বিশেষ করে রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার-প্রথার কিছুটা বিশ্লেষণ।

এই পরিচ্ছেদে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পুরানো দিনের রাজনৈতিক বিচার কাহিনী নিয়ে আলোচনা করব। পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র ও খাস

সোভিয়েট রাশিয়ায় স্তালিনী-যুগের কয়েকটি মামলার বিচারের উল্লেখ করব।
স্তালিনী-যুগটাই বেছে নিচ্ছি, কেননা স্তালিন-মূল্যায়নের নামে নূতন করে
কোন কোন মার্কসবাদী শিবিরে স্তালিন-বন্দনা স্থুরু হয়েছে সম্ভবত একটা
দূরপাল্লার দৃষ্টি সামনে রেখে। সোভিয়েট রাশিয়ার কমিউনিস্ট নেতারা
ভারতে হিংসার রাজনীতির বহিঃপ্রকাশে খুবই উদ্বিগ্ন; গণতন্ত্রের অবক্ষয়েও
ততোধিক উদ্বিগ্ন; যদিও নিজেদের দেশে সর্বহারাশ্রেণীর গণতন্ত্রে রাজনৈতিক
গণতন্ত্রের বাষ্প মাত্রও নেই। ভারতেব ১৯৭৫ সালের জুন মাসে ঘোষিত
'জরুরী অবস্থাব' সমর্থনে এগিয়ে এসেছে রাশিয়া।

স্মরণাতীত কাল থেকেই সমাজে বিচারালয়কে এবং নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থাকে একটি বিশেষ মর্যাদা ও গাম্ভীর্য প্রদান করা হয়েছে। রাষ্ট্র প্রশাসনের সর্বোচ্চ নীতির তাগিদেই বিচারালয় ও বিচারকবর্গকে স্বাধীন নির্ভীক ও নিরপেক্ষ বাখার কথা বিবেচিত হয়ে এসেছে। প্রতি সমাজে রাষ্ট্রে বিভেদ ও সংঘাত আছে। সকল রাজনৈতিক দার্শনিকরাই সমাজের বুক থেকে সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্ব-বিভেদের কারণ দূর করার ওপর জোর দিয়েছেন। কার্ল মার্কস, বাকুনিন, প্রুধোঁ, ক্রোপট্‌কিন, গান্ধী, টলস্টয়, হেনরী থোরো এই মনীষীরা শ্রেণীহীন রাষ্ট্রহীন শোষণহীন স্বাধীন-মুক্ত সমাজের কথা বলে গেছেন, স্বপ্ন দেখেছেন। মার্কস রাষ্ট্রের বিলুপ্তি সাধনের কথা বলেছিলেন (State will wither away)। শ্রেণী থাকলেই রাষ্ট্রব্যবস্থা থাকবে। 'রাষ্ট্র শ্রেণী নিপীড়নের হাতিয়ার ছাড়া আব কিছুই নয়'। তাই রাষ্ট্রের বিলুপ্তি সাধন চাই। মার্কসের এই আদর্শকে সামনে রেখে যে সব 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রত্যেকটিতেই 'রাষ্ট্র' আজ বিপুল অপ্রমত্ত বাধাহীন বলগাহীন ক্ষমতার অধিকারী। জুতো সেলাই থেকে মন্ত্রপাঠ সবই রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

সুবিশাল ঘূর্ণায়মান প্রশাসন যন্ত্র-চক্রের এক-একটি ক্ষুদ্র দাঁত ব্যক্তি-মানুষ যেন। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংঘাত চিরতরে লুপ্ত করতে গিয়ে যেমন কিছু সংঘাতের কারণ দূরীভূত করেছে সত্যিই, তেমনি নূতন নূতন সংঘাতের ক্ষেত্রও সৃষ্টি করেছে। প্রতিটি সমাজেই অনিবার্য সংঘাতের বীজ সুপ্ত আছে। এই সংঘাত ব্যক্তি-স্বার্থের সঙ্গে সমষ্টি-স্বার্থের। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তি-চিন্তা ও ব্যক্তি-অধিকারের, সমষ্টির প্রকৃত স্বার্থের সঙ্গে শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তাবোধের সংঘাত, রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সঙ্গে সার্বজনীন মানবিক

অধিকারের (Universal Human Rights) সংঘাত। আবার গ্রামীন স্বার্থের সঙ্গে শহরের স্বার্থ-সংঘাত, বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সঙ্গে কায়িক পরিশ্রমকারী শ্রমিকের, দক্ষ শ্রমিকের সঙ্গে অদক্ষ শ্রমিকের, কায়িক শ্রমিকের সঙ্গে উচ্চ বেতনভুক্ অশ্রমিক (non-worker) টেক্‌নোক্রাট কর্মচারী অফিসারের, শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সঙ্গে কৃষিশ্রমিকের, ভারী শিল্পের সঙ্গে ক্ষুদ্র কুটীর-শিল্পের। দেশের অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক উন্নয়নের বোঝা কাদের কাঁধে চাপান হবে— শহরের মানুষের ওপর না গ্রামের কৃষক শ্রেণীর ওপর—এ তর্ক নিয়েও সংঘাত আছে।

এই সব জটিল গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে কেন্দ্র করে যে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা দেবে অনিবার্যভাবে তার মীমাংসার ভার কি রাষ্ট্রের কর্ণধারদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে? রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত যদি মনঃপূত না হয় নাগরিকের তাহলে সে বিচার পাবে কোথা থেকে? রাষ্ট্র বনাম নাগরিকের স্বার্থ-সংঘাতের সুমীমাংসার জন্য কি নিরপেক্ষ একটা 'ফোরাম' থাকবে না? আর সেইরকম নিরপেক্ষ নির্ভীক স্বাধীন 'ফোরাম' না থাকলে বিচার তো হবে নিছক প্রহসন। বিচারালয় তাই এই ভূমিকাই নিয়ে থাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। যেখানে নিরপেক্ষ বিচারালয় নেই যা নির্ভয়ে রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারিতা বা অন্যায় বেআইনী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সরাসরি রায় ঘোষণা করতে পারে—সেখানে সমাজ পরিচালিত হয় একদলীয় একনায়কতান্ত্রিক শাসনে, প্রকৃত আইনের শাসনে কখনই নয়।

মস্কো-বিচারের সূচনা

১৯৩৪ সালের ১লা ডিসেম্বর বেলা ৪টার সময় লেনিনগ্রাদ কমিউনিস্ট পার্টির সদর কার্যালয়ে লিওনিদ নিকোলায়েভ নামে কথিত এক ব্যক্তি প্রবেশ করে কিরভ-কে কর্মরত অবস্থায় পিস্তল থেকে গুলি-বর্ষণ করে হত্যা করে। পলিট ব্যুরোর সদস্য কিরভ তখন নাকি কমিউনিস্ট দলের কেন্দ্রীয় কমিটির নভেম্বর প্লেনামের রিপোর্ট প্রস্তুত করছিলেন বলে শোনা যায়। এই মারাত্মক হত্যাকাণ্ডের পর থেকে পরবর্তী চার বছর ধরে রাশিয়ার স্তালিন-প্রশাসন হত্যা-হিংসা-গণ-নিপীড়নের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। কিরভ-হত্যা নাটকের পেছনে ছিল অতি কুৎসিত এক রাজনৈতিক চক্রান্ত এবং এই ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডকে স্তালিন

ও তাঁর অনুগামীরা ব্যবহার করেছিলেন রাজনৈতিক জিঘাংসা চরিতার্থ করতে ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের নির্বংশ করার অজুহাত ও হাতিয়াররূপে। সুচতুরভাবে স্তালিন কিরভ-হত্যার পিছনে বিরোধীদের রাজনৈতিক চক্রান্ত ও মতলব আবিষ্কার করে ফেললেন। প্রকৃতপক্ষে যেদিন কিরভ-হত্যাকাণ্ড ঘটে সেই দিনই হত্যা তদন্ত সুরু হবার পূর্বেই স্তালিনের নির্দেশেই রাজনৈতিক মোকদ্দমা-গুলির দ্রুত তদন্তের জন্য একটি সহজ আপাতদৃষ্ট সরল আইন রচিত হয়ে গেল। এই হত্যাকে অজুহাত হিসাবেই এই আইনের কারণ বলে দেখান হল। এই আইন দ্বারা স্তালিন তাঁর নিরঙ্কুশ একনায়কত্ব দলের মধ্যে সুদৃঢ় করলেন। বলা হয়েছিল লেনিনগ্রাদে বসে স্তালিন নাকি এই কড়া আইন রচনার পরামর্শ দেন। কিন্তু মস্কো থেকে ৪০০ মাইল দূরে অবস্থিত লেনিনগ্রাদ শহরে সেই দিনই খবর পাবার পর স্তালিন কি করে পৌছুলেন? আর তিনি ট্রেনেই খবর পেয়ে রওনা হয়েছিলেন ঘটনার দিন। ১লা ডিসেম্বরের আগে পৌছন সম্ভবই ছিল না তাঁর পক্ষে। অথচ আইনটি প্রণয়নের তারিখ ১লা ডিসেম্বর। এই আইনের বিষয় ছিল :

(১) হিংসাত্মক কাজ বা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত ক্ষিপ্রগতিতে সম্পন্ন করতে হবে—তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে।

(২) যেসব আদালতে এই ধরনের রাজনৈতিক মামলার বিচার হবে—সেই সব আদালতকে—যখন বা যেখানে অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন—সেই মৃত্যুদণ্ড তৎক্ষণাৎ কার্যকরী করতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টির প্রেসিডিয়ামের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে অপরাধীদের কাছ থেকে দরখাস্ত বা আবেদনপত্র গ্রহণ করা এসব ক্ষেত্রে সম্ভব হবে না।

(৩) আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সম্পর্কিত সংস্থাগুলিকে এইসব ক্ষেত্রে আদালত-প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ড সাথে সাথে কার্যকরী করতে হবে।

পলিট ব্যুরোর সঙ্গে কোনরকম পরামর্শ না করেই এই আইন রচিত হল এবং পরের দিনই এই বিপজ্জনক কালা কানুনটি বিজ্ঞাপিত হল। অবশ্য তার পরের দিন পলিট ব্যুরো বিচার-বিতর্ক না করেই অনুমোদন করে দিলেন। সরকারী অপ্রমত্ত সন্ত্রাসের ঢালাও ছাড়পত্র হল এই কুখ্যাত আইনটি। সর্বোৎকৃষ্ট 'সর্বহারার গণতন্ত্রে'—এরূপ একটি আইন রাতারাতি প্রণীত হয়ে কার্যকরী করা হয়ে গেল। কোন আপত্তি বা প্রতিবাদ উঠল না। এতেও স্তালিন নিশ্চিত হতে

পারেন নি। কিরভ হত্যা-তদন্তকে নিজের পরিকল্পনা এবং রাজনৈতিক মতলব অনুযায়ী পরিচালনা করলেন। তদন্তের ভার এমন এমন ব্যক্তির হাতে দেওয়া হল যাঁরা স্তালিনের প্রতি ছিলেন ব্যক্তিগত আনুগত্য বন্ধনে আবদ্ধ (খাঁটি আইনের শাসন ! ব্ল্যাকমেলের স্তালিনবাদী রাজনীতি।) ।

কিরভ-হত্যা সম্বন্ধে একাধিক ভাষ্য প্রচলিত আছে। একটি ভাষ্য হল : কমিউনিস্ট নেতা জিনোভিভের রাজনৈতিক অপরাধ বিচারের সময়ই কিরভ-হত্যার পরিকল্পনা তৈরী হয়েছিল—অর্থাৎ ১৯৩৪ সালের গ্রীষ্মকালে। স্তালিন কিরভকে ঐ বছরই আগস্ট মাসে মধ্য এশিয়ায় পাঠান। কিরভ লেনিনগ্রাদে ফিরে আসেন ১লা অক্টোবর। এই সময়ের ফাঁকেই পরিকল্পনাটি তৈরী হয়। আর একটি ভাষ্য : স্তালিন লেনিনগ্রাদ গুপ্ত-পুলিশ বিভাগের অধিকর্তারূপে ফিলিপ মেড্‌ভেদকে (Philip Medved) সরিয়ে সে জায়গায় তাঁর নিজের লোক কুখ্যাত অত্যাচারী ই. জি. এভ্‌ডোকিমভ্‌কে আনতে চেয়েছিলেন। এতে কমরেড কিরভ বাধা দিয়েছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল লেনিনগ্রাদ প্রাদেশিক কমিটির সম্মতি ব্যতিরেকে একাজ করা চলে না। স্তালিনের ইচ্ছার গতিরোধ হল।

সে সময় রাশিয়ায় NKVD-পুলিশ সংস্থার প্রধান ছিলেন ইয়াগোডা (Yagoda)। স্তালিন জানতে পারেন ইয়াগোডা জারের আমলে প্রাক্-বিপ্লবী যুগে জারের পুলিশের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ইয়াগোডার অধীনস্থ অফিসার Trilisser-কে দিয়ে ইয়াগোডা সম্বন্ধে গোপনে তদন্ত করে ইয়াগোডার বিরুদ্ধে একটি ক্ষতিকারক রিপোর্ট সংগ্রহ করে ভবিষ্যতে উপযুক্ত সময়ে ব্যবহারের জন্য রেখে দেন। এই রিপোর্টে Trilisser জানান যে, Yagoda তাঁর আসল ভূমিকার কথা গোপন করেছিলেন প্রাক্-বিপ্লবী যুগ। স্তালিন নিজেই এই রিপোর্ট সংগ্রহ করলেন Yagoda-র বিরুদ্ধে। কিন্তু তিনিই আবার Trilisser-কে এই রিপোর্ট দেবার জন্য চাকরি থেকে বরখাস্ত করলেন। পরে ইয়াগোডাকে দক্ষিণপন্থী ও ট্রট্স্কীপন্থীদের বিরুদ্ধে আনীত রাজনৈতিক মামলার অন্যতম আসামীরূপে হাজির করলেন। এই লোমহর্ষক বিচারগুলি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৮ সালে। বিচারে ইয়াগোডা, যিনি আভ্যন্তরীণ পুলিশের সর্বময় কর্তা ছিলেন তিনি এক 'স্বীকারোক্তি' করে (confession) বললেন 'কিরভের হত্যায় তিনি সাহায্য করেছিলেন' ('to assist in the murder of Kirov')। বিচারে

ইয়াগোডা বললেন : "…I was compelled to instruct Zaporozhets who occupied the post of Asst. Chief of the Regional Administration of the People's Commissariat of Internal Affairs, not to place any obstacles in the way of the terrorist act against Kirov."

অর্থাৎ কিরভের বিরুদ্ধে কোন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের কোন রকম ব্যবস্থা না নেবার জন্য Zoporozhets-কে নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। Zoporozhets—গোয়েন্দা দপ্তরের ফাইলপত্র অনুসন্ধানকালে এক হতাশ বিভ্রান্ত কমিউনিস্ট নেতৃত্ব-বিরোধী তরুণ কমিউনিস্ট কর্মী নিকোলায়েভের একটি রিপোর্ট থেকে তিনিই এই ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর এক বন্ধুর মাধ্যমে যোগাযোগ করেন। এই তরুণ নাকি কোন কমিউনিস্ট নেতাকে বিদ্বেষবশতঃ হত্যা করার সঙ্কল্প মনে মনে পুষে রেখেছিলেন।

Zaporozhets এই যুবককে একটি পিস্তলও সরবরাহ করেন এবং কিরভকে হত্যার বুদ্ধিটাও তিনি দিয়েছিলেন। স্তালিনের ব্ল্যাকমেল কত বীভৎস এই হত্যাকাণ্ড থেকে তা উপলব্ধি করা যাবে। যে-অফিসে কিরভ কর্তব্যরত ছিলেন সেখানে পিস্তলহাতে প্রবেশের পথে বাধা দূর করার ব্যবস্থাটাও পুলিশের কর্তা-ব্যক্তিটিই করে দিয়েছিলেন। ঐ বাড়ীতে যে সব ঘাঁটি আগলিয়ে প্রহরী মোতায়েন ছিল তাদেরও সরিয়ে আনা হয়েছিল। হত্যাকাণ্ড শোনার সাথে সাথে স্তালিন শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন! স্তালিন, ভরোশিলভ, মলোটভ, ঝানভ একযোগে মৃত কমরেডকে দেখার জন্য ছুটলেন লেনিনগ্রাদের অভিমুখে। কি নিষ্ঠুর, কি অদ্ভুত নাটক! ১৯৬১ সালের রুশ কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাবিংশতিতম কংগ্রেসে (XXII nd Party Congress) একজন সরকারী পক্ষের বক্তা বলেই ফেললেন ক্রুশ্চভের উপস্থিতিতে যে, এই ঘটনার অব্যবহিত পরই গ্রেপ্তারের পর গ্রেপ্তার শুরু হয়ে গেল। শুরু হল রাজনৈতিক অভিযোগের ভিত্তিতে মোকদ্দমা :

'It is as it they had been waiting for this pretext in order, by deceiving the Party, to launch anti-Leninist anti-party methods of struggle to maintain a leading position in the Party and State."

দল থেকে গণতন্ত্র ও উদারনৈতিকতাকে চিরতরে নির্বাসিত করে নিরঙ্কুশ একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার এ ছিল এক অদ্ভুত পরিকল্পনা।

স্তালিন কিরভ-হত্যার আয়োজন করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি হত্যা-তদন্তের ব্যাপারটাও নিজের হাতে নিলেন। বরিশভ এই তদন্তের অন্যতম সাক্ষী। তিনি কিরভের দেহরক্ষী ছিলেন। বরিশভ কিরভের প্রতি অনুগত ছিলেন। এঁকে স্তালিন পথের কাঁটা মনে করে নিলেন। এই অফিসার সম্বন্ধে তিনি সন্দেহ পোষণ করছিলেন। এঁকে তাই সরিয়ে ফেলতে হবে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। Zoporozhets এমন ব্যবস্থা করলেন যাতে যে-মোটরে বরিশভ সদর কার্যালয়ে (লেনিনগ্রাদে) আসছিলেন সেই গাড়ীকে এক দুর্ঘটনায় জড়িয়ে দিয়ে বরিশভকে প্রাণে মেরে ফেলা হল। এই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীকে পৃথিবীর বুক থেকে এইভাবে সরিয়ে দেওয়া হল। এ সম্বন্ধে ক্রুশ্চভ বলেছেন :

"When the chief of Kirov's body guard was being taken for questioning and he was to be questioned by Stalin, Molotov and Voroshilov—the car and its driver said afterwards was involved in an accident deliberately arranged by those who were taking the man to the interrogation. They said that he died as a result of the accident even though he was actually killed by those who accompanied him.

In this way the man who guarded Kirov was killed. Later those who killed him were shot. This was no accident but carefully planned crime." [Speech by N. S. Kruschev to the XXIInd Party Congress]

অথচ স্তালিন ও তাঁর পারিষদরা কিরভ-হত্যার দায়িত্ব চাপিয়েছিলেন কমিউনিস্ট নেতা জিনোভিয়েভ, ক্যামেনেভ এবং অন্যান্য 'দক্ষিণপন্থী' নেতৃবৃন্দের ওপর। হত্যাকারী রিভলভারধারী লিওনিদ নিকোলায়েভ স্তালিন-ইয়াগোডা-জ্যাপোরোঝেটের হাতের কাঠপুতুলীরূপে ব্যবহৃত হয়েছিলেন মাত্র। নিকোলায়েভ কিন্তু কোন অবস্থাতেই জিনোভিয়েভ যে আদৌ এ ব্যাপারে কোনভাবে জড়িত তার ইঙ্গিতও করেন নি। কিন্তু দলের মধ্যে বিরোধীদের খুঁজে বার করে নির্মূল করার অভিযান শুরু হল। পত্র-পত্রিকায় ট্রট্স্কী-পন্থীদের বিরুদ্ধে

জেহাদ সুরু হল। ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসেই লেনিনগ্রাদের ৩৮ থেকে ৪৩ হাজার মানুষকে সাইবেরিয়া ও আর্কটিক অঞ্চলে নির্বাসন দেওয়া হল। নির্মম গণ-নিপীড়নের পালা সুরু হল সেদেশে। এর পরই ক্যামেনেভ, জিনোভিয়েভ দুই প্রাক্তন পলিট ব্যুরোর সদস্য, জালুটস্কী (Zalutsky) কুকলিন, সাফারভ প্রমুখ আরও অনেক বিশিষ্ট নেতাদের ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার মোকদ্দমায় আসামীরূপে খাড়া করা হল। জিনোভিয়েভ ক্যামেনেভের বিরুদ্ধে সরাসরি কোন অপরাধের অভিযোগই ছিল না। তাঁদের অপরাধ ছিল তাঁরা নাকি নেতৃত্ব-পদে ফিরে আসতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। আর সেই উদ্দেশ্য সাধনে একটি গোষ্ঠীকে সাহায্য করছিলেন। সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর প্রতি তাঁদের নাকি সমর্থন ছিল।

রাশিয়ায় এই যে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মামলাগুলি হয়েছিল বিশিষ্ট বলশেভিক নেতাদের বিরুদ্ধে - প্রতিটি মামলায়ই নেতারা অপরাধ 'স্বীকার' (Confession) করে নিয়েছিলেন। সেই স্বীকারোক্তি সম্বন্ধে আলোচনা থেকে বোঝা যাবে—'সর্বহারার গণতন্ত্রে' আইনের শাসনের স্বরূপটা কি। রাজনৈতিক মহলে এই বিচারগুলি 'কনফেশন ট্রায়ালস্' বলেও পরিচিত। 'স্বীকারোক্তিগুলি' বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে—অবিশ্বাস্য স্বীকারোক্তি। জিনোভিয়েভ নৈতিক দায়িত্ব (moral responsibility) স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু অন্যান্য গুরুতর ঘৃণ্য অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ স্বীকার করেন নি। জিনোভিয়েভ-ক্যামেনেভ গোষ্ঠী সে সময় ছিলেন সম্পূর্ণ ক্ষমতাচ্যুত এবং স্তালিনবাদীদের কাছে পরাস্ত। এতেও স্তালিন সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাদের দৈহিক অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালের ১৬ই জানুয়ারী জিনোভিয়েভকে দশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। ক্যামেনেভের দণ্ড হল ৫ বছরের। কেউই কিন্তু ভবিষ্যতে জেল থেকে বার হয়ে আর আসেন নি। এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এঁরা নাকি 'দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির' সমর্থক ছিলেন (Right deviation)।

মস্কো-বিচার

মস্কো-বিচারের তথ্যগুলি সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। যেহেতু এদেশের কমিউনিস্টরা ভারতে 'গণতন্ত্র রক্ষার' জন্য বড় বেশী নাটুকেপনা করছেন

এবং ভারতের শাসক শ্রেণীর অগণতান্ত্রিক আচরণ সম্বন্ধে অকমিউনিস্ট রাজনৈতিক দলগুলি যখনই সমালোচনায় মুখর হন তখনই কি 'প্রাভ্‌দা' কি ভারতের কমিউনিস্ট নেতারা উষ্মায় ফেটে পড়েন 'পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের' বিরুদ্ধে 'প্রতিক্রিয়াশীলদের' 'ষড়যন্ত্রে', সেই কারণেও সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রচলিত বিচার-ব্যবস্থায় রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারগুলি কিভাবে সাচ্চা গণতান্ত্রিক কায়দায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা দরকার। এই সব রাজনৈতিক মামলাগুলির ১৯৩৬-৩৮ সালের মধ্যে রুশ দেশে বিচার ও নিষ্পত্তি হয়েছিল। প্রথম বিচারে অপরাধীদের মধ্যে ছিলেন: G. E. Zinoviev, L. B. Kamenev, S. V. Mrachkovsky, G. E. Evdokinov, I. N. Smirnov, I. P. Bakayev. V. A. Teivaganyan, E. A. Dreitzer.

দ্বিতীয় গ্রুপে যাঁদের আসামীর কাঠগড়ায় তোলা হয় তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট নেতারা হলেন: Y. L. Pyatokov, K. B. Radek, G. Y. Sokolinikov, N. I. Muralov, L. P. Serebriakov. তৃতীয় গ্রুপে ছিলেন: N. I. Bukharin, A. I. Rykov, N. K. Krestinsky, K. G. Rakovsky, G. Y. Yagoda প্রভৃতি।

রুশ-বিপ্লবের ইতিহাসে এঁরা স্মরণীয় ব্যক্তি, বলশেভিক দলেও এঁরা ছিলেন বিশিষ্ট নেতা ও ব্যক্তি। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কয়েকজনের পরিচয়টা জেনে নেওয়া যাক।

জিনোভিয়েভ লেনিনের বিশিষ্ট সহকর্মী ছিলেন। ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের' (কমিণ্টার্ণ) কার্যকরী সমিতির সভাপতিরূপে বহুদিন এই দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকরী সমিতি এবং পলিট ব্যুরোর সভ্য এবং প্রায় একটানা ৩৫ বছর বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে ৫২ বছর বয়সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। স্মারণভ ছিলেন লালফৌজের অন্যতম স্রষ্টা। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। ১৯৩৬ সালে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। বাকায়েভ ছিলেন একজন বিখ্যাত সমর-বিশারদ, সেণ্ট্রাল কন্‌ট্রোল কমিশন ও লেনিনগ্রাদ সোভিয়েটের সদস্য ছিলেন। এঁকে ৪৯ বছর বয়সে অপরাধী বিচারে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। টারভাগান্যানকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তিনি 'Under Banner of Marxism' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

বুখারীনকে যখন গ্রেপ্তার করা হল তখন তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। জিনো ভয়েভের পর তিনি কমিণ্টার্ণের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। কমিণ্টার্ণের কার্যসূচীর রচয়িতা এবং 'প্রাভ্দা' পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন বুখারীন। ১৯২০ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত স্তালিনের খুব বিশস্ত সহকর্মীরূপে স্তালিনের পক্ষ নিয়ে তদানীন্তন বাম-বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে কাজ করেন। স্তালিন দলীয় নেতৃত্বের লড়াই-এ জয়লাভ করার পর বুখারীনকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করেন। স্তালিন নিজের হাতে এঁকে হত্যা করেন। বুখারীন ছিলেন একজন বিরাট প্রতিভাধর নেতা। লেনিনের উত্তরাধিকারীরূপে অনেকেই এঁকে কল্পনা করতেন। সকোলিনিকভ লেনিনের অন্যতম সহযোগী-রূপে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী রচনা করেছিলেন। ব্রেস্ট্ লিটভ্স্কে সোভিয়েট 'শান্তি মিশনে' ডেলিগেশনের সভাপতিরূপে যান এবং দেশের হয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিতে স্বাক্ষর দেন। ১৯২২ সালে অর্থমন্ত্রী ছিলেন। ১৯২৬ সালে 'রাজ্য যোজনা পর্ষদের' সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য ছিলেন; ১৯২৯ সালে ব্রিটেনে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

সেরিব্রীয়াকভ্ ১৯০৫ সাল থেকে বিপ্লবী সংগ্রামে অংশ নেন। বলশেভিকরা ক্ষমতায় আসার পর তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে স্থান পেয়েছিলেন। মুরালভ গৃহযুদ্ধের সময় অসামান্য ভূমিকা নিয়েছিলেন।

র‍্যাকোভ্স্কী বুলগেরিয়া রুমেনিয়ার কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্ণধার ছিলেন। তিনিও ছিলেন 'কমিণ্টার্ণের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশে পর্যায়ক্রমে রুশ রাষ্ট্রদূত মনোনীত হয়েছিলেন। স্তালিনের বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন। বিশেষ দৌতকার্যে স্তালিন এঁকে এক সময় জাপানে পাঠিয়েছিলেন। এঁকেও গুলি করে হত্যা করা হয় বিচারের পর।

ক্রেস্টিনস্কী ছিলেন একজন আইনবিদ। স্তালিন দলের সর্বাধিনায়ক পদে আসীন হবার আগে ইনিই ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক। বার্লিনে রুশ রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন। প্রায় ৪০ বছর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

এবার অভিযোগগুলো কি ধরনের ছিল সেটা দেখা যাক :

"...accused of having on the instruction of the intelligence services of foreign States hostile to Soviet Union formed a

conspirtorial group named 'the Bloc of Right and Trotskyists' with the object of espionage on be half of foreign States wrecking divesonst and terroist activities, underhiping the military power of the U.S.S.R., dismembering the U.S.S.R.·· with the object of over-throwing the Socialist social and state system existing in the U S.S.R. and of restoring capitalism, of restoring the powers of the Bourgeoisie."

সকলের বিরুদ্ধে প্রায়ই একই ধরনের অভিযোগ : রাষ্ট্রদ্রোহিতা, বিদেশী পুঁজিবাদী, সোভিয়েট-বিরোধী রাষ্ট্রের অর্থে দেশের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাবৃত্তি, সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে তার জায়গায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ও পুঁজিপতিদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চক্রান্ত, দেশের অভ্যন্তরে দেশকে খণ্ড বিখণ্ডিত করার ষড়যন্ত্র। এমন কি লেনিন স্তালিনকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগও কয়েকজনের বিরুদ্ধে ছিল।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের খুব সংক্ষিপ্ত পরিচয় যা দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে অভিযোগগুলি পড়লে দেখা যাবে যাঁরা আমরণ বিদেশী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বোচ্চ ত্যাগে কোনদিন পরাঙ্মুখ হননি, জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করে বহু নির্যাতন বরণ করেছেন তাঁরাই এই সব হীনতম অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন। নিয়তির কি নির্মম পরিহাস ! এঁদের চরম শত্রুরাও বলতে পারবেন না যে, এঁরা অতীতে জারের বা জারতন্ত্রের পক্ষে বা বিপ্লবের বিরুদ্ধে কাজ করেছিলেন। কেবল কট্টর স্তালিনবাদীরা এবং তাঁদের স্তাবকরাই এইসব আজগুবি অবিশ্বাস্য অভিযোগগুলিকে প্রমাণিত সত্যের আসনে বসাতে চাইবেন।

এই ধরনের অভিযোগ ও সাজান রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা রুশ-প্রভাবিত প্রতিটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রেই অনুষ্ঠিত হয়েছে বিপক্ষ গোষ্ঠীকে নির্মূল করার জন্য, সকল রকম রাজনৈতিক বিরোধিতার বীজ সমাজের বুক থেকে উৎপাটিত করার জন্য। এখন প্রশ্ন হল, এই ধরনের মারাত্মক অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সুবিচারের জন্য প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য যে পরিবেশ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রয়োজন তা কি এক-পার্টি শাসিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সম্ভব ? বিচারালয় ও আইন-

জাবীদের স্বাধীনতা যদি না থাকে তাহলে কি প্রকৃত বিচারের পরিবেশ সৃষ্টি আদৌ হতে পারে? এই শাসনব্যবস্থায় বিচারকরাও তো পার্টির সক্রিয় সদস্য বা সমর্থক। তাঁরা তো সম্পূর্ণভাবে 'কমিটেড্'—দলের নেতা-নেতৃত্ব-কর্মসূচী ও রাজনৈতিক লক্ষ্য ও নির্দেশের প্রতি, 'পলিটিক্যাল লাইন'-এর প্রতি।

আদালতের সামনে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে যাঁরা সওয়াল করবেন তাঁদের জীবিকা বা বৃত্তি 'স্বাধীন' বলে আদৌ গণ্য নয়। তাঁরাও তো সরকারী প্রশাসন-ব্যবস্থার অঙ্গ। তাঁরাও তো দলের সভ্য বা সমর্থক। সে-শাসক দল অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি রাষ্ট্রদ্রোহিতা বা নানাবিধ মারাত্মক ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করেছেন সেই সব অভিযোগ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অসূয়া-প্রণোদিত, কাল্পনিক মিথ্যা এবং চক্রান্তমূলক বা চরিত্র হনন-মূলক একথা আকারে-ইঙ্গিতে মামলা পরিচালনা কালে বলার সুযোগই বা কোথায়? আর সে সাহস বা ক্ষমতা পাবেনই বা কি করে অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থনকারী আইনজীবীরা? তাঁরাও তো সম্পূর্ণ 'কমিটেড'। এসব আইনজীবীরা সরকারের বিরুদ্ধে বললে তাঁরাও তো রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত হবেন।

[ভারতের একজন বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা যিনি পরবর্তীকালে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী থাকাকালে ভারতের বিচারপতিদের শাসক দলের 'প্রগতিশীল' পলিটিক্যাল লাইন-এর প্রতি অনুগত থাকার পক্ষে অর্থাৎ "কমিটেড্ জুডিসিয়ারি'র পক্ষে জোরালো মত প্রকাশ করেছিলেন। সোভিয়েট বা কমিউনিস্ট বিচার-ব্যবস্থা ও আইনের শাসন বলতে একপার্টি-শাসিত রাষ্ট্রে কি বোঝায় এটা যাঁরা উপলব্ধি করতে পারবেন তাঁরাই বুঝবেন উক্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ইঙ্গিতটি কত অর্থবহ ছিল।]

মস্কোতে ১৯৩৬-৩৮ সালের মধ্যে এবং পরবর্তী কালে পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য 'সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র'গুলিতে যে সব রাজনৈতিক গর্হিত অপরাধজনিত মোকদ্দমা হয়েছিল সেই সব মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেন। তাই এসব বিচার 'কনফেশন ট্রায়াল' বলেও পরিচিত। এই ধরনের কয়েকটি মোকদ্দমায় যে সব 'স্বীকারোক্তি' গৃহীত হয়েছিল তার কয়েকটার উল্লেখ করব। একপার্টি-শাসিত রাষ্ট্রে 'আইনের শাসন' কি রূপ নিতে পারে এবং নিয়ে থাকে সেটা বুঝতে এই ধরনের তথাকথিত স্বীকারোক্তি অনেকটা সাহায্য করবে।

এবার কমিউনিস্ট নেতা বুখারীনের 'স্বীকারোক্তি' নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব। বুখারীনকে লেনিন 'Darling of the Party' বলতেন। সত্যসন্ধী নিরপেক্ষ পাঠক যাঁর মনে সোভিয়েট ব্যবস্থার প্রতি যুক্তিহীন ভক্তির প্রাবল্য অথবা অন্ধ বিদ্বেষ নেই এই নেতার 'স্বীকারোক্তি' নামক আদালতে প্রদত্ত ঐতিহাসিক বিবৃতির নিম্নে উদ্ধৃত অংশটুকু পড়লেই প্রকৃত অবস্থাটা বুঝে নিতে পারবেন।

বুখারীনের ঐতিহাতিক বিচারের সময় বুখারীন কেন নিজের অপরাধ 'স্বীকার' করলেন তার কারণ ব্যাখ্যা করতে তিনি গিয়ে বললেন :

"I shall now speak of myself, of the reasons for my repentence. Of course, it must be admitted that the incriminating evidence play a very important part. *For three months I refused to say anything.* Then I began to testify. *Why*? Because while in prisorn I made a complete evaluation of my entire past. For when you ask yourself : 'If you are to die what are you dying for ?'—an absolutely black vacuity suddenly rises before you with startling vividness. There was nothing to die for if one wanted to die unrepented. And, on the contrary, everything positive that glistens in the Soviet Union acquires new dimension in a man's mind. This in the end disarmed me completely and led me to bend my knee before the party and the country. And when you ask yourself : 'Very well, suppose you do not die. *Suppose by some miracle you remain alive, again what for? Isolated from everything, an enemy of the people, in an inhuman position completely isolated from every thing that constitutes the essence of life*···' and at once the same reply arises. And at such moments, citizen Judges, everything personal, all the personal incrustation, and the rancour pride and a number of other things fall away, disappear. And in addition, when the

reverberations of the broad International struggle reach your ear, all this in its entirety does its work and the result is the complete moral victory of the U.S.S.R. over its kneeling opponents". সার কথাটা হল এই :

"*Isolated from every thing, an enemy of the people in an inhuman position, completely isolated from every thing that constitutes the essence of life.*"

"আমি এবার আমার অনুশোচনার কারণগুলি বর্ণনা করছি। অবশ্যই বিরুদ্ধ সাক্ষ্যর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তিনমাস কাল আমি কোন স্বীকারোক্তি করতে অস্বীকার করি। তারপর স্বীকারোক্তির পালা সুরু হল। কিন্তু কেন ? কেননা কারাবাস কালে আমি আমার সমগ্র অতীতের মূল্যায়ন করি। নিজের মনে নিজেকেই যখন প্রশ্ন করলাম 'যদি মৃত্যুবরণই করতে হয় তবে কিসের জন্য, কোন্ আদর্শের জন্য ?' তখন এক নিশ্চিত মসীকৃষ্ণ শূন্যতাই তার সমগ্র বীভৎসতা ও ব্যাপকতা নিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে। অনুতপ্ত না হয়ে মৃত্যুবরণের মধ্যে একটা গ্লানি থেকে যায়। অপর-পক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়নের যা-কিছু ভাল তা বিস্তৃত দিগন্ত নিয়ে মানসপটে দীপ্যমান হয়ে ওঠে। এই চিন্তাই শেষে আমাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে ফেলল এবং দল ও দেশের কাছে নতজানু হতে প্রবৃত্ত করল। এবং নিজেকে যখন জিজ্ঞাসা করা যায়, 'বেশ তো, মনে করুন না কেন আপনার প্রাণদণ্ড হল না', কল্পনা করুন কোন অভাবনীয় অলৌকিক প্রক্রিয়া দ্বারা মৃত্যুকে এড়িয়ে প্রাণে বেঁচে রইলেন' ; কিন্তু আবার সেই প্রশ্ন, 'কিসের জন্য ?' নিজেকে সমস্ত কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে দেশবাসীর পরম শত্রুরূপে গণ্য হয়ে এক অমানসিক অবস্থায় জীবনে বেঁচে থাকার সমস্ত আকর্ষণ ও আনন্দ এবং জীবনের অপরিহার্য উপাদান-গুলি থেকে চির-বঞ্চিত থেকে ঘৃণিত জীবনের বোঝা বহনের গ্লানিকর ছবিটি মনের সামনে ভেসে আসে। আর তখনই সেই একই উত্তর এসে যায়। আর সেই মুহূর্তে যা-কিছু ব্যক্তিগত মান-অভিমান আত্মমর্যাদা ক্রোধ সব কিছুই যেন বিলীন হয়ে যায়, সর্বোপরি আন্তর্জাতিক সংগ্রামের প্রতিধ্বনি যখন কানে এসে পৌঁছায় তখন সকল কারণগুলো মিলে মিশে একত্রিত হয়ে বিচারাধীন কয়েদীর মনের উপর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার অপরিহার্য পরিণামই হল রুশ শাসন-

ব্যবস্থা ও শাসন-নীতি বিরোধী 'অনুতপ্ত' অপরাধীদের ওপর সোভিয়েট রাশিয়ার চূড়ান্ত নৈতিক বিজয়।" [বুখারীন]

ইংরাজীতে একটা কথা আছে 'Reading between the lines'—যার অর্থ পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে যে অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন অর্থ আছে সেটা পড়ে উপলব্ধি করা। বুখারীনের 'স্বীকারোক্তির' উপরোক্ত অংশটার অর্থ এতই স্পষ্ট যে, অন্তর্নিহিত অর্থের কথা উল্লেখ না করলেও চলে হয়ত। কিন্তু তবু একটু বিশ্লেষণ দরকার। কেননা এই বিবৃতি রুশীয় আইনের শাসনের স্বরূপটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। বিশ্লেষণ আরও দরকার 'প্রগতির' নামে রুশ অনুকরণের নেশা যখন বুদ্ধিজীবীদের একাংশকে পেয়ে বসেছে। আর এই প্রগতি-পন্থীরাই এদেশের শাসক শ্রেণীকে চালনা করছেন যে। কিভাবে বিচারের আগে তদন্তকারী পুলিশ অভিযুক্তদের কাছ থেকে 'স্বীকারোক্তি' আদায় করে থাকে, কি অবস্থায় অভিযুক্তদের বহু ক্ষেত্রে 'দোষ' 'স্বীকার' করে নিজেদের বুক হালকা করতে অথবা প্রাণ বাঁচাতে সচেষ্ট হতে হয় তা অন্তত ভারতবর্ষের নাগরিকদের নূতন করে বোঝাতে হবে না।

শেখান সাজান বিবৃতিতে কিভাবে প্রলুব্ধ করে অথবা ভীতি সঞ্চার করে পুলিশ স্বীকারোক্তি নিয়ে থাকে তা আর কারুর অজানা নেই। আর সেটা জানা আছে বলেও বটে, অভিযুক্তদের 'স্বীকারোক্তি'কে আদালত মৌখিক মূল্যে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করে না এদেশেও। 'স্বীকারোক্তি' গ্রহণযোগ্য এবং সাক্ষ্য হিসাবে তা বিচারের ভিত্তি কি কি অবস্থায় হতে পারে সে বিষয়ে এ দেশের আইনেই বলা আছে (Evidence Act)। ভারতেব বিভিন্ন রাজ্যে পুলিশ-হাজতে বন্দীদের যে অবস্থায় রাখা হয় তাদের প্রতি কি আচরণ করা হয়ে থাকে তা এক প্রচণ্ড কলঙ্ক। দেশ স্বাধীন হবার পর ২৫ বছর কেটে গেল বটে, কিন্তু সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঘৃণিত ব্যবস্থা আজও অব্যাহত রয়েছে। পুলিশ-হাজতে বিচারাধীন বন্দীদের নির্মম নিপীড়ন আইন-বিরুদ্ধ অমানবিক অবর্ণনীয় অত্যাচার সইতে হয়, জোর-পূর্বক স্বীকারোক্তি আদায় স্বাভাবিক রীতিতে দাঁড়িয়ে গেছে ভারতবর্ষে। কারাগারে বন্দীদের ওপর, বিশেষ করে নকশাল-পন্থীরূপে প্রচারিত বন্দীদের ওপর পুনঃপুনঃ গুলি চালনা, লাঠি চালনা, বিচারাধীন বন্দীদের জেলে জেল-পুলিশ, ওয়ার্ডারদের গুলিতে মৃত্যু কলঙ্কজনক ঘটনা ছাড়া আর কি?

বুখারীনের বিবৃতি পাঠ করে বোঝা যায় মনস্তাত্বিক কারণেই আনীত অভিযোগ তাঁকে 'স্বীকার' করতে হল শেষ পর্যন্ত। মৃত্যু-ভয় রয়েছে। ভবিষ্যৎ পরিণতির দুশ্চিন্তা রয়েছে। বুখারীনের নিজের স্বীকারোক্তি ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ তথা সরকার (Prosecution) বিচারে প্রমাণ করতে পারেন নি। তিনি স্বীকারোক্তি দিয়ে তাঁর অতীতের গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামী ঐতিহ্যের কিছুটা বাঁচাবার প্রয়াস করেছিলেন এবং যে নূতন রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা সৃষ্টির তাগিদে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন জীবন-সর্বস্ব পণ করে সেই রাষ্ট্রের (তা নিজের মনোমত না হওয়া সত্ত্বেও) কর্ণধারদের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে। বিপ্লবোত্তর যুগে রাশিয়ায় কমিউনিস্ট শাসনে গঠনমূলক জনকল্যাণকর যা কিছু কাজ হয়েছিল তার পেছনে বিপ্লবী বুখারীনের অবদান কম ছিল না। সেই সঙ্কল্প সংগ্রাম ও ত্যাগের ইতিহাসকে কি অস্বীকার করা যায়? অপরাধ 'স্বীকার' করে নিলে কমিউনিস্ট দল-রচিত ও প্রচারিত ইতিহাসে অতীতের আত্মত্যাগ নিষ্ঠা ও সংগ্রামের নীরব প্রচ্ছন্ন একটা স্বীকৃতিও হয়ত থেকে যেতে পারে। অপরাধ স্বীকার করে বুখারীনকে নিজের বুক হাল্কা করে মহান স্তালিনের 'ঘাতকদের' স্তুতিগান করে যেতেই হবে। অপরাধ অস্বীকার করলে মৃত্যু অনিবার্য। কেননা বুখারীন নিজেই বলেছেন এ অবস্থায় প্রাণ ফিরে পাওয়াটা হবে একটা 'মির্যাকল', অলৌকিক ঘটনা। এরকম ঘৃণ্য অপবাদ নিয়ে এভাবে কে মৃত্যু বরণ করতে চায়? অপরাধ স্বীকার করলে প্রাণভিক্ষা মিলতে পারে, লঘু শাস্তি হতেও পারে। বুখারীন বলছেন, ধরেই নেওয়া গেল বিচারে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে প্রাণ ফিরে পাওয়া গেল। কিন্তু সেই জীবনের বাকি দিনগুলির আকর্ষণই বা কি? এর পরিণতি তো বুখারীনের ভাষায়:

"Isolated from everything, an enemy of the people in an inhuman position completely isolated from every thing that constitutes the essence of life."

এই কথাগুলি কি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইনের শাসনব্যবস্থার অন্তরালে যে আসল স্বরূপটি বিরাজ করে তা কি প্রকাশ করে দেয় না? এই বিচার-ব্যবস্থা কি গণতন্ত্র মানবিক মূল্যবোধ ও ন্যায়-বিচার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত? ভারতের প্রচলিত বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি ভরা বিচারব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনে যাঁরা

আগ্রহী তাঁরা কি সমাজতন্ত্রের নামে যে-'আদর্শ' বিচারব্যবস্থার জয়গান সাগর পার থেকে অবিরাম ভেসে আসছে সেই ব্যবস্থার অনুকরণকামী হবেন? বিপক্ষ শক্তির ভয়াল ভ্রুকুটির কাছে ন্যায়-বিচারের বাণী শুব্ধ নয় কি? বুখারীন 'Reverberations of broad international struggle' 'বিরাট আন্তর্জাতিক সংগ্রামের প্রতিধ্বনি' শোনার কথা বলেছিলেন। কারা-প্রাচীরের অন্তরালে বিচারাধীন বন্দীকে বদ্ধ প্রকোষ্ঠের মধ্যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের পদধ্বনি শুনতে হয় অভিযোগকারী কমিউনিস্ট গোয়েন্দা-কর্তাদের মুখ থেকেই তো। যে-দেশে 'মুক্ত' মানুষ দুনিয়ার খবরের কোন নাগালই পায় না, কমিউনিস্ট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশিত প্রয়োজনীয় সংবাদ ভিন্ন অন্য কোন নিরপেক্ষ স্বাধীন সংস্থা মাধ্যমে বিশ্ব পরিস্থিতির খবর যেদেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না সে দেশে কারারুদ্ধ মানুষ 'Broad international struggle' সম্বন্ধে কতটা ওয়াকিবহাল হতে পারেন তা অনুমান করতে অসুবিধা নিশ্চয়ই হয় না। [Modern Inquisition ; Hugo Dewar]

মস্কোর চিকিৎসকদের বিচার প্রসঙ্গ ঃ

রুশ কমিউনিস্ট বিচারব্যবস্থায় স্বীকারোক্তি আদায় করা হয় ভয় দেখিয়ে এবং লক্ষ্য কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থার অভ্রান্ততা প্রমাণ করা—তাকে অর্থাৎ একনায়কতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করা এবং সকল প্রকার প্রকাশ্য সুপ্ত ও সম্ভাব্য রাজনৈতিক বিরোধীদের সমূলে উৎপাটিত করা। এ সবই স্তালিনবাদী কৌশলমাত্র। একথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য স্তালিনবাদী কমিউনিস্ট নেতা ঝানভ্-এর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মস্কোর বিশিষ্ট নয় জন চিকিৎসকের কারাবাস বিচার ও বিচারে 'স্বীকারোক্তির' (Confession) ভিত্তিতে শাস্তিদানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি এবার (Doctors' Trial)।

স্তালিন-যুগের রাশিয়ায় ঝানভ্ একটি বিশিষ্ট নাম। তিনি ছিলেন দলের অন্যতম স্তম্ভ এবং স্তালিনের বিশিষ্ট সহযোগী। তাঁকে স্তালিনের 'উত্তরাধিকারী' ('Successor') বলে অভিহিত করা হত। তিনি ১৯৪৬ সালে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক মনোনীত হন এবং 'Master planner of Russia's foreign Policy' বলে কমিউনিস্ট দুনিয়ায় এঁর খ্যাতি ছিল। ১৯৪৮ সালের ৩১শে আগস্ট ৫২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর

অব্যবহিত পরই মস্কোর বিখ্যাত ৯ জন ইহুদী চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করা হল। সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'টাস' এজেন্সী সরকারী বিবৃতি প্রচার করলেন এই মর্মে :

"The criminals confessed that they had taken advantage of the illness of A. D. Zhadanov, announced a wrong diagnosis of his illness and kept secret of the symptom of a heart disease. They later prescibed a drug harmfrul for this serious illness and thus killed A. D. Zhadanov. These doctors were described as 'criminals' and 'terrorists'. Five of these doctors were named as belonging to a 'terrorist group' connected with an international Jewish Bourgeois nationalist organisation." প্রাভ্দা পত্রিকার ঘোষণা করা হল :

"These doctors were members of an organization of Zionist spies hidden under the guise of a charity association."

অর্থাৎ এইসব বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদরা জেনে-শুনে ইচ্ছা-পূর্বক ভুল চিকিৎসা করে ভুল ওষুধের ব্যবস্থা দিয়েছিলেন, যার ফলে ঝানভের মৃত্যু হয়। তার যে হৃদরোগের উপসর্গ ছিল তা চিকিৎসকরা গোপন করেছিলেন। এঁরা আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী জাতীয়তাবাদী ইহুদী-সংঘের নিয়োজিত গুপ্তচর, রাষ্ট্র-দ্রোহী, ঘৃণ্য আসামী।

এঁরা কারারুদ্ধ হলেন স্তালিনের জাবদ্দশাতেই। লাভ্রেন্‌তি বেরিয়া তখন ছিলেন আভ্যন্তরীণ ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের সর্বময় কর্তা। যে ভদ্রমহোদয় দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করে ঝানভ মৃত্যু-রহস্য উদ্ঘাটন করেছিলেন তিনিও একজন ডাক্তার। তাঁর নাম Dr. L. F. T. Mashuk। এঁর রহস্য উদ্ঘাটন কাজটিতে সন্তুষ্ট হয়ে স্তালিন এঁকে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'Order of Lenin' উপাধি দিয়েছিলেন। এই সব চিকিৎসকরা বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলেন। রুশ পত্র-পত্রিকায় ঘোষিত হল :

"It was established with the help of documents by medical experts and *confession* by those guilty that the criminals were secret enemies of the people. They sabotaged the treatment

of the sick damaging their health. It was established during the enquiries that the members of the group had used their situation as doctors of medicine and abused the trust of the patients. They were damaging intentionally and criminally the health of those patients. The first attempt of these criminals were directed a· the military leaders of the country. They tried to eliminate them and then to weaken the defence of the country" [Excerpts from 'Hindu', January 14, 1953]

এই সব চিকিৎসকরাও বুখারীনের মতো নিজেদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি 'স্বীকার' করে নিয়েছিলেন। প্রমাণ হল এও যে, অভিযোগকারীরা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে কিছু করেন নি ; তাঁরা অভ্রান্ত। ১৯৩৮ সালের রাষ্ট্রদ্রোহিতা অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যেও ৪ জন চিকিৎসক ছিলেন। অভিযোগ ছিল তাঁরাও রুশ নেতাদের 'ভুল চিকিৎসার ব্যবস্থা দিয়ে' তাঁদের মৃত্যু নাকি ত্বরান্বিত করেছিলেন। তাঁরাও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন সেদিন। [লেনিনের চিকিৎসক ছিলেন Kazakov, Pletnev। এঁদের বিরুদ্ধে পলিট ব্যুরো অভিযোগ আনেন যে, লেনিন, প্লেখানভ, মাক্সিম গর্কী এঁদের হত্যার চক্রান্তের সঙ্গে চিকিৎসকরা নাকি যুক্ত ছিলেন।]

স্তালিনের মৃত্যুর পর ১৯৫৩ সালে ম্যালেন্‌কভ প্রধানমন্ত্রী হলেন। সোভিয়েট রাজনৈতিক মঞ্চে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৯৫৩ সালের ৪ঠা এপ্রিল এই সব ইহুদী চিকিৎসকরা মুক্তিলাভ করলেন জেলখানা থেকে। Dr. L. F. T Mashuk, যিনি এইসব চিকিৎসকদের 'চক্রান্ত' 'ষড়যন্ত্র' ব্যর্থ করে দিয়ে তাদের ধরিয়ে দিতে সাহায্য করে 'অর্ডার অব লেনিন' পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা এবার কারারুদ্ধ হলেন। এর পরই স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হল :

"Ministry of Internal affairs has made a thorough investigation of the materials of preliaminary investigation and other data in the cases of the group of physicians ..As a result of verification has shown that the charges against the

above mentioned persons were *false* and the documentary data on which investigation workers based themselves were *unfounded.* It has been established that the testimony of the arrested men *allegedly confirming* the charges made against them were obtained by workers of the investigation section of the former ministry of State Security *through use of methods of investigation which are inadmissible and most strictly forbidden by the Soviet law*".

"রুশ স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করে প্রমাণিত হয়েছে চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা এবং যে-সব তথ্য ও সাক্ষ্য-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে অপরাধীদের 'দোষী' সাব্যস্ত করা হয়েছিল সেগুলোও ভিত্তিহীন। এও প্রমাণিত হয়েছে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র বিভাগের অধীন যে-সব কর্মচারীরা অনুসন্ধান কার্য চালাতে গিয়ে অপরাধীদের কাছ থেকে 'স্বীকারোক্তি' সংগ্রহ করেছিল তা সোভিয়েট আইনে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং যে-পদ্ধতি প্রয়োগ করে এই সব 'স্বীকারোক্তি' নেওয়া হয়েছিল তাও সোভিয়েট আইনশাস্ত্র-নিষিদ্ধ ও গর্হিত।"

এর পর এদের নির্দোষ বলে ঘোষণা করে মুক্তি দেওয়া হয়। ["The arrested doctors came home fully cleared of the charges of wrecking, terrorist and espionage activities preferred against them"] [বুখারীনের স্বীকারোক্তির আলোচিত অংশ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।] স্তালিন-যুগের শাসক শ্রেণীর কুৎসিত একটা রাজনৈতিক চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেল ম্যালেনকভের আমলে। অতীতেও এই একই জিনিস স্তালিনের আমলে যে হয়নি এবং আজও যে হচ্ছে না তার প্রমাণ কি? অতীতেও তো সকল রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা বিচারে দোষ 'স্বীকার' করে বিবৃতি দিয়েছিলেন। প্রথমত, অতীতে 'স্বীকারোক্তির' ভিত্তিতে যে-সব বিশিষ্ট নেতারা দোষী সাব্যস্ত হয়ে মৃত্যুদণ্ড বা দীর্ঘ কারাদণ্ড বা নির্বাসন দণ্ড ভোগ করেছিলেন তাঁদের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ উপায়ে ভয় দেখিয়ে চাপ দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করার সম্ভাবনা আরও বেশী ছিল। অতীতের 'দোষীরা' সবাই ঘৃণ্য অবিশ্বাসী বা শয়তান ছিলেন এবং 'মহান' স্তালিন তাঁদের পরলোকে পাঠাবার ব্যবস্থা করে

সমাজতান্ত্রিক রুশ রাষ্ট্রের বনিয়াদ আরও শক্তিশালী করে জাতির ও পার্টির কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছিলেন। আর শুধুমাত্র এই চিকিৎসাবিদরাই মিথ্যে মিথ্যে 'দোষী' সাব্যস্ত হয়েছিলেন কেবল তাদের 'স্বীকারোক্তিগুলিই' চাপ দিয়ে বেআইনীভাবে আদায় করা হয়েছিল এ মনে করার পেছনে যুক্তিই বা কি আছে? দ্বিতীয়ত, ১৯৫৩ সালেই রাশিয়ার স্বরাষ্ট্র দপ্তর রুশ দেশের কমিউনিস্ট শাসনের সুদীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে সর্বপ্রথম কেবলমাত্র এই ৯ জন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে 'সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ পদ্ধতির' আশ্রয় নিয়ে ('most strictly forbidden methods') 'মিথ্যা' স্বীকারোক্তি আদায় করেছিল এরকম মনে করারও কোন প্রমাণ বা আনুমানিক কারণও নেই। তাছাড়া এই ডাক্তাররা তো রাজনীতিবিদ ছিলেন না যে, তাঁদের খতম করার জন্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে এত নীচতায় আশ্রয় নিতেই হবে।

এ হেন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যদি এই প্রতিহিংসা-পরায়ণতা স্বরাষ্ট্র বিভাগ দেখাতে পারে তাহলে বুখারীন ক্যামেনেভ জিনোভিয়েভ রাইকভ রাকোসোভস্কী এঁদের ক্ষেত্রে না জানি কত ক্রূর পদ্ধতি অবলম্বিত হয়ে থাকতে পারে, কেননা তাঁদের স্তালিন ভয় করতেন প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীভুক্ত বলে। তৃতীয়ত, সমস্ত অন্যায়ের দায়িত্ব শুধুমাত্র স্বরাষ্ট্র দপ্তর এবং বেরিয়ার ওপর চাপিয়ে দিলেই বা সেটা যুক্তিবাদী মানুষের কাছে গ্রাহ্য হবে কেন? তখন তো স্তালিন জীবিত ছিলেন। পার্টির সম্পাদক পদে ছিলেন ম্যালেনকভ নিজে। প্রথম যখন ডাক্তারদের গ্রেপ্তার করা হল তখন ম্যালেন্‌কভ ও তার সমর্থকরা নীরব ছিলেন কেন? ম্যালেন্‌কভকেও স্তালিনের 'উত্তরাধিকারী' বলা হত। তাই তাঁর প্রভাব ছিল প্রচুর। ক্ষমতা ও প্রভাব দুই-ই থাকতেও তিনি নীরব দর্শক থেকে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে নিজের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক সৌভাগ্যের ভিত্তিকে নাড়া খেতে দেননি। সত্য ও ন্যায়ের পতাকা দলের মধ্যে তুলে ধরতে পারলেন না কেন ম্যালেন্‌কভ স্তালিনের জীবদ্দশায়?

রুশ কমিউনিস্ট পার্টিতে আদর্শ আভ্যন্তরীণ পার্টি গণতন্ত্র (Inner Party democrocy) আছে বলে কমিউনিস্টরা দিবারাত্রি যে দম্ভোক্তি করে থাকেন সেটা যে কত অলীক ও অসত্য তা বার বার প্রমাণ হয়ে গেছে। স্তালিনের একটা কথা প্রায়ই শোনা যেত 'voice of the party voice of the people'। ম্যালেন্‌কভ তাঁর কালে একই কথা বলেছিলেন। তাহলে ঘৃণিত

অপরাধের দায়িত্ব সমস্ত প্রশাসন-ব্যবস্থার ওপর, পার্টি-প্রথার ওপর কেন বর্তাবে না? এও তো অদ্ভুত। এক-পার্টি শাসনতন্ত্রে বিভিন্ন বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা স্বীকৃত নয়। সব কিছুরই দায়িত্ব দলের। কমিউনিস্টরা অহর্নিশি বলে থাকেন "মস্কো অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি ভুল করে না, অন্যায় করে না।" কিন্তু সোভিয়েট চিকিৎসকদের পরবর্তী কালে 'নির্দোষ' বলে ঘোষণা করে তাদের কারামুক্তি দিয়ে সরকারী বিজ্ঞপ্তি দিয়ে, সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, মস্কো প্রমাণ করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি মারাত্মক ভুল অবিচার এবং অন্যায় করে থাকে।

দলের সিদ্ধান্ত আদৌ অভ্রান্ত নয়। স্তালিনোত্তর-কালে এই প্রথম দল তার 'ভুল' প্রকাশ্যে স্বীকার করল। সোভিয়েট সংবিধানের ৪৮, ৪৯, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫ ধারা বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে দায়িত্ব কেবলমাত্র স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এবং বেরিয়ারই শুধু ছিল না। সমস্ত আভ্যন্তরীণ দলীয় নোংরামি স্বৈরতন্ত্র ও দুর্নীতির দায় থেকে নিজেকে ও নিজের গোষ্ঠীকে বাঁচিয়ে 'সাধু' ও 'ন্যায়বান' সাজার চেষ্টা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ম্যালেনকভ। স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার, যখন এই সব নিরপরাধ চিকিৎসকদের গ্রেপ্তার করে বিচারে শাস্তি দেবার আয়োজন চলছিল তখনও দলীয় নেতৃত্ব স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে দায়ী করেছিল 'বিভাগীয় গাফিলতির জন্য' ("Laxity on the part of the organs of state security") অর্থাৎ বলা হয়েছিল স্বরাষ্ট্র দপ্তর সজাগ ও তৎপর থাকলে এই 'ষড়যন্ত্রকারী চিকিৎসকদের' আরো আগেই শাস্তি হত। ১৯৫৩ সালের ১৮ই জানুয়ারী 'প্রাভদা' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয়েছিল:

"A care-free smug, complacent mood has penetrated the party ranks and *such unpleasant facts as capitalist encirclement and plot have begun to be forgotten.*"

পার্টি-কর্মীদের ও দেশবাসীদের উদ্দেশে বলা হল:

"They are losing sight of the fact that the imperialists, specially the Americans, developing preparation for a new war attempting to send into our country and other countries of Soviet camp twice and three times their agents, spies, diversionists than into the rear of any bourgeois country."

এটাই হল আসল কথা। দেশবাসীকে সব সময় মনে করতে হবে 'দেশ শত্রু

দ্বারা সদা-পরিবেষ্টিত। সেই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত সফল করার জন্য দুগুণ তিনগুণ গোয়েন্দা, গুপ্তচর রুশ দেশে ও তার বন্ধু-রাষ্ট্রগুলিতে পাঠান হচ্ছে। দেশের মধ্যে একটা নিশ্চেষ্ট উদাসীনতার ভাব পরিব্যাপ্ত হয়েছে। বিদেশী শত্রু রাষ্ট্র কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে থাকা এবং তাদের চক্রান্তের কথা ভুলে থাকার মনোভাব পেয়ে বসেছে যেন।'

এই রাজনৈতিক প্রচার-তত্ত্বের পটভূমিতেই মামলাগুলির তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়। শত্রুর অস্তিত্ব-তত্ত্ব দিয়ে কমিউনিস্ট একনায়কতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করা হয়ে থাকে। তাকে আরও দীর্ঘমেয়াদী ও সকল সম্ভাব্য বিরোধিতা-মুক্ত করার মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি সৃষ্টি করা হয় শত্রু-ভীতি জনসাধারণের মনে সঞ্চার করে। 'দেশ বিপন্ন শত্রুদের দ্বারা' এ কথাটা সব সময়ই দেশবাসীদের মনে রাখতে হবে। [এই যুক্তি দিয়ে আমাদের দেশেও জরুরীকালীন অবস্থাকে আজও জিইয়ে রাখা হয়েছে। সকল গণতান্ত্রিক অধিকার সঙ্কুচিত করে রাখা হয়েছে।] এই অবস্থা চলতে থাকলে দেশের আভ্যন্তরীণ যে-কোন গণতান্ত্রিক বিরোধ বা মত-পার্থক্য ও নিষ্পাপ প্রতিবাদকেও 'বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের কারসাজি' এবং 'দেশের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার চক্রান্ত' বলে অভিহিত করে—দাবিয়ে রাখা সহজ হবে। জনগণের কণ্ঠরোধ করার পক্ষে এই রাজনৈতিক তত্ত্বকে হাজির করান যাবে।

সর্বহারার একনায়কত্বের নামে কমিউনিস্টরা গণতন্ত্র নয়—তাঁদের দলীয় একনায়কত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর—এই সমালোচনার উত্তরে কমিউনিস্টরা বলে থাকেন যে, এই একনায়কতন্ত্র স্বল্প-মেয়াদী। কিন্তু কমিউনিস্টরা যদি অবিরাম প্রচার দ্বারা জনমানসে এই বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারেন যে, তাঁদের 'দেশ বিপন্ন' ও 'শত্রু পরিবেষ্টিত' এবং 'শত্রুরা তাঁদের দেশকে পদানত করার চক্রান্ত করছে'—'দেশে পঞ্চমবাহিনী সৃষ্টি করে এবং গুপ্তচর ঝাঁকে ঝাঁকে পাঠিয়ে', আর সেই ভীতি যদি সত্যি সত্যি গেঁথে দেওয়া যায় জনমানসে—তাহলে একনায়কতন্ত্রের আয়ুও ক্ষীণতর হবার কোন লক্ষণই দেখা যাবে না। আর সেই পরিস্থিতিতে একনায়কতন্ত্র হটিয়ে সে জায়গায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলার স্পর্ধাও কারুর থাকবে না। 'রাষ্ট্র পরিশেষে বিলুপ্ত হবে' ('state will wither away').এই ভবিষ্যদ্বাণী এই মৌল তত্ত্বটি আষাঢ়ে গল্প হয়ে বইয়ের পৃষ্ঠায়ই বন্দী হয়ে থাকবে।

এই ধরনের অভিযোগ চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে আনার পেছনে যে মনস্তত্ত্ব ফুটে ওঠে তাও বিস্ময় সৃষ্টি না করে পারে না। চিকিৎসক যদি ভুল চিকিৎসাও করে থাকেন তাহলে চিকিৎসাধীন রুগী বা তাঁর আত্মীয়রা চিকিৎসকের 'ভুল চিকিৎসা' 'উদ্দেশ্য-প্রণোদিত' এবং 'রাষ্ট্রদ্রোহিতার' পর্যায়ভুক্ত হয় কিভাবে? চিকিৎসা-বিদ্যা তো যাদু-বিদ্যা নয়—চিকিৎসকরাও যাদুকর নন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যত বিকাশ ও উন্নতিই হোক না কেন—মৃত্যু রোগ শোক থেকে অব্যাহাত নেই। চিকিৎসকরা নিজেদের প্রজ্ঞা ও বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করেই রোগের কারণ এবং উপশমের চেষ্টা করেন। যাঁরা অভিযোগ করছেন ভুল চিকিৎসা হয়েছে বলে তাঁদের বিচারের ভিত্তিই বা কি? রুগী মরে গেছে বলেই সব সময়ই চিকিৎসক ভুল চিকিৎসা করেছেন—এ তো যুক্তির কথা নয়। অন্য এক দল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দল যদি ঘোষণা করেন—ভুল চিকিৎসার ফলে রুগীর মৃত্যু হয়েছে—তাঁদের মতই যে অভ্রান্ত তা মনে করারই বা কি কারণ? ভুল চিকিৎসার জন্য যদি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে চিকিৎসককে কাঠগড়ায় দাঁড় করান হয়—তাহলে শত শত চিকিৎসককে কারাগারের প্রকোষ্ঠে চির-বন্দী করে রাখা যায়। এ তো রাজনৈতিক ব্ল্যাকমেইলের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াবে।

চিকিৎসকদের চিকিৎসাও কি পার্টি-লাইন মাফিক হওয়া চাই? পার্টি-লাইনের চশমা দিয়েই কি রোগ নির্ণয় করতে হবে? কোন কোন চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে, তাঁরা যত্ন সহকারে রুগীকে পরীক্ষা করেন না—, গাফিলতির পরিচয় দেন—রুগীকে হাতে রাখেন বেশী দিন অনাবশ্যকভাবে চিকিৎসাধীনে রেখে ইত্যাদি ইত্যাদি; ভুল চিকিৎসা চরম অবহেলার ফলে বহু রুগীর মৃত্যুও হয়। কিন্তু কোন চিকিৎসক 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য'-বশতঃ ভিন্ন-মতাবলম্বী এক রুগীকে 'ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল চিকিৎসা দ্বারা' সেই রুগীর মৃত্যু ঘটিয়ে বিরোধী গোষ্ঠীকে খতম করবেন একথা কল্পনা করতেও মন শিউরিয়ে উঠবে।

এদেশের কথাই ধরা যাক। কোন বিশিষ্ট কংগ্রেসপন্থী চিকিৎসক চিকিৎসাধীন কোন বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা বা কর্মীর ইচ্ছাকৃত ভুল চিকিৎসা দ্বারা তার মৃত্যু ঘটিয়ে কংগ্রেস-বিরোধী শিবির দুর্বল করবেন এই ধরনের চিন্তা কোন গোঁড়া কমিউনিস্টের মনেও কোন সময় উঁকি দেয় না। বহু বিশিষ্ট কমিউনিস্ট চিকিৎসকের হাতে কমিউনিস্ট-বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা চিকিৎসাধীন থাকেন। রুগীর মনে কি ভুলেও কখনও কোন সন্দেহ

উঁকি মারে, না মেরেছে? চিকিৎসকের প্রতি এই অবিশ্বাস শুধু আত্মঘাতী চিন্তাই নয়—মনুষ্যত্বের প্রতি অবিশ্বাসের নামান্তর। সর্বব্যাপী ক্ষমতা-সম্পন্ন একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রে সবাই যেন সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখে। সবাই সবাইকে শত্রু মনে করে। প্রেম ঔদার্য মানবতা বিশ্বাস ক্ষমা সহনশীলতা এ সবই 'বুর্জোয়া' 'পুঁজিবাদী' নীতি-কথা বলে নিন্দিত। ব্যক্তির মর্যাদা ও আত্মসম্মান সর্বব্যাপী সন্দেহ ও ভীতির বিষাক্ত পরিবেশে যেন সঙ্কুচিত।

একটা প্রশ্ন উঠতে পারে—অন্যায় কাজ বা গর্হিত কাজ হলেও চিকিৎসকদের বিচার প্রহসনের-ব্যাপারটির প্রকৃত রহস্য তো রাশিয়ায় উদ্ঘাটিত শেষ পর্যন্ত হল। চিকিৎসকরা তো শেষ পর্যন্ত রেহাই পেলেন এবং বেরিয়ারও তো শাস্তি হল। রুশ প্রশাসন-ব্যবস্থায়ই এটা সম্ভব হয়েছিল। এ বিশ্লেষণ কিন্তু যুক্তি-যুক্ত নয়। মূল পাল্টা প্রশ্ন: স্তালিনের জীবদ্দশায় এটা সম্ভব হয়নি কেন? স্তালিনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরই স্তালিনবাদীদের ক্ষমতা ও দাপট শিথিল হবার পরই এটা সম্ভব হয়েছিল। স্তালিনের জীবদ্দশায় ম্যালেন্‌কভ ক্রুশ্চভ জুকভ কেউই মাথা তুলতে পারেন নি। স্তালিন ছিলেন প্রশ্নাতীত সন্দেহাতীত নেতা। স্তালিনের সমালোচনার অর্থই হবে রাষ্ট্রদ্রোহিতা। কোন সাংবিধানিক অধিকারের ভিত্তিতে অভিযুক্ত চিকিৎসকদের মৌল অধিকারের সূত্র ধরে বা কোন আন্দোলনের ভিত্তিতে এই হীন চক্রান্তের উদ্ঘাটন হয়নি। আদালতের রায়ের ভিত্তিতেও হয়নি। প্রধানমন্ত্রী ম্যালেন্‌কভের ইচ্ছা ও সঙ্কল্পই ছিল ঘৃণ্য চক্রান্ত উদ্ঘাটনের উৎস,—'আইনের শাসন' নয়—সোভিয়েট সাংবিধানিক গ্যারাণ্টি নয়, রুশ সংবিধানও নয়। এত বড় একটা চিকিৎসক-বিরোধী ঘৃণ্য চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেল কিন্তু রুশ দেশে হল না কোন গণ-বিক্ষোভ শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের লতাগাছ যে-রাজনৈতিক কাঠামোকে জড়িয়ে অবলম্বন করে বিকশিত পল্লবিত হয়—সেই কাঠামোই যদি না থাকে তাহলে গণতন্ত্রের লতা অচিরেই বিনষ্ট হয়। গণ-বিক্ষোভ গণ-আন্দোলনের সুযোগ ও পরিবেশ কোনটাই থাকে না।

বেরিয়া-বিচার প্রসঙ্গ

মস্কোর চিকিৎসকদের বিচার প্রহসনের যবনিকা উত্তোলিত হয়ে 'দোষী' চিকিৎসকরা 'নির্দোষ' বিচারে যখন মুক্তি পেলেন তখনই অনুমান করা গিয়েছিল

রুশ দেশে আর একটা রাজনৈতিক ঝড় আসন্ন এবং নূতন পার্জ-এর রাজনীতি সুরু হবে। বেরিয়ার রাজনৈতিক জীবন বিপন্ন আশঙ্কা করেছিলেন কেউ কেউ। ১৯৩৯ সাল থেকেই বেরিয়া স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রায় সর্বময় কর্তা ছিলেন। ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির এক বিশেষ সভায় বেরিয়াকে দল থেকে বহিষ্কার করা হল এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচারের জন্য আদালতের কাছে অভিযোগ পেশ করা হল। বেরিয়ার বিরুদ্ধে আনীত অভি-যোগের আলোচনা সুরু করার আগে তাঁর সম্বন্ধে দু-চারটে কথা বলা প্রয়োজন।

তিনি ১৯৩৭ সালে বলশেভিক পার্টিতে যোগ দেন এবং ২০ বছর ধরে 'মহান' স্তালিনের বিশ্বস্ত সহযোগী ছিলেন। স্তালিনের মৃত্যুর পর তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে যে বিশাল সমাবেশ হয় তাতে ভাষণ দিতে গিয়ে ম্যালেন্‌কভ ঘোষণা করেন যে, বেরিয়ার স্থান রুশ রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে 'দ্বিতীয়' ("Number two in the Soviet hierarchy ahead of Molotov"), মলোটভেরও উর্ধ্বে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে 'মার্শাল' উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। এছাড়া সোভিয়েট রাষ্ট্রের আরও তিনটি বড় খেতাব এঁকে দেওয়া হয়। যথা: (১) অর্ডার অব লেনিন, (২) অর্ডার অব দি রেড ব্যানার অব দি লেবার, (৩) অর্ডার অব সুভোরভ। ১৯৩৪ সাল থেকেই একটানা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। স্তালিনের মৃত্যুর পরই যাঁকে প্রধানমন্ত্রী ম্যালেন্‌কভ দেশের 'Number two' বলে ঘোষণা করলেন দেশের কর্ণধারদের মধ্যে, মাসাধিককাল অতিবাহিত না হতেই তাঁকেই আবার 'দেশদ্রোহী' 'সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়নক' বলে অভিযুক্ত করে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। প্রাভদা ও ইজভেস্তিয়ায় বলা হল:

"Agent of international imperialism and the sworn foe of the Party and the Government".

বেরিয়া নিরপরাধ একথা আদৌ আমার প্রতিপাদ্য নয়। অগণিত মানুষের রক্ত ঝরিয়েছেন, স্তালিনের বিশ্বস্ত জহ্লাদ ছিলেন তিনি। স্তালিন-কন্যা শ্বেতলানা তাঁর পত্রে স্তালিনের মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্ত বর্ণনা করতে গিয়ে বেরিয়া সম্বন্ধে লিখেছেন:

"There was only one person who was behaving in a way that was very nearly obscene. That was Beria. His

face repulsive enough at the best of times, now was twisted by his passions—by ambitions cruelty cunning and a lust for power and more power still. He was trying so hard at this moment of crisis to strike exactly the right balance, to be cunning, yet not too cunning. It was written all over him. He went up to the bed and spent a long time gazing into the dying man's face. From time to time my father opened his eyes but was apparently unconscious or in that semi-consciousness. Beria stared fixedly at those clouded eyes anxious even now to convince my father that he was the most loyal and devoted of them all as he had always tried with every ounce of his strength to appear to be. Unfortunately he had succeeded for too long.

He was a magnificent modern specimen of the artful courtier, the embodiment of oriental perfidy, flattery, hypocrisy who had succeeded in confounding even my father, a man whom it was ordinarily difficult to deceive. A good deal that this monster did is a blot on my father's name and in a good many things they were guilty together. But I had not the slightest doubt that Beria used his cunning to trick my father into many other things and laughed his sleeve about it afterwards. All the other leaders knew it." [Twenty Letters To A Friend ; Svetlana Alliluyeva, P. 8—9.]

অনুগ্রহপ্রার্থী তোষামুদে রাজ-সভাসদ সম্বন্ধে স্তালিন-দুহিতার এই বিশ্লেষণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি তো এঁকে কিছুটা কাছে থেকে দেখেছিলেন। কিভাবে এই ধূর্ত ব্যক্তিটি তাঁর পিতাকে ভুল বুঝিয়ে অগণিত অন্যায় কাজ করিয়ে নিয়েছিলেন, স্তালিনের ন্যায় ধূর্ত চতুর রাজনীতি-কূটনীতি বিশারদকে বোকা বানিয়ে কাজ হাসিল করেছিলেন তা স্তালিন-কন্যা শ্বেতলানা মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন। বিশ্বাসঘাতকতা স্তাবকতা ভণ্ডামীর মূর্ত প্রতীক ছিলেন এই

ব্যক্তিটি। অচৈতন্য মৃত্যুপথযাত্রী স্তালিন যখন অচেতন অবস্থায় মধ্যে মধ্যে চোখ মেলছিলেন তখন বেরিয়া তাঁর মুখের ওপর উঁচু হয়ে পড়ে—তাঁর নেতাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করছিলেন প্রভুর প্রতি তাঁর আনুগত্য। মনে মনে চাইছিলেন স্তালিনের মৃত্যুর পরই তো মসনদ তাঁর দখলে আসবে। ক্ষমতার, আরও ক্ষমতার লোভ মানুষকে কি কুৎসিত করতে পারে তার অন্যতম প্রমাণ ছিলেন ব্যক্তি-বেরিয়া।

কিন্তু এহেন ব্যক্তিকে দেশের 'দু-নম্বর নেতা' বলে ঘোষণা করার কিছু কালের মধ্যেই 'দেশের দুশমন' বলে শাস্তি দেওয়া হল—একি এক তাজ্জব ব্যাপার নয়? কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটা সম্ভব? বিরোধী-পন্থীরা করতে পারেন, কিন্তু নিজের দলের কাছ থেকে কি এটা প্রত্যাশিত? তাহলে অন্যরা বলতে পারেন আজ যাঁরা রুশ দেশের জননায়ক তাঁরাই যে ক্ষমতাচ্যুত হবার পর 'সাম্রাজ্যবাদীদের দালালী' 'বিদেশীদের স্বার্থে গুপ্তচরবৃত্তি' করছিলেন না তারই বা কি প্রমাণ?

বেরিয়া সম্বন্ধে প্রাভদা পত্রিকায় বলা হল:

"An adventurist and hireling of foreign imperialist forces, he hatched plans to grab the leadership of the Party and country with the aim of actually destroying the Communist Party and to change the policy elaborated by the Party by a policy which would have brought about ultimately the restoration of capitalism."

"সাম্রাজ্যবাদীদের ভাড়াটিয়া এই চক্রান্তকারী ব্যক্তিটি দলের নেতৃত্ব নিজের মুঠোর মধ্যে এনে দলীয় কর্মসূচী ও নীতিকে বিসর্জন দিয়ে কমিউনিস্ট দলকে ধ্বংস করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পুনঃ-প্রবর্তনের চক্রান্ত করেছিলেন।"

উক্ত পত্রিকায় আরও বলা হয়:

"Beria started to disclose his real face—the face of a criminal enemy of the party and the Soviet people. Such intensification of Beria's criminal activities can be explained by a general intensification of the undermining of the anti-Soviet activities of international reactionary forces which

are hostile to our state. Beria started by attempting to put the U.S.S R. Ministry of Internal Affairs before the Party and the people and create difficulties in the country's food supply".

এই হচ্ছে বেরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগের তালিকা। "তিনি সোভিয়েট রাষ্ট্রবিরোধী আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দৃঢতা দেখাননি, পরন্তু তাকে লঘু করে দেখার চেষ্টা করেছেন। দল ও জনতার উর্ধ্বে নিজের দপ্তরকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি দেশের খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার অসুবিধা সৃষ্টি করেছিলেন।" অভিযোগ তো সবই ভাসা ভাসা, অস্পষ্ট। দলের নীতির প্রতি গোপন অশ্রদ্ধার জন্য কোন নেতা কর্মীকে দল থেকে বহিষ্কার করা যেতে পারে। কিন্তু দলের নীতির বিরোধিতা করা বা তার প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব দেখান আর যাই হোক দেশদ্রোহিতা বলে কখনই গণ্য হতে পারে না। তাছাড়া গণতান্ত্রিক দলের সকল সদস্যদের মৌলিক অধিকার আছে নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অথবা প্রচলিত নেতৃত্বকে সরিয়ে নূতন নেতৃত্ব সৃষ্টি করার।

তাহলে এক-পার্টি-শাসিত কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে 'দেশ' ও 'দল' সমার্থ-বোধক শব্দ। (কমিউনিস্ট পার্টি=রাশিয়া) তাই কমিউনিস্ট পার্টির নীতির বিরোধিতার অর্থ দেশদ্রোহিতা। দ্বিতীয়, কমিউনিস্টরা নিজেদের পার্টিকে সেরা গণতান্ত্রিক দল বলে অহোরাত্র প্রচার করে থাকেন। সেই রুশ কমিউনিস্ট পার্টিতে সদস্যদের নেতৃত্ব দখলের বা পরিবর্তনের কোন রকম গণতান্ত্রিক অধিকার তাহলে নেই। অতএব দল গণতান্ত্রিক তো নয়ই, প্রকৃত অর্থে জনগণেরও নয়। জনগণের দলের মনোনীত নেতাদের ও দলের কর্মসূচীকে নির্বিচারে অনুসরণ করারই অধিকার আছে মাত্র, পরিবর্তনের নয়। কর্মী ও জনগণের কর্তব্য নির্দেশ-পালন ও অনুসরণ করার, আর দলের নেতাদের আছে হুকুম করার অধিকার।

বেরিয়ার বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ "তিনি দলের নীতিকে উল্‌টিয়ে দিয়ে তার জায়গায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চালু করতে চেয়েছিলেন।" এহেন ব্যক্তির পক্ষে সদা-সজাগ রুশ কমিউনিস্ট পার্টি-শাসিত দেশে ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত এই বিরাট দায়িত্বে কি করে অধিষ্ঠিত থাকা সম্ভব হল? এরকম একজন 'জনতার শত্রুর' পক্ষে এই বিপুল ক্ষমতা করায়ত্ত করা সম্ভব হল বিনা বাধায়

বিনা প্রতিবাদে? আর একা বেরিয়ার হাতে এত ক্ষমতা ছিল যে, তাঁর চক্রান্তের জন্যই দেশে পুঁজিবাদ পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হতে পারত?

দীর্ঘ ৩৬ বছরের অপরিসীম চেষ্টা সাধনা ও ত্যাগের দ্বারা গড়ে তোলা সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে রাতারাতি কি করে একজন ব্যক্তি বা নেতা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করতে পারেন? তা যদি সম্ভব হয় তাহলে বুঝতে হবে ৩৬ বছর সমাজতন্ত্র চালু হবার পরও সে দেশের জনমানসে সমাজতন্ত্রের প্রতি কোন আবেগ সৃষ্টি হয়নি; সুযোগ পেলে সে দেশের লোক তাহলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে শাঁখ-ঘণ্টা বাজিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে বসবে। দ্বিতীয়ত, বেরিয়ার বিরুদ্ধে যেভাবে অভিযোগ দাঁড করান হয়েছে সেটা মৌখিক মূল্যে গ্রহণ করলে এই সিদ্ধান্তে না এসে উপায় থাকে না যে, সোভিয়েট রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ক্ষমতার বণ্টন-ব্যবস্থা (Distribution of powers) এমনই যে, যে কোন বিশেষ এক নেতা বা গোষ্ঠীর পক্ষে পর্দার আড়ালে, লোকচক্ষুর অগোচরে, এমন অপরিসীম ক্ষমতা করায়ত্ত করা সম্ভব যার ফলে দেশের জনগণ এবং 'বিপ্লবী' 'সবহারা শ্রেণী পার্টির' সজাগ প্রহরা সচেতনতা ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেশের প্রগতিশীল সমাজ-ব্যবস্থাকে (সমাজতন্ত্র) উল্টিয়ে দিয়ে তার জায়গায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অথবা 'জারতন্ত্র' পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব।

বেরিয়ার সম্বন্ধে আনীত সাংঘাতিক অভিযোগগুলি সম্বন্ধে ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৫৩ সালের মে মাস পর্যন্ত রুশ-জনগণের শতকরা ৯৯ জন কিছুমাত্র খবরও রাখতেন না। তিনি তো দেশে নেতৃত্বের 'দুই নম্বর ব্যক্তি' (Number two in the hierarchy)। সত্যবাদী 'প্রাভদা'-ই যখন এই 'সত্য' উদ্ঘাটন করলেন দেশবাসী তখনই তা জানলেন। কি গণতন্ত্র! যে দেশে সত্যকারের গণতন্ত্র আছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে এবং শাসক দল যেদেশে গণতন্ত্রের শক্ত জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত সেখানে সে দেশে জনগণের সজাগ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে এই ধরনের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র অসম্ভব।

কয়েকটি কমিউনিস্ট দেশে রাজনৈতিক মামলার বিচারের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, বিচার সুরু হবার সময় থেকেই দেশের রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা সংবাদপত্র মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ সুরু হয়ে যায়—বিচারে দোষী সাব্যস্ত হবার অনেক আগেই। [এ ব্যাপারে এদেশের কিছু কিছু নামী দামী সংবাদপত্রের ভূমিকা আদৌ প্রশংসনীয় নয়। বিচারের আগেই

নিরপেক্ষ পরিবেশ অনেক ক্ষেত্রে থাকে না। এসব ক্ষেত্রে আদালত অবমাননার (কন্‌টেম্‌পট অব কোর্ট) দায়ে ব্যবস্থা নেবার বিধান আছে সত্যি—কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে নানা কারণে সে অধিকার বা সুযোগ কার্যকরী হয় না।] ইংলণ্ডের কোর্টের একটি নজীর উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৪৯ সালে Haigh নামে এক ব্যক্তিকে এক খুনের অপরাধে লণ্ডনের পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এই হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতা ইংলণ্ডবাসীর মনে এক বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল। হেইগকে গ্রেপ্তার করার পর স্থানীয় একটি জনপ্রিয় সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে 'নর-রক্তশোষক জানোয়ার' ('Vampire') বলে আসামীকে চিত্রিত করেছিল। নিহত ব্যক্তির একটি ছবিও সেই সঙ্গে ছাপা হয়েছিল একই কাগজে। আদালতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক আদালত অবমাননার দায়ে দণ্ডিত হন। লর্ড চীফ জাস্টিস গডার্ড তাঁর রায়ে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে সম্পাদককে তিনমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সংবাদপত্রকে দশ হাজার পাউণ্ড জরিমানাও করেন।

এই সব বিধানের উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে প্রকৃত সত্যাসত্যের বিচার হয়। বিচারের আগে থেকে সংবাদপত্রে চটকদারী শিরোনাম ও রিপোর্ট প্রকাশিত হলে কাগজের প্রচলন বাড়ে। এই ধরনের প্রচার বিচারকের মনকেও প্রভাবিত করতে পারে। লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা প্রেজুডিস্‌ড না হয়। চমক লাগিয়ে চটকদারী সংবাদ কাহিনী প্রকাশ করে এদেশের কিছু কিছু পত্র-পত্রিকার ভূমিকা যদি নিন্দিত না হয় তাহলে আদালতের নিরপেক্ষ বিচারের পূর্বেই দেশবাসীর কাছে অভিযুক্ত ব্যক্তির নৈতিক বিচার ও শাস্তি হয়ে যায়।

বেরিয়ার ক্ষেত্রেও অতীতের মস্কো-বিচারের মতই বিচার চলা কালেই পত্র-পত্রিকায় বিষোদ্গার সুরু হয়ে যায়।

একটি পত্রিকায় বলা হল:

"No words can express the wrath and indignation of collective farmers caused by the criminal activiti s of the despicable enemy cf the people, the degenerate Beria and his gang. The perfidious wcrk of spies traitors and murderers was directed against the State". ['Collective Farmers']

প্রাভদায় বলা হল :

"Beria an apostate and a traitor who had lanched our the pattern of monstrous crimes and attempted to hinder the communist construction in our countries"

সুপ্রীম কোর্টের চূড়ান্ত বিচার হবার পূর্বেই বেরিয়া অপরাধী বলে সাব্যস্ত হলেন। প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষের কালো হাওয়ায় বিচারকদের মন ও দৃষ্টি আচ্ছন্ন করা হল। সোভিয়েট সংবিধানের ১২৩ ও ১২৫ ধারায় যে মূল্যবান অধিকার স্বীকৃত তা যে নিছক কাগজিক অধিকার—তা বিভিন্ন রাজনৈতিক মোকদ্দমাগুলিতে প্রমাণ হয়ে গেছে।

সেই প্রথম ঐতিহাসিক মস্কো-বিচার থেকে সুরু করে আজ অবধি একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হচ্ছে—একই ট্র্যাডিশন চলে আসছে। কোথাও কোন পরিবর্তন নেই। স্টেজও তৈরী, কাহিনীও প্রস্তুত। শুধু নায়কের পরিবর্তন ঘটছে মাত্র। যে কারাগারগুলি ১৭ বছরে ধবে বেরিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল এবং তাঁরই নির্দেশে সহস্র সহস্র নিরপরাধ নর-নারীর যে কারাগারগুলিতে জীবন শেষ হয়েছে, ইতিহাসের ক্রূরতম নৃশংস হত্যা ও মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে সরকারী অপরাধের—গোয়েন্দা পুলিশের পরামর্শ ও চক্রান্তের সাক্ষী যে কারাগারগুলি, সেই কারাগারেরই একটিতে বেরিয়া বন্দী হয়ে রইলেন। শেষ দিনগুলি কারাগারেই কাটালেন।

রুশ রাজনীতি বিশেষজ্ঞদের কারুর কারুর মতে ম্যালেন্কভ প্রধানমন্ত্রী না হলে বেরিয়াই তাঁকে একদিন খতম করতেন। জুন্টা পরিচালিত একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রে অথবা এক-পার্টি-শাসিত রাষ্ট্রে আভ্যন্তরীণ ক্ষমতার লড়াই-এ আসল প্রশ্ন হল কে আগে উপযুক্ত মুহূর্তে কোপ মারতে পারে অপরের শিরঃদেশে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ব করা নির্ভর করে না আদৌ—জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন শুভেচ্ছার ওপর। বন্দুকের নলই যে ক্ষমতার উৎস! পুলিশ-মিলিটারির সমর্থনই নেতৃত্ব-প্রতিষ্ঠার গ্যারান্টী।

সুপ্রীম কোর্ট বেরিয়া ও তাঁর সহযোগীদের গোপন বিচারে (camera trial) মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। বিচারের সময় বেরিয়া ও তাঁর সহযোগীরা আদৌ উপস্থিত ছিলেন কি না জানা যায়নি। সুপ্রীম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছিল :

"The sentence is final and is not subject to appeal". [New Herald, 29. 12. 53]

'এই দণ্ডাদেশই চূড়ান্ত; এর বিরুদ্ধে কোন আপীল করা চলবে না।' বুখারীনের বেলায়ও এই ধরনের ডিক্রী জারী করা হয়েছিল 'আপীলের কোন অবকাশ নেই।' আর, কার কাছে আপীল হবে? যে-রাজ্যের শাসক দলের ক্ষমতাসীন নেতারা 'অভ্রান্ত' 'নির্ভুল' তাঁদের সিদ্ধান্তের ওপর মতব্বরি করবে কোন্ উচ্চ ট্রাইবুন্যাল বা আদালত? অসম্ভব। আদালতের বিচার করাও তো দলেরই সদস্য কমিটেড। দলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ও শেষ কথা। রায় দিতে গিয়ে আদালত কি আসামীদের আপীলের অধিকার কখনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কেড়ে নিতে পারে? দলের হুকুমই কি 'আইনের শাসন'' বলে বিবেচিত হবে? গণতান্ত্রিক বিচার-ব্যবস্থা ও আইনের শাসন একথা মানে না যে, বিচারক অভ্রান্ত। তাই আপীল রিভ্যু রিভিশনের ব্যবস্থা আছে বা থাকে। কমিউনিস্ট বিচার-ব্যবস্থায় তা নেই দেখা গেল।

বেরিয়াকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল—বিচারের পরই। লণ্ডন থেকে প্রচারিত এক সংবাদে বলা হয় 'Beria buried in an unknown grave' যে-ব্যক্তিকে ঘৃণ্যতম অপরাধী, কৃতঘ্ন, জনগণের দুশমন বলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল মৃত্যুর পর তার মৃতদেহ নিয়ে এই গোপনীয়তা কেন? সুপ্রীম কোর্টের শতকরা একশ জন বিচারকই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। দেশের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিচারের সময়ও অনেক বিশিষ্ট দলনেতা ও সামরিক অফিসার উপস্থিত থাকেন ট্রাইবুন্যালের সদস্যরূপে। বেরিয়ার বিচারকদের মধ্যে ছিলেন মার্শাল অব সোভিয়েট ইউনিয়ন, চেয়ারম্যান অব অল্ ইউনিয়ন সেণ্ট্রাল কাউন্সিল অব ট্রেড ইউনিয়নস, আর্মি জেনারেল, সেক্রেটারী অব দি মস্কো রিজিওন্যাল কমিটি অব দি কমিউনিস্ট পার্টি অব দি সোভিয়েট ইউনিয়ন, চেয়ারম্যান অব দি কাউনসিল অব ট্রেড ইউনিয়নস্ অব জর্জিয়া, ফার্স্ট ডেপুটি মিনিস্টার অব ইন্টারন্যাল এ্যাফেয়ারস ইত্যাদি। এ যেন কমিউনিস্ট পার্টির উচ্চতর পরিষদের এক জরুরী বৈঠক। এই হল ট্রাইবুন্যালের চেহারা। এর নাম সর্বহারার 'উচ্চতর' শ্রেণী-গণতন্ত্র, আদর্শ গণতন্ত্র!

চেকোশ্লোভাকিয়া রাষ্ট্রে শ্লান্স্কী-বিচার প্রসঙ্গ

চেকোশ্লোভাকিয়ায় ১৯৫২ সালের নভেম্বরে শ্লান্স্কীর (Slansky) বিচার সুরু হয়। সেদেশে খ্যাতনামা ১৪ জন কমিউনিস্ট পার্টি নেতা ও উচ্চ পদাধি-

কারী দলের অপরাপর কয়েকজন নেতার এই সঙ্গে যৌথ বিচার হয়েছিল। এঁদের মধ্যে ১১ জনই ছিলেন ইহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত (স্তালিনপন্থীদের ইহুদী-বিদ্বেষ হিটলারের ও নাৎসীদের মতই সর্বজনবিদিত।) রুডল্‌ফ্ স্লানস্কীর সঙ্গে ছিলেন অভিযুক্তদের মধ্যে আঁদ্রে সিমনে। ৩০ বছর যাবৎ দলের সদস্য। বিচারের সময় তিনিও 'স্বীকারোক্তি' করলেন। তিনি 'স্বীকার' করলেন: ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে রুডল্‌ফ্ স্লান্‌স্কী তাঁকে চেক দেশের রাজনৈতিক বিপ্লবের ইতিহাস, বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি কি করে ক্ষমতা দখল করেছিল তার ইতিহাস লিখতে অনুরোধ করেছিলেন। স্বীকারোক্তিতে বলা হয়েছিল:

"Slansky asked me to describe him as the chief personality of this period and told me to model my book on Reed's 'Ten days that shook the World' written in the Trotskyist spirit. By falsifying history Slansky wanted to gain popularity among the Czechoslovak people and to suppress the leading and decisive part played by Gottwald."

"স্লান্‌স্কী তাঁকে সিমনে-রচিত রাজনৈতিক ইতিহাসে বিপ্লবের মূল নায়ক ও জননায়করূপে চিত্রিত করতে অনুরোধ করেছিলেন। অনুরোধ করেছিলেন যে-দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জন রীড তাঁর রচিত 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন' নামে বিখ্যাত রুশ-বিপ্লবের কাহিনী লিখেছিলেন ঠিক সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিপ্লব-ইতিহাস যেন লেখা হয়। জন রীড্ নাকি ট্রট্স্কীপন্থী'র দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর বইটা লিখেছিলেন। জন রীডের পুস্তকে রুশ-বিপ্লবে ট্রট্স্কীকে এক উচ্চ স্থান দিয়েছিলেন লেখক, স্তালিনকে নয়। এইখানেই স্তালিনপন্থীদের রাগ। ক্লিমেণ্ট গটওয়াল্ড, যিনি কট্টর স্তালিনপন্থী বলে পরিচিত ছিলেন, চেক-বিপ্লবের ইতিহাস রচনার সময় সিমনে গটওয়াল্ডকে মূল নায়ক হিসাবে যাতে চিত্রিত না করেন সেই অনুরোধ স্লান্‌স্কী নাকি করেছিলেন।

[জন রীডের এই রোমাঞ্চকর পুস্তক 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন' স্তালিনের জীবদ্দশায় রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য 'সমাজতান্ত্রিক' দেশগুলির পাঠাগারগুলিতে স্থান পায়নি। দেশবাসী সেই বই পড়ারও সুযোগ পায়নি। এতে যে স্তালিন-বন্দনা ছিল না। বইটি বর্তমানে আবার ছাপা হয়েছে তবে লেনিনের আগের 'ভূমিকা'টি কিন্তু নেই। অনুসন্ধিৎসু পাঠক মিলিয়ে নিতে পারেন।]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার জন রীডের উপরোক্ত বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা স্বয়ং লেনিন করেছিলেন। পুস্তকের ভূমিকায় লেনিন লিখেছিলেন :

"Unreservedly I recommend it to the workers of the world. Here is a book which I should like to see published in millions of copies and translated into all languages. It gives a most truthful and vital exposition of the events so significant to the comprehension of what really is the proletarian revolution and the dictatorship of the proletariat."

বইটির মধ্যে কিছু মাত্র অসত্য তথ্য থাকলে লেনিন এভাবে ভূমিকা লিখে দিতেন না নিশ্চয়ই এবং বইটিরও দ্বিধাহীন চিত্তে তিনি রুশবাসী ও বিশ্ববাসীর কাছে সুপারিশ করতেন না।

তাহলে এই বইটি 'ট্রট্স্কীপন্থীর দৃষ্টিকোণ' থেকে লেখা হয়েছিল বলে যে অভিযোগ উঠল সেটাও টেকে না। আর বিকৃত ইতিহাস লিখতে অনুরোধ করা তো রাষ্ট্রদ্রোহিতা হতে পারে না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস—বিপ্লবীদের ভূমিকা—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবী ভূমিকা, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ভূমিকা এসব ব্যাপারে কত লেখকদের দিয়ে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বিকৃত ইতিহাস লেখার তো বিরাম নেই।

[ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে যাঁরা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন, যাঁরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তাঁরাই এ কালে দিল্লীর প্রসাদ-পুষ্ট হয়ে ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাস লিখছেন এবং লেখাচ্ছেন আড়ালে থেকে।]

রুডল্ফ্ স্লান্স্কীর কথা হচ্ছিল। তিনি তো ছিলেন পয়লা নম্বর আসামী। তাঁরই জন্মদিবসে ১৯৫১ সালের জুলাই মাসের চেক সরকারী Rudo Pravo পত্রিকায় বলা হয়েছিল :

"Rudolf Slansky's outstanding feature is loyalty. Loyalty to the principles of Marxism-Leninism, loyalty to Soviet Union—the foundation stone of Socialism in the

whole world, loyalty to the teachings and achievements of Great Stalin. And he shows the same unshakable loyalty and devotion to our working class, to our whole people, our Communist Party and its pilot comrade Gottwald. Gomrade Slansky has been a close faithful adjutant to Klement Gottwald for 25 years." [Modern Inquisition, Hugo Dewar]

"রুডল্‌ফ্‌ স্লান্‌স্কীর সবচেয়ে বড় গুণ তাঁর আনুগত্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি, সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি (দেশপ্রেমিক চেক নেতার আনুগত্য সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি কেন থাকবে?), সর্বোপরি মহান স্তালিনের প্রতি। তাছাড়া তিনি সমগ্র মেহনতী জনগণের প্রতি, জাতির প্রতি এবং ক্লেমেণ্ট গটওয়াল্ডের প্রতি প্রগাঢ় দরদ ও নিষ্ঠা প্রদর্শন করে এসেছেন। সুদীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ তিনি গটওয়াল্ডের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরূপে পরিচিত।"

স্লান্‌স্কীর জন্মদিবসে কমিউনিস্ট পার্টি তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে যে প্রশস্তি পত্র পাঠিয়েছিলেন তাতে স্বয়ং গটওয়াল্ডের এবং প্রধানমন্ত্রী জাপাট্‌কী এত শ্রদ্ধা ও প্রশংসার পরও ছমাসও কাটল না। স্লান্‌স্কীকে চেক কমিউনিস্ট পার্টির পদ থেকে অপসারিত করা হল। এই স্লান্‌স্কীর পঞ্চাশতম জন্মদিনে তাঁর সম্মানার্থে সে-দেশের কল-কারখানা খামারের শ্রমিকদের অতিরিক্ত পরিশ্রম করে উৎপাদন বাড়াবার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছিল। আবার এ হেন নেতার বিচারের পর যখন প্রাণদণ্ডাদেশ জারী হল তখন আবার এই শ্রেণী-সচেতন (!) শ্রমিকদের সর্বহারার 'উচ্চতর গণতন্ত্রে' অতিরিক্ত খাটুনী খেটে ছুটির দিনেও কাজ করে পার্টিকে কলঙ্ক-মুক্ত করার ব্যবস্থা হয়েছিল।

স্লান্‌স্কী ২১ বছর বয়স থেকে পার্টির সভ্য ছিলেন। আর সেই ব্যক্তি বিচারের সময় নিজের বিরুদ্ধে আনীত যাবতীয় অভিযোগ 'স্বীকার' করে নিলেন। এই হাস্যকর অদ্ভুত 'স্বীকারোক্তি' করতে গিয়ে তিনি বললেন আদালতের সামনে—তিনি নাকি কোন কালেই কমিউনিস্টই ছিলেন না। আরও বললেন:

"I prepaied for war yet talked of peace, talked of democracy and socialism but prepared for fascist dictatorship". অর্থাৎ তিনি 'মুখে শান্তির কথা' বললেও কার্যত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি চালিয়ে-

ছিলেন। মুখে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের কথা বললেও কার্যত ফ্যাসিস্ট এক-নায়কতন্ত্রের জন্য কাজ করেছন।"

সত্যই কি বিচিত্র সর্ব্বহারা আদর্শ গণতন্ত্র!

সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরী রাষ্ট্রে ল্যাজলো রাজেকের বিচার

এই ধরনের 'কনফেশন ট্রায়াল' স্বীকারোক্তি-ভিত্তিক রাজনৈতিক মামলার বিচার প্রহসন হাঙ্গেরী-বুলগেরিয়াতেও হয়েছিল। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিচারের বিষয়ই আলোচনা করছি মাত্র।

হাঙ্গেরীর কমিউনিস্ট নেতা Laszlo Rajk-এর বিচারটিও স্মরণীয়। ইনি ছিলেন একজন কট্টর স্তালিনপন্থী নেতা। Laszlo Rajk দেশদ্রোহিতার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই বিচারের কিছুকাল পূর্বে হাঙ্গেরীর সর্বোচ্চ-পদে অধিষ্ঠিত কমিউনিস্ট নেতা Mattias Rakosi এক বিবৃতিতে বলেছিলেন:

"Let me say a few words about the appreciation of the activities of comrade Laszlo Rajk, Minister of Interior who was the object of so many attacks incurred as a result of the undermining of conspirators. It was not by chance that the fury of the react on, organised underground, concentrated particularly upon his person. They knew that they stood in opposition to a man who had come from Hungarian working people··· who was a courageous and intruepid fighter in the Hungarian workers, movement, who fought in the Spanish revolution and who with death-defying courage suffered in 1944 and who was forged like steel in the uncompromising battle against the Horthy reaction. Now we know that the conspirators had launched a systematic calumny campaign against him and the Democratic police··· We trust Rajk and the Democratic police to carry out, by through and good work, the consolidation and defence of democracy···" [Modern Inquisition, Hugo Dewar]

এই Rajk-এর বিরুদ্ধে আদালত ঘোষণা করলেন: "তিনি নাকি প্রথম থেকেই পুলিশের লোক ছিলেন—সাম্রাজ্যবাদী ও রাজতন্ত্রের হয়ে তাদেরই অর্থে পুষ্ট হয়ে গোয়েন্দাগিরি করেছেন। জীবনে তিনি যে অসংখ্যবার কারাবরণ করেছিলেন তাও নাকি পুলিশের নির্দেশ অনুসারে, কমিউনিস্টদের বিশ্বাসভাজন হয়ে ভিতর থেকে ষড়যন্ত্রকে সফল করার জন্য। অর্থাৎ যখন পুঁজিবাদী রাজতন্ত্র হাঙ্গেরীতে কায়েম ছিল তখন পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ সেই শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই পরিচালনা করে তাকে ধ্বংস করে তার জায়গায় নূতন কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পুলিশ Laszlo Rajk-কে নিযুক্ত করেছিল। পুলিশের নির্দেশেই তিনি নাকি স্পেনের গৃহযুদ্ধে গণতন্ত্রের পক্ষে জীবন বিপন্ন করে লড়াই করতে যান।" বিচারের পূর্বে কমিউনিস্ট পত্রিকায় এই সব কথা বলা হল।

বিচারের আগেই কারারুদ্ধ থাকাকালে এই আক্রমণ চলতে থাকে তাঁর বিরুদ্ধে। এঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ—ইনি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সমর্থক ছিলেন এবং সোভিয়েট রাশিয়াকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না। এটাই আসল অভিযোগ হতে পারে না। এই একই অপরাধ করেছিলেন যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্র-নায়ক বিপ্লবী মার্শাল টিটো, চিন্তা-নায়ক মিলোভান জিলাস। মার্শাল টিটোকে স্তালিন ও তাঁর সহকর্মীরা ঘায়েল করতে পারেন নি। কেননা তিনি শুধু বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ, বড় যোদ্ধা, দেশের ত্রাণকর্তাই নন—সর্বোপরি তাঁর পেছনে ছিল অনুগত বিশ্বস্ত রাজনৈতিক দল এবং সামরিক বাহিনীর অকুণ্ঠ সমর্থন। অন্যান্য যে-দেশেই সম্ভব হয়েছে এমনিভাবে দেশদ্রোহিতার অজুহাতে সম্ভাব্য বিরোধীদের রুশ রাজনীতি কূটনীতি ও সম্প্রসারণ নীতির যুপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হয়েছে।

Rajk-ও তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগ সত্য বলে 'স্বীকারোক্তি' করলেন। তিনি স্বীকার করলেন যে, পুলিশের চর হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে অনুপ্রবেশ করেন এবং ভিতর থেকে দলের কর্মসূচী ব্যর্থ করার চেষ্টা করে এসেছেন। [কিভাবে এহেন ব্যক্তি তাহলে কমিউনিস্ট দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হন? এটা কমিউনিস্ট শাসন-ব্যবস্থারই বৈশিষ্ট্য। কমিউনিস্ট দলের গঠনতন্ত্র ও আভ্যন্তরীণ পরিচালনা সম্বন্ধে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, দীর্ঘদিন ধরে দলের ভিতরে থেকে দলের বিরুদ্ধাচরণ, কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের

বিরুদ্ধাচরণ করলে কমিউনিস্ট দলে তার স্থান হয় না।] আর যে-দল পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে 'সুশৃঙ্খল' 'নিয়মানুগ' এবং সব দিক দিয়ে আদর্শ-স্থানীয় বলে দিবারাত্র প্রচারিত হয়ে থাকে সেই 'বিপ্লবী' দলের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিস্ট আদর্শ-বিধ্বংসা শক্তির প্রতিনিধি স্বরূপ একজন নেতা আত্মগোপন করে দীর্ঘকাল ধরে ধ্বংসাত্মক রাষ্ট্র-বিরোধী কাজ করে যাবেন, দলের সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হবেন একথা স্বীকার করলে কমিউনিস্টদের খুশি হবার কোন কারণ থাকে না। যাঁরা লৌহ-যবনিকার অন্তরালে থেকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত মুহূর্তের মধ্যে আবিষ্কার করে তাকে ব্যর্থ করার কৃতিত্ব দাবী করে থাকেন তাঁরা নিজের ঘরের 'মুখোশধারী' 'চক্রান্তকারীদের' চিনতে পারলেন না? ভিন্নমতাবলম্বীদের মনে তো প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আজকের কমিউনিস্ট নেতারাও যে 'মুখোশধারী' 'চক্রান্তকারীদের অর্থপুষ্ট' নন তারই বা কি প্রমাণ?

এক-পার্টি-শাসিত একনায়কতন্ত্রী সমাজতান্ত্রিক দু'-একটি রাষ্ট্রের দু'-চারটি রাজনৈতিক নেতার বিচার প্রসঙ্গ নিয়ে যে-আলোচনা করা হল তা থেকে 'আইনের শাসনের' একটা রূপ পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রত্যেক দেশই আইনের দ্বারা শাসিত হয়—তা সে ক্যাপিটালিস্ট কমিউনিস্ট ফ্যাসিস্ট বা সামরিক জুন্টা শাসিতই হোক। সব দেশেই শাসক শ্রেণী 'আইনের শাসনের' বড়াই করে থাকে এবং প্রচলিত আইন ও শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে কেউ গেলে কঠোর শাস্তির লাঠি সব দেশের নাগরিকদের মাথার ওপর ডেমক্লিসের তরবারির মতই সদা-উদ্যত থাকে। কিন্তু আইন তো 'বেআইনী আইন' 'lawless law' হতে পারে। তাই সব আইনের প্রতি প্রশ্নাতীত দ্বিধাহীন আনুগত্য জাতির স্বাস্থ্যের লক্ষণ হতে পারে না। এই ধরনের অন্ধ আনুগত্য ও বশ্যতা আইনের প্রতি ততটা নয়, যতটা শাসক শ্রেণীর বাধা-মুক্ত শাসনের প্রতি। শাসক শ্রেণী নিজের একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারকে পুলিশ মিলিটারী দিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে জনগণকে দিয়ে মানিয়ে নেবার জন্যই প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে পারে। আইন-প্রণয়ন, আইনের ব্যাখ্যা এবং আইনের প্রয়োগ এই ত্রিবিধ কাজ যদি একই সংস্থার ওপর ন্যস্ত ও কেন্দ্রীভূত হয় তাহলে 'আইনের শাসনের' নামে চালু হয় অসুর-দানবের রক্তাক্ত শাসন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ভিন্ন প্রকৃত গণতন্ত্র অসম্ভব। ব্যক্তি-মর্যাদা, ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে পদদলিত বা উপেক্ষা করতে, রাষ্ট্র-সর্বস্বতা দল-

সর্বস্বতাকে দেশের আরাধ্য আদর্শ-প্রতিমারূপে পুজো করতে শেখানর রাজনীতি 'আইনের শাসনের' সহায়ক হয় না কখনই।

রুশ দেশে আদর্শের (Ideology) নামে শাসকগোষ্ঠী স্তালিনের যুগে লক্ষ লক্ষ নাগরিককে খতম করেছিল, লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাধ্যতামূলক দাস শিবিরে চিরবন্দী করে রেখেছিল। সেদেশে সকল প্রকার রাজনৈতিক বিরোধিতার অবসান ঘটানর চক্রান্ত হয়েছে। বিশ্ব-বিশ্রুত সাহিত্যিক সলঝেনিৎসীনের চাঞ্চল্যকর পুস্তকে [The Gulag Archipelago, Vol. I, By Alexander Solzhenitsyn] তার বর্ণনা রয়েছে। এই ঐতিহাসিক পুস্তক বিশ্ব-বিখ্যাত সাহিত্যিক তাঁর স্বদেশবাসীর জন্যই মূখ্যত লিখেছেন। সত্য কথা বলার অপরাধে তাঁকে নিজের মাতৃভূমি থেকে নির্বাসিত হতে হল। শুধু রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও ভিন্নমত স্তব্ধ করাই হয়নি বা হচ্ছে না। বিজ্ঞান সাহিত্য শিল্প-কলা সর্বক্ষেত্রেই 'পার্টি-লাইন' অবশ্যমান্য। শাসক গোষ্ঠী মতবাদের (Ideology) প্রয়োজনমত যেমন যেমন ব্যাখ্যা করবেন বিজ্ঞানী-সাহিত্যিক-শিল্পীকে সেই-ভাবেই কাজ করতে হবে। একনায়কতন্ত্রের বিভীষিকার দুঃস্বপ্ন নিয়ে কোন শিল্পী নাট্যকার পেরেছেন সমাজতান্ত্রিক রুশ দেশে কোন 'দুঃস্বপ্নের নগরী' মঞ্চস্থ করতে, অথবা খর্বতার অপমানে অপমানিত মনুষ্যত্বের হয়ে শাসক শ্রেণীকে 'দিন বদলের পালা' শোনাবার সুযোগ পেয়েছেন সে দেশের কোন সাহিত্যিক নাট্যকার লেখক বিরোধী দল ?

বিচার-ব্যবস্থা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থতার হাতিয়ারে যেন পরিণত হয়। অভিযুক্ত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের 'স্বীকারোক্তি আদায়ের' পদ্ধতি, বিচার পদ্ধতিই তা প্রমাণ করে দেয়। স্বরাষ্ট্র দপ্তরে, গোয়েন্দা ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাই চূড়ান্ত। বিচার বিভাগীয় পর্যবেক্ষণের বা তদারকির কোন সুযোগই নেই। আদালত পুলিশ প্রশাসনের হাতের রবার স্ট্যাম্প ছাড়া আর কিছুই নয়। সর্বশক্তিমান শাসন বিভাগের অধিকর্তার অভিরুচি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত মতামতই একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রে আইনের প্রকৃত উৎস, জনগণের সচেতন পরিমার্জিত ইচ্ছা ও নির্ভীক মতামত নয়।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র এবং সমগ্রতান্ত্রিক (totalitarian) সমাজতন্ত্রের ব্যবধান বুঝে নিতে সচেতন সজাগ নাগরিকের কোন অসুবিধাই হয় না। স্বাধীন নির্ভীক বিচারালয় ব্যক্তি-স্বাধীনতার বড় দুর্গ বলে গণতান্ত্রিক দুনিয়ায়

বন্দিত আজও। কিন্তু বিচারালয় যেখানে শাসন বিভাগের হাতের ইচ্ছামত ব্যবহারের রবার স্ট্যাম্প সেখানে কোন দেশের শাসনতন্ত্রে (Constitution) ব্যবহৃত গালভরা মন-জুড়ান শব্দে-ঠাসা 'মৌলিক অধিকার' বাগাড়ম্বর ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এ অবস্থার জন্য সমস্ত দোষ স্তালিনের একার ওপর চাপালে সত্যের অপলাপ হবে। আসলে এর সুরু লেনিনের সময় (১৯১৮) থেকেই। সোভিয়েট বিচার-প্রথা রাজনৈতিক জিঘাংসা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতার হাতিয়াররূপে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে লেনিনের সময় থেকেই। কোন সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণ গ্যারান্টি লেনিন নিজেও চাননি বা সৃষ্টি করেন নি অবিচার নিপীড়ন ও প্রতিহিংসার হাত থেকে দলের কর্মী সমর্থক ও নাগরিকদের বাঁচাবার জন্য। রাশিয়ায় বিপ্লবের পর থেকেই পুলিশ গোয়েন্দা সাধারণ প্রশাসন পুলিশের তদন্তকারী অফিসার বিচারক সবাইকে একই তন্ত্রে ও মন্ত্রে বাঁধা হয়েছে। এ অবস্থায় নিরপেক্ষ ন্যায় ভিত্তিক বিচার কি করে সম্ভব? কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে বিচারালয় কমিউনিস্ট রাজনীতির উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ার মাত্র।

১৯৩৮ সালে প্রকাশিত একটি কমিউনিস্ট বুলেটিনে বলা হয়েছিল:

"The State demands that all its courts shall wage an implacable struggle against all the enemies of socialism··· In sweeping away and utterly exterminating the traitorous Trotskyites and Bukharinites the court will be fulfilling their sacred duty towards the country."

[Bulletin Quotidien, August 22, 1938]

"আদালতের মুখ্য কাজ হবে সমাজতন্ত্রের শত্রুর বিরুদ্ধে বিচারহীন লড়াই চালিয়ে যাওয়া। বিশ্বাসঘাতক ট্রট্স্কীপন্থী বুখারীণপন্থীদের নির্মূল করে, তাদের বিলুপ্তি সাধন করে দেশের প্রতি তাদের পবিত্র কর্তব্য যথাযথভাবে দেশের আদালতগুলি পালন করবে।"

তাই দেখা যাচ্ছে প্রতিহিংসাপরায়ণতা স্বেচ্ছাচারিতা নৃশংসতা সমগ্রতান্ত্রিক বিচার-প্রথার (totalitarian justice) প্রাণ। বিচারকরা তাঁদের বিচার-বোধকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করবেন তথাকথিত 'বৈপ্লবিক যুক্তির' ('Revolutionary reason') দ্বারা। দেশের দণ্ড আইনের ৫৮ ধারায় সকল প্রকার 'প্রতি-বিপ্লবী' কার্যকলাপ ('All forms of counter-revolu-

tions') দমন করতে বলা হয়েছে। আর এই অভিযোগে পুলিশ যে-কোন ব্যক্তিকে যখন-তখন খুশিমত অভিযুক্ত করতে পারে, যে-কোন দণ্ড দিতে পারে সেদেশে 'হেবিয়াস কর্পাস' পিটিশন করার কোন সুযোগই নেই। 'কৃষিতে অসাফল্য' বা 'ব্যর্থতা' (shortcomings in agriculture, emphasis on small and cottage industry, heavy industry, failure to achieve production target) এ সবই ৫৮ ধারার আওতায় আসতে পারে উৎপাদন হ্রাস পাবার জন্য শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার, ম্যানেজার সবাই 'প্রতি-বিপ্লবী তৎপরতাকে সাহায্য করছেন বলে অভিযোগ আসতে পারে। আবার দণ্ড আইনের ১৬ ধারায় বলা হয়েছে: "Acts constituting social danger and not provided for in the existing courts may be judged by analogy"। তাই সরাসরি ৫৮ ধারার আওতায় না এলেও দণ্ড আইনের ১৬ ধারা বলে অবলীলাক্রমে পুলিশ এঁদের অভিযুক্ত করতে পারে। আদালতও তাদের নির্মম শাস্তি দিতে পারে প্রয়োজন মনে করলে।

এই ধরনের বিচার-ব্যবস্থাকে দেশের আরাধ্য আদর্শ প্রতিমারূপে চিত্রিত করে ভারতের বিচার-ব্যবস্থাকে সেই ছাঁচে ঢালাই করা হবে কিনা দেশের রাজনীতিবিদ নাগরিক বুদ্ধিজীবীদের দেশহিতৈষীদের বিচার করে দেখা দরকার।

॥ পরিশিষ্ট ॥

From—

Kashi Kanta Maitra
Member, Legislative Assembly
West Bengal
45, S. R. Das Road,
Calcutta-700 026.
July 2, 1975.

Sri Lakshmi Kanta Bose, M.L.A.,
General Secretary,
Congress Legislature Party,
77, Acharya Jagadish Chandra Bose Road,
Calcutta-700 014.

Dear Friend,

I am in receipt of your letter dated, Calcutta June 27, 1975, communicating to me your exparte decision suspending me from the Congress Legislature Party.

... ...

.. Today the West Bengal Congress Party has shed its democratic ideal and has allowed itself to be converted into a one man show as those seeking favour are too willing to dance to the tune set by the showman. It is no wonder therefore that all who are interested are dancing to the the witch-hunt tune in utter disregard of decency and morality. I would ask those who are dancing to the tune not to ignore the lesson of history.

... ...

The whole atmosphere is sickening and suffocating to-day. Party Members are stripped of all their cherished democratic rights. Party has been turned into an oppressive bulldozer driven by a power-drunk and ambitious careerist. There has been a crackdown on all forms of political criticism. Voices of dissent have been stilled. Even slightest breath of dissidence is not tolerated. The whole Party and its proclaimed ideal of socialist democracy have been sought to be forced into the procrustean frame of an insance power-philosophy unrelated to public good. The eerie quiet of the graveyard and the prison has descended on the country and the party. Whole climate is vitiated by an all-pervading fear psychosis. This is undeniably the ideal psychological moment for the leader of the Party to launch witch-hunt enquiries to eliminate those who stand for democratic socialist values in instalments on false pleas.

What sort of political morality is there in our party and public life if dissenting opinions are not only ruthlessly gagged but punished by expulsions, arbitrary motivated suspensions and detention behind prison bars? Those who would express contrary opinions are expelled or suspended from party in shameful disregard of democratic norms and values. Party to-day is wholly power-oriented and not value or service-oriented. Power is increasingly torn away from the Party workers, sympathisers and the people and is being used against them. Power is being used as a weapon of blackmail as well. You call it democracy? It is modern Machiavellianism. Leader invested with god-like infallibility is surrounded by sycophants and flunkeyes. In the din of

their nauseous flatteries—goodness politics is drowned. Members of the Party are asked to obey 'orders' and not to question them. Is this democracy ?

Has the Congress Legislature Party, during the last two years or so, held any meeting to seriously discuss political ideological issues and the programme of the party, the incredible poverty, unspeakable suffering and misery of the masses, the appalling unemployment problem and the explosive economic situation obtaining in the State ? Have you or the leader of the Party ever in humility discussed yawning gap between promises and performance ? The Congress Legislature Party, I should say the entire Party, is being used as an adjunct to buttress up the personal power of the Chief Minister, as a registering machine to be occasionally commissioned to put the seal of approval of the whims and caprices of one man. Members of the Legislature Party cannot speak out their mind for fear of the 'muscle men' of democracy. Dissent is equated with treason to-day. Must there be no competition of ideas, free-struggle for opinion in a political party, more so when it professes democratic socialism ? Does 'freedom' mean freedom for those who hold opinions favourable to the ruling gods, the supporters of the governing caucus ? Does not this term imply freedom to think differently ? Leaden rump of autocracy has come to reign on the head of our basic ideology and the cherished values for which the party had fought and bled.

You will still talk of discipline and political morality ? You as the Secretary of the Congress Legislature Party surely know who is the principal offender against violations of rules

of discipline, political ethics and code of conduct. In a political party slanderers and villifiers should have no place. I am not affraid of the punishment you may be commanded to inflict, for members have no independent views of their own. I should have thought that every member of the Executive Committee and the Legislature Party should feel sorry and terribly sad for all that are being done in the name of the party and its new cult.

With political dissent stifled, opposition suppressed, free press muzzled completely, legislature emasculated, judiciary and judicial process humbled, democracy is dead and gone, its corpse is put rescent. Yet democracy in our last and the only hope. Long live Democracy. Long live soldiers of Democratic socialism. Is there anyone who can speak up against dictatorial conduct of the Chief Minister ? Party is mere play-thing in his hand to-day. This is not my explanation but my protest against your action. The power-drunk leadership, is fighting forces of democracy in Stalinist style. I would, incidentally, ask you and through you all the members of the Congress Legislature Party to go through the thought-provoking theoretical article by Pandit Nehru captioned 'The Basic Approach' published in the Economic Review in 1958 a Journal of the A.I.C.C. and consider dispassionately if the party is following the correct path to socialism and democracy. It is unmistakably clear that the 'Basic Approach' has been given a complete go-by.

What I have said are not unconnected with your motivated witch-hunt 'enquiries'. There is still time to raise your heads high with dauntless hearts and fight for demo-

cracy and fundamental freedoms. I find five of us have been suspended. This is just the beginning. To-day it is our turn no doubt, but similar fate awaits others as well. The purge-dragon will not be satisfied with only few sacrifices. It would not relent but cry for more. These are the testing times. Please do not play the role of mere onlookers. At such moments one needs to be reminded of the unforgettable words of Netaji Subhas Chandra Bose: "Forget not that greatest crime is to compromise with injustice and wrong...... Remember that the highest virtue is to battle against inequity, no matter what the cost may be". There come moments in individual's life when one must assert that our rights and liberties cannot be bartered away and must not hesitate to pay the full price of such assertion. Harmful truth is better than useful lie, in the ultimate analysis, for history is a stern judge and it forgives none.

You may be burning the ideals and ideas to-day which you were taught to worship with religious scrupulousness and worshipping creeds which you all learnt to loathe and burn in the past at the behest of a tyrant with clay feet but you can't force all to fall in line with you. Truth and good will persist even in the midst of untruth. The lamp of democracy and human values will remain aflame in the hearts of the members of the Party and the people even in the darkest hour. It may flicker, it might become at times dim and obscure but, I dare say, it will never be extinguished.

'Jai Hind'

Yours truly,
Kashi Kanta Maitra

N.B. Copy to :

Members of the Executive
Committee and President,
W.B.P.C.C., Calcutta for
information.

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ১৯৫৫ সালের ২৬শে জুন রাত্রে "জরুরী অবস্থা" জারী হবার পরের দিন ২৭শে জুন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কংগ্রেস পরিষদীয় দল থেকে লেখকসহ ৫ জন বিধানসভার প্রবীণ সদস্যকে সাসপেণ্ড করে 'শো কজ' নোটিশ জারী করা হয়। ঐ 'শো কজ' নোটিশের জবাবে লেখকের দীর্ঘ পত্রের কিছু অংশ প্রকাশ করা হল।

প্রকাশক